ইন্দিরা দেবী

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

পাঁচ টাকা

প্রাতঃস্মরণীয় পরমারাধ্য পিতামহদেব পূজ্যপাদ

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

শ্রীপাদপদ্মে—

দাদাবাবু!

তুমি তুলে দিয়েছিলে সুরভি কুসুম-দলে—
তুমি স্নেহ কল্পতরু—বসি' তব ছায়া-তলে
জীবন-প্রভাতে দেব! হেরেছি অরুণোদয়—
দুর্গম সংসার-বর্ত্মে আজো লভি 'বরাভয়'!
এবে তুমি বহুদূরে—হে আমার পূজ্যতম—
লহ এ দীনের পূজা—শতবার নমোনমঃ।

প্রণতা—

"সুরূপা"

"যথা স্পর্শমণি স্পর্শাৎ
দুর্ব্বর্ণাদেঃ সুবর্ণতা।
তথা সাধুবধূ যোগাৎ
কুটুম্বস্যাপি সাধুতা॥"

প্রথম খণ্ড

১

প্রজাপতির দূত

হুগলী-ঘাট ষ্টেশনের অনতিদূরে গঙ্গার ধারে একখানি একতালা বাড়ী। বাড়ীখানি পাকা, ইটের গাঁথুনি, বহুকাল মেরামত হয় নাই, অনেকগুলি বর্ষার ধারা তাহার মান্ধাতার আমলের চূণের কাজকরা দেওয়ালে কালো কালো রেখা আঁকিয়া আঁকিয়া সবটুকুকেই এখন একরঙ্গা করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। সদর দরজার উপর বড় বড় অক্ষরে "হরের্নামৈব কেবলম্" এবং তাহার নীচে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" লেখা। বাড়ীখানি যে কোন নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর, তাহা প্রথম দৃষ্টিপাতেই বুঝা যায়।

বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে খিড়কীর পুকুর, চারিধারে আম, জাম, ডুমুর, সজিনা প্রভৃতি বড় বড় গাছপালা পুকুরটিকে রৌদ্রালোক হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আশপাশের গাছের ঝরা পাতায় পুষ্করিণীর জল অনেক সময় আচ্ছন্ন থাকিলেও বাতাস বহিলে জলের গায়ে একটা শিহরণ উঠিয়া ভাসমান পাতাগুলিকে একপাশে জড় করিয়া দেয় এবং ভিতরের স্বচ্ছতা কাচের মত ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠে। গঙ্গা কাছেই, তাই স্নান ও পানের জন্য এ জল ব্যবহার করা হয় না, গৃহস্থের অন্য সকল কাজ এই জলেই চলিয়া থাকে। পুষ্করিণীর ডান দিকে অনেকখানি জমিকে ফণিমনসা ও রাংচিতার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া বাগান করা হইয়াছে। বাগানে দেশী বিলাতী অনেক জাতীয় ফুলের গাছ—যূঁই, বেল, টগর, মল্লিকা, স্থলপদ্ম, সূর্য্যমণির সহিত হাসনাহানা, মোরগ, জিনিয়া এবং কয়েকটি অজ্ঞাতনামা বিলাতী ফুল ও পাতাবাহার ক্রোটন গাছ মিশিয়া বাগানখানির শোভাবর্দ্ধন ও উদ্যান-স্বামীর সুরুচির পরিচয় দিতেছে।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন বৈকালের দিকে মেঘ ও বিদ্যুতের অবিশ্রাম কৌতুক-দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। খানিক আগে পেঁজা তূলার মত যে হাল্কা মেঘ রৌদ্রহীন নীলাকাশের বুক জুড়িয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, এখন সেগুলা অদৃশ্য,—বাতাসের জোরে সন্‌সন্ করিয়া ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের স্থানে কয়েকটা বড় বড় কালো মেঘের টুকরা সারা

আকাশ জুড়িয়া ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে মাঝিমাল্লারা সাবধানে নিজ নিজ নৌকা তীরের দিকে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়েরা শুকান কাপড় প্রভৃতি তুলিবার জন্য ছাদে উঠিয়াছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঝড়ের আভাস মাত্রেই অভিভাবকদের মানা না মানিয়া মহানন্দে বাহিরে ছুটাছুটি-খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

সেই আসন্ন বৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া এগারো কিংবা বারো বছরের একটি বালিকা একটি বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতির অনুসরণে পূর্ব্ববর্ণিত বাগানে চক্র দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার ঘন কেশপাশ সেই প্রবল বাতাসে দুলিতেছিল; ধূলা উড়িয়া তাহার সুন্দর সুগোল মুখখানি ও খোলা চুলে যেন পিঙ্গলবর্ণের আবির মাখাইয়া দিতেছিল। ঝড়ের মধ্যে লঘু-পক্ষ প্রজাপতিটা কখন যে কেমন করিয়া দৃষ্টিপথ এড়াইয়া কোন নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়াছে, বালিকা তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইল না। ক্ষুণ্ণচিত্তে সে বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বৃষ্টি নামিল। রৌদ্রদগ্ধ ধরণীর বক্ষতাপ জুড়াইবার জন্যই যেন বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল।

ভিতর হইতে ঘন ঘন ডাক আসিল,—"উমা—উমা—জলে ভিজ্‌ছিস্ বুঝি?" সঙ্গে সঙ্গেই এক অল্পবয়স্কা বিধবা ভিতরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বালিকা ছুটিয়া তাহার কাছে আসিয়া ক্ষুণ্ণমনে কহিল,—"দিদি, একটা এমন চমৎকার প্রজাপতি উড়্‌ছিল ভাই, এমন সুন্দর রং—সে কি বল্‌ব! কোথায় যে লুকিয়ে গেল খুঁজে পেলাম না।"

বালিকাকে স্নেহভরে কাছে টানিয়া তরুণী মৃদু হাসিয়া কহিল,—"প্রজাপতির পিছনে আর ছুটোছুটি কেন ভাই, প্রজাপতি মঞ্জুবাবুকে তার দূত করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি বাইরে এসে বসে রয়েছেন। মাগো—চুলগুলোর কি দুরবস্থা করেছিস্ বল্ দেখি! তোর জন্যে সত্যি উমা আমার যেন কান্না পায়। যত বড় হচ্ছিস্ ততই—"

উমা তাহার সুকোমল বাহুবেষ্টনে দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া আদরের স্বরে কহিল,—"কই বড় হচ্ছি দিদি? এই দেখ না তোমার কাঁধ পর্য্যন্ত হইনি!"

সত্যই বালিকাকে বয়সের অপেক্ষা অনেক ছোট দেখাইত। সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যের অভাবই তাহার বাড়ের মুখ বন্ধ রাখিয়াছিল।

দিদি আঁচল দিয়া তাহার মাথা মুছাইতে মুছাইতে হাসিয়া কহিল,—"আর ছোট নেই রে, বিয়ের ফুল ফুটেছে—এইবার ঘোমটা দিয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বৌ হতে হবে।"

"ইস্, হলাম ত! আমার বয়ে গেছে!"—বলিয়া বালিকা দিদিকে অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। দিদিও তাহার অনুসরণ করিল।

এই ভগিনীদ্বয় বিদ্যানাথ বাচস্পতি মহাশয়ের পৌত্রী। বাচস্পতি মহাশয় হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত। বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট খ্যাতি সত্ত্বেও সাংসারিক হিসাবে ইহার অধিক উন্নতি তাঁহার হইল না। প্রথম জীবনে তিনি নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিয়া অনেকগুলি ছাত্রকে বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। সকলের অবস্থাই যে ভাল ছিল, এমন নয়, কয়েকটি তাঁহার প্রতিপাল্যেরই সামিল ছিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োঃকনিষ্ঠ ও প্রিয়দর্শন ছিল অনাথ। আত্মীয়হীন অনাথ বালকের নামকরণ বিদ্যানাথের ৺জননীদেবী করিয়া গিয়াছিলেন। যজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের নিত্যকার্য্যকেই বিদ্যানাথ নিজের কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে অর্থ-স্বাচ্ছল্য না থাক, অভাব-বোধও সেই অনুপাতে কম ছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে নিমন্ত্রণ আসিত। সমাজেও বাচস্পতি মহাশয় একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। আড়ম্বরহীন গৃহস্থালীতে বিদ্যানাথ-গৃহিণীর অনলস সেবাপরায়ণতা ও হাসিমুখ, অভাবের দুঃখকে যেন নিকটেও আসিতে দিত না। বিদ্যানাথের পুত্র চণ্ডীচরণ সংস্কৃত শিক্ষার সহিত রাজবিদ্যাও শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিদ্যার খ্যাতিও দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছিল। তখনকার দিনে তাঁহার মত নৈয়ায়িক পণ্ডিত কেহ ছিলেন না বলিলেও হয়। চণ্ডীচরণের দুই কন্যা—অন্নপূর্ণা ও উমাসুন্দরী। বড় মেয়েটিকে বিদ্যানাথ সাত বৎসরে পাত্রস্থা করিয়াছিলেন। এত অল্পবয়সে মেয়ের বিবাহ দেওয়া চণ্ডীচরণের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পিতার একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তিনি কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। সাধ্যাতিরিক্ত সমারোহে বিদ্যানাথ সপ্তম বৎসরে কন্যাদানে পৃথিবীদানের পুণ্য-সঞ্চয় করিলেন। কিন্তু সে আনন্দ বেশী দিন ভোগ করিতে পাইলেন না। সেই সমারোহের পরিশ্রমে চণ্ডীচরণের নিউমোনিয়া হইল। তিনদিনের জ্বরে তিনি তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা, প্রেমময়ী পত্নী ও শিশু-কন্যার ভবিষ্যৎ-চিন্তা অসম্পূর্ণ রাখিয়া, কোন অজানা নূতন রাজ্যের ডাক শুনিয়া চলিয়া গেলেন। চণ্ডীচরণের অকালমৃত্যু, বিদ্যানাথের মনের উপর দিয়া একটা প্রলয়ের ঝড় বহাইয়া দিয়া গেল। শোক—শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতকে অভিভূত করিয়া দিল। পুত্র শোকাতুরা বিদ্যানাথ-গৃহিণী অল্পদিনের মধ্যেই পুত্রের অনুসরণ করিয়া সকল জ্বালা এড়াইয়া গেলেন, এবং দুঃখের চরম দৃশ্য দেখাইবার জন্যই বোধ হয় নবম বর্ষীয়া অন্নপূর্ণাও বিবাহের দুই বৎসর পরে শাঁখা সিঁদুর ফেলিয়া জননীর সহিত হবিষ্যান্নের ভাগ লইল।

এক সঙ্গে এতগুলা বড় বড় শোকে বিদ্যানাথের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুঃখের সংসারে সমদুঃখী হইয়া কাল যাপন করা ছাত্রদের পক্ষে ক্রমেই কষ্টকর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিদ্যানাথের শারীরিক অসুস্থতার অছিলা পাইয়া তাহারা একে একে রূপরাম বেদান্ততীর্থের নূতন টোলে চলিয়া গেল। সকলেই ছাড়িয়া গেল, গেল না কেবল অনাথ—সেই কেবল আত্মীয়ের মত স্নেহে যত্নে সেবায় এই বিধ্বস্ত পরিবারের সাহায্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিল। যাইবার স্থানও তাহার ছিল না।

একটা চলিত কথা আছে,—"অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।" এ ক্ষেত্রেও অনেকটা তাহাই ঘটিয়াছিল। দুঃখের বেগ ক্রমে সহনীয় সীমায় আসিলে বিদ্যানাথ দেখিলেন, অর্থ ভিন্ন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নয়। যাহারা গেল তাহারা ত জুড়াইয়া গেল, যাহারা পড়িয়া রহিল তাহাদের অসীম দুঃখের ভিতর এও আবার একটা বিশেষ চিন্তার বিষয়। বিদ্যানাথের একজন বন্ধু চেষ্টা করিয়া তাঁহার জন্য নর্ম্মাল স্কুলের হেডপণ্ডিতী যোগাড় করিয়া দিলেন। বিদ্যানাথ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। এ ভাঙ্গা মন লইয়া কোথায় আবার ছাত্র সংগ্রহ করিয়া বেড়াইবেন।

অন্নপূর্ণার বিবাহে নিজ মনের কাছে তিনি যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উমার বিবাহে তিনি যেন অত্যধিক বিলম্ব করিতে চাহিতেছিলেন। উমার মা রাজলক্ষ্মী একদিন শ্বশুরকে এ সম্বন্ধে সজাগ করিয়া লইবার প্রয়াস পাইলেন। বিদ্যানাথ, অদূরোপবিষ্টা পাঠনিরতা পৌত্রী উমার পানে সস্নেহ-নেত্রে চাহিয়া কহিলেন,—"তাই নাকি উমা, তুই তবে বড় হয়ে গেছিস্? এইবার তোর জন্যে পাগ্‌লা ভোলাকে তলব পাঠাতে হবে? তোর কিন্তু বুড়ো বর হবে বাপু, তা আমি এখন থেকে বলে খালাস"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখের পাতা যেন ভারি হইয়া আসিল।

পিতামহের কথার প্রতিবাদে উমা প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"আমি কল্লে ত।"

বিদ্যানাথ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কল্লে রে? বুড়ো বরকে বিয়ে?"

"না, কাক্কেও না"—বলিয়া উমা সে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

বধূর প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিলেন,—"তাড়াতাড়ি কেন মা? যে কটা দিন হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পারে দিক্। বিবাহ ত দিতেই হবে—বড় কি এত হয়েছে!"

কিন্তু তবু হিন্দু—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যতদিন সম্ভব কাটাইয়া একদিন বিদ্যানাথকেও স্বীকার কবিতে হইল—আর উপেক্ষা করা চলে না, এইবাব একটা স্থির করিয়া ফেলা উচিত। স্থির করাটাও তাঁহার নিজের কাছে খুব বেশী অস্থিব ছিল না। একদিন বাজলক্ষ্মীকে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"অনাথেব সঙ্গে উমাব বিয়ে দিলে হয় না ?"

শ্বশুরের গোপন ইচ্ছা রাজলক্ষ্মীব মনেও কিছু দিন হইতে অস্ফুট প্রকাশ পাইতেছিল। বধূ বোধ হয এই কথাটাই প্রত্যাশা কবিয়া আসিযাছিলেন, তাই বিস্মিত না হইয়া চুপ কবিয়া বহিলেন।

বধূকে নিরুত্তব দেখিয়া বিদ্যানাথ বিস্মিত হইলেন, তবে মত নাই না কি ? একবাব পুত্রেব অমতে একজনেব বিবাহ দিয়া তাহাব জীবনটা বৃথা কবিয়া দিযাছেন—আবাব কি তাহাই হইবে ? কিন্তু অনাথকে মন হইতে সবাইয়া দেওয়া—তাহাও যে এখন বড কঠিন সমস্যা। তাহাকে এতদিন হাতে কবিযা ঠিক নিজেব মনেব মত কবিয়া গডিয়া তুলিয়াছেন। সে যে এখন অস্থি মজ্জায তাঁহাব নিজেবই হইযা গিয়াছে। প্রলোভন বড অধিক।

বিদ্যানাথ সংশযপূর্ণ কণ্ঠে পুনবায প্রশ্ন কবিলেন,—"কেন চুপ কবে রইলে মা, তোমাব কি এতে মত নেই তবে ?"

বধূ লজ্জাকুণ্ঠিত মৃদুস্বরে কহিল,—"ছেলেটি বড গবীব, আপন জন কেউ কোথাও নেই, চিবটা জীবন উমাবও কি তবে এমনি কবে দুঃখের ভিতর কেটে যাবে ?"

বিদ্যানাথ চমকিয়া উঠিলেন। সংসাবেব এ দিকটা তিনি কখনও তলাইয়া দেখেন নাই—দেখিতে শিখেনও নাই। ভাবিতে লাগিলেন—এই জগদ্ব্যাপী বিবাট দুঃখেব হাত হইতে মুক্তি পাইবাবও স্থান আছে না কি ? অহং-মত্ত মানব নিজেব শক্তিকেই বড দেখে, মনে কবে—আমি কবি। কে কবে—কে করায ? 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' যদি তাই মানি, তবে উমার ভাগ্যলিপি কি আমার হাতে বদল হইয়া যাইবে ? শিব শম্ভো! তোমাব ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমি কেন নিমিত্ত হইতে চাই।—প্রকাশ্যে বলিলেন,—"তেমন জানা শোনা ভাল ছেলে কৈ ? আবার ওদিকটাও ত দেখতে হবে—জান ত মা আজকাল মেয়েব বিয়ের পণ দেওয়া এক বিষম দায়। ঘরের খবব ত তোমাব অজানিত নয়। অনাথের চেয়ে অন্য কিছুতে বড না হোক্, ধনে বড খুঁজতে গেলে তার দামও ত তেমনি লাগবে!"

বধূ সঙ্কোচ-জড়িত স্বরে কহিলেন,—"ও পাড়ার কাকার জামাই মঞ্জুভূষণ আজই অনাথের কাছে বলেছেন, তাঁর এক বড় মানুষের ছেলে বন্ধু পণ না নিয়ে বিয়ে করতে রাজী আছেন। ছেলে নিজে মেয়ে দেখতে চান। ছেলেটি বি-এ পাশ, আবার ডাক্তারী পাশ, দেখতেও নাকি খুব ভাল। তা উমাকে একবার দেখালে হয় না বাবা?"

ধনী-সন্তান, তাহার উপর আবার বাগ্‌দেবীর বরপুত্র, সে যে দরিদ্র স্কুল-পণ্ডিতের পৌত্রীকে গ্রহণ করিবে এমন দুরাশা বিদ্যানাথের মনে কন্যাস্নেহান্ধ জননীর মত এত সহজে স্থান না পাইলেও, তিনি সুমার্জ্জিত পিতলের ডিবা খুলিয়া নস্য লইয়া কহিলেন,—"বেশ ত, অনুকূলকে বলা যাক্, তাঁর জামাই যদি পাত্রটিকে একদিন আনিয়ে উমাকে দেখতে পারেন, তাতে আর বিশেষ ক্ষতি কি? কুমারী কন্যা পাঁচ জায়গা থেকে দেখতে আসা ত পদ্ধতি আছে।" বধূর ধনী গৃহে কুটুম্বিতার সাধ বুঝিয়া অনাথের কথা দ্বিতীয়বার উত্থাপনের ইচ্ছা আর তাঁহার হইল না।

বিদ্যানাথকে কোন অনুরোধের জন্য অনুকূল ভট্টাচার্য্যের শরণ লইতে হইল না। মঞ্জুভূষণ উপযাচক হইয়া অদ্য অপরাহ্নে নিজে আসিয়াছে। রাজলক্ষ্মী-দত্ত আসনে বসিয়া তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত ক্ষীরের ছাঁচ ও নারিকেল-ছাপায় মিষ্টমুখ করিয়া, পানের খিলি লইয়া, বরকে কল্য বৈকালে লইয়া আসিবে আশ্বাস দিয়া সে চলিয়া গেল।

পরদিন বিকালে মঞ্জুভূষণের সহিত বর নিজেই পাত্রী দেখিতে আসিল। অন্নপূর্ণা উমাকে যথাসাধ্য মাজিয়া ঘষিয়া, একখানি চাঁদের আলো কাপড় পরাইয়া, কপালে সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া, যথাযোগ্য উপদেশানন্তর বিদ্যানাথের সহিত বৈঠকখানা ঘরে পাঠাইয়া দিয়া—মার সহিত পাশের ঘরে কবাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

দাদামণির আদেশে উমা নত হইয়া সম্মুখোপবিষ্ট ভদ্রলোক দুইটিকে প্রণাম করিয়া, বিনা আদেশেই দাদামহাশয়কে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি মাথায় দিল। বিদ্যানাথ গভীর স্নেহে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মঞ্জুভূষণ অত্যন্ত প্রশংসমাননেত্রে উমার লজ্জাবনত মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—"তোমার নাম কি?"

দাদামহাশয়ের আদেশে সে উত্তর দিল,—"শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী।"

"লেখা পড়া জান ত? কি পড়?"

উমার বিপন্নভাব দর্শন করিয়া বিদ্যানাথ নিজেই তাহার হইয়া উত্তর

দিলেন,—"কিছু বাংলা, কিছু সংস্কৃত—এমনি স্ত্রীলোকের কাজ চলা গোছেব শিখেছে।"

বিদুষী নারীদেব খবব মঞ্জুভূষণেব খুব বেশী জানা ছিল না, বডজোব দাতাকর্ণ অথবা বামায়ণ পাঠ পর্য্যন্তই তাহাব আদর্শেব দৌড। সে খুসী হইয়া বলিল,—"তা হলেই ঢেব হলো, আব বেশী দরকাব কি? একবাব মুখ তুলে চাও ত।"

মঞ্জুভূষণেব অনুবোধে উমা তাহাব লজ্জানত চোখ তুলিতেই সম্মুখোপবিষ্ট অপব এক ব্যক্তিব চোখেব সহিত তাহাব দৃষ্টি মিলিত হইল।

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য তখন তাহাব সবটুকু বশ্মি গুটাইয়া লইয়াছেন। খোলা জানালা দিয়া যে অল্প অল্প আলো ঘবে আসিয়া পডিয়াছিল, সেই ম্লান আলোকে তাহাব সম্মুখোপবিষ্ট যুবকেব মুখখানাও ম্লানায়মান, তবু উমাব বিস্ময়-মুগ্ধ নয়ন-যুগল কিছুক্ষণেব জন্য সে মুখ হইতে অপসৃত হইতে পাবিল না।

মঞ্জুভূষণ চাবিখানা স্বর্ণমুদ্রা উমাব কুণ্ঠিত হস্তে গুঁজিয়া দিয়া যখন সম্বন্ধ স্বীকাবসূচক আশীর্ব্বাদ কবিল, তখন গৃহান্তবালে রাজলক্ষ্মীব চক্ষু আনন্দের অশ্রুতে পবিপ্লাবিত হইয়া গেল।

২

বিবাহ

মেয়ে পছন্দ হওয়ায মঞ্জুভূষণই কর্ত্তা হইয়া কথা কহিল। বাজলক্ষ্মীকে সে স্ত্রীব সম্পর্ক ধবিয়া "পিসিমা' বলিত। বাজলক্ষ্মী লজ্জা ত্যাগ করিয়া মঞ্জুকে ভিতবে ডাকাইয়া আনিযা পাত্রেব সংবাদ সব খুঁটাইয়া জানিযা লইলেন।

মঞ্জুভূষণেব কথায় জানা গেল ছেলেটিব বাপ মা নাই, বৈমাত্রেয় জ্যেঠা আছেন, তিনি ক্রোডপতি, বিস্তব জমিদাবী—বাডীঘব—রাজার ঐশ্বর্য্য। ছেলেবা দুটি ভাই, এইটিই বড। ছেলে ডাক্তাবীতে এম্‌-বি পাশ কবিয়াছে, স্বভাব চবিত্র নির্ম্মল। জ্যেঠা মহাশয বিবাহ কবেন নাই, ইহাবাই বিষয়েব অধিকাবী। তবে, বুড়ার মেজাজটা খুব ঠাণ্ডা নয়,—বয়সে এমন হইয়াই থাকে। হয় ত এ বিবাহ তাঁহার মনোমত নাও হইতে পারে, কিন্তু সে জন্য আটকাইবে না। তিনি ছেলেব অত্যন্ত বাধ্য, ছেলে স্বীকাব করিয়াছে শুনিলে, না বলিতে পারিবেন না। মঞ্জুভূষণ সকল কথাই খুলিয়া বলিল,—পেশাদার ঘটকদের মত তিনদিক ঢাকা দিয়া একদিক দেখাইল না।

বিশ্বনাথ এ সকল শুনিয়া একটু চিন্তিত হইয়া পডিলেন। ভাবিলেন,

কর্ত্তার অমতে কার্য্য, শেষ মেয়েটার খোয়ার না হয়। রাজলক্ষ্মী কহিলেন,—"বিয়ের সময় অমন কত হয়, হয়ে গেলে আর রাগ থাকে না। ছেলে পছন্দ করে বিয়ে করবেন—সুখেরই হবে। যদি ওর কপালে এতেও সুখ না হয়, আমাদের দুঃখ করবার কিছু থাকল না।"

মায়ের মন প্রবোধ মানিলেও পিতামহের মানিতেছিল না। কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল—ইহাকে কি পছন্দ করা বলে! অমন যে স্বর্ণপ্রতিমা, পাত্র একবার চোখ চাহিয়াও ত দেখিল না। সে যে বড় লাজুক এমনও ত মনে হইল না; মাথা ত কোথাও নত হয় না!

উমাকে দেখিয়া বিদ্যানাথ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"দিদি, একলাই শুভদৃষ্টি করে নিলি ভাই? বরের জন্যে অপেক্ষা কল্লি না রে?"

উমা সলজ্জ হাসি হাসিয়া পিতামহের কোলে মুখ লুকাইয়া বলিল,—"যান্, তাই বই কি!"

বিদ্যানাথ কহিলেন,—"২৮শে শ্রাবণ বিয়ের দিন স্থির করে গেল, হয়ে উঠবে? মধ্যে ত দুটো দিন।"

অন্নপূর্ণা হাসিল। বলিল,—"কি হবে না দাদামশাই? গড়ের বাদ্যির বায়নাও হবে না—কিছুই হবে না। পিঁড়ে আল্‌পনা আর শ্রী বরণডালা—সে খুব হয়ে যাবে।"

এই ২৮শে তারিখটা কোন মতে কাটাইয়া দিতে পারিলে মধ্যে পাঁচ মাস বিবাহে বাধা, বিদ্যানাথ যেন সবটা তলাইয়া বুঝিবার জন্য সময় লইতে চাহিতেছিলেন। নতুবা বিনা পণে বিনা অলঙ্কারে শাঁখা হাতে দিয়া মেয়ে পার করিবার এমন সুযোগ কেহ কখন হেলায় ছাড়িতে চায়? তাঁহার কেমন মনে হইতেছিল, বিবাহের বর যেন অপ্রকৃতিস্থ, অব্যবস্থিতচিত্ত,—তাহার চোখে মুখে একটা অবসন্ন অবসাদের ছায়া যে, মনেই হয় না, সে নিজের ইচ্ছায় চিরদিনের দায়িত্বপূর্ণ এত বড় একটা বন্ধনের ব্যাপার স্বীকার করিতেছে। মঞ্জুভূষণই যেন তাহাকে দম দিয়া চালাইয়া লইতেছিল। কিন্তু তাহাই বা কেন হইবে? এ তাঁহার মনের ভ্রম—আশাতীত কিছুই মানুষ সহ্য করিতে পারে না, তাই এই আশাতীত আনন্দও বুঝি তিনি পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারিতেছিলেন না।

বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী, মধ্যে দুই দিনের ব্যবধান। অনাথকে লইয়া বিদ্যানাথ উদ্যোগের দিকে মন দিলেন। অনাথের পানে চাহিয়া তাঁহার মনে

হইল—এই যে মনের খুঁৎখুঁতানি, এ বুঝি মনের কাছে ছলনা! অনাথকে যে ছাড়িতে হইল, এই ক্ষোভে এমন দুর্লভ পাত্রেও বুঝি মন উঠিতে চাহিতেছে না।

পরদিন এক সময় অন্নপূর্ণা তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বর কি আপনার পছন্দ হয় নি দাদামশাই ?"

বিদ্যানাথ চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"এ কথা জিজ্ঞেস কর্চ্চ কেন ?"

অন্নপূর্ণা মুখ নত করিয়া কহিল,—"কেমন যেন আপনাকে বড়ই উন্মনা দেখছি। ছেলেটিকে কি এমন কিছু দেখলেন"—

বিদ্যানাথ বাধা দিলেন,—"না—না দিব্যি ছেলে, কিন্তু কেমন যেন মন-মরা।"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিল, —"জ্যেঠার সঙ্গে যুদ্ধ দেবার ভয় ত এখনও কেটে যায় নি। মঞ্জুবাবু বলছিলেন, জ্যেঠা ত এখনও বিয়ের কথা জানেনই না। আশীর্ব্বাদ করে গেল —এইবার খবর দেবে।"

বিদ্যানাথ স্বীয় কেশ-বিরহিত মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন,—"ঐখানেই ত গোল। আজকাল কর্ত্তা একজন না থাকায় কর্ত্তৃত্ব অনেক বেড়ে গেছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধে—আমার উলুখড়টি না ছিঁড়ে যায়।"

মঞ্জুভূষণ বরপক্ষীয়ের হইয়া জানাইল, ধূমধাম কিছুই হইবে না, বরযাত্রীও নিতান্ত দুইচারিজন মাত্র আসিবে, উদ্যোগ আয়োজনের বাহুল্য প্রয়োজন নাই।—কন্যাপক্ষের অবস্থা বুঝিয়াই সম্ভবতঃ এ ব্যবস্থা, তবু রাজলক্ষ্মীর মনটা একটু খুঁৎখুঁৎ করিল, পাড়া পড়শীরা ক্ষুণ্ণ হইল, একটা বড় রকম জাঁকজমক দেখিবার আশায় তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে না উঠিতেই নিরাশ হইল।

মঞ্জুভূষণ পাড়ার জামাই, তাহার সাম্‌নে বাহির হইতে অনেকেই কুণ্ঠিত হয়েন না। শালী শালাজ ঠান্‌দি সম্পর্কীয়ারা চাপিয়া ধরিলেন,—"সে হবে না—একটু ধুমধাম করে বর আস্‌বে বই কি—নৈলে কি মানায়!"

মঞ্জুভূষণ কর্ত্তৃপক্ষে দরখাস্ত করিয়া মঞ্জুর না হওয়ায় হতাশ হইয়া জানাইলেন,—"ও সব লেখাপড়া জানা ছেলে কি আর আলো বাজনা করে বিয়ে কর্‌তে আসে ? বলে, এ কি পাড়াগেঁয়ে বিয়ে, যে বাজনা আলো হবে।"

আবেদনকারিণীরা তর্কে হারিবার পাত্র নহেন। কহিলেন,—"বেশ ত, বাজনা আলো নাই হোল, বরের রূপেই না হয় আসর আলো হবে, তবু ধুমধাম—থ্রোন—এ সব হতে ত মানা নেই।"

মঞ্জু জানিত, সেখানকার রায় অটল,—সে হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া

বলিল,—"সে হবার নয়।" মেয়েরা বরকে না পাইয়া বরের বন্ধুর উপর ঝাল ঝাড়িতে লাগিল,—"ভারী ত মুরদ! উনি আবার বড়াই করেন—ওঁর ঘটকালীতে বিয়ে হচ্ছে! বিয়েতে খরচ করবে না, ওরা আবার বড়মানুষ! সমস্ত চালাকি।"

মঞ্জুভূষণ অগত্যা অপবাদ স্বীকার করিয়া লইল।

সে দিন বিত্মানাথ, অনাথ ও রামরূপ পণ্ডিতকে লইয়া পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পাত্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিত্মানাথ যেটুকু সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন, ববকর্ত্তা রুদ্রকান্তের ধরণ-ধারণ ও বচন শুনিয়া সেটুকু লোপ পাইয়াছিল। বিত্মানাথের পৌত্রী গ্রহণ করা তাঁহার ধনবত্বা ও মহত্ত্বেরই অকাট্য প্রমাণ—এইটুকুই যেন লোকের কাছে বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সতীনাথ আশীর্ব্বাদের গিনিখানি তাঁহারই পায়ের কাছে রাখিয়া, একটা দায়-ঠেকা গোছের অর্দ্ধ প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। কর্ত্তা ভাল করিয়া একটা কথাও কহেন নাই। বাড়ীর দাসদাসীগুলা পর্য্যন্ত যেন বড়মানুষীর বাতাস লাগিয়া কেমন এক রকম চালচলনে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। উমার ভবিষ্যজীবনের ঘরকন্না এবং ঘরের প্রধান লোকগুলিকে দেখিয়া বিত্মানাথ খুব বেশী খুসী হইয়া আসিতে পারেন নাই।

পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া বিত্মানাথ মনের সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব মিটাইয়া আশাতরুর মূলোচ্ছেদ করিয়া অনাথের উপর হইতে মন সরাইয়া লইলেন। মনে করিলেন, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম এবং প্রাক্তনের ফলই বলবৎ; বৃথা দ্বন্দ্বের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, 'জন্ম মৃত্যু বিবাহে বিধাতাব নিয়ম' মানিয়া চলাই ভাল; কি জানি নিজের উপর ত আর বিশ্বাস নাই!

'শেষ কাজ' মনে করিয়াই বিত্মানাথ এ বিবাহে একটু বিশেষ ভাবেই উত্মোগ আয়োজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনাথ একাই 'একশত' হইয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী অনবরত অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিলেও, কাজে তাঁহার শৈথিল্য ছিল না। ক্রমে বিত্মানাথেরও প্রসন্ন মুখে বর্ষণমুক্ত নীল-আকাশের শান্ত জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল।

কেবল অন্নপূর্ণা কোন কাজেই হাত দিবার অবসর পাইতেছিল না। সে উমাকে দিন রাত্রি নিজের কাছে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াও যেন পর্য্যাপ্তরূপে তাহাকে পাইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিল না। বোন্‌টিকে যেন সে এই আজ প্রথম দেখিল—তাহার দেখিবার তৃষ্ণা আর কিছুতেই মিটিতেছে না—

এমনি ভাবে সে যখন তখন তাহার পানে চাহিয়া থাকে। বুকের ভিতর টানিয়াও মনে হয় বুঝি এখনও অনেক দূরে রহিল, আরও কাছে পাওয়া যাইত! সে যে বুকের ভিতর রাখিয়াই তাহাকে সংসারের সকল দুঃখ ব্যথার অতীত করিয়া এতদিন বড় যত্নে বড় করিয়া তুলিয়াছে। মা তাঁহার শোক-দুঃখপূর্ণ সংসার লইয়া যখন ব্যস্ত থাকিয়াছেন, সে যে তখন ইহাকে লইয়াই অবলম্বনহীন জীবনের অবলম্বন পাইযাছে—আশা ও স্নেহের অঞ্জলি দানে স্বহস্তে বর্দ্ধিত তরুটির সুখ-ফলের আশাপথ চাহিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। সেই উমা আজ পর হইয়া যাইবে! পরের ঘরে কে তাহাকে এমনি করিয়া বুঝিবে, কে তাহার অভাব ব্যথা ঘুচাইতে এমন সজাগ চোখে দিন রাত্রি প্রহরা দিয়া চাহিয়া থাকিবে? সেখানে অনেক থাকিতে পাবে, কিন্তু স্নেহ মমতা দিবার লোক কেহ আছে কি না, এই প্রশ্নটাই আজ কেবলই তাহার মনে উঠিতেছিল।

এ দুইদিন সে দিনের মধ্যে পাচবার উমার চুল খুলিয়া নূতন নূতন ফ্যাসানে চুল বাঁধিয়া, টিপ মুছিয়া নূতন টিপ পরাইয়া, তাহাকে নিজের হাতে খাওয়াইয়া তৃপ্তি পাইতেছিল না। কেবলই বুকের ভিতর একটা দুরু দুরু কম্পনের সহিত ধ্বনিত হইতেছিল,—'আজ তোমার উমা পর হইয়া গেল।' অন্নপূর্ণা চোখের জল মুছিয়া মুখে হাসি আনিয়া মনে মনে বলিল,—'তাই যাক্। সেই ঘরই উমাব আপন ঘব হোক্। এ ঘরকে যেন তার অবলম্বন করতে না হয়। ঠাকুর, আর যা দাও না দাও, শাঁখা সিঁদূরেব অধিকার তার বজায় রেখ।' স্বামীর স্নেহে অনভিজ্ঞ বালবিধবা অন্নপূর্ণা আজ চিরাগত সংস্কারের হাত এড়াইতে পারিল না। নিজের শূন্য মনের অসহনীয়তা স্মরণ করিয়া মনে মনে সে প্রার্থনা করিতে লাগিল,—'হে ঠাকুর, উমাব মনে যেন কোন অভাব ক্ষোভের হাহাকাব না বাজে, উমা সুখী হোক্, ভাল থাক্—তার সুখই আমাদেব সকলের সুখ।'

রাত্রে নির্দ্দিষ্ট লগ্নে বিদ্যানাথ সতীনাথের হাতে উমার হাত রাখিয়া, দেব-দ্বিজ-অগ্নি সাক্ষী করিয়া, তাহাদের চিরজীবনের গ্রন্থি বাঁধিয়া দিলেন। বরও পুরোহিত-আদিষ্ট মন্ত্রাবলীর উচ্চারণে সে বন্ধন স্বীকার করিয়া লইল। সাক্ষী রূপে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীর দল উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন।

শুভদৃষ্টির সময় বিদ্যানাথ কর্ত্তৃক আদিষ্ট উমা তাহার নত নেত্রযুগল ঈষৎ উন্নমিত করিয়াই অর্দ্ধপথে নামাইয়া লইল। সেই প্রথম দেখা ও আশীর্ব্বাদের দিনের পিতামহের পরিহাস মনে পড়িয়া, তাহার সূক্ষ্ম ওষ্ঠে সলজ্জ মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। দাদামহাশয় তামাসা করিয়া বলিয়াছিলেন—'একাই শুভদৃষ্টি

করিলিরে?' আজিও হয় ত তেমনি কোন বিভ্রাট বাধিয়া আবার তাহাকে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করিয়া দিবে!

বিবাহদর্শনার্থিনী নারীর দল অচিরেই তাহার প্রমাণ দিলেন। "ওমা এ কি বর গো! 'শুভদৃষ্টি কর।' ববের যে দেখি মেয়েমানুষের বাড়া লজ্জা। চাও, চাও—ভাল করে চাও। উমা, চেয়ে দেখ্।"—এবার আর উমা চোখ তুলিল না।

বিবাহের পর বাসর ঘবে যাঁহারা বাসব জাগিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আপন মনে বকিয়া শ্রান্ত হইয়া, কিছুক্ষণেব মধ্যে ঘুমাইযা পড়িলেন। যাঁহাদের সখ বেশী, তাঁহারা নিজেবাই গান গাহিয়া, কথা কহিয়া সখ মিটাইলেন। নিদ্রাতুরা উমাকে অন্নপূর্ণা শযন কবাইয়া দিল। বিদ্যানাথও সতীনাথকে ঘুমাইতে দিবার জন্য বাড়ীর ভিতব আদেশ পাঠাইলেন। "গোমড়ামুখো বরের" উপব মেয়ের দল খুসী না থাকায, তাহাব বোল ফুটিবাব জন্য 'ওল' মানসিক কবিয়া তাঁহারা বরকে ঘুমেব জন্য ছুটি দিলেন। সতীনাথ ঘুমেব জন্য যত না হউক, তাঁহাদের হাতে ছাড়া পাইয়া পাশ ফিবিয়া ঘুমেব ভানে অব্যাহতি লাভ করিল।

৩

বিনামেঘে বজ্রাঘাত

বড়লোকের ছেলে সতীনাথেব বিবাহ উপযুক্ত সমাবোহের সহিত সম্পন্ন হয় নাই। ববের সঙ্গে আসিয়াছিল তাঁহার দুই-চাবিজন বন্ধু এবং বাড়ীব সবকার গোমস্তা ও বরের সম্পর্কীয় ভাই মুবাবি। এ ছাড়া দুই একজন চাকব বাকর দরোয়ান আসিয়াছিল। ববকন্যা বিদাযেব জন্য রূপাব চতুর্দ্দোলা মোটর খ্রোন অথবা চতুরশ্বযুক্ত পুষ্পমালা-শোভিত শকট পর্য্যন্ত নয। আলো বাজী বাজনার কথা কেহই শুনিতে পাইল না। এমন কি ববেব বাড়ী হইতে—আজকাল রেখো রেমোও যাহা করিয়া থাকে—একটা গায়ে হলুদেব তত্ত্ব পর্য্যন্ত আসে নাই। তবু রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন, তাঁহার মেয়ের মত ভাগ্যবতী কয়জন। পাড়া-পড়শীরা সে কথা অস্বীকার না করিলেও, বড়মানুষীর ধূমধাম দেখায় বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভে মনকে বুঝাইল, গরীব বিদ্যানাথের উপর জুলুমের ভয়ে পাত্রপক্ষ এমন দীনভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি কবে কোথায় কোন্ বড়লোকের ছেলে কেমন সমারোহে বিবাহ করিয়া নিজ হইতে খরচ দিয়া শ্বশুরের মান রক্ষা করিয়া উদারতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার

বিবরণও জানাইতে ত্রুটী করিল না। "পয়সা থাকিলেই হয় না, নজর থাকা চাই।" সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া গেল যে, উমার শ্বশুরের নাম লইলে সে দিনকার অন্ন মিলিবার পথে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে! বিবাহ ত আর নিত্যকার ব্যাপার নয়। জীবনের এতবড় একটা "স্মরণীয়" দিনকে এমন করিয়া বৃথা ব্যয়িত হইতে দিয়া প্রতিবাসী ও আত্মীয়জনের সাধে "বাদ" সাধা রুদ্রকান্তের যে অনুচিত বর্ব্বরতা ইহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

পরদিন বর-কন্যাব বিদায়-আয়োজন আরম্ভ হইল। রাজলক্ষ্মী হাতে কাজ করিতেছিলেন এবং অনবরত অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিলেন। আজ অনেক দিনের পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনের ভিতর উথলিয়া উঠিতেছিল। আর এক দিন—এমনই দিন তাঁহার জীবনে আসিযাছিল। তখন তাঁহারও জীবনের সূর্য্য তরুণ-মূর্ত্তিতে সবেমাত্র পূর্ব্বাকাশে উদয়োন্মুখ। দীপ্ত মধ্যাহ্নের জ্বালাময়ী তীব্রতা তখনও তাঁহাব অজ্ঞাত। তাহাব পব কত প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়া বহিয়া তাহাব একত্রিংশবর্ষীয় জীবনটাকে জর্জ্জরিত কবিয়া তাঁহাকে অকালবৃদ্ধত্বে উপনীত কবিয়া দিয়াছে। আজ আসন্ন কন্যা-বিদায়-বিয়োগ-ব্যথাও সে সব স্মৃতিকে ডুবাইতে পাবিতেছিল না।

উমাব চুল বাঁধিয়া মুখ মুছাইযা ললাটে শুভ-চন্দনের চিত্রলেখা আঁকিয়া দিবার অধিকাব অন্নপূর্ণাব আজ না থাকায়, সে প্রতিবাসী-কন্যা মঞ্জুভূষণের কোন শ্যালিকা দ্বারা সে সকল করণীয় সম্পন্ন করাইয়া লইল। চুল-বাঁধা কিন্তু অন্নপূর্ণার মনঃপূত হইল না। সে ভাবিতে লাগিল—"হইলই বা এলো খোঁপা, দুই খি করিয়া চুলের গুছি পাকাইয়া সর্পাকৃতিতে জড়াইয়া দিলে কেমন চমৎকার মানাইত! সামনেটাও যেন কেমন্ন কেমন হইয়াছে; বাঁ দিকের ঝাপট্টা বেশ পরিপাটি আঁচড়ান হন নাই।" এত দিনের পরিশ্রমের শিক্ষা অন্নপূর্ণার আজ বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইল। আসল কাজের সময়ই যদি তাহার বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা নাই, তবে এ বিফলা বিদ্যার আরাধনায় সে কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছিল! অকল্যাণের ভয়ে সে অদম্য ইচ্ছাটাকে চাপিয়া ফেলিয়া, উমার ললাটে একটা সিন্দুরের টিপও পরাইয়া দিল না। তাহাকেও যে একদিন এমনই সন্তর্পণে দুর্ভাগিনী স্বামিহীনাদের বাতাস বাঁচাইয়াও শেষ রক্ষা করিতে পারা যায় নাই, কেবল সেই কথাটা একবারও তাহার মনে পড়িল না।

চুল বাঁধা সাজসজ্জার অবসানে ছাড়ান পাইয়া উমা দুই হাতে দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"দিদি, আমি যাব না ভাই, তোমাদের ছেড়ে কোথাও আমি থাক্‌তে পারব না।"

অন্নপূর্ণার এতক্ষণের পর শাসনতাড়িত চোখের জল আর বারণ মানিল না। উচ্ছ্বসিত বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মত সবেগে বাহির হইয়া বক্ষঃলগ্ন উমার শাড়ী ভিজাইয়া তুলিল। তবুও সে মুখে হাসিতেছিল। সে রৌদ্র ও বৃষ্টির অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিবার উপযুক্ত দর্শক সেখানে কেহই ছিল না। অন্নপূর্ণা হাসিয়া উমাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে কহিল -"দেখ্‌বে রে দেখবে, এর পর আবার তুই ই বলবি, 'দিদি, এসো না ভাই, ছেড়ে যে থাক্‌তে পারিনে'। উমা তাহার হাত ঠেলিয়া রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"কক্ষনো না, দেখে নিয়ে। আর কখনও যাব কি না।"

অন্নপূর্ণা হাসি ছাড়িয়া গম্ভীর হইয়া কহিল—"ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। জন্ম জন্ম সেই ঘরই কর্‌—করতে যেন পাস্‌। সে ঘরে থাক্‌বার সুখ যখন বুঝবি, তখন কিন্তু দিদিকে ভুলে যাসনে উমা।"

"দিদি—শুভ-সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আর দেরী করো না"—বলিয়া সেই স্নেহের গঙ্গা-যমুনা মিলন ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার চিরপ্রসন্ন শান্ত সহিষ্ণু মুখখানিও আজ আর অন্তর্নিহিত বেদনাটি লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না। হাসির জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে মেঘের কালোছায়া তাই স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইতেছিল।

অন্নপূর্ণা কর্তৃক আদিষ্ট উমা পিতামহের পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলে, তিনি তাহাকে বুকে টানিয়া মুদ্রিত নেত্রে ভাষাতীত আশীর্ব্বাদে সিঞ্চিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"যে গৃহ আজ লক্ষ্মীরূপে তোমায় বরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই তুমি অচলা হয়ে পতিগতা থেক। সংসার শুধু শান্তিভোগের স্থান নয়, এখানে ঝড় ঝঞ্ঝা অবশ্যম্ভাবী, তোমার কেন্দ্র যেন স্থির থাকে, এইটুকুই আমার আশীর্ব্বাদ।"

তাঁহার মনে পড়িল আর একদিনের কথা, সেও এমনই অম্লান উজ্জ্বল প্রভাত। প্রথম জীবনের আঘাতবেদনাহীন দিবসে কি সুগভীর বিশ্বস্ত হৃদয়েই তিনি আর একখানি এমনই কল্যাণপূর্ণ হস্তের সহিত আর একটি অপরিচিত তরুণ হস্ত বাঁধিয়া জীবন-গ্রন্থি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা তখন শিশু, পিতৃগৃহ ও আত্মীয়জনের বিচ্ছেদ-ব্যথা অনুভব করিবার শক্তিও তাহার ভাল করিয়া জন্মে নাই। শুধু ঘোমটা দিয়া পাল্কী চড়িয়া বধূ হইবার প্রলোভনটাই তাহার কাছে সব চেয়ে প্রবল মনে হইয়াছিল। কেমন হাসিমুখে মায়ের আদেশে দাদামণির পায়ের ধুলা লইয়া সে পাল্কী চড়িয়া বসিয়াছিল। সে ত এই সে দিনের কথা। তার পর কত অল্প সময়ের ভিতর কত বড় অঘটনই না ঘটিয়া গেল। মুকুল না ফুটিতে গাছেই

শুকাইল। সেই সঙ্গে অতীতের অনেক কথাই বৃদ্ধের মনে জাগিতেছিল। যাহার কন্যা, সে আজ কোথায়? সেই জ্ঞানে দীপ্ত, বুদ্ধিতে মার্জ্জিত, স্নেহে করুণ, ভক্তিতে নত—তাঁহার চণ্ডীচরণ—সে আজ কোথায়?

উমাকে লইয়া বিশ্বনাথ যখন বিব্রত, তখন পাশের ঘরে সরিয়া আসিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়া অন্নপূর্ণা আত্মসম্বরণেব চেষ্টা করিতেছিল। তাঁহার ব্যর্থ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র সুখই যে উমা! সেই উমাও আজ তাহার কোল ছাড়া হইয়া গেল, চিরদিনের মতই তাহার পরে দাবী ফুরাইল, চোখের দেখা—তাহাও আর কখনও দেখিতে পায় কি না সন্দেহ স্থল। পায় যদি, সে আশার অতীত। পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া দাদামহাশয় যতটুকু দেখিয়া ও বুঝিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে উমার পিত্রালয়ে প্রত্যাগমনের আশা বড়ই অল্প।

বিবাহের পর উমা অন্ততঃ একটিবার মাত্র ফিরিয়া আসুক; তাহার হাসিমুখ খানা দেখিযা, সে যে সুখী হইযাছে, এইটুকু জানিতে পারিলেই অন্নপূর্ণার তৃপ্তি। তার পর, তাহার চিরদিনের আপন ঘরে সে অচলা হইয়া চিরপ্রতিষ্ঠিতাই থাক্, সেই ঘবই তাহাকে লক্ষ্মীর আসনে বরণ করিয়া লউক—এইরূপ নানাকথা অন্নপূর্ণার মনে উদয় হইতেছিল। তবু অন্তরের রোদন সে ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার মেঘাচ্ছন্ন জীবনটা আজ যেন একান্তভাবে উমাকেই অবলম্বন করিতে চাহিতেছিল। মনকে সে চোক্ বাঙ্গাইয়া বলিতেছিল—'এ দিন যে আসিবে এবং আসাই সে প্রার্থিত, তাহা ত জানাই ছিল, তবে এত ব্যাকুলতা কিসের?'

সহসা অন্নপূর্ণাব চিন্তা ও দৃষ্টি ভিন্ন পথে ফিবিল। জানালার নীচেই ফুলবাগান। তথায় বরবেশী সতীনাথ ও তাহাব বন্ধু অমব দাঁড়াইয়া ফুলের সৌরভকে ডুবাইয়া চুরুটের গন্ধে ও ধূমে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি মুখ হইতে ছাড়িয়া দিয়া বরের বন্ধু কহিল—"কেমন কনে হল বল? এমন মনের গতি বোধ করি ফিরেছে?"

সতীনাথ দগ্ধাবশিষ্ট চুরুটের ছাই বাম হস্তের অঙ্গুলির আঘাতে ঝাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে উত্তরে কহিল—"ফির্‌ল কিসে?"

"তা তোমার মনের কাছে জিজ্ঞাসা কর। মেয়ে যে সুন্দরী তা বোধ হয় অস্বীকার কর্‌তে পার না।"—অমর প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে তাকাইল।

সীতানাথ একটুখানি শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিল—"ভট্‌চায্যি বামুনের ঘরে যেমন হয়ে থাকে, তাই। রামী শ্যামীর চেয়ে খুব বেশী তফাৎও নয়।"

শুনিয়া অমর হাসিয়া কহিল—"ওঃ, ঠাট্টা হচ্চে? তাই বল ভায়া, ডুবে জল

খেতে চাও! ভয় কি ভাই, তোমার জিনিস তোমারই থাক্‌বে, ওখানে ত আর বন্ধুত্বের দাবী চল্‌বে না! আমরা মিষ্টি মুখ করেই তুষ্ট হব।"

সতীনাথ উদাসীন ভাবে দ্বিতীয় চুরুটে অগ্নি সংযোগ করিয়া জ্বলন্ত দেশালাইয়ের কাঠিটা পায়ে মাড়াইয়া জোর দিয়া কহিল—"সুবিধা ঐখানেই। তোমরা মিষ্টি মুখ করেই খালাস, আর বোঝাটা পড়্‌ল আমার ঘাড়ে। তা অবশ্য এ ঘাড় সে বোঝা বইতে বাধ্য নয়, সে বুঝ্‌বেন জ্যেঠা মশাই।"

অমর হাসিল, কহিল—"আচ্ছা হে আচ্ছা, দেখা যাবে যদি বেঁচে থাকি। এর পর পদপল্লব ছাড়িয়ে বন্ধুবান্ধবদের দর্শন পাওয়াই ভার হবে। তখন কোথায় থাক্‌বেন জ্যেঠা মশাই!"

অব্যবহৃত অগ্নিসংস্কৃত চুরুট্‌টা সীতানাথ সজোরে একটা জবাগাছের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। নাড়া পাইয়া কয়েকটা বাসিফুল ও একটা সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পঞ্চমুখী জবা মাটিতে ঝরিয়া পড়িল। সতীনাথ সজোরে মাটিতে পা ঠুকিয়া গম্ভীর অথচ চাপা স্বরে কহিল—"তুমি ত জান, জ্যেঠা মশায়ের কুলমর্য্যাদার প্রয়োজন ছিল, সংসারের একজন কর্ত্রীর প্রয়োজন ছিল, তাই বিবাহ কর্‌লাম। আর—আর—না, সে সব কথা জন্মের মতই ফুরিয়ে গেছে। এটা ঠিক যে—স্ত্রীর প্রয়োজনে ওকে আমি বিয়ে করিনি।"

সতীনাথের কুঞ্চিত-ভ্রূ, ক্রুদ্ধ মুখ দেখিয়া অন্নপূর্ণা শিহরিয়া সরিয়া আসিল। এই—বিবাহের বর! গতরাত্রে ইহারই হাতে হাত রাখিয়া দেব-গুরু-অগ্নি-সাক্ষী করিয়া উমার চিরজীবনের বন্ধন ঘটিয়া গিয়াছে! জীবনব্যাপী অনুতাপেও যে সে বন্ধন মোচন করিবার কাহারও আর সাধ্য নাই। কুমারীর পবিত্র বিশ্বস্ত হৃদয়ের দান—অম্লান ফুলের মালা এখনও যে তাহার কণ্ঠলগ্ন!

অন্নপূর্ণার পায়ের নীচে পৃথিবী যেন ভূমিকম্পে কাঁপিতে লাগিল। চোখে অন্ধকার দেখিয়া সে ভূমিতে প্রায় লুটাইয়া পড়িল। দুই হাতে বুক চাপিয়া আর্ত্তস্বরে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"উমা, দিদি আমার, কি কল্লাম! আমরা তোমার এ কি কল্লাম!

সহসা তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল—"দিদি, ভগবানের বিধান মাথা পেতেই নিতে হবে, তাঁর কাজের উপর কারও হাত দেবার উপায় ত নেই।"

এ কি দৈবাদেশ? চমকিয়া অন্নপূর্ণা মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল—"কে, অনাথ? শুনেছ সব-ই?"

অনাথ নতমস্তকে বলিল—"শুনেছি দিদি। তাই বলে ঝড়ের আগে ভেঙ্গে পড়বেন কেন? উমাও ত সে শিক্ষা পায়নি! সে তার নিজের স্থান করে নিতে

পারবে। না পারে, তাতেই বা এমন দুঃখ কি? এখানে আমরা চিরদিনের বাসস্থান ত স্থির করে আসিনি। পরীক্ষা দেবার জন্যে যেমন ছেলেরা বিদ্যামন্দিরে আসে, এও যে আমাদের পরীক্ষাগার দিদি। আমি জানি, উমা আমাদের নীচে পড়ে থাকবে না। বর কনে বিদায় হবে, তাদের আশীর্ব্বাদ করবেন চলুন।"

বাহিরে কর্ম্মকর্ত্তা-রূপে বরের ভাই মুরারি যুবকদের গ্রামভাটি, বারোয়ারী, কাঙ্গালীভোজন ইত্যাদিতে আশাতিরিক্ত রূপে খুসী করিয়া দেওয়ায় তাহার খাতিরের অন্ত ছিল না। বরকে ছাড়িয়া সকলে তাহার সহিত আলাপ করিতেই ব্যস্ত।

তেজস্বী কৃষ্ণবর্ণ অশ্বযুগল সহ বৃহৎ ফেটন গাড়ী বরকন্যার জন্য এবং কয়েকখানা ঠিকাগাড়ী বরযাত্রিগণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মোটা মোটা সোনার তাগা হাতে, পাগড়ী বাঁধা দরোয়ানের দল এবং বরের সহযাত্রী লোকজনেরা বরের বহির্গমন প্রতীক্ষায় রাস্তায় দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে।

উমার লাল চেলীর আঁচলের সহিত গাত্রাবরণের গ্রন্থি বাঁধিয়া বর বাহির হইয়া আসিল। বিদ্যানাথ প্রদত্ত চেলী ছাড়িয়া নিজ শাদা ধুতিই সে পরিয়া লইয়াছে। গলার ফুলের মালা এবং টোপরটা পরামাণিকের হাতে।

বরকন্যা আসিয়া ফেটনে আরোহণ করিল। সহরের ভিতর দিয়া গাড়ী ছুটিল।

সতীনাথ অন্যমনে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ছিল। অদূরে একটা দ্বিতল বাড়ীর বাতায়নে দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র, একটি নারী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চক্ষু নিশ্চল হইয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই বিপুল বিস্ময়ের মধ্যেও একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও জয়ের আনন্দ সতীনাথের আয়ত চক্ষুতে জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল—তাহার সাধনা তবে সার্থক হইয়াছে! সে দেখিয়াছে, দাঁড়াইয়া নিজের চক্ষে সে দেখিয়াছে! কে বলে ভগবান নাই, বিচার নাই? মনে মনে বলিল—"আছ প্রভু, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি ন্যায় বিচারক।"

গাড়ী ক্রমে হুগলী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইল। সতীনাথের তখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। রণজয়ী বীরের মত সে যুদ্ধজয়ের প্রাপ্ত পুরস্কার নববধূর পানে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু তখনই সহসা তাহার বিজয়ানন্দ দারুণ অবসাদে পরিণত হইল। তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিল। এতক্ষণ যাহা ভগবানের দেওয়া পুরস্কার বলিয়া সে মনে করিতেছিল, এখন তাহাই যেন নিজ মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা বলিয়া অনুভব করিল।

হায় মানবের মন, তুমি কি চাও, তাহা তুমি নিজেই জান না। সতীনাথ সেই মুহূর্ত্তেই হৃদয়ঙ্গম করিল যে, না বুঝিয়া, ক্রোধে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিতে জ্ঞানহারা হইয়া, সে তাহার জীবনের গতি যে পথে আনিয়া ফেলিযাছে, সেখান হইতে ফিরিবার পথ আর নাই। তাহার ভবিষ্যজীবন দিকশূন্য অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাতের পাশা একবার ফেলিয়া দিলে আর ফিরাইবার উপায় থাকে না। তখন অন্ধের 'কিং জিতং কিং জিতং' প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য, ধন, পত্নী পর্য্যন্ত পণের মূল্যে বিকাইয়া রিক্ত হস্তে দাঁড়ান ছাড়া আর কোন পথই নাই।

একটা অসহ্য যন্ত্রণার সহিত সতীনাথের কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার যদি কোন উপায় থাকিত, এই বির [illegible] বন্ধনটা কোন উপায়ে কেহ যদি ছিন্ন করাইয়া দিতে পারিত, তবে তাহাকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দি[illegible] সে এখনই ফকিরী লইয়া চলি[illegible] যাইত।

বিজয়ার পরে

হিন্দুগৃহে কন্যা বিবাহ-রাত্রি কালীপূজার রাত্রির সহিত উপমিত হইয়া [illegible], যেদিন পূজা সেইদিনই বিসর্জ্জন। এক রাত্রেই উৎসব শেষ হইয়া [illegible] কন্যা বিবাহেও তাই, বিবাহের পরদিন প্রভাত না হইতেই বিদায়ের পালা।

আপনার জিনিষটি সম্পূর্ণরূপে কোন অপরিচিত অজ্ঞাত হৃদয় ব্যক্তির হস্তে চিরদিনের জন্য নিঃস্বত্ব হইয়া দান করিয়া পর হইয়া দাঁড়াইতে হয় বলিয়াই, বোধ হয় কন্যা সন্তানের প্রতি স্নেহটি এরূপ সশঙ্ক ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। মেয়ে জন্মিবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই সর্ব্বদা মনে হয়—সে পরের জিনিষ, কেবল দুইদিনের জন্য গচ্ছিত দ্রব্যের মত কাছে রহিযাছে। তাই ভয়ে ভয়ে 'কখন হারাই- কখন হারাই' মনে করিয়া তাহাকে একটু যেন বেশী কাছে রাখিতে ইচ্ছা করে।

যে ক্ষুদ্রা নগন্যা বালিকা এতদিন পুতুল সাজাইয়া অথবা হাঁড়ী কুঁড়ি ধূলা মাটিতে কৃত্রিম গৃহস্থালী পাতিযা কোথায় কোন্ গৃহকোণে দিন যাপন করিত, কার্য্য ব্যস্ততায় তাহার সংবাদ লইতেও সময় পাওয়া যাইত না, একদিন সেই যখন রঙ্গীন চেলী পরিয়া মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া একজন অপরিচিতের হস্তে হস্ত রাখিয়া বিদায় চাহিয়া বসে—তখনই সারা অন্তঃকরণ ব্যাকুল ব্যথায় বিদীর্ণ হইয়া বলিয়া উঠে—'এখনি, এত শীঘ্র চলিলি রে?' দুই দিন যে চোখ ভরিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়াও হইল না।'—তখন সংসারের

সকল কাজে সকল ঝঞ্ঝাটের মাঝে সেই হেমন্তের শিশির-মণ্ডিত করুণ ক্ষুদ্র মুখখানিই দিবা নিশি মনের মধ্যে জাগিতে থাকে। তাহারই কথাগুলি, হাসিটুকু, কবে কোন্ বায়না করিয়া কি চাহিয়া পায় নাই—এই সব তুচ্ছ বিষয়ই মনের যেন একমাত্র খোরাক হইয়া পড়ে।

দেবী-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া উৎসব-গৃহ যেমন নিরানন্দে ভরিয়া যায়, কন্যা-বিবাহের পরদিনও বিবাহ-বাড়ী তেমনি আনন্দহীন হইয়া পড়ে। বিদায়-প্রাপ্ত রৌসনচৌকীর বিলাপরাগিণী সেই মর্ম্মবাণীরই অনুকরণে যেন বাজিতে থাকে। বিরহ-ব্যাকুল অন্তরের অন্তর হইতে সেই বিষাদেরই করুণ সুর—পাষাণ টুটিয়া ব্যাকুল বেগে বাহির হইতে চায়। শুধু হিন্দুগৃহ নয়, সকল গৃহে সকল জাতির মধ্যে এই ভাবই অল্প বিস্তররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এখানে ধনী দরিদ্রে ভেদ নাই। শকুন্তলাকে স্বামিসকাশে পাঠাইতে গিয়া মহর্ষি কণ্ব বলিতেছেন—

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।"

—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরও যদি স্নেহপাত্রের জন্য এমন হৃদয়-বৈক্লব্য জন্মে, তবে গৃহীদের যে কন্যা-বিচ্ছেদ-বেদনা অসহনীয় হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

বিশ্বনাথের গৃহও আজ দেবী-প্রতিমা-বর্জ্জিত পূজার দালানের মতই একান্ত শ্রীহীন নিরানন্দ হইয়া গিয়াছিল। বিবাহ উপলক্ষে যে সব কুটুম্ব কুটুম্বিনীরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের ছেলে মেয়েদের কল-কোলাহলে, হাসি ক্রন্দন কলহে বাড়ীখানা দুই দিন একটু জাঁকাইয়া রাখিয়াছিল। ফুলশয্যা পার হইতে দেখিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। সকলেরই সংসার আছে, কুটুম্ব বাড়ী বসিয়া থাকিলে ছেলেরা স্কুলের ভাত পাইবে না, গৃহকর্ত্তারও উপরওয়ালার নিকট জবাব দেওয়া দায় হইবে। তাই রাজলক্ষ্মীও বৃথা অনুরোধে বাধ্য করিয়া করিয়া কাহাকেও বেশী দিন রাখিতে পারিলেন না। এখন উত্তেজনার পর গভীর অবসাদের সময় খালি বাড়ীটা নিতান্তই যেন দুঃসহ মনে হইতেছিল।

সেই একটি মাত্র বালিকার হাসি-খেলার অভাবে সারা বাড়ীখানা যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। কাজকর্ম্মেও মন বসিতে চাহে না, কাজ করিতে গেলে কখন যে সম্পন্ন হইয়া যায় বোঝা যায় না। তখন

কাজের জ্বালায় অন্নপূর্ণার দুই দণ্ড উমার কাছে বসিয়া গল্প করিবার সময় মিলিত না—এখন সেই কাজই অন্য মনে শেষ হইয়া যায়। যখন বুঝিতে পারে, তখনই মনে হয়, তবে আর দিন কাটিবে কি করিয়া? ব্রহ্মার যুগের মত এ যেন অফুরন্ত সময়, ইহার শেষ নাই। শুধু দিনই নয়, রাত্রিও যে তেমনি দীর্ঘ। আজ আর গল্প শুনিবার জন্য কেহ বিছানার ভিতর ব্যাকুল আগ্রহে জাগিয়া নাই। "এতক্ষণে হল? কাজ আর তোমার ফুরোয় না দিদি!"—বলিয়া মৃদু অনুযোগের সহিত দুইখানি কোমল বাহুলতা তেমন করিয়া আর জড়াইয়া ধরিবে না। মাথার বালিসটিতে এখনও তাহার চুলের মাথাঘসার গন্ধ, বিছানাতে তাহারই সুরভিস্পর্শ লাগিয়া আছে, সে-ই কেবল নাই। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুকের বাধা ঠেলিয়াও বাহির হইয়া আসে, শূন্য মনটা শূন্য ঘরখানায় 'হায় হায়' করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

ফুলশয্যার দিন তত্ত্ব লইয়া যাহারা কলিকাতায় কুটুম্বগৃহে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিল, তাহাতে রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, বিশ্বনাথ—কেহই খুসী হইতে পারেন নাই। উমার ভবিষ্য-জীবন চির সুখের হইবে কি না, এই সংশয়ই সকলের মনে জাগিতেছিল। কুলীনশ্রেষ্ঠ রুদ্রকান্ত 'পরের' অর্থ গ্রহণ করেন না, তাই অকল্যাণ-ভীতা সতীনাথের পিসামার কান্নাকাটিতে কেবল ফুল চন্দন ও কনের ঢাকাই শাড়ীখানি মাত্র লইয়াছিলেন। বাকী জিনিষ যেমন গিয়াছিল, তেমনি ফেরৎ আসিয়াছে। সেই সঙ্গে পুনরায় তত্ত্ব না পাঠানর জন্য আদেশও আসিয়াছে। বাড়ীর দাসী মাতঙ্গিনী অনেক চেষ্টায় উমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইয়াছিল। আর কাহারও সে সুযোগটুকুও ঘটে নাই। বাপের বাড়ীর দাসী চাকরদের দেখিলে আদুরে মেয়ে কান্নাকাটি করিবে, অকারণ মন উতলা করিবার প্রয়োজন নাই—কর্ত্তার নিকট হইতে এমনই হুকুম আসায়, কেহ আর সাহস করিয়া উমার কাছে তাহাদের লইয়া যাইতে পারে নাই। মাতী কাহারও মানা মানিবার পাত্রী নয়, তাই সে কতকটা জোর করিয়াই দিদিমণিকে দেখিয়া আসিয়াছে!

অন্নপূর্ণা প্রতিদিন একটু একটু করিয়া সে দিনের সব কথাগুলি খুঁটাইয়া মাতীর কাছে জানিয়া লইয়াছে, তবু তাহার শুনিবার আশা মিটে নাই। মাতীরও সেই একই কথা বলিয়া বলিয়া শ্রান্তি ছিল না—কিন্তু তাহার বর্ণিত সংবাদে অন্নপূর্ণা বা রাজলক্ষ্মী প্রীত হইতে পারিলেন না। উমার অঙ্গে পিত্রালয়ের দুই চারিখানি গহনা ছাড়া সেখানকার কোন অলঙ্কার স্থান পায় নাই। মাতী তাহা ভাল করিয়াই দেখিয়া লইয়াছে। পরণেও একখানি সামান্য শাড়ী, চেলী

বেণাবসী এমন কি একখানা বং করাও নয়। সাবা বাড়ী ঘুবিয়াও সে একটা লোককে পাত পাড়িয়া ভাত খাইতে দেখে নাই। অথচ সেইদিনই নাকি বৌভাত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতা মহিলাদেব নাম গন্ধও ত পাইল না। পুরুষ কেহ ছিল কি না তাহাব সংবাদ সে জানে না। কেবল পাগড়ী-বাধা দবোয়ান ও তেডী-কাটা চাকবেব দল সাবা বাড়ী ঘুবিযা বেড়াইতেছিল। দাসীবাও কার্য্যাভাবে কেবল গণ্ডগোল কবিযা সমযটা কাটাইতে ব্যস্ত। মাতীকে দেখিয়া ভয়েই হউক বা যে কাবণেই হউক উমা কাঁদে নাই, ববং একটু হাসিয়াই ছিল।

জামাই বাবুব কথা তুলিতেই মাতঙ্গিনীব মুখে বাগ্‌দেবীব অধিষ্ঠান হইত—"তা অন্য সব যাই হোক, মায়েব আমাব জামাই যা হয়েচে, অমন কারোদেবও হয় না। আহা, ছেলে ত নয়, যেন মৌব ছাড়া কার্ত্তিক। কিবে রং, কিবে গড়ন, যেন পটেব ঠাকুবটি। খালি গায়ে বসে আছে, ঘব যেন আলো কবে বযেচে। ছোট দিদিমণি সাক্ষেৎ শিবপূজো কবেছিল বাবু, নৈলে কি আব অমন শিবতুল্য সোযামী হয়। আর, বাড়ী ঘব নয় ত—যেন ইন্দিব ভুবন। কিবে শোবা, কিবে আলো, কিবে জাঁকজমক। আবাব আযনা সব কি! দাঁড়ালে মনিষ্যিব পায়েব নখ থেকে মাথাব চুল পয্যন্ত দেখা যায়। দেখে নজ্জাব মবি। 'এ পোড়াব মুখ আব আয়নায় কেন' বলে তাড়াতাড়ি বেরুতে পথ পাইনি। ভাগ্যিস ঘবে কেউ নোক ছ্যালোনা, থাকলে বল্‌তো—বুড়ো মাগীব সখ দেখ, আয়নায় চেহারা দেখ্‌চে।' তা, দিদিমণি আমাদেব খুব সুখে থাকবে। সে এক বাজাব বাজ্যি। এব পব দেখে নিও মা, তখন বলবে যে—'হ্যাঁ, মাতী বলেছ্যাল বটে'।"

বাজলক্ষ্মী কতক বিশ্বাসে কতক সন্দেহে মনে মনে কহিলেন—"তাই হোক্! মা আমাব সেখানে সুখেই থাকুন। আমি ত তাঁকে কাছে রাখতে চাইনি। মেয়ে কাছে বাখাব যে কত জ্বালা, তা যে হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি। সিঁদুব নোয়া নিযে মা আমাব সেই ঘবই করুন।"

অন্নপূর্ণা অশ্রু সম্ববণেব জন্য উঠিয়া গিয়া আলনাব কাপড়গুলা পাড়িয়া পুনবায় গুছাইতে বসিল। কুটুম্বগৃহ-প্রত্যাখ্যাত ক্ষীবেব ছাঁচ চন্দ্রপুলি আম-সন্দেশ প্রভৃতি বাজলক্ষ্মী পাড়াব ছেলেমেয়েদেব ডাকিযা বিতবণ কবিয়া দিলেন।

কয়েকদিন পবে বিশ্বনাথ নিজে কলিকাতায় গিয়া 'যোড়ে' ববকনেব আসিবার প্রস্তাব কবিলেন। শুনিয়া রুদ্রকান্ত রুদ্রমূর্ত্তি ধবিলেন। "কুলীনেব ঘরে ও সব যোড়ফোড় হয় না। মেয়ে নিয়ে যেতে হয় একেবারেই যান্। আমাদেব বাড়ীব বৌয়েদেব বাপের বাড়ী যাবার নিয়ম নেই, ও সব পণ্ডিতী

মত টত এখানে চল্‌বে না। মেয়েব বিয়ে দিয়েছেন, ব্যস্‌। আবার নিত্যি বায়না, আজ যোড়ে যাবে, কাল বিযোড়ে যাবে—সে সব হবে না।"

উমার সহিতও সাক্ষাৎ হইল না, তাহাতে তাহাকে না কি অবাধ্যতা শিক্ষাব প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। "মেয়ে ত একেই কত কেতাদোবস্ত! তাব উপবে নিত্যি নিত্যি বাপের বাড়ীর লোকেব সঙ্গে দেখা হলে আব ঘবে মন টেঁকবে?"

বিশ্বানাথ নীববে গৃহে ফিরিযা আসিলেন। বুঝিলেন—ধনী দবিদ্রেব কুটুম্বিতাব ফল এমনই হইয়া থাকে, এজন্য প্রস্তুত হইয়া আসাই উচিত ছিল। কিন্তু উচিতবোধ যতই থাক, সকল সময় সকল উচিতকে মানিয়া লওয়া যায় না। বিশ্বানাথেব উচিত-জ্ঞানেব অন্তবালবাসী মনেব ভিতবটা যে কি বলিতেছিল. তাঁহাব অন্তর্য্যামীই বলিতে পাবেন। বাহিবে তাহাব প্রসন্নমুখে খুব বেশী ছায দেখা গেল না। তবু এক সময় অন্নপূর্ণার সতর্ক চক্ষু এবং নীবব প্রশ্নেব কাছে মনেব লুকান ইচ্ছাটিকে লুকাইতে না পাবিয়া একদিন তিনি বলিয়া ফেলিলেন—'তাব সঙ্গে আর দেখা হবে না বে। তাকে বডলোকেব বউ কবে দিযেছি। সে আব এখানকাব কেউ নয়।'

* * * * *

সারাদিন বর্ষণেব পব সন্ধ্যাব দিকে বৃষ্টি থামিয়াছে। পথে জল জমিয়া আছে স্কুলেব ছেলেরা ছাতা মাথায দিযা জুতা হাতে হাটু পর্য্যন্ত কাপড তুলিয়া সঘন পদচালনায কাপড জামা মুখ মাথা কর্দ্দমাক্ত জলে ভিজাইয়া মহানন্দে বাড়ী ফিবিতেছিল। তাহাদের উৎসাহ বা আনন্দে বাধা দেওয়াব শক্তি প্রকৃতিবও নাই। যোগী ঋষিদেব মতই তাহাদেব প্রসন্ন-চিত্ত সমভাবে বর্ষাব ধাবা ও বৌদ্রেব তেজ গ্রহণ কবিতে সমর্থ। কোন বাড়ীব ছেলে কাগজেব নৌকা পথেব জলে ভাসাইযা দিয়া উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাহাব গতি নিবীক্ষণ কবিতেছে। মেযেবা কাপড কাচিয়া ঠাকুবঘবেব প্রদীপ সাজাইতেছিল, কেহ বা বাত্রের বন্ধনেব আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময বিশ্বানাথ গৃহে ফিবিয়া স্কুলেব কাপড ছাড়িযা মুখ হাত ধুইযা কি একটা প্রয়োজনে দালানে উঠিতে গিয়াই থমকিয়া দাডাইযা পড়িলেন।

ভিতব বাড়ীর সাম্‌নেব দালানে একখানা বিস্তৃত কুশাসনেব পার্শ্বে মাটিতে বসিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা এক বিধবা নাবী, অদূবোপবিষ্টা অন্নপূর্ণাব সহিত গল্প কবিতেছিলেন।

বিশ্বানাথের খড়মের শব্দে সচকিত হইযা দুইজনেই ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিধবা অগ্রসব হইয়া বিশ্বানাথের পায়েব কাছে নতজানু হইয়া

মাটিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া মাথা দিয়া একবার চরণ ধূলা স্পর্শ করিলেন। বিদ্যানাথ মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার পানে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লইলেন। প্রসন্নমুখে কহিলেন—"কখন এলে মা? বাঁশবেড়ে থেকেই আস্‌ছ ত? সঙ্গে কে আছে?"

রমণী প্রবল চেষ্টায় মানসিক উচ্ছ্বাসটুকু গোপন করিবার জন্য কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া, তাহার পর মুখ না তুলিয়াই কহিলেন—"সেখানে আমার ঠাঁই হোল না বাবা! আমি কল্‌কাতা থেকেই এসেচি। নৈহাটিতে মাসীর বাড়ী কদিন ছিলাম, সঙ্গে আমার মেয়ে কল্যাণী।

বিদ্যানাথ একটুখানি বিস্মিত হইলেও স্নেহের স্বরে কহিলেন—"এখন তা হলে দিন কতক এখানেই থেকে যাও মা। কল্যাণীকে পেলে অন্নপূর্ণাও খুসী হবে। কল্‌কাতার বাসার তা'হলে কি বন্দোবস্ত করে এলে?"

রমণী মুখ তুলিয়া নিম্ন স্বরে কহিলেন—"সেখানকার বাস উঠিয়েই এসেচি। সংসারের ঘা খেয়ে খেয়ে মন আমার ভেঙ্গে গেছে—তাই আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে এলাম বাবা"—রমণীর চোখ দিয়া দুই ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিদ্যানাথ মনে করিলেই, কল্যাণীরও হয়ত অকালবৈধব্য ঘটিয়া গিয়াছে। একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—"তারা—তারা!"

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া এক ক্ষীণাঙ্গী কিশোরী বাহিরে আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর দুইটি ফুটন্ত স্থলপদ্ম রাখিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। হাসি মুখে সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, বিদ্যানাথের প্রশান্ত দৃষ্টি প্রশংসায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভাবিলেন,—এ যে শুক্লবর্ণা স্মিতাননা বীণাবাদিনীর শরীরিণী মূর্ত্তি! কিন্তু সে প্রশংসার দৃষ্টি শীঘ্রই রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার মুখের আলোক যেন সঙ্গে সঙ্গে মেঘে ঢাকা পড়িল। ভাবিলেন তাঁহার অনুমান ত তবে ভ্রান্ত নয়। মেয়েটির বামহস্তে লোহা বা সীঁথায় সিঁদুর,—এয়োতীর কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই। তাঁহার বক্ষ কাঁপাইয়া একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস নির্গত হইল।

বিধবা সম্ভবতঃ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তাই একটু ব্যথিত, একটুখানি লজ্জিতভাবে মৃদুস্বরে যেন তাঁহারই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ কহিলেন—"ওর বিয়ে দিইনি। ওকে আপনার পায়ে ফেলে দিতে এসেছি বাবা! মন আমার শান্তিহারা, আমায় দয়া করে কেবল তাই দিন।"

মেয়েটিকে অবিবাহিতা জানিয়া বিদ্যানাথ বিস্মিত হইলেন না। ভাবিলেন, লোকবল ও অর্থবল না থাকায় হয় ত মেয়ের বিবাহের সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিয়াই শিষ্যা তাঁহার সাহায্য প্রার্থনায় আসিয়াছে, মেয়ে একটু ডাগর হইয়া পড়িয়াছে,—উপায় না থাকিলে কাজেই এমনি হইয়া যায়।

অন্যান্য অবান্তর কথার পব বিদ্যানাথ তাঁহাদের আহারাদি হইয়াছে কি না সংবাদ লইলেন। অন্নপূর্ণা মৃদু হাসিয়া অনুযোগের স্বরে কহিল—"কাকীমা বুঝি আজ এসেছেন দাদামশাই? উমাব বিয়েব আগের দিন ওঁবা এসেছেন। ঐ যে গঙ্গার উপব দোতালা বাড়ীখানা—ঐতে বয়েছেন, তবু বিয়েব সময় খবব দিলেন না।"

বিদ্যানাথেব বিস্মিত দৃষ্টিপাতে লজ্জিত মুখে অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া রমণী কহিলেন—"মাসীব ছেলে প্রকাশ বাড়ী ঠিক কবে আমাদের সেই দিন সন্ধ্যের সময় একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এল। এসেই শুন্‌লাম, উমাব বিয়ে। কল্যাণীর শরীর তখন এমনি খারাপ যে, বিয়ে বাড়ীতে রোগীব ঝঞ্ঝাট ঢোকাতে সাহস হল না। তার পর—"

কন্যাব সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হওয়ায় বমণী বাকী কথা আব শেষ কবিলেন না। বিদ্যানাথ কিছুই বলিলেন না। কিন্তু গুরুব কাছে থাকিয়াও তিনি যে গুরুদর্শন করিতে আসিতে পাবেন নাই, এই অপবাধেব লজ্জায় বমণীব মুখখানি সঙ্কুচিত হইয়া বহিল।

কল্যাণী সরিয়া গিয়া দালানেব অপব অংশে দাঁড়াইয়া ছিল। উঠানেব ফুলগাছগুলি অথবা খোঁটায় বাঁধা বোমন্থন-বত সুখশায়িত মুংলী গাইটি,—কি যে তাহাব এতখানি মনোযোগ আকর্ষণ কবিয়া লইযাছিল ভাল বুঝা গেল না। বিদ্যানাথকে গমনোদ্যত বুঝিয়া সে মুখ ফিবাইয়া দেখিল, মেঘভাঙ্গা বৌদ্রালোক সূর্য্যাস্তেব অপরূপ আভায় বঞ্জিত, তাহাবই খানিকটা তবঙ্গায়িত আলো তাহাব শান্ত মুখে আসিয়া পড়িয়া, এক অবর্ণনীয় মহিমময় সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। সে মুখেব পানে চাহিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ে তরুণীব হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কাছে আসিয়া পুনবায় ভূমিষ্ঠ প্রণাম কবিযা দাঁড়াইতেই, বিদ্যানাথ তাহাব মাথায় হাত রাখিয়া স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে কহিলেন—"সাবিত্রী-সমানা ভব।'

৫

পূর্ব্বকথা

দেবীনাথপুবেব সুবিখ্যাত জমিদাব রায় সাহেব রুদ্রকান্তের নাম কে না জানে? কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটে প্রকাণ্ড বাড়ীখানাব জাঁকজমকে, চাকববাকবদের মূল্যবান্ পবিচ্ছদে, আস্তাবলে অসংখ্য বহুমূল্য গাড়ী ঘোড়ায ও সহিস কোচম্যানদের তকমা-আঁটা চামর-বাঁধা জমিদার জমকালো উর্দ্দিতে অনেকেব অন্তঃকবণেই তাঁহার অর্থ-স্বাচ্ছল্যের পরিমাণ-প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিত। ও জিনিষটাব এমনি

মোহিনী শক্তি যে, যাহার কোন প্রাপ্তি বা প্রাপ্তির আশা পর্য্যন্ত নাই, সেও অহেতুকী ভক্তিতে একবার চাহিয়া দেখিতে বাধ্য হয়।

বাড়ীখানার বাহিরে ও ভিতরে কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্মুখভাগে অনেকখানি খোলা জমি। তাহা আবৃত করিয়া প্রকৃতিদত্ত সবুজের পুরু গালিচা পাতা। চারিধারে সুদৃশ্য রেলিংঘেরা, মাঝখানে বাগান। বাগানে দেশী বিলাতী, জানিত অজানিত, ফুল, পাতার বিচিত্র বাহার, দেশীয় অপেক্ষা বিলাতীরই আধিক্য। স্থানে স্থানে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত আসন-বেদিকা, কৃত্রিম প্রস্রবণ, শষ্পাবৃত কৃত্রিম শৈল, সুন্দর সুন্দর লতাকুঞ্জ এবং দুইধারে গাছের বর্ডার লাগান কঙ্করাবৃত পথ। পথের কোন কোন অংশে বৃত্তাকার, চতুষ্কোণ এবং অন্য নানা প্রকার জ্যামিতিক চিত্রের অনুকরণে গঠিত ভূখণ্ডে নানা জাতীয় ঋতুপুষ্পের বাহার। মর্ম্মরময়ী উড্ডীয়মানা অর্দ্ধনগ্না পরীমূর্ত্তিরও অভাব ছিল না।

রায় সাহেব রুদ্রকান্ত স্বনামধন্য পুরুষ। তাহার বিপুল অর্থ স্বোপার্জ্জিত। বাণিজ্য লক্ষ্মী নিজ ধনভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া এই ভক্ত সেবকটিকে দুই হাতে ধনরত্ন বিতরণে কৃপণতা করেন নাই। কয়লার খনি ও অভ্রের খনি হইতে তাহার মাসিক আয়ের পরিমাণ সাধারণের বিস্ময় উৎপাদনে সমর্থ হইলেও যে কোন বড় ব্যবসাতেও তাহার নাম অজড়িত নহে। শুধু পশ্চিমাঞ্চলেই নয়—আমেরিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়াতেও তাহার অর্থ বাণিজ্যে খাটিয়া থাকে।

কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। শৈশবে, কৈশোরে ও যৌবনের প্রথমাংশে তাহাকেও দুঃখ-দারিদ্র্য যথেষ্টই ভোগ করিতে হইয়াছিল। পিতার নিকট হইতে রুদ্রকান্ত উত্তরাধিকার সূত্রে অসামান্য কৌলীন্য খ্যাতি ও দৈহিক সৌন্দর্য্য ছাড়া অপর কোন সম্পত্তিই পান নাই।

কুলীনশ্রেষ্ঠ রুদ্রকান্তের পিতা ষষ্ঠীদাসের ঘর-দুয়ার কিংবা ভিটার সংবাদ কেহ জানিত না। কুলীন-কুমারের চিরন্তন অধিকারে মাতুল গৃহেই তাঁহার আজীবন বাস। কুলীনের কুল রক্ষা করাই ছিল তাহার একমাত্র পেশা। এ ব্যবসায়ে আয় বড় মন্দ ছিল না, বরং খরিদ্দার সংখ্যার আধিক্যে প্রাপ্য আদায়ের সময়াভাবই দৃষ্ট হইত। নদীপারের পথ ক্লেশ সহ্য করিয়া রাঢ় দেশে গিয়াও তিনি দুই-একটি বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি ছিল।

কুলীন-গৌরব ষষ্ঠীদাসের ষষ্ঠি-সংখ্যক পত্নী গ্রহণের পর কোন রসিকপুরুষ তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'ষেটের ষষ্ঠীদাস'। এই নামকরণই তাঁহার পক্ষে কাল হইয়াছিল। এই জন্যই বলে শূন্য সংখ্যা রাখিতে নাই। 'ষেটের-ষষ্ঠীদাসের'

শূন্যের ঘরে এক বসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মহাপ্রস্থানের ডাক আসিল। পরলোকগতা অনূঢ়া কুলীন কন্যাদের জন্য সেখান হইতে আবেদন পত্র আসিয়াছিল কি না জানা যায় নাই, কিন্তু বাক্‌শক্তিহীন হওয়ায় ও সময়াভাবেই—ইহলোকের দুইটি বাগ্‌দত্তা কুমারীকে আজীবন অনূঢ়াই থাকিতে হইল—ইহাদের পালটিঘর আর মিলিল না। সেই একমাত্র মহাপুরুষের মৃত্যুতে ষষ্টি-সংখ্যক বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী ও শিশু হিন্দুনারী একাদশী ব্রত-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার সম্যক সুযোগ পাইয়াছিলেন।

'মেটের ষষ্ঠীদাসে'র একতমা পত্নী দ্রবময়ী দেবী রুদ্রকান্তের জননী।

মামার বাড়ীতেই রুদ্রকান্ত নিজ বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সে সময়, তাঁহার ন্যায় দুষ্ট ছেলে সে গ্রামে ত ছিলই না, সে অঞ্চলে ছিল কি না সন্দেহ।

রুদ্রকান্তের ষোড়শ বর্ষ বয়সে একদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' উচ্চারণের সহিত দ্রবময়ীর জীবনের খেলা সাঙ্গ হইয়া গেল।

মাতৃবিয়োগে রুদ্রকান্ত কিছুদিন শান্ত ভাবাপন্ন হইল, কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হইল না। তাঁহার মাতুল ও মাতুলানীরা তাঁহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে, একদিন রুদ্রকান্ত গৃহ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন।

তখনও রেলপথ বহুদূর বিস্তৃত হয় নাই। কেমন করিয়া কপর্দ্দকহীন রুদ্রকান্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চলিতে চলিতে, কখনও ভিক্ষা করিয়া, কখনও অতিথিশালায় খাইয়া বহুদিন বহু অবস্থান্তরের পর বিন্ধ্যাচলে আসিয়া পৌছিলেন, এবং ক্রমে দ্বিতীয় কাবুলযুদ্ধের শেষাবস্থায় কমিসেরিয়েটের এক সাহেবের সুনজরে পড়িয়া সৈন্যদলের রসদ যোগাইবার চাকরী পাইয়া, সে কার্য্যে বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়া, যুদ্ধাবসানে পেশোয়ারে বসবাস করিতে লাগিলেন, এবং উপার্জ্জিত অর্থরাশি ব্যবসায়ে খাটাইয়া বৎসরের পর বৎসর একান্ত অধ্যবসায়ে মহাধনী হইয়া উঠিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন।

অর্থ ও যশঃ যখন রুদ্রকান্তের গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিল, তখন হইতেই এই দুইটির স্পৃহা তাঁহার কমিয়া গেল। মানুষ যতক্ষণ না পায়, ততক্ষণই তাহার পাইবার ব্যাকুলতা। আশা পূর্ণ হইলে অবসাদ অবশ্যম্ভাবী,—তখন আর প্রাপ্তের প্রতি অনুরাগ থাকে না, অপ্রাপ্তের জন্যই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। সুখ কিসে? পাওয়ার অথবা পাইবার আশায়? অর্থ, যশঃ ও সম্মানের উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত হইয়াও রুদ্রকান্তের মনে সুখ ছিল না, প্রাণে শান্তি ছিল না। সুখের আশায়

অসার আনন্দে ডুব দিয়া রুদ্রকান্ত দেখিলেন, তাহাতে ক্ষুধা মিটে না, তৃষ্ণা বাড়ে। তৃপ্তি নাই, অবসাদ আছে। যৌবনের অদম্য উৎসাহে তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, তখন সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছিলেন। সে সাধনা বৃথা হয় নাই, তপস্যায় সিদ্ধি মিলিয়াছে। কিন্তু জীবন-মধ্যাহ্নে তপ্ত-আকাশের তেজ সহিবার যে শক্তি ছিল, এখন তাহা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। এখন ক্লান্ত মন একটু স্নিগ্ধ ছায়া, একটু শান্তির স্পর্শের জন্য ব্যাকুল। বাসনার বহ্নি রুদ্রতেজে জ্বলিয়া দাহিকা শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। মন তাই নূতন ভুলিয়া পুরাতনের জন্য— দেশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল! সুখ, দুঃখ, আশা, তৃষ্ণা—শৈশবের, কৈশোরের কত মধুময় স্মৃতি এখনও বুঝি সেখানকার পথের ধূলায় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, খুঁজিলে মিলিবে—সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল, সত্যই কি মিলিবে? যাহাদের ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তাহারা এখনও তাঁহার প্রত্যাগমনের পথ চাহিয়া কি বসিয়া আছে?

জীবনের পথে চলিতে গিয়া প্রথমেই রুদ্রকান্ত ভুল করিয়াছিলেন। তিনি ভাগ্যদেবীর বরপুত্র, সুতরাং সেই সুদূর পেশোয়ারেও প্রজাপতির আয়োজনে শিথিলতা দেখা যায় নাই। প্রবাসী বাঙ্গালী অনেকেই তাঁহাকে জীবন-সঙ্গিনী নির্ব্বাচনে অনুরোধও করিয়াছিলেন। রুদ্রকান্ত তখন স্বাধীন-জীবনের কল্পনায় সে সব অনুরোধ হাসিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন,—'বিবাহের বেড়ী পায়ে দিয়া কেন নিজেকে অধীন করিয়া ফেলিব, এ বেশ আছি।,—ক্রমে এই জীবনই অভ্যস্ত হইয়া গেল, বিবাহের কথা আর মনেও পড়িত না। কিন্তু জীবনের অপরাহ্নে যখন শূন্য ঘরের পানে ফিরিয়া চাহিলেন, তখন হৃদয় যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। সেখানে আদেশপালক ভৃত্য আছে, সুখের সহচর বন্ধু আছে, উপদেষ্টা সুহৃৎও হয় ত থাকিতে পারে, কিন্তু আপন বলিয়া বুকে টানিবার, শান্তি দিবার, তৃপ্তি দিবার, কর্ম্মক্লান্তি জুড়াইয়া দিবার প্রিয়জন নাই। তাই ক্রমে ব্যবসায় কতক গুটাইয়া কতক সুবন্দোবস্ত করিয়া ক্রোরপতি রুদ্রকান্ত আবার একদিন তাঁহার জননী জন্মভূমির স্নেহের অঙ্কে ফিরিয়া আসিলেন। সে জননী তখন বৃদ্ধা, জীর্ণা, শীর্ণা, কঙ্কালবিশিষ্টা, ম্যালেরিয়া-বিষে জর্জ্জরিতা হইয়া গিয়াছেন। এ মাকে দেখিয়া রুদ্রকান্তের সেই শস্য শ্যামলা পত্র-পুষ্পাভরণা লীলা-মাধুর্য্য-মণ্ডিতা কমলদল-খচিতা শৈশবের সেই আনন্দদায়িনী 'মা' বলিয়া যেন মনে পড়িল না। পল্লজননী আজ রূপান্তরিতা হইয়া গিয়াছেন।

রুদ্রকান্ত যাহাদের ফেলিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আর তাহাদের দেখিতে পাইলেন না। শৈশবের খেলাধূলার সাথী হরকুমার ও নবকুমার—মামাতো ভাই

দুইটির মৃত্যু হইয়াছে, মাতুলানীও স্বর্গগতা। পুরাতনের স্থান লইয়া এখন নূতন লোক সেখানে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। হরকুমার ও নবকুমারের বিধবাদ্বয় কয়েকটি ছেলেমেয়ে লইয়া জীর্ণ ঘরে কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া বাস করিয়া আছেন। এ বধূ দুইটিই রুদ্রকান্তের অপরিচিতা; ছেলেমেয়েগুলিও ততোধিক। রুদ্রকান্তকে তাহারা কেমন করিয়া চিনিবে? হরকুমারের পত্নী, স্বামী ও শাশুড়ীর কাছে রুদ্রকান্তের গল্প শুনিয়াছিলেন, সে রাগ করিয়া দেশত্যাগী হইয়া গিয়াছে—এই পর্য্যন্তই জানা ছিল। সেই রুদ্রকান্ত যখন লোক-লস্কর সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, আনন্দে ক্ষুদ্র পল্লী তোলপাড় হইয়া উঠিল। দেশে নবীনদের অনেকেই অন্তর্হিত হইলেও, শিকড়-বাহির-করা জীর্ণ বটগাছের মত। প্রাচীনদের এখনও কয়েকজনকে দেখিতে পাওয়া গেল। তাঁহারাও ম্যালেরিয়া-জীর্ণ- প্রতিদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। রুদ্রকান্তকে চিনিয়া তাহারাই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। রায় পুকুরের তীরে দাঁড়াইয়া, শৈবালাচ্ছন্ন পানাভরা পঙ্কিল পুষ্করিণীর সবুজ জলের পানে চাহিয়া রুদ্রকান্তের মনে হইল, জল নাড়া দিয়া অতীতের সেই সব সুখের স্মৃতিগুলি আবার খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি?

রুদ্রকান্ত নবকুমারের রোগ-জীর্ণ, প্লীহা লিবারে-স্ফীতোদর, অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন, অপরিপুষ্ট ছেলেমেয়েগুলিকে, মনের সঙ্গে না পারিলেও, নিজের কাছে টানিতে চেষ্টা করিলেন। বসন-ভূষণের অভাব ঘুচাইয়া অনেকখানি চেহারা বাহির করিতেও সক্ষম হইলেন। তবু এক গাছের শাখা ভাঙ্গিয়া অন্য গাছে জোড়া দিলেও যেমন অল্প দিনেই তাহার শুষ্ক-মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠে, রুদ্রকান্তের কাছে ইহারাও তেমনি ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া উঠিতেছিল। ভিতরের ব্যাপার কতটুকু কৃত্রিম, এ তত্ত্ব বুঝিতে শিশু-প্রকৃতি অদ্বিতীয়। রুদ্রকান্তের স্নেহ তাই তাহারাও মন খুলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না।

পল্লীগ্রামের অনাড়ম্বর শান্ত জীবন রুদ্রকান্তের বেশী দিন ভাল লাগিল না, কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী কিনিয়া বাস করিলেন। আসিবার সময় নবকুমারের বড় ছেলেটিকে সঙ্গে আনিলেন। ছেলে আসিতে ভয় পাইতেছিল, মা বুঝাইলেন,—"জ্যেঠার মন যুগিয়ে ভাল করে চল্‌তে পার্‌লে, তোরই সব,—একটা রাজার ঐশ্বর্য্য তোর জ্যেঠার। কেন দুঃখে মর্‌বি, সঙ্গে যা।" ছেলে মুরারি এ কথার পর আর কোন আপত্তি করিল না। রুদ্রকান্ত তাহাকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া বিদ্বান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিলেন, সে আশা দুরাশা। স্কুল পলাইয়া ঘুড়ি উড়াইয়া ছোটলোকের দলে মিশিয়া আড্ডা দিবার দিকেই

তাহাব লোলুপ দৃষ্টি। রুদ্রকান্তকে সে ভয় কবে, ভক্তিও দেখায়—কিন্তু ভালোবাসে না।

কোপন-স্বভাব রুদ্রকান্ত একদিন শাসনেব মাত্রা বর্দ্ধিত করায়, মুবারি কোথায় যে অন্তর্হিত হইযা গেল, সাবাদিন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সন্ধ্যাব সময একটা বাবোযারীব যাত্রাস্থল হইতে চাকরেবা তাহাকে ধরিয়া আনিল। মুবাবি পথে অনেক বাধা দিয়াছিল, তাহাব 'বডলোকেব পোষ্যপুত্র' হইবার প্রয়োজন নাই, বলিযা হাত পা ছুঁডিয়া নিজেকে ছাডাইয়া লইবাব যথেষ্ট চেষ্টাও কবিযাছিল, কিন্তু পালোযান গিবিধাবীলালেব হাত ছাডাইতে পারে নাই। রুদ্রকান্তেব সম্মুখে যখন তাহাকে ছাডিয়া দেওযা হইল, সে ভিজা বিডালটিব মত একোণ নিবীহ ভাবে মুখ নীচু কবিযা দাঁডাইল। এতক্ষণেব তর্জ্জন গর্জ্জনের চিহ্নমাত্র ছিল না। যেন অত্যন্ত সুবোধ, বডই বাধ্য, বিনীত। রুদ্রকান্ত একবাব মুখ তুলিযা দেখিযা, সংবাদপত্র পডিতে লাগিলেন। কোন কথাই বলিলেন না। মুবাবি হাঁপ ছাডিযা বাচিল। রুদ্রকান্ত মনে কবিয়াছিলেন, শাসনেব অপেক্ষা এই মৌন তিবস্কাবে হযত অধিক ফল হইবে। মুরারি ছাডা পাইয়া নিঃশব্দে চলিযা গেলে রুদ্রকান্ত বুঝিলেন, অভিমানেবও পাত্রাপাত্র আছে।

ইহাব কিছুকাল পবে কযলাব খনি সম্বন্ধে এক মোকদ্দমা উপলক্ষে একদিন বর্দ্ধমানে গিয়া তাহাব পুবাতন বন্ধু বর্দ্ধমানবাসী মন্মথ বসুব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে গেলেন। মন্মথেব সহিত পেশোযাবেব আলাপ—সেও সেখানে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা কুডাইতে গিযাছিল, কিন্তু ঘবেব দিকে টান অধিক থাকায় বেশী দিন টেঁকিয়া থাকিতে পাবে নাই। রুদ্রকান্তকে দেখিয়া মন্মথ আশাতীত আনন্দ লাভ করিল, দুই বন্ধুতে সুখ দুঃখ, অতীত বর্ত্তমানেব অনেক আলোচনাই হইল। বন্ধু বিদায় চাহিলে মন্মথ অনুবোধ কবিল-"আজ বাতটা থেকে যাও ভাই। যদি দয়া কবে দীনেব কুটীরে পা দিয়েচ, আজ আব ছেডে দিচ্চি না। বাডীর গিন্নির তা হলে আপশোষেব সীমা থাকবে না, কাল খাওয়া দাওয়া কবে তবে যাবাব কথা—আজ অসময়ে কিছুই ত জোগাড-জাগাড হল না। রুদ্রকান্ত হাসিয়া সম্মতি দিলেন—"যাচা অন্ন ছেড়ে যাওয়াই মূর্খামি। বামুনের ছেলে ফলার পেলে ছাডা শক্ত হে। গিন্নিকে খবব দাও, তাঁব নিমন্ত্রণ না খেয়ে নডচি না।"

মন্মথ হাসিয়া কহিল—"সুধু ব্রাহ্মণ—একেবারে কুলীন কেশরী! কি আশ্চর্য্য! বংশের নাম ডুবিয়ে দিলে হে? চিরকুমার ব্রতাবলম্বী—তোমার তা হলে কি নাম দেওয়া যায় বল দেখি?" রুদ্রকান্ত বলিলেন—"কার্ত্তিক ছাডা

আর কি বলতে পার বল? চেহারাখানাও অনেকটা সেই রকম ত?" বলিয়া গোঁফে চাড়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন। মন্মথ এ পরিহাসের সত্যতা অস্বীকার করিল না, কহিল—"তা বড় মিছে বলনি ভাই, আহা তোমারই এক জাত-ভাই—চন্দ্রনাথ বলে একটি ছোকরা এখানে ছিল, বড় অমায়িক ছোকরা। স্ত্রীটিও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কলেরা হয়ে একদিনে দুজনে মারা গেল, এক চিতায় দাহ করা হোল। সে এক বিরাট ব্যাপার! ফুলের মালা, চন্দন কাঠ, সিঁদূর, আল্‌তায় ঘাট বোঝাই হয়ে গেল। মেয়েরা সব গায়ের গহনা বাঁধা দিয়ে সহমরণের খরচ ঘি চন্দন যোগাতে লাগ্‌লো। পায়ের ধূলো নেবার, সিঁদূর মাথাবার সে যে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি! তা যা বল ভাই, আমাদের মেয়েদের ভেতর এতটুকু খাঁটি জিনিস এখনও আছে। বেঁচে থাকতে যাঁরা যত জালাই দিন—মলে সঙ্গে যাবার জন্যে সবাই তৈরী।" রুদ্রকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, এ বসে তিনি বঞ্চিত,—হিন্দুর মেয়ের স্বামী-প্রেম তাঁহার ধারণার অতীত। শৈশবে তিনি দেশ ছাড়িয়া গিয়াছেন—নিজের পিতাকে কখনও চক্ষে দেখেন নাই। তবু উচিত বোধে উৎসাহ দেখাইয়া কহিলেন—"তার পর, তাদের ছেলেপুলে কেউ ছিল না কি?"

মন্মথ দুঃখিত ভাবে কহিল—"ছিল কেন? আছেও দুটি,—একটি মাস কতকের। তাদেরই কে একজন অনেক দূরের জ্ঞাতি পিসি সেই ছেলে দুটির কাছে এসে রয়েছে—মানুষ কচ্চে। আহা ছেলে ত নয়—যেন রাজপুত্তুর—দেখ্‌লে চোখ জুড়োয়! মরি মরি, বাছাদের মুখ চাইলে বুক ফেটে যায়।" রুদ্রকান্ত কহিলেন—"চন্দ্রনাথ'বল্লে বুঝি? তা তাঁর দেশ কোথা ছিল?" মন্মথ হাসিল—"কুলীনের ছেলের দেশ কোথায় থাকে নিজে বুঝে দেখ? এখানে ছিল মামার বাড়ী! মামা ছিল না, তার মা-ই—বাপের এক মেয়ে—বাপ মারা যাওয়ায় জামাই বিষয় পায়। বিষয় ত অনেক। এখন ছেলে দুটির সকল দিকেই দুরবস্থা। চন্দ্রনাথের বাপের নাম ছিল—'ষেটের ষষ্ঠীদাস'। পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুরের পঞ্চসার গ্রামে বাড়ী ছিল। ষাট্‌টি বিয়ে থাকায় ঐ নামকরণ করা হয়েছিল। আসল নাম—ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনেছি ষাট্‌টীতেই বেচারার সময় ফুরিয়ে গেল—এ কি তোমার অসুখ কচ্চে না কি? ওরে ও হরে, এই রেজো, পাখা নিয়ে আয়। কি গরমই পড়েচে? কপালটা এমন ঘাম্‌ল কেন বল দেখি?" রুদ্রকান্ত হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—"না,—না, কিছু হয় নি। ছেলে দুটিকে একবার দেখা চাই যে, তারা আমারই ভাই-পো।"

পরদিন বন্ধুকে লইয়া রুদ্রকান্ত তাহাদের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিছু দূরে

একখানা জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রুদ্রকান্ত যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইলেন।

রান্নাঘরের বাহিরে গোবর-মাটি নিকান দাওয়ায় বসিয়া একজন প্রৌঢ়া নারী কড়ায় করিয়া দুধ জ্বাল দিতেছিলেন। তাঁহারই অল্প দূরে ছিন্ন মাদুরের উপর দাঁড়াইয়া গৌরতনু কোমলকান্তি তরুণ মহাদেবের মূর্ত্তি বার তের বছরের একটি বালক,—একটি জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্রকায় শিশুকে দোলাইয়া, সুর করিয়া পাঠ্য পুস্তকের কবিতা আবৃত্তি করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত ক্ষুধাতুর শিশু—কবিতার মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবলি কাঁদিতেছিল। অপরিচিত রুদ্রকান্ত ও পরিচিত গ্রাম সম্পর্কীয় মন্মথ কাকাকে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে তাহার বড় বড় কালো চোখ দুটি রুদ্রকান্তের মুখের উপর স্থির করিতেই, মন্মথ কহিলেন,—"ইনি তোমার জ্যেঠামশাই, তোমাদের দেখ্‌তে এসেছেন, এঁকে প্রণাম কর সতীনাথ।" সতীনাথ ক্রন্দনাতুর ভাইটিকে মাদুরে শোয়াইয়া রুদ্রকান্তের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। সেই মুহূর্ত্তেই রুদ্রকান্তের মনে হইল, আজিকার প্রণামই যেন তাহার জীবনের প্রথম প্রণাম পাওয়া। একরাশি কুন্দফুলের মত অনাবৃত-গাত্র সতীনাথের সঙ্কুচিত দেহ দুই হাতে ধরিয়া বুকে চাপিতেই, যেন তাহার তৃষিত অন্তরের দাহ-তাপ জুড়াইয়া শরীর শীতল হইয়া গেল।

সতীনাথ কখনও জ্যেঠামশায়কে দেখা দূরে থাকুক, নামও শুনে নাই; তবু তাঁহার স্নেহের সে স্পর্শটুকু সে তাহার শোকাতুর অন্তঃকরণের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল। অপরিচিত ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া সতীনাথের পিসীমা মাথায় একটু কাপড় টানিয়া দিয়া, রান্নাঘরের ভিতর চলিয়া গিয়াছিলেন। রুদ্রকান্ত সতীনাথের জ্যেঠামশায় শুনিয়া ভ্রাতৃসম্বন্ধের দাবী থাকায় তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"আজ বিকেলের গাড়ীতে এদের আমি বাড়ী নিয়ে যাব দিদি। আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে। আমার ঘরে ত মেয়ে ছেলে নেই, কচি বাচ্ছা মানুষ করবার ভার তাঁরা আপনাকে দিয়ে গেছেন, আপনি ত ফেলতে পারবেন না।"

রুদ্রকান্ত এমন ভাবে কথা পাড়িলেন ও উপসংহার করিলেন যে, দাক্ষায়ণী, মনে যাই থাক, মুখেও একবার লোক দেখান "সে কি হয়, আমি কি করে যাই" বলিতে সময় পাইলেন না। সংসারে তাহার নিজের বলিবার বন্ধন কাটিয়া ছিঁড়িয়া ফুরাইয়া গিয়াছে, কাজেই মৌনে সম্মতি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।

মন্মথ কহিল,—"বাড়ী ঘরের ব্যবস্থা তা হলে কি রকম করা হবে?" রুদ্রকান্ত হাসিয়া কহিলেন,—"সতীনাথের পৈত্রিক ভিটা বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে বৈ কি।

গিয়েই টাকা পাঠিয়ে দেব, সংস্কাব করিও। কেউ বাস কর্‌তে চায় বাস কর্‌বে, ভাড়া টাকা দিতে হবে না। সন্ধ্যের আলো পড়বে, তা হলেই হলো।”

সতীনাথ, সুধীব ও তাহাদেব পিসীমাকে লইয়া রুদ্রকান্ত কলিকাতায় ফিবিয়া আসিলেন। মনে হইল, এতদিনে তাঁহাব অর্থ সঞ্চয়, বিপুল ব্যয়ে উদ্যান, অট্টালিকা নির্ম্মাণ সমস্তই সার্থক হইয়াছে।

সেই বারো বছবেব সুন্দর ছেলেটিব ভিতব এমন কি ছিল বলা যায় না, যাহাতে রুদ্রকান্তেব প্রকৃতিও পিতৃবৎ স্নেহ কোমল হইযা উঠিল। স্নেহ প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিগুলিকে তিনি চিবদিন ‘নাবীভূষণ’ আখ্যা দিয়া ঠাট্টাই কবিয়া আসিয়াছেন। তবু এই অনাস্বাদিত স্নেহেব শিকল পায়ে পবিবাব সময় তাঁহার ভারবোধ হইল না, অনুতাপ আসিল না। সতীনাথকে রুদ্রকান্ত সত্যই ভালবাসিয়াছিলেন। যে পবিত্র জাহ্নবীধাবা ছড়াইযা দিলে তৃষ্ণাতুবেব তৃষ্ণা হবণ করিয়া জীবন ধন্য হইত, রুদ্রকান্ত তাহাকে শম্ভুজটাজালবদ্ধ ভোগবতীব ন্যায় সতীনাথেব পরেই বদ্ধ কবিযা বাখিয়া দিলেন। বিশ্বেব তৃষ্ণা মিটাইতে দিলেন না। তাঁহার চিববুভুক্ষ অন্তঃকবণ যখন একটিমাত্র স্নেহপাত্রেব উপব আপনাব সারাজীবনেব ক্ষতি পূবণেব দাবী চাহিয়া বসিল, তখন একবাব ভাবিযাও দেখিল না যে, সে প্রচণ্ড ক্ষুধা মিটাইবার শক্তি ঐ একমাত্র স্নেহাধাবেব থাকা সম্ভব কি না।

অবশ্য সতীনাথকে ভালবাসিয়া তাঁহাব মেজাজ যে একেবাবে বদল হইয়া গিয়াছিল, এমন নয়,—শুধু একটা নিদ্রিত বৃত্তি জাগিয়াছিল মাত্র। বযসেব সঙ্গে রুক্ষতার ঝাঁজ রুদ্রকান্তের বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সতীনাথেব ছোট ভাই সুধীব বিশেষ কবিয়া তাঁহাব চক্ষুশূলই হইয়াছিল। মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত রুগ্ন, শীর্ণকায় শিশুব ক্রন্দনে অনেক সময় তাঁহাব ইচ্ছা হইত, পা দুইটা ধবিয়া মাটিতে আছাড় দিয়া তাহার মাতৃহীন জীবন শেষ কবিয়া দেন আর সেই অদম্য প্রলোভনটাকে দমন করিবার জন্য মুখে তিনি অবিশ্রাম গর্জ্জন কবিতেন। তাহার উপব শত্রুতা সাধনের জন্যই যে তাহাদের জননী নিজ অকাল মৃত্যুও ঘটাইয়াছে, সে বিষয়ে রুদ্রকান্তেব সংশয় না থাকায়, মৃতাও সে মিষ্ট আপ্যায়নে বঞ্চিত থাকিত না। কেবল সতীনাথের পিতার উপবে তাঁহাব কোন আক্রোশ ছিল না। বাডীব লোকে প্রাণপণে তাঁহার মন যোগাইয়াও অকাবণ গালি হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। কেবল সতীনাথই সে সব ঝড় ঝাপ্‌টার হাত হইতে এড়াইয়া যাইত। এই অসম-পক্ষপাতিতাব ফল সতীনাথেব পক্ষে বড় মঙ্গলের হয় নাই।

রুদ্রকান্তের পক্ষপাতিতায় সবচেয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল মুরারি। আর, বোধ হয় সে জন্য তাহাকে খুব বেশী অপরাধীও করা যায় না। শৈশবে মাতুল-গৃহে পালিত

রুদ্রকান্তের যখন পিতৃগৃহের সহিত কোনও পরিচয় ছিল না, তখন একমাত্র আত্মীয় ছিল এই মুরারির পিতা। তখন কোথায় ছিল তাহার কুলীন পিতা এবং কোথায় ছিল এই সব উড়িয়া-আসা বৈমাত্রেয় সংসার! স্নেহের দাবী, আত্মীয়তার দাবী, অন্নের ঋণ—সে সব কিছুই নয়,—এখন আপন হইল বৈমাত্রেয় ভায়েব ছেলে? এ অবিচার ভগবান্ যে কেমন কবিয়া সহিয়া থাকিলেন, তাহা মুরারির বোধগম্য না হইলেও, সে যে নিজে সহিতে অসমর্থ, এটুকু ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। একটা মেয়েলি কথা আছে,—"যে এলো চষে—সে থাক বসে, যে এলো হাত নেড়ে—তাবে দেও ভাত বেড়ে"—এ যেন তেমনি বিচার হইল। 'জন জামাই ভাগিনেয়' যে কখনও আপনার হয় না, অকৃতজ্ঞ রুদ্রকান্তই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আপনার পল্লীবাসে দরিদ্র-কুটীরে সে ত সুখেই ছিল; যদি সতীনাথের 'পরেই এতখানি টান, তবে তাহাকে সেখান হইতে খুঁজিয়া আনিয়া প্রলোভনে ভুলাইবার প্রয়োজন কি ছিল? ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিত্বের আশা স্পষ্টতঃ রুদ্রকান্ত কখনও তাহাকে না দিন, তাঁহার কৌমার-জীবন স্বতঃই মুরারির মনে এই আশা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং তাঁহার লোভাতুরা মাতাও এই আশাতেই স্বেচ্ছায় তাহাকে রুদ্রকান্তের অনুবর্ত্তী কবিয়া দিয়াছিলেন। অকৃতজ্ঞ রুদ্রকান্ত নিজ শৈশব-জীবন বিস্মরণ হইলেও তাহাবা ত ভুলিতে পাবে না!

৬

কল্যাণী

কয়েক বৎসর কাটিল। অসাধাবণ মেধা ও অদম্য উৎসাহেব বলে, সতীনাথ ২২ বৎসর বয়সে মেডিক্যাল কলেজে হইতে এম-বি উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। সে বাড়ীতেই বসিয়া থাকে এবং সুদীর্ঘ অবসর কাল নানা শাস্ত্রচর্চ্চায় অতিবাহিত করে।

ঘড়ির কাঁটার সহিত সমতা রাখিয়া প্রতিদিন বেলা দশটার সময় সতীনাথকে তাহার দ্বিতলের পাঠগৃহের রাস্তার ধারের জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যাইতে লাগিল। কোনদিন তাহার হাতে একখানা পাতা খোলা পুস্তক, কোনদিন কিছু নাও থাকিত। অফিস কলেজের সময় পথে গাড়ী চলার অন্ত নাই; তবু যতক্ষণ একখানা বিশেষ গঠনের পরিচিত গাড়ী রাস্তার অপরপারের একখানা ছোট দ্বিতল বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া সেখানকার আরোহিণীটিকে লইয়া চলিয়া না যাইত, ততক্ষণ হাজার কাজ থাকিলেও সতীনাথের সে স্থান ছাড়িয়া যাইবার তাড়া দেখা যাইত না।

ঘটনা ক্রমে একদিন সেই বিদ্যার্থিনী মেয়েটির দুটি কালো চোখের কোমল দৃষ্টি অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত রূপে সতীনাথের মুখে নিবদ্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল। তারপর কেন যে সতীনাথ নিজেদের প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড বাড়ীখানায় যথেষ্ট আরামের স্থান না পাইয়া, প্রতিবাসিনীর স্বল্পায়ত ভাঙ্গাচুরা ভাড়াটিয়া বাড়ীখানায় যাতায়াত আরম্ভ করিল, এবং কেমন করিয়া তাঁহাদের চিত্তের মধ্যেও অনেকখানি স্থান করিয়া লইল তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে কল্যাণীব একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺নবীনমাধব মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী তারাসুন্দরী তাঁহার একমাত্র মেয়েটিকে লইয়া ঐ ১৭ নম্বর ভাড়াটিয়া বাড়ীখানায় বাস করিতেন। কন্যা কল্যাণী বেথুন স্কুলের ছাত্রী। আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফলতার আশায় কঠোর অধ্যয়নে সে তাহার ক্ষীণ দেহখানিকে ক্ষীণতর করিয়া তুলিতেছিল। সে স্বভাবতঃই ক্ষীণাঙ্গী, দেখিলে মনে হয় হাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া আছে,—জগতের এতটুকু ঝড় সহ্য ত দূরের কথা, একটু জোরে বাতাস উঠিলেই বুঝি এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবু সে যে সুন্দরী—এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিত না।

তারাসুন্দরীর স্বামী নবীনমাধব যখন নিজ সমাজ ও আত্মীয়দেব ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার তরুণী পত্নী স্বামীর অনুগামিনী হইতে স্বীকৃত হন নাই। নবীনমাধবের পিতা তখনও বর্ত্তমান এবং তারাসুন্দরী সন্তানসম্ভবা হিন্দু কুলবধূ। পুত্রের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সংবাদে বৃদ্ধ ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় ক্রোধে জলন্ত অগ্নির মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিলেন। নবীনমাধব স্ত্রীকে কাছে লইয়া যাইতে চায় শুনিয়া সে অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। ক্রুদ্ধ পিতা জানাইয়া দিলেন, এই নূতন ধর্ম্মের সহিত নবীন তাহার আত্মীয় বন্ধু পত্নী এবং উত্তরাধিকারিত্ব হইতে চির নির্ব্বাসিত হইল। স্ত্রীর মুখেও সেই একই ধরণের কথা—"সে যাইবে না।" সে কাঁদিয়া মুখ চোখ ফুলাইয়া ফেলিল, তবু স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইতে চাহিল না। বাপ পিতামহের ধর্ম্ম ছাড়িয়া সে খ্রীষ্টানী ধর্ম্ম লইতে পারিবে না। অভিমানে নবীনমাধব স্ত্রীর উপর জোর করিলেন না, বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

কন্যা কল্যাণীর জন্মের পর নবীনমাধব আর একবার স্ত্রীকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়া, হাল ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ঘনশ্যাম পয়সার মানুষ ছিলেন না। নবীন ব্যতীত তাঁহার আরও দুই তিনটি সন্তান থাকায় মৃত্যুকালে তারাসুন্দরীর ভবিষ্যতের জন্য বড় বেশী উপায় করিয়া

যাইতে পারিলেন না। ছেলেদের কাছে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন—কল্যাণীর পিতার উপর তিনি যে অন্যায় করিলেন, কল্যাণীর 'পরে তাহার কাকারা যেন তাহা না করেন। যেন "ঘর বর" ভাল দেখিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া হয়।

স্বামী-পরিত্যক্তা বধূর উপর সাধারণতঃ কোন সংসারেই বিশেষ করিয়া কাহারও মমতা জন্মায় না। বরং গলগ্রহ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসটাও ক্রমশঃ "ভড়ং" "বাহাদুরি" লওয়া "মেয়ে মদ্দামী" এই সকল শ্রুতি-সুখকর বিশেষণে বিশেষিত হইয়া উঠিতেছিল। 'স্বামী যার ভাল নিলে না, পরে তার ভার বইবে কেন?' এমনি একটা বিদ্রোহের ভাব সকলের মনেই ঘনশ্যামের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঘনাইয়া উঠিতেছিল। তাহার উপর—মেয়ে যখন মাথা ঝাড়া দিয়া তাহার বিবাহ দিবার আশু প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে চাহিল, তখন সংসারের ছোট বড় সকলকার মনই তাহাদের উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। বাপ বর্ত্তমান—তবু 'কন্যাদায়' হেন এত বড় দায় অপরকে বহিতে হইবে—এ যে বেজায় জুলুম? এত যার মনে বল—যিনি স্বামী ত্যাগ করিতে ভয় পান না—মেয়ের বিয়ের জন্য তাঁহার ভাবনা কিসের? তার ধর্ম্ম তাঁকে সাহায্য করুক। দুর্ভাগিনী বলিয়া ঘনশ্যাম অন্য বধূ কন্যাদের অপেক্ষা তারাসুন্দরীকে অধিক স্নেহ করিতেন—বধূ যে তাঁহারই কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য আত্মবলি দিল এটুকু তিনি ত বিস্মৃত হয়েন নাই? উপরে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া ভিতরটা যে তাঁহারও ভস্ম হইয়া যাইতেছিল। অপরাধী ত বধূরই সর্ব্বস্ব নহে—সে যে বড় আশার বুকের ধন, বংশের দুলাল—জ্যেষ্ঠপুত্র! মরণের পরেও তাহার কাছে দাবী রাখিয়া বসিয়াছিলেন তাহাকে যে ত্যাগ করিতে হইল—এ দুঃখ কি ভুলিবার! তাই কল্যাণীর আদর সকল ছেলেমেয়ের উপরে। বাড়ীর লোকে অত কথা বুঝিবে কেন? তাহারা বৃদ্ধের পক্ষপাতিত্বে ঈর্ষ্যা-ক্ষুণ্ণ হইত।

প্রথমে তারাসুন্দরী শ্বশুরের ভয়ে ও পরিজনবর্গের বিরাগ সম্ভাবনায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইতে সাহস করেন নাই। কিন্তু দুঃখের দিনে তিনি যখন তাঁহার নিজ ইষ্টদেবতাকেই অবলম্বন করিতে শিখিলেন, তখন অস্বীকার নিজের মনের কাছেও প্রবল হইয়া উঠিল। স্বামীর পথই যে তাহার পথ, সে কথা তিনি কিছুতেই আর মানিতে পারিলেন না। স্বামীই স্ত্রীর ঈশ্বর, কিন্তু তাঁরও যে ঈশ্বর আছেন! ধর্ম্ম কি ব্যবসায়ের জিনিষ, যে স্বামীর সাহচর্য্য লোভে সে ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন? অথবা মনে অন্য ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখিয়া বাহিরে ভান দেখাইবেন? ভিন্নধর্ম্মী স্বামী-স্ত্রীর যে একত্রবাস ও একাত্মা হওয়া সম্ভব নয়, তাহা নবীনমাধবও অস্বীকার করিলেন না। তাই পিতার মৃত্যুর পর নবীনমাধব যখন শেষবার স্ত্রীর মত চাহিলেন, তখন

তারাসুন্দরী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া সানুনয়ে অসম্মতি জানাইলেন—এ জন্মের মত স্বামিপূজা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। নিজের ধর্ম্ম আচার বিশ্বাস, ঐহিক সুখের জন্য বেচিতে পারিবেন না। নবীনমাধব ক্ষুণ্ণ হইলেও মনে মনে স্ত্রীর প্রশংসাই করিলেন। এই ত তাঁহার যোগ্য পত্নী! তিনি যেমন পার্থিব কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে নিজ বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই, ধর্ম্মকে শুধু ধর্ম্মের জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন,—স্ত্রীও যদি তেমনি ভাবে নিজের কেন্দ্রে নিজে স্থির থাকিতে পারেন, তাহাতে তিনি বাধা দিবেন কেন? তাঁহার মনে আঘাত না লাগিয়া তাহা বরং শ্রদ্ধায় আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ঘনশ্যামের মৃত্যুর পরেই তারাসুন্দরীর পৃথিবীর রঙ্ বদল হইয়া গেল। তিনি এখন শ্বশুর-গৃহের অনাবশ্যক ভার মাত্র হইয়া উঠিলেন। দেবর ও যাতৃগণের অনাদর ও অবহেলা সহ্য করিয়া আরও কিছুদিন কাটাইলেন।

একদিন আকস্মিক বজ্রাঘাতের মত শুনিলেন—তিনি বিধবা। যে স্বামীকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মরণকালেও সেই স্বামী, স্ত্রী কন্যার অসহায় অবস্থা স্মরণে রাখিয়া স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি তাঁহারই নামে দানপত্র লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরদের সহিত একত্র বাস যখন আর সম্ভব হইল না, তারাসুন্দরী তখন পুরাতন ভৃত্য ভজহরির সাহায্যে নবীনমাধবের কলিকাতার ভাড়াটিয়া বাসা বাড়ীতে মেয়ে লইয়া বাস করিতে আসিলেন। হুগলীতে তাঁহার গুরুর বাড়ী, একবার ইচ্ছা হইয়াছিল সেইখানেই যান, কিন্তু তীর্থকামী তীর্থবাসের সুযোগ পাইলে যেমন সহজে তাহার লোভ ত্যাগ করিতে পারে না, স্বামীর শেষজীবনের স্মৃতিতীর্থস্থানটিও তেমনি ভাবে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিল। কার্য্য কারণের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যে বিধাতা অদৃশ্যে প্রতিনিয়ত অলক্ষ্য সূত্র যোগাইয়া চলিতেছিলেন, হয়ত তাঁহারও অদৃশ্য ইঙ্গিত ইহার তলে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিয়াছিল। অদূরদর্শী মানব তাহার গোপন অবস্থান লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল সূত্রে জড়াইয়া পড়িল।

কলিকাতার সহস্র কোলাহলের মধ্যে তারাসুন্দরীর সমাহিত চিত্তকে খুব বেশী বিক্ষিপ্ত করিতে পারিল না। ভগবানের উপর অটল বিশ্বাসে মেয়ের ভবিষ্যতের ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়া, নিজের পূজার্চ্চনার কাল তিনি বাড়াইয়া দিলেন। স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলে তিনি তাঁহার কন্যার সম্বন্ধে কি ভাবে চলিতেন, এই চিন্তাটা যখন তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল, তখন অনেক ভাবিয়া মেয়েকে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ঘনশ্যাম জীবিত থাকিতে, কল্যাণীর স্বাভাবিক জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা ও তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি দেখিয়া নিজেই তাহার শিক্ষার ভার

লইয়াছিলেন। সে বাংলা, সংস্কৃত, ব্যাকরণ ভালই শিখিয়াছিল। তারাসুন্দরী এইবার তাহার ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিলেন। এখনকার দিনে লেখাপড়া ভাল জানাটা যে মেয়ের বিবাহের একমাত্র না হউক, একটা প্রধান উপায় তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন।

মেয়ে বড় হইলে, তাহার বিবাহের জন্য তারাসুন্দরী সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি সহায়হীনা, কে তাঁহাকে সৎপাত্র আনিয়া দিবে!

একদিন হঠাৎ তারাসুন্দরীর কলেরা হইল। ভয়বিহ্বল ভজহরি ভৃত্য, ডাক্তার ডাকিবার জন্য বাহির হইয়া পথেই সতীনাথকে দেখিতে পাইল। তাঁহাদের বাড়ীর দরোয়ান ও চাকরদের মজলিসে ভজহরি ছোট বাবুর অদ্ভুত নাড়ীজ্ঞান ও ঔষধের প্রত্যক্ষ ফল দর্শনের যথেষ্ট প্রশংসা পূর্ব্বাবধিই শুনিয়াছিল। সময় সময় বিনামূল্যে ঔষধপ্রার্থী দুই চারিজন নরনারীকে তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকিতেও সে দেখিয়াছে। সুতরাং ডাক্তারের শক্তিমত্তায় ভজহরির মনে যথেষ্টই শ্রদ্ধা ছিল।

ভজহরির আহ্বানে সতীনাথের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল অসুখ কার? তাহারই নহে ত? চটিজুতা পায়ে দিয়াই সে ভজহরির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ১৭ নম্বর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। উৎকণ্ঠা অধিকক্ষণ সহ্য করিতে হইল না। প্রবেশ পথেই দুইটি ভীতি-ব্যাকুল চক্ষুতে কাতর প্রার্থনা ভরিয়া সেই সুন্দর মুখখানাই সাগ্রহে আহ্বান করিল—"আসুন ডাক্তার বাবু, দেখুন ত, মা যেন বড কাহিল হয়ে পড়েচেন, ডাক্‌লেও আর সাড়া পাচ্চিনে যে!"

সতীনাথ ব্যস্ত হইয়া রোগীর কাছে গেল, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আশ্বাস দিল—"কোন ভয় নেই, ঘুমুচ্ছেন।"

তারাসুন্দরীর রোগ কঠিন নয়, কলেরা বলিয়া মনে হইল না। সতীনাথ নিজেই তাঁহার চিকিৎসার ভার লইল এবং দুই তিন দিনের মধ্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিয়া তুলিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এ বাড়ীতে আসা যাওয়ার প্রয়োজনও তাহার ফুরাইয়া গেল।

তারাসুন্দরী যখন শুনিলেন সে ভিজিট লইবে না, পেশাদার ডাক্তারও সে নয়, বড় মানুষের ছেলে, তখন কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধায় পরিণত হইল। দুই একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া সুখী হইলেন। মধ্যে মধ্যে তাহাকে আসিবার জন্য অনুরোধও জানাইলেন। 'কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত' দেখাইলে সে সহজে কখনও সরিয়া যায় না। সতীনাথ তারাসুন্দরীর অন্তরে ও গৃহে তাঁহার অজ্ঞাতেই অনেকখানি স্থান করিয়া লইল।

এই আত্মীয়-বর্জ্জিত সংসারে এমন একজন উদার ও স্নেহসম্পন্ন বন্ধু পাইয়া কল্যাণীও আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল না। সাধারণতঃ পুরুষ জাতির সম্বন্ধে সতর্ক সাবধানতার উপদেশ পাইয়া পাইয়া তাহার বয়সী বঙ্গবালাদের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে, কল্যাণীর ভাগ্যে তেমন সুযোগ ঘটে নাই। দেশ ছাড়িয়া পর্য্যন্ত সে কাহারও বাড়ী যাইতে পাইত না। তাহাদের বাড়ীও কেহ আসিত না। ছাদে ছাদে যোগ রাখিয়া মেয়েদের ভিতর আত্মীয়তার যেটুকু সুবিধা পাওয়া যায়, কল্যাণীদের বাড়ীর ছাদের সিঁড়ি না থাকায় সে সুযোগও ছিল না। তা সে জন্য কল্যাণীর মনেও কোন অভাব বোধ ছিল না। সে আপনার রাজ্যে বনবিহঙ্গিনীর মত আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। লেখাপড়া, গান, বাজনা হাসি খেলায় মার অন্ধকার বুকখানি উজ্জ্বল করিয়া রাখিত। স্কুলের গাড়ীতে সহপাঠিনীদের সহিত গল্প করিত। বাড়ী ফিরিয়া মার কাজের সাহায্য করিত। সন্ধ্যাবেলা তিনি কাজে বা সন্ধ্যাবন্দনায় থাকিলে সে নিজের পাঠ মুখস্থ করিত। রাত্রে কোন দিন বাগানে বসিয়া কোন দিন বিছানায় শুইয়া তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ের আলোচনা করিত। আলোচ্য বিষয় বেশীর ভাগই সাহিত্য সম্বন্ধে। তারাসুন্দরী গল্পচ্ছলে তাহাকে সীতা, সাবিত্রী চিন্তা দময়ন্তীর চরিত্র উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিতেন, কল্যাণী মুগ্ধ হইয়া শুনিত। মা ঘুমাইয়া পড়িলেও সে সেই সকল মহিয়সী মহিলাদের বিষয় চিন্তা করিত। কি সে পতিপ্রেম—যাহার বলে যমের সহিত অন্ধকারে একা অগম্য পথে যাইতেও নারী ভয় করে না! যাহার মোহিনী শক্তিতে, নিরপরাধে বর্জ্জিতা হইয়াও স্বামীর উপর মনে মনেও রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ জন্মায় না! স্বামীর নিন্দা শুনিলে প্রাণত্যাগ করিতে পারা যায়! সতীনারীর হস্তস্পর্শে অচল নৌকা জলে ভাসে, অঙ্গস্পর্শে জলন্ত অনলও দাহিকাশক্তি হারায়, বাক্যে সূর্য্য উদয় হইতে পারেন না, সৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া থাকে! কল্যাণী ভাবিত, তা বুঝি আবার হয়? —এ সব কবির অত্যুক্তি—কাব্যের অলঙ্কার। অল্পায়ুজনকে সাধ করিয়া বুঝি জানিয়া শুনিয়া কেহ কখনও বিবাহ করিতে পারে? সাধ করিয়া কেহ আবার বিধবা হইতে চায়? ও সব পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য কবির ছলনা।— যুক্তি যাহাই বলুক, মন বলিত, হউক ছলনা, ছলনার ভাবটুকু কি মধুর!

মনে যখন এমনি ভাব, সেই সময় সতীনাথের মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন বন্ধুলাভ হইল। সতীনাথ তাহার পাঠ বুঝাইয়া দেয়, সঙ্গীতের দোষ ত্রুটি সুধরাইয়া লয়, নূতন নূতন গৎ শিখায়, কাব্য সাহিত্য ইতিহাস গণিতের আলোচনা করে, তাহার বাগানের ফুলগাছের যত্ন লয়, কত নূতন নূতন মূল্যবান্ লতা পাতা ফুলের গাছ আনিয়া

যোগায়, আবাব মায়ের স্নেহেব অংশ লইয়া কৃত্রিম কলহ মান অভিমান ও সন্ধি করে। একাধাবে সর্ব্বগুণগ্রাহী এমন বন্ধু, এমন সঙ্গী তাহার আব কখনও মিলে নাই, তাই কৃতজ্ঞতা কখন শ্রদ্ধায় এবং শ্রদ্ধা ভালবাসায় রূপান্তরিত হইয়া গেল, অনভিজ্ঞ কল্যাণী তাহা ভাল বুঝিতে পাবিল না।

৭

মুরারির আশ্বাস

কল্যাণী ও সতীনাথ এ ভালবাসাব রূপ অনুভব কবিতে না পাবিলেও তারাসুন্দবীব কাছে তাহা অজ্ঞাত বহিল না। তিনি চিন্তিত হইলেন। সতীনাথেব মুখেব উপব বলিতে পারেন না যে তুমি আব আসিও না। এ ছেলেখেলাব ফল যে শুভ হইবে না তাহা তিনি বুঝিতেছিলেন। এ ভাবেব প্রশ্রয় দিলে কল্যাণীব ভবিষ্যৎ হয়ত নৈবাশ্যেব অন্ধকাবে পূর্ণ হইয়া যাইবে। তাই দ্বিধা-গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন—কবা যায় কি? বড়মানুষেব ছেলে, স্বাস্থ্য-সুন্দব দেহ, বিশ্ববিদ্যালয়েব সবস্বতী যাহাব কণ্ঠে নিজেব হাতে বিজয়মাল্য দুলাইয়া দিয়াছেন—তেমন পাত্র কি সহজলভ্য? সে প্রলোভন বড অধিক, তথাপি তারাসুন্দবীব মত নাবীব পক্ষে তাহা জয় কবাও কিছু কঠিন নয়। ছেলেটি মা বলিয়া ডাকে, একটুকু স্নেহ মমতা চায়, জোব কবিয়া আপন হইতে চেষ্টা কবে—কেনই বা তাহাকে একটুকু না দিবেন? আহা—উহার যতই থাক, প্রধান জিনিষ, বাপ মার স্নেহ, তাই যে নাই। মাতৃহাবা ছেলেটি যখন মা বলিয়া ডাকিয়া স্বেচ্ছায় ধরা দিতে চাহিল, তিনিও অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাকে কাছে টানিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ভগবানের এই ক্ষণিক দানটুকু জীবনব্যাপী দুঃখের প্রতিষেধকেব কণিকারূপে গ্রহণ করিতে ক্ষতি কি? কঠোব জীবনপথে একটি ছোট ফুল বা মুকুল এতটুকু স্নেহের নিদর্শন—যাহা আপনা হইতে নিকটে আসে—তাহা কি উপেক্ষাব জিনিষ? মানুষ সাবা জীবনে কতটুকু কিই বা পায় যে ভগবানেব এমন অমূল্য দান—ভক্তি, স্নেহেব অর্ঘ্য অহঙ্কাবে ঠেলিয়া ফেলিতে পাবে? তারাসুন্দবীব ব্যর্থ অভিশপ্ত জীবনের দ্বাবে যে স্নেহলোলুপ ভিখারীটি ভিক্ষাপাত্র হাতে কবিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহাব ভিক্ষার যোগ্যতাব সম্বন্ধে তাই তাঁহাব স্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয়ে সন্দেহের কোন প্রশ্নটি পর্য্যন্ত উঠিতে পায় নাই। কিন্তু আগুন লইয়া খেলা যে সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে, মাস কতকের মধ্যেই তিনি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়া নিজের অল্প বুদ্ধিকে মনে মনে ধিক্কার দিলেন।

অনাহূত অযাচিত মেঘে যেদিন ধরণীর মরুবক্ষে বর্ষাব প্রথম ধারাপাতেব মত

সতীনাথ তারাসুন্দরীর কাছে অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব করিয়া বসিল—সেদিন প্রলুব্ধ চিত্তকে অগ্রসর হইতে না দিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের বাধা বিপত্তি স্মরণ রাখিয়া সতীনাথকে তিনি বিবাহের অযৌক্তিকতা বুঝাইয়া সংকল্প হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। বন্যলতা উদ্যানতরুকে অবলম্বন করিলে তাহা যে প্রীতিকর হয় না, তাঁহাব এ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে। সতীনাথ অত কথা বুঝিতে চাহিল না। তাহার তরুণ জীবন, নূতন আশার মাদকতা, জগতে তাহার কাছে তখন ব্যর্থতার লেশমাত্র ছিল না। বাধা বিঘ্ন নিরাশার বোধ জন্মায় নাই। প্রেমের অঞ্জন চোখে দিয়া সে তখন ধরণীর বর্ণে গোলাপের আভা, সূর্য্যালোকে জ্যোৎস্নাকিবণ দেখিতেছিল। পার্থিব লাভ ক্ষতিব হিসাব লইবার অবকাশ কোথায়? হইলই বা কুলীন—জ্যেঠামহাশয় কৌলীন্য-প্রথাব বিদ্বেষী, সেও নিজেকে কৌলীন্যেব সম্মান দিতে অনিচ্ছুক। ধনী দরিদ্রের পার্থক্য—ও কোন কাজেব কথাই নয়। মৃত্তিকাগর্ভেই হীরা মণি গোপন থাকে, সেজন্য তাহাদের মূল্য কমে না। সতীনাথ যদি জ্যেঠামহাশয়কে বলে সে কল্যাণী ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ কবিবে না—করিতে পাবিবে না—নিশ্চয়ই তিনি বাধা দিবেন না। তিনি যে পুত্রেব সুখই খুঁজিয়া থাকেন, বাধা দিবেন কেন?—তাঁহার স্নেহে সে এতটুকুও সন্দিহান নয়।—সতীনাথের মুখে এই সকল যুক্তি শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমতী তাবাসুন্দরীও ভুলিলেন—স্নেহের জয় বুঝি সর্ব্বত্র।

স্নেহেব কাছে তাঁহার পরাভব ঘটিল। কহিলেন,—"যদি রুদ্রকান্ত সম্মত হয়েন—তাঁহাব কোন আপত্তিই নাই।"

দ্বিধা কিন্তু ঘোচে না—মন মাঝে মাঝে শঙ্কাকুল হইয়া উঠে। জন্মান্তবীণ কর্ম্মসূত্রে যে অভাগী তাঁহার উদরে স্থান গ্রহণ কবিয়াছে, তাহাব কপালে এমন স্বপ্ন-কথা কি কখনও সত্য হওয়া সম্ভব? একদিন সতীনাথকে মনেব কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন। কুণ্ঠিত সতীনাথ আবক্ত মুখ নত কবিয়াই কহিল, সে ভার তাহার, তাঁহাব আদেশ পাইলেই সে কৃতার্থ, যত বড ঝড ঝঞ্ঝা, যে কোন প্রবল বাধাই আসুক, কল্যাণীর জন্য সে মাথা পাতিয়া সবই সহিতে প্রস্তুত।

তারাসুন্দবী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সে মুখে বিশ্বাস ও প্রেমেব যে জ্বলন্ত ছবি ফুটিয়াছিল, তাবা সুন্দরী তাহাতেই স্থির নিশ্চিন্ত হইলেন। এমন পাত্রে এত সহজে কন্যাদান—এ যে অভাবনীয় সুযোগ। আশা কহিল—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ এমনি অভাবনীয় ভাবেই ঘটিয়া থাকে। নির্জ্জনে আনন্দের অশ্রুজলে মাটি ভিজাইয়া মনে মনে বলিলেন—"তুমিই জান ঠাকুর! কত দুঃখের সান্ত্বনা আমি তোমার কাছে পেয়েছি, তুমি আমায় যা দেবে তাই আমি যেন খুসী হয়ে

নিতে পারি। অতি সুখে ধৈর্য্যহারা হয়ে যেন তোমার দান চিন্‌তে ভুলে না যাই।"

নিজের মুখে বিবাহের পাকা কথা কহিবার পর সতীনাথ আর তেমন অসঙ্কোচে তাঁহাদের বাড়ী যাতায়াত রাখিতে পারিল না। সলজ্জ কুণ্ঠায় পা যেন জড়াইয়া ধরে, অগ্রসর হইতে পারে না। এক পা অগ্রসর হইতে গিয়া পাঁচ পা পিছাইয়া আসে। পড়াশুনা কাজকর্ম্ম বিশ্রাম নিদ্রার মধ্যেও সেই মুখখানি জাগিয়া থাকে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে কাছছাড়া করা যায় না। কতদিন মনে হয়, কল্যাণী হয়ত এখন তাহার নিজের ঘরে বই কোলে করিয়া বসিয়া আছে, বইএর পাতা খোলা কিন্তু মন তাহার কোন স্বপ্নরাজ্যে উধাও হইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। সেও কি তাহার কথা ভাবে? এম্‌নি করিয়া তাহার মনও কি দর্শনের লালসায় কাঁদিতে থাকে? সামাজিক বাধা বিঘ্নের গোল মিটাইয়া কবে সে সম্পূর্ণ রূপে নিজের বলিয়া তাহাকে দাবী করিতে পারিবে, কবে তাহার নিরানন্দ গৃহে আনন্দ-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়া, মরুভূমিতে ফুল ফুটাইয়া নন্দনকাননে পরিণত করিতে পারিবে! কতবার মনে করে, কল্যাণীর পাঠের ক্ষতি হইবার দোহাই দিয়া আবার তাহাদের বাড়ী যাইবে, তেমনি সঙ্কোচহীন আত্মীয়তায় অতীত দিনগুলিকে জাগাইয়া তুলিবে। যায়ও তাই, কিন্তু বাড়ীর দরজার কাছে গিয়া আর যেন অগ্রসর হইতে পারে না। কোন দিন সাহস করিয়া নিজে অথবা ভজহরির অনুরোধে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াও পড়ে। তারাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি বসিতে বলেন, স্বহস্তে তাহার পছন্দমত খাবার তৈয়ারী করিয়া খাওয়ান, কত প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, সতীনাথ মুখে তাঁহার কথার উত্তর দেয়, কান তাহার সজাগ হইয়া থাকে, চোখ সঙ্কোচে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে সাহস পায় না—এখনি তারাসুন্দরী তাহার চুরি করিয়া চাওয়া দেখিয়া ফেলিবেন! কল্যাণী যেন দেওয়ালের অন্তরালে নিজেকে সাবধানে লুকাইয়া ফেলিয়াছে। যদি দৈবাৎ বহু সতর্ক সাবধানতা সত্বেও কোনদিন সতীনাথের চোখে পড়িয়া যায়, সলজ্জ মৃদু হাসিটুকু অধরপ্রান্তে ফুটাইয়া তাড়াতাড়ি সে পলায়ন করে—যেন কতই কার্য্যে ব্যস্ত! বাজনার সুর ঠিক হইতেছে কি না পরীক্ষা করিতে বলে না, বাগানের কোন্ গাছে কুঁড়ি ধরিল, কোন্‌টিতে ফুল ফুটিল—কিছুই খবর দেয় না। তারাসুন্দরীও অনূঢ়াকন্যার স্বাধীনতার মাত্রা সংযত করিয়া রাখিতেন—"একি সাহেব বিবির ঘর যে বিয়ের আগেই সর্ব্বদা একত্র থাকিতে হইবে? ছি!"—তা, কল্যাণীর সেজন্য খুব বেশী ক্ষতি হয় নাই। কারণ সতীনাথ তাহাকে দেখিতে না পাইলেও, তাহার ত সে সুযোগের অভাব ঘটিত না। সে গোপনে লুকাইয়া

দেখিয়া লইত। ভাবিত—সে যখন স্বয়ম্বরা হইয়া মনে মনে তাঁহাকেই বরমাল্য দিয়াছে তখন চোখের দেখায় আর দোষ কি? সতীনাথ যেদিন বিবাহের কথা পাড়িয়া তাহাকে লজ্জায় ফেলিয়া তাহাদের অবাধ শান্তিতে আঘাত তুলিয়াছিল, সেদিন সুখের কি দুঃখের কি একটা অজ্ঞাত ব্যথায় তাহার চোখের জল যেন অসম্বরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন আর সে চিন্তা তাহার মনে ক্ষোভ জাগায় না। এই কয়দিনের ভিতর কেমন করিয়া যে ঐ একটা যাদুমন্ত্র এত বড় বিপ্লব ঘটাইয়া দিল তাহা সে বুঝিতেও পারে না। তবু অন্তঃসলিলা নদীটির মত একটা অননুভূত পুলকানন্দ যেন তাহার দেহ মনে প্রতিনিয়ত ক্ষরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। চোখে মুখে হাসিতে চাহনিতে সেই আনন্দেরই খানিকটা রঙীন আলো ইন্দ্রধনুর মত বিচিত্র বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। অন্তরে আনন্দের মৃদু শিহরণ নীরবে বহিয়া যাইত—তিনি এইবার তাহাদের আপনার লোক হইবেন। তাঁহার সঙ্গে স্নেহ ভালবাসার আর কেহ বাধা জন্মাইতে আসিবে না,—সে তাহার কুমারীহৃদয়ের গোপন-লোকবাসী তরুণ দেবতার পদে হৃদয়ের ভক্তি প্রেম প্রীতির নৈবেদ্য সাজাইয়া নীরবে নিবেদন করিয়া দিল। সে গোপন পূজার সাক্ষী রহিল তাহার মন আর অন্তরীক্ষে অন্তর্য্যামী। এখন সে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করে, রাজকন্যা সাবিত্রীর পক্ষে অল্পায়ু বনবাসীকে পতিত্বে বরণ করা কিছুই আশ্চর্য্য হয় নাই। প্রয়োজন হইলে যমের সহিতও বুঝি যাওয়া যায়।

তারাসুন্দরী কল্যাণীকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঘরের পাশেই বরের বাড়ী। রুদ্রকান্তের মন ত জানা যায় নাই, বিদ্যার পরীক্ষা দিতে গিয়া কি জানি এই অপরাধে যদি জীবনের পরীক্ষায় সে ফেল করিয়া বসে! কল্যাণী দুঃখিত হইল, বলিতে লাগিল—"পরীক্ষাটা হয়ে যাক্ না মা?" সতীনাথও কহিল—"এই কটা মাস বৈত নয়, ওর জন্যে পরীক্ষাটা হবে না?" তারাসুন্দরী সংক্ষেপে কহিলেন—"কাজ নেই।"—ভজহরির মুখে কর্ত্তার প্রকৃতির যতটুকু সংবাদ তাঁহার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে এসকল বিষয়ে সাবধানতা লওয়াই যে তাঁহার প্রয়োজন! তিনি যে মেয়ের মা, ভাবী বৈবাহিকের মন না বুঝিয়া কেমন করিয়া এতখানি স্বাধীনতা গ্রহণ করেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিল। তারাসুন্দরী একদিন সন্তর্পণে সতীনাথকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে এই আষাঢ় শ্রাবণ দুইটা মাস কাটিয়া গেলে, ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক শুভকর্ম্মে পরিত্যজ্য, মাসত্রয়ান্তে মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণে, জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীনাথের বিবাহের প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারে, তাহা হইলে পৌষের পর সেই মাঘ মাস ভিন্ন আর দিন নাই। মেয়ে রোগা তাই এতদিন রাখা গিয়াছিল, আর কি যায়,

এতেই লোকে কত নিন্দাই না করিবে ?—কল্যাণীর কৌমার্য্য ঘুচাইবার জন্য যত না হউক, রুদ্রকান্তের কথা ভাবিয়া ভিতরে ভিতরে তারাসুন্দরীর মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। শুভকর্ম্ম চুকিয়া যতক্ষণে দুহাত এক না হয় ততক্ষণ ভরসা কিসের ? ছাদ্‌নাতলা হইতে বর উঠিয়া যায়—এ ত এখনও প্রধান ব্যাপারই বাকী। সতীনাথ যতই সহজ মনে করুক, তাঁহার যে ভরসা পাইতেও ভরসা করে না। বড় লোকের মতির স্থিরতা সম্বন্ধে তিনি যে যথেষ্টই সন্দিহান। কল্যাণীর মুখের পানে চাহিয়া সে উৎকণ্ঠা হাজার গুণে বাড়িয়া যায়। সে চঞ্চলা বনহরিণী যে ব্যাধের বংশীধ্বনিতে বিদ্ধ হইয়া গতি হারাইয়াছে, মায়ের চোখে তাহা কি আর গোপন থাকে। তাহার অনাবিল উচ্চহাস্য এখন আর অধর প্রান্ত ছাড়াইয়া বাহির হয় না। নয়নেও লজ্জা সঙ্কোচের জড়তা নামিয়াছে। শুভ্রগণ্ডে বসন্তের গোলাপের আভা ফুটিয়া থাকে। ভুলিয়াও সে আর সতী-নাথের নাম করে না, অথচ চক্ষু কর্ণ সজাগ হইয়া সেই প্রার্থিত জনেরই আগমন আশায় উৎকণ্ঠিত। পদে পদে কাজের ভুলে তাহার প্রমাণ করিয়া দেয়। তারাসুন্দরী ব্যস্ত হইলেন, ভীতও হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এখন শেষ রক্ষা হইলেই বাঁচা যায়।

বাহিরে ঘন মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া যে প্রলয়ের ঝড় তুলিতে চাহিতেছিল রুদ্ধদ্বার কক্ষের বিশ্বস্ত অধিবাসীর কর্ণে তাহার কোন সংবাদই পৌঁছে নাই। মুরারির উপর সতীনাথের বড় বেশী শ্রদ্ধা না থাক, কখনও কোন বিদ্বেষভাবও ছিল না। রুদ্রকান্তের অত্যধিক পক্ষপাতিত্বে তাহাকে সে নিজের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে আনিবার কারণ পর্য্যন্ত অনুভব করে নাই। সতীনাথ ও মুরারির প্রকৃতিগত পার্থক্য তাহাদের একত্র বাসেও বন্ধুত্ব জন্মাইতে পারে না। সতীনাথ যখন বিদ্যামন্দিরের এক একটা সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশোদ্যত, মুরারি তখন ঈর্ষ্যাপূর্ণ কটাক্ষে নিম্নভূমিতে দাঁড়াইয়া তাহার গতি নিরীক্ষণ করিলেও প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করা ত দূরের কথা, নিকটবর্ত্তী হইতেও চেষ্টা করে নাই। এই অসমকক্ষতাই রুদ্রকান্তের মন হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া ফেলিতেছে—এ চিন্তা হইতেও নিতান্ত নির্লিপ্তের মত নিজেকে সে সরাইয়া রাখিল।—"খাও দাও আমোদ কর মনের সুখে, কোন্ দিন যেতে হবে শিঙ্গে ফুঁকে"—এই নীতিই তাহার জীবনের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাই অধ্যয়নের কঠোরতায় দেহ মন পিষ্ট করিতে সে সম্মত হইল না। পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইলেই, হয় তাহার কোন পীড়ার সূত্রপাত হয়, নয় বাড়ীতে মা বা ভায়েদের তেমনি কোন প্রয়োজন পড়ে—পরীক্ষা দিবার সুযোগই পাওয়া

যায় না! হাল ছাড়িয়া দিয়া রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"আর বিদ্যা শেখার দরকার নাই, জমিদারী কাজকর্ম্ম দেখ।" মুরারিও নিঃশ্বাস ফেলিয়া অব্যাহতি লাভ করিল। ডাক্তারী পরীক্ষান্তে গৃহে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পণ্ডিত রাখিয়া সতীনাথ যখন সাহিত্য-উদ্যানের শ্রেষ্ঠ কুসুমগুলির সুগন্ধ গ্রহণে ব্যগ্র, মুরারি তখন সঙ্গীতবাদ্য শিক্ষায় মনোযোগ দিল। রুদ্রকান্ত নিজে সঙ্গীতজ্ঞ, ইহাতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, মনে করিলেন কিছু না করার চেয়ে তবু কিছু ত করুক।

দুর্ব্বলের পক্ষে প্রবলের এবং আশ্রিতের পক্ষে আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধাচরণ করা যখন সম্ভব নয়, তখন মনে যাই থাক্, মুরারি বাহিরে রুদ্রকান্ত ও সতীনাথকে যথোপযুক্ত স্নেহ সম্মান দেখাইয়া চলিত। রুদ্রকান্তের চোখে কিছুই প্রায় ছাপা থাকিত না—তবু তিনিও স্বীকার করিতেন যে তাহার মনের অন্ত পাইলেন না।

রুদ্রকান্তের বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মুরারির কোন আশা না থাকিলেও, রুদ্রকান্তের যে তাহাকে প্রয়োজন ছিল, এটুকু সে ভালই বুঝিত। থিয়েটার দেখা, গান বাজনা শোনা, তাস পাশা দাবা খেলা, আবার জমিদারীর গোলযোগ মিটাইবার জন্য মফঃস্বলে যাইতে হইলে মুরারিকেই তাঁহার আগে খোঁজ পড়িত। সে ইহাতে খুসী না হইয়া অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। তবু নিরুপায় ক্রোধের বিষাক্ত জ্বালা অন্তর মধ্যেই নিরুদ্ধ রাখিয়া কর্ত্তার মন যোগাইবার নূতন নূতন মন্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত, কারণ সে আশ্রিত, আশ্রয়দাতাকে খুসী রাখিতে না পারিলে চলিবে কেন? এক এক সময় তাহার মনে হইত, বড় মানুষের মোসাহেবী ছাড়িয়া দিয়া তাহার নিজের মৃৎকুটীরে ফিরিয়া যায়। কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি? সেখানকার অন্ন, সেও যে ইহারই অবহেলিত দান। তা ছাড়া অভ্যাস বাধা দিতে থাকে। বিলাসিতার বিষ একবার যাহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, সহজে সে বিষের ক্রিয়া সে আর রোধ করিতে পারে না। এই বিদ্যুতালোক-দীপ্ত সুরম্য হর্ম্ম্যের শত স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া নন্দীপুরের জঙ্গলাবাসে চির-দারিদ্র্যের মধ্যে নির্ব্বাসন দণ্ড—সে দৃশ্য মুরারি আর কল্পনাতেও আনিতে ইচ্ছা করে না। তাই সে ভুলিয়া থাকিবার জন্য কলিকাতার নানাবিধ অসার আমোদের স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। রুদ্রকান্ত খবর জানিয়া দুই একবার সতর্কতার ইঙ্গিতও করিয়াছিলেন, মুরারি সে কথা কানে তুলে নাই।

সতীনাথের মনের নিভৃত নিকুঞ্জে ফাল্গুনের বাতাস যে অত্যধিক প্রবল ভাবেই বহিতে সুরু করিয়াছে তাহার সংবাদ মুরারির কাছেই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ পাইল।

মলয়ানিলের উৎপত্তি স্থানটুকুর আবিষ্কারেও তাহার কালবিলম্ব ঘটিল না। ঘটনাটিকে সে যে কি ভাবে গ্রহণ করিবে প্রথমে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এ যেন ভগবানের সুযোগ প্রদান। রুদ্রকান্তের অদম্য ক্রোধ ও জেদ সে ভালই জানে। সতীনাথের ব্রাহ্মকন্যা বিবাহ নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রেত ও অনুমোদিত হইবে না, অথচ সতীনাথ যেরূপ মজিয়াছে, সেও কিছু সহজে কল্যাণীর আশা ছাড়িবে না। এই উপলক্ষে রুদ্রকান্ত ও সতীনাথে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী এবং রুদ্রকান্তের পক্ষে সতীনাথকে ত্যাগ করাও বিচিত্র নহে। এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত মুরারি দেখিয়াছে। পিতা পুত্রে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়—এ ত পালিত পুত্র! তার পর কে জানে কি! ভবিষ্যতের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, তার পর বাধা বিঘ্নহীন আলোকোজ্জ্বল সফলতার কাম্যভূমি! ভবিষ্যৎ যাহাই বলুক, বর্ত্তমানকে অবাধে চলিয়া যাইতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাযা নয়। মুরারি এ সুযোগ মূর্খের মত ত্যাগ করিবে না। বিষয়টি সালঙ্কারে রুদ্রকান্তের কানে তুলিয়া কেমন করিয়া সতীনাথের উপর তাঁহার মন চটাইয়া দিবে, এইটুকুই তাহার প্রধান চিন্তা হইয়া পড়িয়াছিল। গরীবের মেয়ে, বড় মেয়ে। তা ছাড়া, সে স্বেচ্ছাচারিণী মাতার কন্যা। স্বামীর ঘর যে করিল না, তাহার কন্যা নিশ্চয়ই স্বামীর মতাবলম্বিনী হইয়া বাধ্য বিনীত হইবে না। মাতা যে স্বধর্ম্মত্যাগিনী নহেন, এ পরিচয়টুকুও গোপন রাখা প্রয়োজন। আরও কি কি অলঙ্কার যোগ করিতে পারা যায়, তাহাই এখন মুরারির মনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগ্যদেবী যখন যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার সুবিধার জন্য কোথা দিয়া কি যে অঘটন সংঘটন করিয়া বসেন, ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহার ফল দেখিয়া নিজেই অবাক্ হইয়া যায়।

সতীনাথ যখন নিরুপায়ে মুরারিকেই অবলম্বন করিতে চাহিল, তখন এ ঘটনাটিও তাহার নিজের কার্য্যের অনুকূল বলিয়া মনে হইল। সতী যদি নিজেই কথা তুলিত, তবে হয়ত বিপ্লবের পর আবার সন্ধি হইবারও পথ থাকিত—এখন সে আশঙ্কাও বড় রহিল না। মুরারি মনে মনে হাসিল,—বেশ লোকেরই সে সাহায্য চাহিয়াছে।

তারাসুন্দরীর মানসিক উৎকণ্ঠার আভাস পাইয়া সতীনাথের মনে হইল আর বিলম্ব করা চলে না, এইবার জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে অনুমতি প্রার্থনা প্রয়োজন। প্রয়োজন বলিল 'জানাইতেই হইবে' কিন্তু লজ্জা বলিল—'কেমন করিয়া তা হয়?' যে বিষয়টা সব চেয়ে সহজ মনে হইয়াছিল, কার্য্যকালে দেখা গেল সেইটাই সব

চেয়ে কঠিন। নিতান্ত নির্লজ্জের মত সে নিজের বিবাহের ঘটকালী নিজে করিবে কি করিয়া? অনেক ভাবিয়া শেষে মুরারির আশ্রয় লওয়াই তাহার সঙ্গত মনে হইল।

মুরারি শুনিয়া অজ্ঞতার ভানে প্রথমটা বিস্ময় এবং শেষে আনন্দ প্রকাশ করিল; কহিল—"সত্যি? আঃ বাঁচলুম! তোমার রকম সকম দেখে ভয় লেগে গেছল; মনে কল্লুম আইবুড়ই বুঝি থেকে গেলে।"

সতীনাথ হাসিয়া কহিল,—"এতটা ভয়ের কারণ? আইবুড় না থাকি, খুব বুড়ও যে হইনি তা জোর করেই বল্‌তে পারি। নিজের পথ পবিষ্কার হচ্ছিল না তাই বল?"

মুরারি নিঃশ্বাস ফেলিয়া অভিনযেব স্থর করিয়া কহিল—"ঐ যা বল্লে দাদা! বড় থাক্‌তে ত ছোটর হবার কোন আশাই নেই! সেই ভয়েই মবে ছিলুম।"

সতীনাথ উচ্চহাস্যে কহিল,—"ঠাট্টা নয় মুরারি, হয়ত তোমাব জীবনে এমন দিন কখনও আস্‌বে, যখন একটি নোলকপরা কচি মুখই"—

মুরারি বাধা দিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল,—"রামঃ! সে আর এ জন্মে নয়। সাধ করে শিকল পর্‌ব,—কেন? কি দুঃখে? সেই নোলকপরা মুখের হুকুমে উঠ্‌তে হবে, বস্‌তে হবে, সে পাঠশালে বান্দা পড়্‌বে না—তা হলপ্‌ করে বলে দিচ্চি।"

সতীনাথ তাহার গর্ব্বিত মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি করুণার হাসি হাসিল —ভায়া যদি একবার সেই হুকুম পালনের স্থখ বুঝিত, তবে আর স্বাধীনতার বড়াই করিতে চাহিত না। প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না।

সতীনাথকে যে কোন ছুতায় আক্রমণ করিতে পারিলেই এখন মুরারি তৃপ্ত হয়। সে তাহাকে সমপদস্থ মনে করে না, মূর্খ বলিয়া মনে মনে ঘৃণা কবে, মুবাবির এমনই বিশ্বাস। তাই আজিকার আনন্দেও সে তাহাকে একটুখানি বেদনা দিবার ইচ্ছায় সকাল বেলার সংবাদপত্রে পঠিত সিভিলিয়ানী পরীক্ষোত্তীর্ণ যে ছাত্রদের নাম দেখিয়াছিল, তাহারই মধ্যে যে নামটা স্মরণ হইল সেই নামটা উপলক্ষ্য করিয়া মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া কহিল, "তা জ্যাঠামশায়কে বল্‌বখ'ন, সেজন্যে আট্‌কাবে না। বলি, উদিকের মত টত আছে ত?"

তাহাকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষে চাহিতে দেখিয়া সতীনাথ একটুখানি হাসিল! কহিল,—"তার জন্যে ভাবনা নেই। আসল বিপদ থেকে তুমি ত এখন উদ্ধার কর ভাই!"

মুরারি পরিহাসের আভাষটুকু প্রকাশ না করিয়া কহিল,—"তবে যে গুজব

শুনেছিলাম নবীনবাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষালের সঙ্গে স্থির করে গেছেন? ছেলেটি বিলেতে সিভিলিয়ানী পাশ দিতে গেছে, ফিরে এলেই বিয়ে হবে? সেটা তবে কাজের কথা নয়?"

সতীনাথ এ সংবাদ জানিত না, শুনিয়া মনের ভিতরটা একটুখানি দুলিয়া উঠিয়া তখনই আবার স্থির হইল। হাসিয়া কহিল,—"কে বল্লে তোমায়? ও সব বাজে গুজব, কোন ভয় নেই।"

মুরারি কহিল,—"বাঁচলেম, ভয় না থাক্‌লেই ভাল। আমাদের লুচি মণ্ডা বাদ না গেলেই হল, কারণ শাস্ত্র বলেচেন 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"—হাঃ হাঃ কি বল? চল আজ ষ্টারে যাওয়া যাক্, 'বনকুসুম' প্লে হবে, ভারী চমৎকার বই! সেদিন দেখে এসে পর্য্যন্ত মনটা ছট্‌ফট্ কচ্চে। নায়িকা বনলতা চমৎকার সেজেছিল কিন্তু, চল দেখে আসা যাক্। সর্দ্দি হয়েচে? বেশ, আমিও এই গ্যাঁট্ হয়ে বসলুম, কে আমায় জ্যাঠামশায়ের সাম্‌নে নিয়ে যায়, যাক্ দেখি? আমি ওঁর জন্যে বাঘের থাবায় মাথা দেব, আর উনি থিয়েটার দেখে আমায় কৃতার্থ কর্‌তে পার্‌বেন না? জান, জ্যাঠামশাই বলেছেন নিকষ কুলীনের মেয়ে নৈলে বৌ কর্‌বেন না?"

মুরারি সতীনাথকে দলে লইবার জন্য অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সে সঙ্গে থাকিলে রুদ্রকান্তের নিকট তিরস্কারগুলা বাঁচিয়া যায়। আর সতী যে পরমহংস হইয়া প্রশংসা কুড়াইয়া বেড়ায় সে পথও তাহার বন্ধ হয়। কিন্তু সতীনাথ তাহার মতে চলিতে একান্তই অসমর্থ। তাই আজ সতীনাথের গরজ বুঝিয়া সে কোট করিয়া বসিল। সতীনাথেরও মুরারিকে চটাইবার সাহস হইল না—তাহাকে খুসী রাখাই যে এখন তাহার প্রয়োজন। অগত্যা সে স্বীকার হইল,—"আচ্ছা! তাই যাওয়া যাবে, আর রাগে কাজ নেই।"

মুরারিও তাহাকে আশ্বাস দিল, জ্যেঠা মহাশয়ের মেজাজ বুঝিয়া শীঘ্রই সে কথাটা তুলিবে ও মত করাইয়া লইবে। আশ্বস্ত চিত্তে সতীনাথ উঠিয়া গেল।

মুরারি বর্ণিত নির্ম্মলচন্দ্র নামধারী সমুদ্র পারের প্রতিদ্বন্দ্বীর চিন্তাটাকে সে কিন্তু একেবারে মন হইতে তাড়াইয়া বিসর্জ্জন দিতে পারিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে কল্যাণীর বিশ্বস্তমুখ ও তারাসুন্দরীর আশ্বাসবাণী মনে পড়ায় সে হাসিল। সমুদ্র-পারের ভাগ্যান্বেষীর আবেদন যতই বলবৎ হউক, এখানে তাহার কোন মূল্য নাই। কল্যাণী যে তাহাকে ভালবাসে—সে যে আর কাহারও হইবে না এ বিশ্বাস নিজের চিত্ত দিয়াই সে অনুভব করিয়াছে। তাই, অমূলক আশঙ্কাটাকে মন হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিল।

৮

জমিদারী চাল

প্রতিশ্রুত মুরারি পরদিন দাবা খেলিতে বসিয়া রুদ্রকান্তের কাছে সতীনাথের দরখাস্ত দাখিল করিল—ব্রাহ্মধর্ম্মী মৃত নবীনমাধবের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য সতী দৃঢ়সংকল্প, সে তাঁহাদের কাছে বিবাহ করিবার জন্য শপথ করিয়া প্রতিশ্রুতও হইয়াছে, সুতরাং জ্যেঠামহাশয়কে দয়া করিয়া অনুমতি দিতেই হইবে।

রুদ্রকান্ত আলবোলার নল মুখে তুলিলেন, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কেবল মাত্র বলিলেন—"হুঁ।" তার পর আর তেমন উৎসাহের সহিত খেলা চলিল না। মুরারির কেবলই চাল ভুল হইয়া যাইতে লাগিল, রুদ্রকান্ত কহিলেন—"থাক্।" গোবর্দ্ধন কলিকা পরীক্ষা করিয়া পুনরায় নূতন সাজা কলিকা গুড়গুড়ির মুখে বসাইয়া দিয়া গেল। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে ও ধূমে ঘরখানা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং মুরারির ধৈর্য্য পরীক্ষা করিয়া সে ছিলিমটাও ভস্ম হইয়া গেল। রুদ্রকান্ত কোন কথাই কহিলেন না।

বসিয়া বসিয়া অধীর প্রতীক্ষায় মুরারির চিত্ত যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখন এক সময় সে খেলার সরঞ্জামগুলা গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল।

সে চৌকাঠের বাহিরে পা দিলে রুদ্রকান্ত ডাকিয়া বলিলেন,—"নিধিরাম বাবুকে শিবরাম চকের মোকদ্দমার দলিলপত্রগুলো নিয়ে আসতে বল। বেটা নবাবপুত্তুর, তিরিশজন চাই ঘুম ভাঙ্গাতে, ডাক্তে না গেলে আসা হয় না। চাবকে ঢিট করতে হয় সব বেটাকে।"

তাঁহার ক্রুদ্ধদৃষ্টি মুরারির মুখে বদ্ধ থাকায় চাবুকটা মুরারি, সতীনাথ বা নিধিরাম সরকার অথবা কাহার পৃষ্ঠে যে পতিত হইল ঠিক বোঝা গেল না। মুরারি "যে আজ্ঞে" বলিয়া তাড়াতাড়ি "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জন"—এই চাণক্য নীতি অনুসরণ করিল। তাহার গমনশীল মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলে একটুখানি হাসিয়া রুদ্রকান্ত মনে মনে কহিলেন,—"বেটা আমার মনে করে ও ভারী বুদ্ধিমান্। ওরে ভ্যাবাকান্ত, এ বড় কেও কেটা নয়—স্বয়ং রুদ্রকান্ত শর্ম্মা। এখানে যে কেউ চালাকী করে জিতে যাবেন তার জোটি নেই। তুমি বেড়াও ডালে ডালে আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। হুঁঃ—সতীর এইবার পাখ্না হয়েচে, উড়্তে চায়! কুলীনের ছেলে বেম্ম বিয়ে করবেন? আরে খেলে যা! কলেজে পড়ে ছোঁড়াগুলো ঐ বিদ্যেতেই কেবল পাকা হয়।"

কৌলিন্যের প্রতি রুদ্রকান্তের কোন প্রবল অনুরাগের প্রমাণ ইতঃপূর্ব্বে

কখনও পাওয়া যায় নাই; বরং তদ্বিপরীত ভাবই দেখা গিয়াছে। সমাজ ও জাতি রক্ষার জন্য কৌলিন্য প্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধন যে একান্তই বাঞ্ছনীয়, সকলের পক্ষেই যে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে তাঁহাকে টাউন হলে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেও শুনা গিয়াছে। বন্ধু মহলে বাগ্‌যুদ্ধেরও তাঁহারই চিরদিন এ বিষয়ে জয় হইয়াছে। তবু আজ সতীনাথের কৌলিন্য মর্য্যাদা লঙ্ঘনের অভিলাষ বুঝিয়া তাঁহার সুষুপ্ত কুলগর্ব্ব সহসা সতেজে মাথা ঝাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল। "না, এ কখনই হতে দেওয়া হবে না। ঘরে যাই করি, গণ্ডীর বাইরে পা দেব কেন?"

সেই সঙ্গে মনে পড়িল, সতীনাথ তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র! ক্রোধে না হউক জেদে সেও বড় কম যায় না। তাঁহার শরীরেও যে বংশরক্ত প্রবহমান! বাধা দিতে গেলে বিপরীত ফলই সম্ভব। সতীর পিতা ও রুদ্রকান্ত নিজেই তাহার উদাহরণ। বহুদর্শী রুদ্রকান্ত বুঝিলেন, এখানে বিষয়ে বঞ্চিত করিবার ভয় দেখান বৃথা। এখনকার প্রবল মোহে অন্ধ যুবক ভবিষ্যৎ তলাইয়া দেখিবে না, প্রণয়ের উচ্চাদর্শে স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখাইবার এমন সুযোগ সে হয়ত উৎসাহের সহিতই গ্রহণ করিবে। তখন সাধিয়া ডাকা লজ্জাকর হইবে। এক মাত্র উপায়—বুঝাইয়া, স্নেহের দাবী দিয়া নিবৃত্ত করা। এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধের তৃপ্তির জন্য সে কি তাহার নবযৌবনের আশা নির্ম্মিত সাধের অট্টালিকা নিজের হাতে ভাঙ্গিতে সম্মত হইবে?—মনে ত হয় না।

তবে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় কিসে? সে অবোধ, না বুঝিয়া পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিতে চাহিতেছে, তাই বলিয়া অভিজ্ঞ রুদ্রকান্ত তাহাকে টানিয়া ফিরাইবেন না? সতী—তাঁহার সতী—একমাত্র যে তাঁহারই ছিল, সে আজ তাঁহার সংসার হইতে সমাজ হইতে বিষয় হইতে মন হইতে দূরে,—বহুদূরে—চলিয়া গিয়াছে! কল্পনা নেত্রে রুদ্রকান্ত এই চিত্রটাকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন; মন হইতে সে চলিয়া গিয়াছে, এ চিন্তা অসম্ভব। আর পরস্পর বিরোধী এই সম্বন্ধ-বন্ধনের ফলও যে সুখকর হওয়া সম্ভব নয়, তাহাও সুনিশ্চিত। তবে উপায়?

সতীনাথের বিবাহের বয়স হইলেও কেন যে রুদ্রকান্ত তাহার বিবাহ দিবার "গা" করিতেন না, তাহা অপরে না বুঝিলেও, তাঁহার নিজের মনের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। কন্যাভারগ্রস্ত পিতৃসম্প্রদায় হাঁটিয়া হাঁটিয়া তাঁহার বাড়ীর দরজার কাষ্ঠ ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াও ফল পায় নাই। তাঁহার এক কথা—আগে লেখাপড়া শেষ হউক, তাড়াতাড়ি কি। লেখাপড়াও শেষ হইল, তবু কোন ত্বরা দেখা গেল না। পিসীমা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"এখন যাক্ না কেন দুদিন,

যা হোক্ একটা ধরে ত দেওয়া যায় না, ভাল মেয়ে পেলে তখন হবে। অথচ পক্ষবিহীন পরী অপ্সরীদের সংবাদ আসিলেও তাঁহার কোনও ব্যস্ততা দেখা যাইত না।

সতী যে তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও ভালবাসিবে, অপরের হইবে, তাহার স্বার্থ সুখ চিন্তা সমস্তই যে ভিন্ন পথে বহিবে,—এ চিন্তা রুদ্রকান্তের অসহ্য। পাত্রাভাবে যে বিরাট স্নেহের ক্ষুধা তাঁহার অন্তর মধ্যেই চিরদিন নিরুদ্ধ ছিল—একমাত্র সতীনাথকেই তিনি সেই স্নেহের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে অপরের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার থাকিতে পারে, এ চিন্তা একদিনও তাঁহার মনে পড়ে নাই। তাই আজ অতর্কিতরূপে কল্যাণী যখন তাঁহার চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছে বলিয়া রুদ্রকান্তের ধারণা হইল, তখন পুত্রের সকল ত্রুটীর অপরাধ নিক্ষিপ্ত হইল কল্যাণীর মাথায়! সতী তাঁহার নিজের ছেলে, তাহাতে সে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, তাহার উপর ত আর রাগ করা চলে না? সেই যাদুকরী রূপে যত না হউক, হাবভাব-লীলা-চাতুর্য্যে তাঁহার সংসারজ্ঞানহীন শিবতুল্য সন্তানকে বশ করিয়া ফেলিয়াছে!

রুদ্রকান্তের সংকল্প স্থির হইয়া গিয়াছে। মনের অগোচর পাপ নাই, মানুষ ভাল মন্দ যে কোন কার্য্যকালে তাহার ন্যায় অন্যায় বোধ রাখিয়াই করিয়া থাকে। তাই যুক্তি দিয়া মনের কাছে নিজেকে নির্দ্দোষী সাজাইবার প্রয়োজন হয়। কুলীনপুত্র সতীনাথের কৌলিন্য-মর্য্যাদা উপস্থিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাই রুদ্রকান্তের কাছে দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মত একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া গৃহীত হইল। নবীনমাধবেব কন্যাব সম্বন্ধে তাই কোন সংবাদ লওয়াও তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন না। সতীনাথকে ডাকিয়া, সে সমাজ-বিগর্হিত কার্য্যে কি সাহসে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে জিজ্ঞাসাও করিলেন না। মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল। শিক্ষিতা বয়স্থা কন্যা, যাহার অঙ্গুলি হেলনে সতী উঠা বসা করিবে—এমন বধূ তিনি ঘরে আনিবেন না। বিশেষতঃ, ইহাকে ঘরে আনিলে, ইহাব মাতাও আসিয়া জামাতাগৃহবাসিনী হইয়া তাঁহার ছেলেকে ভাঙ্গাইয়া পর করিয়া দিবে।

অনেক মা আছেন যাঁহারা ছেলেকে ভালবাসেন—অত্যন্ত প্রবলরূপেই ভালবাসেন—কিন্তু বধূকে সহ্য করিতে পারেন না। মনে করেন,—বধূ তাঁহার স্নেহের সম্পত্তি জোর করিয়া বে-দখল করিয়া লইতেছে। কোথা হইতে 'উড়িয়া আসা' পরের মেয়ের 'জুড়িয়া বসার' এই অনধিকার দাবীর উপরে তাই নির্ম্মম ভাবে খড়্গাহস্ত হইয়া সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলেন। মায়ের অধিকার খর্ব্ব করা বধূর সাধ্য নয় এবং বধূর বিধিনির্দ্দিষ্ট প্রাপ্য যে বল প্রয়োগে আটক করা

যায় না, তিনিও যে পরের মেয়ে আজ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, বধূত্বের সীমা ছাড়াইয়া শ্বশ্রূস্থানীয়া জননী, এ কথা একেবারেই ভুলিয়া যান। পুত্রের প্রতি এই যে বিশ্বগ্রাসী স্নেহের দাবী, ইহাতে আত্মবিসর্জ্জনের আনন্দ নাই। 'আমার সন্তানের সুখেই আমার সুখ'—এ ভাব না আসিয়া 'আমার সুখের জন্যই ও'—এমনি একটা ভাবই মনে আসে।

সতীনাথের উপর রুদ্রকান্তেরও তেমনি একটা স্বার্থপূর্ণ প্রবল আকর্ষণ ছিল। সতী যে তাঁহাকে না জানাইয়া, নিজে নিজেই বিবাহের ঘটকালী করিয়া পাত্রী পছন্দ করিয়া বসিল, সংকল্প স্থির করিয়া মৌখিক অনুমতি চাহিয়াছে—ইহার অপমান তাঁহার বক্ষে বড ব্যথা দিয়াই আঘাত করিল। তবু সে সতী—তাহার উপর বাগ করিয়া থাকা যায় না। তাই সন্তান-বৎসলা জননী যেমন নিজের পুত্রের দোষ ক্রটী দেখিতে না পাইয়া বধূর উপর সকল অপরাধ আরোপ করিতে চান, রুদ্রকান্তের স্বার্থপূর্ণ স্নেহও তেমনি ভাবে কল্যাণীর প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। ছেলের বিবাহ দিয়া বধূ আনিতে হয়, তিনিই আনিবেন; ছেলে নিজে পছন্দ করিবে কি। "কোর্টশিপ" করিয়া ইংরাজের মত বিবাহ হইবে! দেশের হইল কি? এখনকার দিনে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। এ কার্য্য মুরারির দ্বারা হওয়াই সম্ভব ছিল, সতীও এ হাওয়াব হাত এড়াইতে পারিল না! এজন্য তাহাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। যেখানে রম্ভা তিলোত্তমারা তপস্বীর তপস্যা-ভঙ্গের প্রতিজ্ঞায় অবতীর্ণ হয়, সেখানে মানুষ ত ছার, দেবতাদেরও যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। অপরাধ ত সতীর নয়, সেই নবীনমাধবের বিদুষী কন্যার—সে যে তপস্বী সতীনাথের তপস্যা-ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিয়াই আসরে নামিয়াছে। এখন দেখা যাক্!

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়াই সতীনাথ শুনিল, তাহাকে মহল "খালাসিয়া" যাইতে হইবে।

সেখানকার প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমিদারের খাজনা বন্ধ করায় নায়েবের হুকুমে তাহাদের ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া হয়! বিদ্রোহী প্রজারা সদরে জমিদারের নামে নালিশ রুজু করিয়াছে। সেই অশাসিত প্রজাদের সহিত সন্ধি করিয়া বিবাদ মিটাইবার জন্য সতীনাথের সেই দিনই—সেই দিন বলিলে ঠিক্ বলা হয় না—সেই ক্ষণেই রওনা হওয়া প্রয়োজন, নতুবা ট্রেণ ধরা সম্ভব নয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর গাড়ী নাই।

অন্য সময় হইলে হয়ত এই নূতন কাজের অধিকার-লাভে সতীনাথ খুসীই হইত। কিন্তু এখন দুইটি উজ্জ্বল চোখে তাহার চিত্ত আলোকিত,—সে আলো ত্যাগ করিয়া, অন্ধকার পল্লীবাসে প্রজাশাসন কার্য্যের ভারপ্রাপ্তির সংবাদ তাহার

কর্ণে নির্ব্বাসন-দণ্ডের মতই কঠোর শুনাইল। সতীনাথ বিস্মিতও হইল। আর একবার একটা ছোটখাটো প্রজাবিদ্রোহ ব্যাপারে সে একবার নূতন জমিদারী নেত্রকোনায় যাইতে চায়, জ্যেঠামহাশয় তাহাতে শিহরিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন,—"বাপরে! সেখানে তোমায় যেতে দিতে পারি! যায় সরকার বেটা যাক্, লাঠি সড়কী চালায় বেটাব ওপর দিয়েই যাবে।" সেই কথাটা মনে করিয়া সতীনাথের হাসি পাইল। কাজটা যে কত বড গুরুতর, জ্যেঠামহাশয়েব নিজে হইতে তাহাকে যাইতে বলাতেই ত প্রমাণ হইতেছে। আপনাব মানসিক দৌর্ব্বল্যে সে নিজে নিজেই লজ্জিত হইল। তাডাতাডি প্রস্তুত হইযা রুদ্রকান্তের নিকট বিদায় লইতে গেল। রুদ্রকান্তেব আজ আর প্রয়োজন ফুরাইতে ছিল না, সতীনাথেব বার বাব ঘড়িব পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিও তাঁহাব সতর্ক চক্ষু এডায নাই। ট্রেণ ধরিবার নিতান্ত নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু মাত্র বাখিয়া তিনি তাহাকে ছাডিয়া দিলেন, বলিলেন,—"গাডী জোবে হাঁকিয়ে যেতে হুকুম দিও, নৈলে ট্রেণ ধবৃতে পারবে না।"

বিপিন খানসামা, বাবুব জিনিসপত্র গুছাইয়া পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়া দাঁডাইয়া ছিল। সতীনাথ গাডীব ভিতব বসিলে, সে কোচ-বাক্সে কোচম্যানেব পাশে উঠিয়া বসিল। সতীনাথ ক্ষুণ্নমনে সতৃষ্ণ নেত্রে সেই বর্ষাজলমলিন লুপ্তপ্রায নীলবর্ণের ছোট বাডীখানির পানেই বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সময় নাই! সময় নাই! একবাব বিদায লইবাব, একটা কথা বলিয়া যাইবারও সময় নাই। উপব নীচেব সব কযটা ঘবেব জানালাই আজ বন্ধ রহিয়াছে। হয়ত এখনও সে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠে নাই। যখন উঠিবে, সতীনাথ তখন কতদূরে চলিয়া যাইবে কে জানে? মুবাবিকে দেখিতে পাইলেও বলিযা যাইতে পারিত যে, এই আকস্মিক চলিযা যাওযাব সংবাদটা যেন তাঁহাদেব বলিযা আসে। কিন্তু সেও কোথায় গিয়াছে। তাবাসুন্দবীব বাডীব দবজা তখনও খোলা হয় নাই, বৃদ্ধ ভজহরিব হুঁকা-হাতে চিব-পবিচিত মূর্ত্তিটিও আজ গৃহকোণে লুকাইয়া আপনার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছে। গাড়ী যখন মোড় ঘুরিল, ঠিক সেই সময় উপরের একটা জানালা খুলিয়া কাহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি যেন দেখা গেল, দূরত্ব হেতু চেনা গেল না। জানালার বাহিবে মাথা বাহির করিয়া কোচম্যানকে গাডী থামাইবার আদেশ দিতে গিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল, এবং নিজেব দুর্ব্বলতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া স্থির হইয়া বসিল।

উভয় পার্শ্বের ঘনবিন্যস্ত সৌধমালা, সদ্যোজাগ্রত কর্ম্মভূমির কল্লোল-মুখর-জনতা, গো-শকটের পথাবরোধ এবং ঘোড়ার গাড়ী মোটর গাড়ীর যাতায়াত সতীনাথের

ধ্যাননেত্র হইতে সেই একখানি মাত্র নিদ্রাচ্ছন্ন রুদ্ধগৃহ এবং তাহারই মধ্যস্থ একটি বিশেষ ব্যক্তির স্মৃতিকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। সহিস গাড়ীর দরজা খুলিয়া বাবুর অবতরণ প্রতীক্ষা করিতেছিল, কোচম্যান ঘন ঘন বেল্ বাজাইয়া ত্বরা দিতে দিতে "গাড়ী হঠাও গাড়ী হঠাও" আদেশকারী পাহারাওয়ালার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা জুড়িয়া দিয়াছিল। বিপিন জিনিষপত্র সাবধান করিয়া টিকিট কিনিয়া সম্মুখে আসিয়া জানাইল, ট্রেণ এখনি ছাড়িবে, প্রথম ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে।

৯

জমিদারীতে

প্রজাদের সহিত সন্ধি করিতে সতীনাথকে খুব বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। জমিদারের মিষ্ট প্রকৃতি ও শান্ত ব্যবহারে তাহারা নিজে হইতেই বিদ্রোহের নিশান নামাইয়া লইয়া সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইল। আদালতের বিচার উঠাইয়া লইয়া তাহারাই জমিদারকে বিচারকের আসন দিল।

সতীনাথ বুঝিল, অপরাধ প্রজাদের চেয়ে তাঁহাদের তরফ হইতেই বেশী। গত দুই বৎসর বন্যায় ফসল "হাজিয়া" যাওয়ায় প্রজারা সরকারে উচিত সময়ে খাজনা দাখিল করিতে পারে নাই—সময় চাহিয়াছিল। সময়ের পরিবর্ত্তে গোমস্তা তাহাদের ঘরে আগুন দিবার হুকুম দেয়, এবং সে হুকুমও নিমকহালাল বাগদী পাইকদের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তামিল হয়। অনেক গরীবের ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। যাহাদের খড়ের ছাউনি, মাটির দেওয়াল, তাহাদের বাড়ীর দেওয়ালগুলা কবন্ধের মত মস্তকহীনভাবে এখনও খাড়া থাকিলেও, পাকা বাড়ী একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই অন্নকষ্টের দিনে ঘর ত গিয়াছেই, সেই সঙ্গে ঘরের জিনিসপত্র যাহা কিছু ছিল, তাহাও অগ্নিদাহে নিঃশেষিত। প্রাণ বাঁচাইবার ব্যাকুলতায় তখন জিনিষ উদ্ধারের কথা কাহারও মনে পড়ে নাই।

প্রজারা প্রায় সকলেই নিরক্ষর কৃষিজীবী এবং অধিকাংশই মুসলমান। কিল খাইয়া কিল চুরির সনাতন নীতি গরীবদের জন্য প্রচলিত থাকিলেও, শান্তিবাদী হিন্দুদের মত নির্ব্বিচারে সেটা গ্রহণ করিতে শক্তিশালী মহম্মদের প্রিয় সন্তানেরা সব সময় সক্ষম হয় না। গ্রামের মধ্যে মাতব্বর প্রজা ফৈজু সেখের পরামর্শে তাহারা জেলা কোর্টে গিয়া নালিশ রুজু করিয়া দিয়াছিল।

সতীনাথের বিচারে প্রজাদের অপরাধ সাব্যস্ত হইল না। যাহাদের ঘর পুড়িয়া গিয়াছে, জমিদার তরফ হইতে তাহাদের নূতন ঘর তৈয়ারীর খরচ দেওয়া হইল এবং যথাসম্ভব তাহাদের অগ্নিদাহের ক্ষতিপূরণও করা হইল। পুরাতন

গোমস্তা অভিমানে কর্ম্মত্যাগ করিতে চাহিলে সতীনাথ তৎক্ষণাৎ মঞ্জুরী সহি করিয়া, গ্রাম হইতেই একজন কর্ম্মঠ বিশ্বাসী মুসলমানকে সেই পদে নিয়োগ করিল। এই সকল কাজ মিটাইতে তাহার এক মাসের উপর লাগিল।

গ্রামের অবস্থা দেখিয়া সতীনাথ বুঝিল, ভাল করিয়া বাঁধ দেওয়া ভিন্ন বৎসর বৎসর বন্যা নিবারণের অন্য কোনও উপায় নাই। অনেক গরীবের লাঙ্গলের গরু ভাসিয়া গিয়াছে, পয়সার অভাবে নূতন হেলেগরু কিনিয়া চাষ করিবার ক্ষমতা নাই। দেশে ধান-চালের একান্ত অভাব, পয়সা নাই, থাকিলেও কিনিতে মিলিত না। না খাইয়া অর্দ্ধেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এখন হইতেই 'বুনো ওল,' 'কচুর গোড়া' শাক পাতা সিদ্ধ করিয়া লোকে খাইতে সুরু করিয়াছে। অবস্থাপন্নের বাড়ী 'ভাতের ফ্যানে'র জন্য উমেদারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল। ফ্যান খাইয়া যাহারা জীবনধারণ করিতে প্রস্তুত, প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত কলহ-সংগ্রামেও তাহারা চির অভ্যস্ত। 'ফ্যান' পরিবেশন করাও গৃহস্থের পক্ষে বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সতীনাথের পর-দুঃখকাতর দয়ালু হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। এমন সময় নিজের স্বার্থ চিন্তা তাহার মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

সতীনাথ পত্রে সকল কথা বর্ণনা করিয়া জ্যেঠামহাশয়কে লিখিল—সাহায্যের জন্য হাজার কতক টাকা তাঁহাকে খরচ করিতে হইবে। এমন দিনেও যদি অর্থের সদ্ব্যবহার না হয়, তবে সে অর্থ থাকাই অনর্থক। এক বৎসরের খোরাকের' জন্য চাউল কিনিবার মত, জমিদার সরকার হইতে তাহাদের কর্জ্জ দিতে হইবে। আগামী বৎসরে কমলার করুণা-দৃষ্টি যদি গরীবের উপর পতিত হয়, তবেই তাহারা এই ঋণের কতকটা শোধ করিবে— এই সর্ত্ত থাকিবে। এ বৎসরের বাকী খাজনা মাফ্ করা ভিন্ন উপায় নাই। কুশীদজীবীর হস্তে পড়িলে গরীব লোক ধনে প্রাণে মারা যাইবে।

চিঠি পাঠাইয়া সতীনাথ নিজের লোকজনদের যথা কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিল—কিন্তু একেবারে এত টাকার ফর্দ্দ পাইয়া জ্যেঠামহাশয় কি বলিবেন, সে ভয়টুকুও একেবারে গেল না। তিন দিন পরে উত্তর আসিল, টাকা লইয়া গঙ্গারাম পাইক শীঘ্রই যাইতেছে, কাজ আরম্ভ করা হউক, সতীনাথ এখন উপযুক্ত হইয়াছে, সে যাহা ভাল মনে করে তাহাই করিবে, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

চিঠি পড়িয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় সতীনাথের চোখে জল আসিয়া পড়িল। এই জ্যেঠামহাশয়ের পরদুঃখকাতরতায় সময়ে সময়ে সে সন্দিহান হইত! মনে করিয়া নিজে নিজেই সে লজ্জিত হইল।

বহুপূর্ব্বে যখন গ্রামের অবস্থা ভাল ছিল, তখন বন্যার জল নিকাশের জন্য খাল কাটা হইয়াছিল। দীর্ঘকালের সংস্কারাভাবে পলি পড়িয়া জল নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সতীনাথের মনে হইল, ইহারও সংস্কার করা প্রয়োজন।

বর্ষায় নদীর জল বাড়িয়া বাঁশের সেতু ভাসাইয়া লইয়া যায়, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার উপায় না থাকায় গ্রামবাসীদের অসুবিধার অন্ত থাকে না; পাকা সেতু নির্ম্মাণ ভিন্ন দুঃখ দূর হইবার উপায় নাই। সতীনাথ পাকা সেতু নির্ম্মাণ করাইবার জন্য উদ্যোগী হইল।

স্বাস্থ্যকর পানীয় জলেরও অত্যন্ত অভাব। পুষ্করিণীর সংখ্যা অল্প না হইলেও অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পিসীমাকে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার পুণ্য সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়া একটা বড় রকম পুকুর কাটাইবার সঙ্কল্পটা আপাততঃ সে মনের মধ্যেই রাখিয়া দিল। এক সঙ্গে এতগুলা উপদ্রব জ্যেঠামহাশয় হয়ত সহ্য করিতে অস্বীকৃত হইবেন।

বাঁধ দিবার কাজে মজুরী দিয়া সতীনাথ দরিদ্র প্রজাদেরই নিযুক্ত করিয়া দিল। অবশ্য যাহারা স্বেচ্ছায় কাজ করিতে চাহিল তাহাদেরই কাজ দেওয়া হইল। তখনকার অবস্থায়, মজুরের কাজ না হইয়া যদি ধাঙ্গড় মেথরের কাজ হইত, তাহাতেও ইহারা পশ্চাৎপদ হইত না; খুসী হইয়াই অনেকে কাজে লাগিয়া গেল।

কাজের উৎসাহে সতীনাথ যে কল্যাণীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এমন নয়; বরং অনাড়ম্বর শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির মুক্ত চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া তাহার কল্পনা প্রাণময়ী হইয়া আশার স্বপ্নকে সোনার রঙে রাঙাইয়া তুলিতেছিল। কর্ত্তব্যের কঠোরতা কর্ম্মের উদ্দীপনা তাহারই স্মৃতির সুখে মধুরতর করিয়া তুলিতেছিল। সফলতার আনন্দ বহিয়া যে দিন সে কল্যাণীর পাশে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, সেদিন তাহার অভীষ্ট দেবী কৃতার্থতার পুরস্কারে কখনই তাহাকে বিমুখ করিতে পারিবেন না। কল্যাণীর হৃদয়—তাহার পরার্থপরতা পরদুঃখকাতরতা—সে ত সতীনাথের অজ্ঞাত নয়। এই দীর্ঘ বিরহের দুঃখ তাহারা যে ত্যাগের মন্ত্রে সহিয়া লইতেছে, ইহাই যেন তাহাদের জীবনের সকল অন্ধকার কাটাইয়া মিলনের আলো জ্বালাইয়া দিতে পারে। সতীনাথ মনে মনে আকাশে সুখের সপ্ততল সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। এবার কৃতকার্য্যের পুরস্কার দিতে সিদ্ধি নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিবেন। মনে হইল—এই যে প্রজাবিদ্রোহ, এ যেন তাহার উপর ভগবানের অনুকূল প্রেরণা, এখানকার হাঙ্গামা সহজে মিটাইতে পারায় জ্যেঠামহাশয়কে সে নিশ্চয়ই খুসী করিতে পারিয়াছে। খুসী না হইলে কখনই তিনি বিনা আপত্তিতে অত টাকা খরচ করিতে দিতেন না। গরীবের অভাব মোচনের জন্য বিধি নিয়োজিত উপলক্ষ্য

হইবার সুযোগও সে প্রাপ্ত হইয়াছে। কল্যাণী-লাভ যে তাহার পক্ষে আর কঠিন নয়, কৃতকার্য্যের সফলতার ভিতর দিয়াই যেন তাহার পূর্ব্বাভাষ সূচিত হইতেছিল। সারাদিন কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া অপরাহ্নে যখন তাহার শ্রান্ত দেহ বিশ্রাম চাহিত, মন তখনও ক্লান্ত হইত না। প্রথম যৌবনের আশা উদ্যম তখন পূর্ণমাত্রায় জাগরিত, নিরাশার ব্যর্থতা সেখানে স্থান পাইতে পারে না।

বৈকালে নদীতটে বেড়াইতে বেড়াইতে ভবিষ্যতের সুখের চিত্র কল্পনায় আঁকিয়া সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখে। দূরে ধানের ক্ষেতে রাঙা আলোর ঢেউ তুলিয়া অস্তমান সূর্য্য অপরূপ রূপে ক্ষেতের প্রান্তে ডুবিয়া যায়। আপাদমস্তক ফুলে ভরা পত্রবিহীন 'ছলনা' গাছের তলায় ঝরা ফুলের শয্যা বিছাইয়া মধুর গন্ধ বাতাসকে মদির করিয়া তুলে। সবুজ পাতা বাতাবী লেবুর গাছে ফুল ফল কিছুই নাই, তবু তাহার দোলনে কত মধুরতা। চাঁদের আলোয় নদীর চড়ায় বালির উপর হীরা মাণিক জ্বলিতে থাকে। নদীর বক্ষে নক্ষত্রের ছায়া তাহারই বৃহৎ অনুকরণে ব্যস্ত। সতীনাথ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে—মনে হয় ধরণীর এত রূপ! সে এত দিন কি অন্ধ হইয়াছিল? দুই চোখ ভরিয়া দেখিয়া লয় নাই কেন? আকাশে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-পরিবর্ত্তনের মত মনের রঙ্গিন আলোয় পৃথিবীর বর্ণ তাহার কাছে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বাহিরে তাহারই রূপ রস গন্ধ বহিয়া প্রকৃতি সোনার থালে পূজার অর্ঘ্য ধরিয়া রাখিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীর জলে চাঁদের ছায়া শত-খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়ে, বর্ষার বাতাস কাছারী-বাড়ীর সম্মুখে চাঁপা গাছের সদ্যঃ-ফোটা ফুলের মিষ্ট গন্ধ বহিয়া আনে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ কার্য্য-ক্ষেত্রের পানে চাহিয়া সতীনাথ ভাবে, জীবনটা শুধু স্বপ্ন নয়,—বাস্তব; তাই বাস্তবে এত মধুরতা। কোন দিন বেড়াইতে গিয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। পুকুর-পাড়ে ডোবার ধারে ভেকের দল ঘন কলরবে আরতির বাদ্য বাজায়। বিপিনের হস্ত-ধৃত হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোকে পথ দেখিয়া সে নদীতীর হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসে। প্রদীপ জ্বালিবার তৈলাভাবে সকাল-সকাল আহারাদি সারিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পল্লীবাসী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। যাহারা জমিদার-বাড়ী বা অন্য কোথাও কাজে আবদ্ধ, তাহাদেরও বাড়াভাত ঢাকা-চাপা দেওয়া আছে,—বাড়ী আসিলে একবার আলো জ্বালা হইবে। শুক্লপক্ষে এইটুকুই সুবিধা—তেলের খরচ নাই। চিরদিনের বিশ্রামনীতি-ভঙ্গকারী আলোকধারীদের দেখিয়া পথের পার্শ্বে সুখশায়িত কুকুরগুলা একবার 'ঘেউ' 'ঘেউ' করিয়া সাড়া দেয়, উঠিয়া বসা প্রয়োজন মনে করে না। শৃগালগুলা ছুটিয়া পলায়। পথের ধারে ফুটন্ত ফুলের গাছ তাহাদের মাথায় ঝরাফুলের অঞ্জলি দেয়, শাখা-

বাহুর স্নেহস্পর্শ আদর জানায়। বাড়ী ফিরিয়া মুখে-হাতে জল দিয়া আহার সারিয়া আবার সে খাতাপত্র লইয়া সারাদিনের কাজের হিসাব মিলাইতে বলে। উৎসাহে ক্লান্তি তাহাকে ক্লান্ত করিতে পারে না।

বর্ষার পাট পচিয়া পাতা পচিয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ জাগাইয়া তুলিল। ছেঁড়া লেপ কাঁথা মুড়ি দিয়া ছেলে বুড়ো সারারাত্রি জ্বরের কম্প ভোগ করিয়া আবার সকাল বেলা উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়। সমর্থ হইলে স্নান আহারও করে, অসমর্থ হইলে উপবাস দিয়া পড়িয়া থাকে। এ যে নিত্যকাব ব্যবস্থা—কত আর উপবাস দিবে! সতীনাথ তাহার এতদিনের শিক্ষার পরীক্ষার কাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সযত্নে রোগীদের চিকিৎসার ভাব গ্রহণ করিল। সকালবেলা রোগী দেখিবার সময় নির্দ্দেশ করিল। যাহারা নিতান্ত মানের দায়ে ঔষধ লইতে আসিতে পারে না, সে নিজে তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসে। অনেক রোগীর ঔষধের সঙ্গে পথ্যের ভারও ডাক্তারকে লইতে হয়।

বিনামূল্যের চিকিৎসা ও ঔষধ পাইয়া গরীব লোকে বাঁচিয়া গেল। তাহাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদের স্রোতে পড়িয়া সতীনাথ নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্মেও যেন দিশেহারা হইয়া পড়িল। সময় সময় বিরক্তির ভাব সম্বরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে। চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করিয়া বাড়ী ফিরিবার আশু সংকল্প সে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এমন দুর্দ্দিনে যদি লোকের কাজে না লাগিল তবে এ বিফলা বিদ্যা শিখিবার কি প্রয়োজন ছিল? সে ত অর্থোপার্জ্জনেব কামনায় বিদ্যাশিক্ষা করে নাই!

সতীনাথ মুরারিকে চিঠিতে সব কথা খুলিয়া লিখিল। উপসংহারে লিখিয়া দিল, প্রয়োজন মনে কর চিঠিখানা তাঁকে দেখ্‌তে দিও। মনে করিল কল্যাণীও বুঝিবে সে কতবড় প্রয়োজনে তাহাদের মিলনের দিন পিছাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। সে মহৎ হৃদয়া, তাহাব মনের ভাষা পাঠ কবিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে অপরাধী করিবে না; সফলতার আনন্দে বিবাহের বিলম্ব তাহাকে পীড়িত না করিয়া আনন্দের তৃপ্তিই প্রদান করিবে। মনে হইত, এই সব সরল প্রাণের কৃত্রিমতাহীন অমল শুভ আশীর্ব্বাদই তাহাদের জীবনের মঙ্গলগ্রন্থি বাঁধিয়া দিবার স্বর্ণসূত্র। এখন দুঃখ হয়, এত তাড়াতাড়ি আবেদন জানাইয়া না বসিলে আজ কল্যাণীকে চিঠি লিখিবার উপায় থাকিত। হয় ত উত্তরও পাইতে পারিত।

যেদিন ঘন ঘোর ছায়া ফেলিয়া বৃষ্টিধারা নামিত, বাধ্য হইয়া কাজ বন্ধ রাখিতে হইত। একমাত্র কল্যাণীর চিন্তাই তাহার সেদিনকার অলস-মন্থর দীর্ঘ দিন কাটাইবার সহচর ছিল। কতদিন ইচ্ছা করিত, কল্যাণীকে চিঠি লিখিয়া খবর

লয় ; লজ্জায় সঙ্কোচে পারিত না। তারাসুন্দরী হয়ত এতখানি স্বাধীনতা লওয়া পছন্দ করিবেন না। কল্যাণী কি মনে করিবে কে জানে। সতীনাথের মনে পড়িল, বিবাহের কথা হইবার পর সে আর সাধ্যমত তাহার সাক্ষাতে বাহির হয় নাই। কখনও দেখা হইয়া গেলে, সঙ্কোচজড়িত সলজ্জ হাসি ওষ্ঠে চাপিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িত। সেই লজ্জানম্রা কিশোরীর মোহিনী-মূর্ত্তির স্মৃতি সতীনাথের বিদেশে কর্ম্মক্লান্তি হরণের সঞ্জীবনী-সুধা হইয়া দাঁড়াইল। মুরারিকেও সে কল্যাণীর কথা লিখিতে পারিত না। মুরারি নিজে হইতেই খবর দিত যে তাহারা ভাল আছে, এই ছোট কথাটুকু শুনিবার জন্যই সতীনাথ মুরারির চিঠির উত্তর দিতে একটুও সময় নষ্ট করিত না এবং তাহার পত্রের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতিদিন পরিচিত ডাক হরকরার পথপানে চাহিয়া থাকিত।

এখানে একটা জিনিষের তাহার বড়ই অভাব বোধ হইতেছিল। গ্রামের মধ্যে স্কুল থাকিলেও সে পল্লীর মধ্যে একটি ছোট খাট স্কুল বা পাঠশালাও নাই। গরীব লোকের ছেলেপুলেদের অত দূরে গিয়া পড়াশুনা করিবার মত সকল ঘরে সুবিধা না থাকায়, ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে ছেলেদের শিক্ষা দিতে পারিত না। সতীনাথ মনে করিল, এ সম্বন্ধে কিছু করা প্রয়োজন। একদিন গ্রামের জনকয়েক মাতব্বর লোককে ডাকাইয়া আনিয়া সে এই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিল। তাঁহারা কহিলেন, স্কুল হয় ভালই, কিন্তু তাঁহারা গরীব, বিশেষভাবে ব্যয় বহনে সক্ষম নহেন। সতীনাথ কহিল, অর্দ্ধেক ভার সে লইবে, বাকী চাঁদা করিয়া মাসে মাসে তাঁহাদের তুলিয়া দিতে হইবে। উপস্থিত যতদিন পর্য্যন্ত স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ না হয়, ততদিন জমিদারের কাছারী বাড়ীরই অব্যবহৃত অংশটায় স্কুল বসিবে। হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর ছাত্রই পড়িতে পাইবে। একজন মুসলমান মৌলবী ফার্সী পড়াইবার জন্য এবং ইংরাজী বাংলা অঙ্কের মাষ্টার গ্রাম হইতেই যোগাড় হইল। বেতন অধিক লাগিবে না। কেবল গ্রামান্তর হইতে একজন সংস্কৃত জানা পণ্ডিত আনাইবার প্রয়োজন। পণ্ডিতও উপস্থিত যতদিন সুবিধা করিয়া লইতে না পারেন, কাছারী বাড়ীতে শয়ন ও আহার পাইবেন, এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। আষাঢ় গিয়া শ্রাবণ আসিয়া কোথা দিয়া তাহারও যে তৃতীয়াংশ জীবনকাল ফুরাইয়া গেল, কর্ম্মব্যস্ত সতীনাথ অনুভব করিতেও পারিল না

দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়া যাওয়ায় এবং আবদ্ধ কার্য্যাদির সুবন্দোবস্ত হওয়ায় সতীনাথের এইবার বাড়ী ফিরিবার কথা মনে হইল। নবাগত পণ্ডিতটি স্কুল প্রতিষ্ঠার শুভদিন দেখার জন্য পঞ্জিকা দেখিতে দেখিতে কহিলেন,—"আজ ২২এ শ্রাবণ, ২৬এ দিন খুব ভাল, ঐ দিনে স্কুলের কাজ আরম্ভ করাই উচিত।"

সতীনাথের মনে পড়িল ২৬এ বিবাহের দিন স্থির করিয়া তারাসুন্দরী রুদ্রকান্তের অনুমতি লইবার জন্য সতীনাথকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আজ ২২এ শ্রাবণ কাটিয়া গেল। সতীনাথ তারাসুন্দরীর উৎকণ্ঠা অনুভব করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কথাটা পাকা পাকি করিয়া না রাখিলে তিনি হয় ত ধৈর্য্যরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িবেন। মুরারি বর্ণিত নির্ম্মলের নামটাও হঠাৎ সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল।

১০

সংবাদপত্র পাঠ

এখানকার কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত সমস্তই ভালরকম হইয়া গিয়াছে। এখন আর সতীনাথের উপস্থিত থাকিবার কিছু প্রয়োজন নাই। কর্ম্মচারীদের প্রতি যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া সতীনাথ দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিল। ট্রেণ ধরিবার জন্য মধ্যরাত্রেই পাল্কীতে রওনা হইলে, সকাল ৭টায় ষ্টেশনে পৌঁছাইতে পারিবে। পাল্কী-বেহারাদের খবর দেওয়া হইল।

সেদিন সারাদিন ধনী দরিদ্র প্রজা কাছারী বাড়ী ভরিয়া রহিল। জমিদারের বিদায়-উৎসবে আলো বাজী নাচ ভোজ কিছুই হইল না! তবু গ্রামবাসীর অকৃত্রিম স্নেহ ভক্তি প্রীতি আশীর্ব্বাদে অভিসিঞ্চিত হইয়া সতীনাথের মনে হইল, এ উৎসবের কোন অঙ্গই হানি হয় নাই। এমন সদয় সস্নেহ ব্যবহার বড় লোকের কাছে, বিশেষতঃ দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক জমিদারের কাছে, তাহারা আর কখনও পায় নাই। দায়ে পড়িয়া বাঁধা বুলি "হুজুর মা বাপ" গরীব বা প্রাসাদাকাঙ্ক্ষীদের অনেকবার বলিতে হয় সত্য, কিন্তু সতীনাথকে তাহাদের সত্যই যেন "মা বাপ" বলিয়া মনে হইয়াছিল! যাহারা জমিদারের রোষকেও ভয় না করিয়া আদালতে 'মরিয়া' হইয়া লড়িতে গিয়াছিল, সেই দলের সর্দ্দার ফৈজু শেখের বৃদ্ধা মাতা লাঠি ধরিয়া সতীনাথকে একবার চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইতে আসিল। বুড়ী ঘোলা চোখের জলে ভাসিয়া "খোদা তালার" নিকটে "বাপজানের" মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বাড়ী ফিরিল।

দুই মাসের আত্মীয়তায় সতীনাথ যে বড় অল্প ফেলিয়া যাইতেছে না তাহা সে নিজেও বুঝিয়াছিল। সহরে চিরদিন বাস করিয়াও একখানা মুখও এ পর্য্যন্ত আপন হয় নাই; কিন্তু এই নিরক্ষর অশিক্ষিত চাষা-ভুষাদের অন্তরে এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহার জন্য এত বড় সম্মানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করা হইয়া গিয়াছে, ভাবিয়া সে মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিল। সেখানকার মূল্যবান্ মিষ্টান্ন

কদ্‌মা বাতাসা ও নারিকেলের রসকরা দিয়া ছেলেদের খুসী করিয়া দেওয়া হইল। একটি অসমসাহসিকা চারি বৎসরের মেয়ে "আজা" বাবুর কাছে "আঙা কাপল" চাহিয়া বসিয়া অপরাধের শাস্তি স্বরূপ অভিভাবকদের গোপন তাড়না সহ্য করিলেও, আশার ফললাভে ক্ষতির বেদনা অনুভব করিতে পারিল না। সতীনাথ স্কুলের জন্য অবৈতনিক কয়েক জন মাতব্বর ব্যক্তির হস্তে সমস্ত ভার রাখিয়া যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

রাত দুইটার সময় বাহির হইতে হইল, তাই সঙ্গে অধিক লোকের আসিবার সুবিধা হয় নাই। যাহারা মানা না মানিয়া আসিতেছিল, তাহাদেরও সতীনাথ বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিল।

বাড়ী ফিরিবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, মন তাহার ততই যেন কি একটা অস্পষ্ট বেদনার ভারে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। কোথায় সে ফিরিবার উৎসাহ?

ষ্টেশনে পৌঁছিতে সকাল হইয়া গেল। প্লাটফরমে নামিয়া সতীনাথ পায়চারী করিতেছিল। ট্রেণ আসিবার বড় বেশী বিলম্ব নাই। তাহার মনটা ট্রেণের আগেই ছুটিতে চাহিতেছিল! প্রায় দুইমাস সে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে, এই দীর্ঘকালের অদর্শন কল্যাণীর মনে কিছুই কি অভাব-ব্যথা জাগায় নাই? সতীনাথের মত নাই হউক, তবুও সে যে তাহাকে ভালবাসে, তাহার মনও যে তাহার জন্য ব্যাকুল, সে ত সতীনাথ নিজের মন দিয়াই বুঝিতেছে। মুরারির পত্রে প্রথম প্রথম তাহাদের খবর পাওয়া যাইত, আজকাল প্রায় মাসখানেক মুরারির পত্রের ভাবও যেন কেমন ছাড়া ছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। শেষপত্রে সে জানাইয়াছে— তাহার বলিবার কথা অনেক আছে, কিন্তু বলিতে সাহস পায় না; সতীনাথের শীঘ্র ফিরিয়া আসা প্রয়োজন।—পত্রের ভাব ভাষা যেন প্রহেলিকাপূর্ণ। কি কথা সে বলিতে সাহস পায় না, কল্যাণীর কথাই কি? সে কি তবে পীড়িতা? পীড়া কি সাংঘাতিক? না—না, তা কেন হইবে! সতীনাথ মনকে বুঝাইয়া প্রবোধ দিল, হয় ত কোন বৈষয়িক ব্যবস্থার কথা অথবা জ্যেঠামহাশয়ের মেজাজ ভাল নাই, এমনি কিছু হইবে। সতীনাথের অনুপস্থিতি এবং অজস্র অর্থব্যয়ে এইটাই সব চেয়ে সম্ভব বলিয়া তাহার মনে হইল। মনে পড়িল, আর একবার কিছুদিনের জন্য সে মেদিনীপুরে যায়, ফিরিয়া আসিলে পিসীমা বলিয়াছিলেন,—"সতী, তুই বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি বাবা, তোরে না পেলে তোর জ্যেঠা আর এক মানুষ হয়।" মনকে সে অনেক কথাই বুঝাইতেছিল, তবু অবুঝ মন কিছুতেই কিছু বুঝিতেছিল না।

গাড়ী থামিয়া দাঁড়াইল। সবুজ পতাকা হস্তে গার্ড সাহেবের মূর্ত্তি দেখা দিল। সতীনাথ স্বস্থানে যাইতে গিয়া কোন পরিচিত মুখ দেখিয়া থামিয়া পড়িল। একহাতে একটা ব্রীফ্ ব্যাগ, অপর হাতে খবরের কাগজ—একজন ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া, অপেক্ষাকৃত ভিড়-কম গাড়ী খুঁজিয়া দেখিতেছিলেন। সতীনাথ অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাতখানা ধরিয়া নাড়া দিতেই ভদ্রলোকটি চমকিয়া ফিরিয়া চিনিতে পারিয়া হাসিয়া কহিলেন—"সতী যে! ভাল ত? তুমি কোথা থেকে?"

গাড়ী হুইশেল দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধৃত হস্তখানায় টান দিয়া ব্যস্তভাবে সতীনাথ কহিল,—"মঞ্জু, এস—এস. এই গাড়ীতে উঠে পড, ঢের কথা আছে "

একটুখানি সলজ্জ কুণ্ঠার সহিত মঞ্জুভূষণ কহিল,—"আমাব ইণ্টারের টিকিট, ফার্ষ্ট ক্লাসে গোল করবে।"

সতীনাথ তাহার ধৃত হাতখানা ছাড়িয়া দিল এবং দুইজনে ছুটিয়া চলন্ত গাড়ীর ইণ্টাব ক্লাসেই উঠিয়া পড়িল। বসিবার স্থান করিযা লইয়া সতীনাথ কহিল,—"তারপব—ওঃ কতকালের পর দেখা—মনেই পড়ে না! একটা প্রকাণ্ড যুগ চলে গেছে।"

মঞ্জু হাসিয়া কহিল,—"সত্যি, যখন একসঙ্গে আমরা দুজনে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, সে সব এক দিনই গিয়েছে। তার পর অদৃষ্ট স্রোতে কে কোন্ দিকে গিয়ে পডলুম, এখন আব চোখের দেখাই হয় না।"

সতীনাথ হাসিল; বলিল, "মনে পড়ে? তখন এক দিনও গোলদীঘির মিলন বন্ধ হ'বাব উপায় ছিল না। তার পর, এখন কি কচ্ছ বল দেখি?"

মঞ্জুভূষণ মৃদু হাসিয়া কহিল,—"যা করা উচিত—আমাদের মত লোকের কি ম্যাজিষ্ট্রেটি আশা কর? কেরাণীগিরিতে নাম লিখিয়ে দেওয়া গেছে। পাস কর্‌তে পারলুম নাও বটে, আর বাবা মারা গেলেন, কাজেই বাড়ী এসে বস্‌তে হল। ভাইগুলি সবই ছোট। তোমার খবর পেয়ে থাকি, তুমি যে পাস করে ডাক্তাব হয়ে বেরিয়েছ, তাও কাগজে দেখলুম। বড় খুসী হয়েছি—লক্ষ্মী সরস্বতী একাধাবে না হলে কি মানায়?"

সতীনাথ তাহার স্কন্ধে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিল,—"যা, আর জ্যাঠামো কর্ত্তে হবে না।"

মঞ্জুভূষণ কহিল,—"তার পর, আসল লক্ষ্মীর কথা বল, বিয়ে কল্লে কোথায়? এত বন্ধুত্ব, একটা ফলারের নিমন্ত্রণও কল্লে না ভাই, এমনি করেই ভুলে যেতে হয়!"

সতীনাথ হাসিল ; কহিল—"ভুলেছি কি না, যখন বিয়ে কর্‌ব তখন প্রমাণই পাবে।"

"সত্যি বিয়ে করনি ?"

সতীনাথ কহিল—"না।"

"কেন, বাংলাদেশে মেয়ের দুর্ভিক্ষ না কি ? এমন পাত্র বেকাব পড়ে, আব কুমাবীবা কি না কেরোসিন জ্বেলে আত্মহত্যা কচ্চে ? হা হতবিধে।" —বলিয়া কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় হাসিয়া কহিল—"না—না, বিয়ে করে ফেল। জান ত, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। শেষ কি আবাব জ্যেঠাব ধাত পাবে ? ও সব বাতাস ছোঁয়াচে"—বলিয়া সে সজোরে হাসিয়া উঠিল।

সতীনাথও অনুকম্পাব হাসি হাসিল। বেচাবা সংসাবী-লক্ষ্মীব কদবই বুঝে, বীণাবাদিনী বাগ্‌দেবীর কল্পনা মাথাতেও আসে না। সে যে লক্ষ্মীরূপে সবস্বতীকে বরণ করিয়া ঘবে আনিতে চাহিতেছে, এ কথা এখন ফাঁস কবিয়া সব কবিত মাটি করিয়া দিবে না—যথাসময়ে একেবাবে তাক্ লাগাইয়া দিবে। প্রকাশ্যে কহিল—"কৌমার-ব্রত নেবার তেমন সখ কিছু আমার নেই।"

তাহার পর দুই বন্ধুতে ববপণ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা চলিল। সতীনাথ খুব উৎসাহের সহিতই এ প্রথাব নিন্দা করিতে লাগিল। গবীবেব মেয়েব জন্য বরের দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে কথা হইতে হইতে বলিল—"পঙ্কে জন্মালেও পঙ্কজিনীব মূল্য কমে না।"

মঞ্জু বলিল—"সত্যি বল্‌চ সতী, তুমি গবীবের ঘবে বিয়ে কব্‌তে বাজি আছ।"

ধাবমান লৌহরথের বাহিরে গাছপালাগুলাও সবেগে ছুটিয়া পশ্চাতে সরিয়া পড়িতেছে। দুই ধাবে শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রেব উপবে সকাল বেলাব তবল বৌদ্র কমলার স্বর্ণাঞ্চলেব মত জ্বলিতেছিল। কোথাও ঝোপ ঝাপ ডোবা, কোথাও কোন অট্টালিকাব দৃশ্য, মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। কোদালে কাটা মেঘের ভিতব সূর্য্যালোক পড়িয়া পুঞ্জ পুঞ্জ কার্পাস স্তূপেব ভিতব দিয়া যেন বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ কবিতেছিল।

সতীনাথ দৃষ্টি ফিরাইল। তাহাব চোখে হাসিব আলো তরুণ সূর্য্যালোকেব মতই খেলা কবিয়া গেল। বলিল—"বল্লাম ত, ঐ তোমাবই ভাষায় বলি, দারিদ্র্য-পঙ্কে পঙ্কজিনীব মূল্য হ্রাস কবায় না, আমাব ত এই মত।"

মঞ্জুভূষণ সাগ্রহে বন্ধুব হস্ত গ্রহণ কবিল। কহিল—"তবে কথা দাও, পঙ্কজ দর্শনের জন্য পল্লীগ্রামের পঙ্কিল পুষ্করিণী দেখ্‌তে যেতে তোমার কোন আপত্তি নেই ?"

সতীনাথ অতি মধুর হাসি হাসিয়া কহিল—"এর উত্তর মুখে নয়, চিঠিতে পাবে।" দুই বন্ধুতে করমর্দ্দন করিয়া ও বিষয়ের আলোচনা ঐখানেই উপসংহার করিল।

মঞ্জুভূষণের শ্বশুরালয় হুগলী। বিদ্যানাথ বাচস্পতি তাহার শ্বশুরের প্রতিবাসী এবং উমাও তাহার অ-দৃষ্টা নয়। বিদ্যানাথের পৌত্রীর রূপ গুণ ও বিদ্যার খ্যাতি সে শ্বশুরালয়ে যথেষ্ট শুনিয়াছে, এবং কিছু বা দেখিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র অন্বেষণে প্রতিশ্রুতও হইয়াছে, তবু এমত দুর্ল্লভজনে সে তাহার দুরাশা স্থাপন কবিতে সাহস করে নাই। সতীনাথকে দেখিয়া এবং তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইল, বিধাতা বুঝি যোগ্যের সহিত যোগ্যেব মিলনের জন্যই তাহাকে অতর্কিতভাবে সতীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। নতুবা দীর্ঘকালেব পর এমন ভাবে তাহার সাক্ষাৎ মিলিল কেন? অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়াব এ মায়াব খেলা নহে কি?

মঞ্জুভূষণ সতীনাথেব ভাবে ও কথায় অনেকখানি আশ্বাস পাইয়াছিল। সতী-নাথেব স্বভাব তাহার অজ্ঞাত নয়। সে যাহা উচিত বলিয়া মনের সহিত মানিয়া লইবে তাহা সাধন করিবার জন্য অসাধ্যকে সুসাধ্য করিয়া তুলিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এই দৃঢ়তার বলেই সে বরাবর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়া আসিয়াছে। বাজলক্ষ্মীর উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদধারার অংশ মঞ্জুভূষণ যেন এখনই গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইল।

তাহাব পব অনেক অবান্তর আলোচনা চলিল। দেশের কথা, দশের কথা, জমিদার প্রজার সম্বন্ধ, দেশীয় ব্যবসায়েব উন্নতি, শিক্ষা বিস্তার,—ছোট বড় অনেক বিষয়েরই আলোচনা হইয়া গেল। সতীনাথেব হৃদয়ের পরিচয় আজ যেন মঞ্জুভূষণ নূতন করিয়া লাভ করিল। বযসে তাহার হৃদয়ের মাধুর্য্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই, তবু সে এখনও যে সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞ, তাহা তাহার আশার সফলতার দৃঢ় বিশ্বাসেই অনুমেয়। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অকৃত্রিম স্নেহে মনে করিল,—"ভগবান তোমায় এমনি করেই সংসারের আঘাত থেকে চিরদিন যেন বাঁচিয়ে রাখেন। নিরাশার ঝড় খেয়ে খেয়ে বিশ্বাসের মূল যেন আলগা হয়ে না যায়।"

গাড়ী হুগলী ষ্টেশনে থামিলে, মঞ্জুভূষণ আর একবার তাহার বক্তব্য সম্বন্ধে স্মবণ রাখিবার অনুরোধ জানাইয়া, নিজের ঠিকানা দিয়া, সস্নেহে করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় অনাবশ্যক বোধে পঠিত সংবাদপত্রখানা সঙ্গে লইল না।

যতক্ষণ দেখা গেল, সতীনাথ বন্ধুর গমনশীল মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তার পর পরিত্যক্ত ইংরাজী সংবাদপত্রখানা উঠাইয়া লইয়া সংবাদ-স্তম্ভে দৃষ্টি বদ্ধ করিল।

সকালে রওয়ানা হওয়ায় আজকার ডাক তাহার কাছে পৌছায় নাই। রিডাইরেক্ট করিয়া সে সব বাড়ী পাঠাইবার জন্য আদেশ দিয়া আসিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্ট নামধারী যে অজ্ঞাত শক্তি মানবের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, সতীনাথ চলিয়া আসিলেও তাহার হাত এড়াইয়া আসিতে পারে নাই।

বৈধব্য-যোগযুক্তা বণিক-দুহিতা বেহুলার নেত্রের কজ্জলাঙ্কিত সর্পমূর্ত্তি যেমন অদৃষ্টের প্রাধান্য রক্ষার জন্য জীবনলাভে বাসর-শয্যায় নখীন্দরের প্রাণ হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ মঞ্জুভূষণের পরিত্যক্ত সংবাদ-পত্রখানা, সতীনাথের মৃতের তালিকাভুক্ত না করিলেও যে মৃত্যু জ্বালা দিতে সক্ষম হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। "মিসেস্ রজার্সের স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছেদন," "শীতের প্রকোপে শিশুর প্রাণবিয়োগ," "বরিশালে দুর্ভিক্ষ," "বর্দ্ধমানে ডাকাতের অত্যাচার"—এমনি কয়েকটা সংবাদের পর বিবাহ শীর্ষকে লিখিত ছিল—

"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺নবীনমাধব মুখোপাধ্যায়ের সুশিক্ষিতা কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী দেবীর সহিত সিভিলিয়ান মিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষালের ২২এ শ্রাবণ নববিধান মতে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভগবান দম্পতীকে সুখে রাখুন।"

একবার দুইবার তিনবার—কতবারই সতীনাথ সেই একটিমাত্র সংবাদের উপর চোখ বুলাইয়া গেল। অক্ষরগুলা ধাবমান দৃশ্যাবলীর মত চোখের উপর দিয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। চোখে সবই যেন অন্ধকার—মনেরও অনুভব-শক্তি স্পন্দহীন। কাগজখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল। ক্ষণেকের জন্য সে যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল।

পাশের বেঞ্চিতে যে ভদ্রলোকটি বসিয়া এতক্ষণ তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, তিনি আসিয়া তাহাকে ধরিয়া শয়ন করাইয়া দিলেন। মূর্চ্ছা বা আচ্ছন্নতা কাটিয়া গেলে সতীনাথের মনে হইল, সে যেন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সে কোথায়, প্রথমে যেন তাহাই ভাবিয়া লইতে হইল। তার পর উঠিয়া বসিয়া, ভূপতিত সংবাদপত্রখানার পানে পুনরায় স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার অনুভব-শক্তি ফিরিয়া আসিল। সে কাগজখানা আবার উঠাইয়া, সেই একটিমাত্র সংবাদের নিশ্চয়তা স্থির করিবার জন্য পুনরায় চাহিয়া রহিল। সতীনাথের বেশভূষা ও মঞ্জুভূষণের সহিত কথাবার্ত্তা শুনিয়া, সে যে বড়লোক, ভদ্রলোকটির এমনি অনুমান হইয়াছিল, তাই একটু কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার সঙ্গে কেউ নেই কি? কাগজখানায় কি কোনও অশুভ সংবাদ দেখ্‌লেন? বড় কাতর দেখ্‌ছি, তাই জিজ্ঞাসা করুতে সাহস কল্লেম।"

সতীনাথ উত্তর দিল না। অর্থহীন দৃষ্টিতে লোকটির পানে চাহিয়া রহিল।

লিলুয়া ষ্টেশনে দুবেজী ও বিপিন আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখের পানে চাহিয়া দুইজনেই চমকিয়া উঠিল, যেন কত বড় কঠিন পীড়া ভোগ করিয়া সে উঠিয়া বসিয়াছে। বিপিন ভয় পাইয়া কহিল,—"এ কি ছোটবাবু অসুখ কচ্চে আপনার? চলুন, ও গাড়ীতে চলুন।"

সতীনাথ বাধা দিল না, প্রাণহীন কলের পুতুলের মতই সে বিপিনের অনুসরণ করিয়া চলিল। চলিবার শক্তিও যেন নাই, সে টলিতেছে। যে নূতন যাত্রী এইমাত্র তাহাব পরিত্যক্ত স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছিল, সে সতীনাথের উদ্দেশে কহিল—"মাতাল নাকি? ছোক্‌রার চেহারা যেন রাজপুত্তুর অথচ প্রবৃত্তি দেখ মা।" পুরাতন আরোহী বাধা দিয়া বলিলেন,—"না, মাতাল নয়, লোকটা বিদ্বান, খুব বড় রকম একটা ঘা পেয়েছে, ফিট হয়ে গেছ্‌ল, এই কাগজখানাই সে খবর দিয়েছে। বলিয়া পুনরায় সংবাদপত্রে মনোযোগ দিলেন, কিন্তু কি সংবাদে যে সতীনাথকে এমন অভিভূত করিয়াছিল, দুইজনে মিলিয়া অনেক চেষ্টাতেও তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

নবাগত অনেক ভাবিয়া কহিল, "বোধ হয় ছোকরা, একজন এনার্কিষ্ট, ডাকাতের দল ধরা পড়ার খবরটাতেই বোধ হয় ভেবড়ে গেছে।"

১৩

মা ও মেয়ে

যে দিন অতৃপ্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষা বক্ষে বহিয়া সতীনাথ কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সেই দিন বেলা দশটার মধ্যেই তাহার দেশত্যাগের যে বিবরণ তারাসুন্দরী প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে শুধু বিস্মিত নয়, একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। নিত্যকার মত ভোরে উঠিয়া স্নান পূজা সারিয়া তিনি তখন রান্নাঘরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

বাবুর বাড়ীর দুইজন ভৃত্যের নিকট ভজহরি সে সংবাদের অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জানাইল, কথাটা যথার্থ—ইচ্ছা না থাকিলেও জ্যেঠামহাশয়ের হুকুমে তাহাকে সুদূর বিক্রমপুরে পত্নী-সংগ্রহে যাইতে হইয়াছে।

সতীনাথের উপর ভজহরির, একটুখানি পক্ষপাতমূলক স্নেহ থাকায়, সে আরও জানাইল,—"ছোটবাবু কি রাজী হন! কাল সারাদিন এই নিয়ে বাবুর সঙ্গে তুমুল দাঙ্গা হয়ে গেছে। কর্ত্তা বাবুর 'বাঙ্গালে গোঁ'—বলেন সে সব হবে টবে না; নিকষ কুলীনের বেটা অঘরে বিয়ে করবে! জাত খোয়াবে! তা যদি করে, তাহলে আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত। এক পয়সা দেব না। কি করেন, এ রাজ্যিপাট

ত আর ছাড়া যায় না, কাজেই ছোটবাবু দায়ে পড়ে বিয়ে করতে গ্যাছেন। লজ্জায় আর এখানে মুখ দেখাতে পাল্লেন না। মুরারি বাবু তাঁর কেমন ভাই হন, তিনি এই সব কথা নিজে হতে বল্লেন। কত দুঃখ কল্লেন; আবও বল্লেন,—'মাঠাকৃরুণকে বল, যা হয়ে গেল, তার ত আর চারা নেই, ওনার অমন মেয়ে, মেয়ের বিয়ের ভাবনা কি? মাঠাকৃরুণ যদি হুকুম দেন ত আমি নিজেই পাঁচগণ্ডা পাস করা ছেলে এনে হাজির করে দেব'।"—ভজহরি মনে কবিয়াছিল, মুরারি বাবুর এই সান্ত্বনাতে সেও মাঠাকৃরুণকে শান্ত কবিতে পারিবে। কিন্তু তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া সে যখন তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তখন আর সে সম্ভাবিত সান্ত্বনার ভাষা তাহার মুখে ত আসিলই না, মন হইতেও পলাইয়া গেল।

কল্যাণীও শুনিল, সতীনাথ বিক্রমপুরে বিবাহ করিতে গিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল না, মূর্চ্ছাও গেল না। সাধারণতঃ নায়িকারা যাহা করেন, সেরূপ কিছু না করিলেও, তাহার মাথার ভিতব কেমন যন্ত্রণা হইয়া উঠিল। আনন্দ বা দুঃখেব আতিশয্যে মানুষ যেমন স্তব্ধ হইয়া থাকে, কিছুক্ষণের জন্য সেও যেন তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিল। বাহিরেব হাসিখুসী, কথাব আওয়াজ, পথে গাড়ী চলার শব্দ—সমস্তই যেন বহুদূর হইতে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, কিছুই যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল না। তাহার চোখের উপব কেবল এক সুন্দব পুরুষেব ছবি যেন তাহারই পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে—এমনি মনে হইতে লাগিল।

তার পর ধীরে ধীরে সে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। তাহার অত্যন্ত ম্লান হাসিটুকু ভজহরির মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া তাহাব চোখের উপব ফুটিয়া উঠিল। কানে বাজিল—"ভজদা, আজ বাজার যাবে না? রান্না বান্না হবে কখন, আজ দ্বাদশী যে!"—বলিয়াই কল্যাণী কাজের ছুতায় ঘর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ভজহরি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভাবিল, আহা, দিদি আমার ছেলেমানুষ, কিছু ত বোঝে না! যাক্, ওনার যে আঁতে ঘা লাগেনি, এই ঢের ভাগ্যি।"—বাজারের জিনিষপত্রের তালিকা না চাহিয়াই সে ধামা ও মৎস্যপাত্র লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

কল্যাণী রান্নাঘরে গিয়া দেখিল, চুল্লীর আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া কখন নিবিবার উদ্যোগ করিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। খানকয়েক ঘুঁটে ভাঙ্গিয়া উনানের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া কয়লা ঢালিয়া দিল। তার পর দালানে বঁটি পাতিয়া মায়ের জন্য ফল ছাড়াইতে বসিয়াই কল্যাণীর মনে পড়িল, সরবতের চিনি ভিজানো হয় নাই;

ভজা কাল আশ্বাস দিয়াছিল সকালে ডাব আনিয়া দিবে, তাহাও ত হইল না। চিনি লইতে আসিয়া সে দেখিল, মা সেইখানে তখনও বসিয়া আছেন।

কল্যাণী কাছে আসিয়া ডাকিল—"মা।"

তারাসুন্দরী উত্তর দিলেন না, চাহিয়াও দেখিলেন না।

কল্যাণী এবার তাঁহার হাতখানা টানিয়া নিজের ললাটে বুলাইয়া লইয়া পুনরায় ডাকিল—"মা!"

তারাসুন্দরী চাহিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিবার পর তাঁহার দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে আবার সহজভাব ফিরিয়া আসিল। কল্যাণীর মাথাটা কোলে টানিয়া লইতেই মনের বেদনার উচ্ছ্বাস দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টিধারার মতই ঝরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিলে, অসহ্য বেদনাটা সহ্যের সীমায় আসিয়া পড়িল।

তিনি যে তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহার উপর বড় বেশী ভরসাই রাখিয়াছিলেন! সে আশা যে কত বড়, আজই যেন প্রথম তাহা উপলব্ধ হইল।

কল্যাণী নিঃশব্দে অনেকক্ষণ মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া যখন একবার মুখ তুলিল, তারাসুন্দরী দেখিলেন, তাহার চোখ দুইটাও অল্প যেন লাল হইয়া উঠিয়াছে। কল্যাণী মুখ তুলিয়াই একটুখানি হাসিল। তার পর মায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—"চল না মা, খেতে চল না। কত বেলা হল দেখ দেখি?"

তারাসুন্দরী একটুখানি সংশয়ের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তিনি কি তবে ভুল বুঝিয়াছিলেন? সতীনাথ বিশ্বাস ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া কল্যাণীও কি এত সহজেই তাহাকে ভুলিয়া যাইতে পারিবে?—তখনই দুঃখের হাসি আসিল। পারুক আর নাই পারুক, তাহার জন্য ত আর বিধির বিধি বদল হইয়া যাইবে না।

মানুষে গড়ে ও বিধাতা ভাঙ্গেন, এ দৃষ্টান্ত তারাসুন্দরীর জীবনে এই প্রথম নয়। তরুণ-জীবনে আশার আলোকে ভবিষ্যতের মোহন ছবি আঁকিয়া তিনি যেদিন প্রবাসী স্বামীর অধ্যয়ন-সমাপ্তির দিন গণিয়া সুখ-মিলনের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, সেদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাতে ভবিষ্যতের রঙ্গীন ছবি বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার জীবনের সকল সুখসাধের সমাধি হইয়া গিয়াছিল। স্বামী বর্ত্তমানেও তিনি স্বামী-হীনা হইয়াছিলেন। আর, সব চেয়ে বিড়ম্বনা, সে মৃত্যুদণ্ড স্বহস্তেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিধবা পতিহীনা নারী আত্মীয় জনের কাছে সহানুভূতির সমবেদনায় যেটুকু সান্ত্বনা পায়, তাঁহার ভাগ্যে সেটুকুও ঘটে নাই। জীবিতাবস্থায়ও নবীনমাধব তাঁহার আত্মীয়জনের চোখে মৃত হইয়া ছিলেন, সে সংসারে তাঁহার নাম

মুখে আনিবার পর্য্যন্ত কাহারও সাহস ছিল না। তারপর একদিন অত্যন্ত অকস্মাৎ অতর্কিতরূপেই তারাসুন্দরী জানিলেন যে জীবনের দ্বিধা হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিয়া, তাঁহার উপেক্ষিত মহানুভব স্বামী চিরদিনের জন্যই চলিয়া গিয়াছেন। সেদিনের সেই বর্ণনাতীত প্রচণ্ড আঘাত তাঁহার হৃদয়ের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত নড়াইয়া দিলেও একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে নাই। বিধাতার হস্তনিক্ষিপ্ত অমোঘ দণ্ড যতই কঠোর হউক, তাহা যে তিনি মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এ অভিজ্ঞতা সেই দিনই পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। সেদিনও যখন কাটিয়া গিয়াছে, তখন ভবিষ্যতে যত বড দুর্দ্দিনই আসুক, তাহাও যে কাটিয়া যাইবে তাহাতে আর সংশয় মাত্র ছিল না।

তাই সতীনাথের ব্যবহার তাঁহার ভাঙ্গা মনের উপর আঘাত করিলেও নূতন করিয়া আর কিছু ভাঙ্গিতে পারিল না। ঝড খাইয়া খাইয়া যে গাছ টেঁকিয়া আছে, তাহাকে উৎপাটন করা আর ঝড়ের সাধ্য নয়, সে কালেরই প্রতীক্ষা করে।

তবু নিজের জন্য না হউক, মেয়ের জন্য তাঁহাকে ভাবাইয়া তুলিল। সে কুসুম-কোমলা বালিকা এত বড মানসিক আঘাত সহিতে পারিবে কি?

মানুষের ভিতর বাহির যে সমান নয়, বড অধিক মূল্যেই এ অভিজ্ঞতা তারাসুন্দরীকে ক্রয় করিতে হইয়াছে। সতীনাথ এত চঞ্চলচিত্ত! এমন ভাবে সে যে প্রতারণা করিতেও পারে, এ সম্ভাবনার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে উঠে নাই। সতীনাথও এমন ব্যবহার করিতে পারিল? জগতে তবে কিছুই অসম্ভব নয়! তেমন সরল মুখ, তেমন উদার উন্নত ব্যবহার— সে সবই কাপট্যের আবরণ! তাহার বন্ধুত্ব মৌখিক, মুখে সে বলিত কল্যাণীর জন্য জগতের সকল ক্ষতি হাসিমুখে সহ্য করিতে পারে—কিন্তু প্রয়োজনকালে একটা মুখের কথা পর্য্যন্ত জানাইয়া গেল না, চোরের মত লুকাইয়া চলিয়া গেল! একবার ভাবিয়া দেখিল না যে, খেলার ছলে তাহাদের কতখানি ক্ষতি করিয়া গেল! এমন করিয়া, আশা দিয়া সে প্রলুব্ধ করিল কেন! নচেৎ কুটীরবাসিনী দুঃখিনী মায়ের দুঃখিনী কন্যা জন্মাবধি যে পিতৃস্নেহ পর্য্যন্ত পাইল না, কে তাহার জন্য রাজ্যেশ্বরের কামনা মনে আনিত?

তারাসুন্দরী সতীনাথের উপর রাগ ছাড়িয়া, ক্রমে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার উপর রাগ করিতে লাগিলেন। অচেনা অজানা লোকের প্রতি কেন এমন প্রবল আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিলেন! সে যাই বলুক, কেন তিনি সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া, কল্যাণীকে আশা দিয়াছিলেন! এ খেলার প্রশ্রয়দাত্রী তিনি নিজেই যে, এখন রাগ করিবেন কাহার উপর? অদৃষ্টকে তিনি নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন, অদৃষ্টের দোহাই দিলেই বা চলিবে কেন? এ যে স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল!

এইরূপে কিয়দ্দিন কাটিল। একদিন মুরারি রুদ্রকান্তের পত্রবাহক রূপে আসিয়া দেখা দিল। সতীনাথের সহিত আত্মীয়তায় তাহার সম্মুখে অসঙ্কোচে বাহির হইলেও, মুরারির সাক্ষাতে বাহির হইতে তারাসুন্দরীর ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ তাহাদের প্রতি তিনি তখন হাড়ে হাড়ে চটিয়াই আছেন।

ভজহরি বাজারে গিয়াছে, মুরারি অবস্থা বুঝিয়াও নড়িল না। গায়ে পড়িয়া 'মা' বলিয়া ডাকিয়া ঘরে ঢুকিল।

অগত্যা তারাসুন্দরী ললাট পর্য্যন্ত মাথার কাপড় টানিয়া, তাহাকে বসিবার জন্য আসন দিলেন। রুদ্রকান্তের চিঠিখানি অনিচ্ছায় খুলিয়া পড়িতেও হইল। রুদ্রকান্ত "সবিনয় নিবেদন" অনধিকার চর্চ্চার জন্য ক্ষমা চাহিয়া, বিনা আড়ম্বরে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

তাহারা নিকষ কুলীন বংশজের কন্যা লইতে পারিবেন না, আর আর যে কারণ আছে তাহা বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন না, সুতরাং তাহাদের আশা ছাড়িয়া বুদ্ধিমতী জননী যেন কন্যার জন্য অন্য সৎপাত্রের সন্ধান করেন, সতীনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করাই তাহাদের পক্ষে শুভ, কারণ বালক-বালিকা নিজেদের জীবনের লাভ ক্ষতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিলেও বিজ্ঞ অভিভাবকের দূরদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জীবনপথে কণ্টক গুল্ম জন্মিতে দিলে পথ ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়ে। মহানগরীতে বাসস্থানের অভাব নাই, চোখের দূরত্ব মনের দূরত্বসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। অপ্রিয় সত্য বলিবার এই যে ধৃষ্টতা তিনি গ্রহণ করিলেন এ অপরাধ মহাশয়া নিজগুণে যেন ক্ষমা করেন।

বিনীত নিবেদনের সাক্ষরকারীর কঠোর নামটা চীৎকার করিয়া যেন তারাসুন্দরীর আহত হৃদয়ে সজোরে কশাঘাত করিল। পত্রের ভাব ও ভাষা যতই মার্জ্জিত হউক তাহা যে ক্ষমা প্রার্থনা নয়, তাহা যে আদেশ—সে কথা অপমানিত তারাসুন্দরীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তীব্ররোষে তাহার ললাটের শিরাসকল স্ফীত ও ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল।

কিন্তু অগ্নিগর্ভ গিরির মত সে ক্রোধাগ্নি তাহাকে অন্তরের মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইল। কথার ভিতর যতখানি বিষই থাক, অক্ষরগুলা অগ্নিতপ্ত লৌহশলাকার মত হৃদয়ক্ষতের উপর যতই যন্ত্রণার জ্বালায় বিদ্ধ হউক, মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কল্যাণীর মনের ভাষা তাহার চোখের উপর যে ফুটিয়া রহিয়াছে—মেয়ে যে একান্ত ভাবেই সেই দুর্ল্লভজনেই অনুরাগিণী। যে তাহাকে এত বড় অপমানের ভিতর দিয়া এতখানি বেদনা দিল, অভাগিনী কন্যা এখনও যে তাহাকে একান্ত মনেই ভালবাসে। মায়ের কাছে কল্যাণী স্বীকার

করিয়াছে, তাহার পিতার সমাজনীতিই সে গ্রহণ করিবে, সে আজীবন কুমারী থাকিয়া মায়ের সেবা করিবে, বিবাহ সে কখনই করিবে না। এ অবস্থায় সতীনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাওয়া ছাড়া তাঁহার আর কি-ই বা উপায় আছে! গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লওয়াই তাঁহার একমাত্র ভরসা বলিয়া মনে হইল। এই সহজ আর উচিত পথ সময়ে গ্রহণ না করার জন্য নিজের প্রতি তাঁহার ঘৃণাও হইতেছিল। মেয়েকে শিক্ষিতা করিয়া সংপাত্রে দিবার সাধ করিয়াছিলেন—এ তাঁহার সেই অতিলোভের পুরস্কার।

মুরারি যখন নিশ্চয় বুঝিল, সতীনাথের বিবাহবার্তা তারাসুন্দরী বিশ্বাস করিয়াছেন, তখন তাহাতে আরও কিছু অলঙ্কারযোগ করিয়া বয়ান দিয়া কহিল—"কি জানেন, কুলীনের ঘরে অমন কত হয়। ছেলেরা ত আর কুল ফুল মানে না, কথা দিয়ে বসে থাকে। কর্ত্তারা কুলের গোড়া আগ্‌লাতে চান। তা, সে জন্যে আপনার চিন্তা নেই। সতীদা' কথার মানুষ, সে যখন 'হা' বলেছে, তখন না' হবে না। সে বাঙ্গালের মেয়ে—তাও বাপের বাড়ী থাকবে এখন, তাকে নিয়ে কি আর ঘর কর্‌বে? শোনেন নি, সতীদা'র ঠাকুর্দ্দা মহাশয়ের সাতটি বিয়ে ছিল।'

তারাসুন্দরী অসহিষ্ণুভাবে কহিলেন—"তাকে বলবেন, আমরা কুলীনের ঘরে মেয়ে দিই না"—বলিয়া তিনি কক্ষান্তরে উঠিয়া গেলেন।

১২

মুরারির বিস্ময়

ভজহরি বাজারের জিনিষপত্র ভিতরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"বাবু কি বসবেন, তামাক আনব?"

মুরারি তাহার কথার গুরু অর্থ বুঝিয়া অগত্যা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,- "না, তার আর দরকার নেই। তা জান ভজু মাঠাকরুণকে বোল, ওঁর অমন পরীর মত মেয়ে, ও মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা! হুকুম দিলে এই মুরারিই এক্ষুণি পঞ্চাশটা এম-এ বি এ হাজির করে দিতে পারে। তা জান, বলছিলুম গিয়ে, আমি তার ছেলের মতন। যখন যা দরকার, হুকুম কর্‌বেন, এই মুরারি প্রাণ দিয়ে তার কাজ করে দেবে। একজনকে দেখে যেন সবাইকে ভুল বোঝেন না। তা জান, এসব কথা তাঁকে বোল।"

ভজহরি খুসী হইয়া অনুরোধ রাখিবার সম্মতি জানাইলে, মুরারি একবার বক্রকটাক্ষে চারিদিকে চাহিয়া, ঈপ্সিত জনের দর্শন না পাইয়া শিষ্টাচার বিগর্হিত স্বরে শিষ্টাচার জানাইয়া চলিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়াও তাহার মনটা অনিশ্চিত সংশয়ের দোলায় দুলিতে লাগিল। উদ্দেশ্যের সফলতার সম্বন্ধে সে আজ অনেকখানি ভরসা পাইয়া আসিয়াছে। তারাসুন্দরী বলিয়াছেন, কুলীনের ছেলেকে তিনি মেয়ে দিবেন না। এই ভাবটা তাহার স্থায়ী রাখা চাই। সতীদা'র উপরে তাহার মনকে এমনভাবে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহার বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্য সতীদা'কে সকল স্বার্থ ও জ্যেঠামহাশয়ের সহিত কাটাছেঁড়া করিয়া বিশ্বস্ততার প্রমাণ হাতে হাতে দেখাইতে হয়। স্তোকবাক্যে আর চলিবে না—কৌলীন্য-গর্ব্ব ও জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহত্যাগ করা ছাড়া, কল্যাণীলাভের তাহার আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। সবজান্তা মুরারি বুঝিয়াছিল, কল্যাণীর জন্য এ সব স্বার্থ সতীনাথ অনায়াসেই বিসর্জ্জন দিতে পারিবে। সে অপরিণামদর্শী, ভবিষ্যতের আশায় বর্ত্তমান ক্ষতি সহিতে চাহিবে না। মুরারির যথেষ্ট নাটক নভেল উপন্যাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল। প্রেমিক নায়কেরা প্রেমের জন্য, এ ত কোন ছার, কত অসাধ্যও সুসাধ্য করিয়া থাকে—সে সব দৃষ্টান্ত তাহার চোখের উপর এখনও জ্বল জ্বল করিতেছে। সতীদা' আর এইটুকু পারিবে না?

সীতানাথের প্রেমের গভীরতার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়াই সে আসরে নামিয়াছে। এখন সতীনাথ তাহার প্রণয়ের উচ্চ আদর্শ না দেখাইলে চলিবে কেন? জ্যেঠামহাশয় অবশ্য কল্যাণীর সহিত বিবাহ দিবেন না। তারাসুন্দরীও আর স্তোকবাক্যে ভুলিয়া প্রতীক্ষায় থাকিতে রাজি হইবেন না, সতীনাথও কল্যাণীর আশা ছাড়িবে না।

তার পর—তার পরটাতে সে কালনেমির স্বর্ণপুরী ভাগের মত নিজের অংশেই সবটুকু সুযোগ ধরিয়া রাখিল। ছেলে মানুষ শরীরের জন্য সে ভাবে না, তাহার ক্ষণভঙ্গুর স্বাস্থ্যহীন দেহ যদি টিকিয়াই থাকে, তবু জ্যেঠামহাশয়ের কাছে সে দেহের মূল্য খুব বেশী নহে। তাই অমীমাংসিত জীবনসমস্যার সুমীমাংসার জন্য মুরারি অধীর আগ্রহে সতীনাথের পথ পানে চাহিয়া রহিল। সংশয়ের চেয়ে সত্য ভাল, তা সে যে মূর্ত্তিতেই আসুক। মুরারি ত ডুবিয়াইছে, তার ত আশা ভরসা কিছুই নাই। যে তাহাকে ডুবাইল তাহাকেও কেন সঙ্গে লইবে না? ছোট বেলায় কোন একখানা নীতিপুস্তকে সে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িয়াছিল "উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" আজ সেই শ্লোকাংশটুকু তাহার মনে পড়িল। সে লক্ষ্মী-উপাসনার জন্য পুরুষকারের আশ্রয় লইয়াছে, একবার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবে। তার পর, সফলতা লাভ করিতে না পারে,—সন্ন্যাসী হইয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যাইবে।

নিজের মানসিক বিপ্লবে কয়দিন সে এতই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নির্য্যাতিতা প্রতিবেশিনীর সংবাদ লইবার অবকাশ পর্য্যন্ত তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। সেদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়াই মনে হইল, তাহাদের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন। মাঝে মাঝে ইন্ধন না যোগাইলে প্রজ্জলিত অগ্নি যদি আবার নিবিয়া যায়, তখন হয় ত আশাপথ চাহিয়া তারাসুন্দরী তাঁহার যুবতী কন্যাকে প্রৌঢ়ত্ব দিতেও সম্মত হইয়া বসিবেন। প্রতিবেশিনীদের সংবাদ লইতে যাইবার জন্য মুরারি ভাল করিয়া আয়নায় মুখখানা দেখিয়া লইয়া, চুল ফিরাইল। রুমালে একটু গন্ধ ঢালিয়া লইল। কাপড় জামা বদলের প্রয়োজন নাই,—তাহা সর্ব্বদাই বাহিরে যাইবার উপযুক্তভাবে প্রস্তুতই থাকে। মনে মনে একটু রাগও হইল। সতীনাথের প্রতি বিধাতার এও একটা প্রকাণ্ড পক্ষপাতিতা! কেন, মুরারির চেহারাখানার উহার সহিত সামঞ্জস্য রাখা হইলে তাঁহার কতটুকুই বা ক্ষতি হইত? ভাবিল, পক্ষপাতিতায় মনুষ্য রুদ্রকান্তের চেয়ে ভগবানও বড় কম যান না।

প্রতিবেশিনীর বাড়ীর কাছে আসিয়া মুরারির বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিল। এ কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ এবং দেওয়ালের গায়ে—"এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে" লেখা রহিয়াছে। মুরারি কাছাকাছি অনেকের কাছেই জিজ্ঞাসা করিল, কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। ভদ্রগৃহের বন্ধু-মহলে চাকর বাকরের কাছেও কোন কথা জানিতে পারা গেল না।

এ ঘটনায় মুরারি দুঃখিত অথবা খুসী হইল, ঠিক বলা যায় না। কল্পনা যতক্ষণ কল্পনাই থাকে, ততক্ষণই সে সুন্দর, কিন্তু কল্পনা যখন বাস্তব হইয়া আসে, তখন তাহার মোহ কাটিয়া সত্যের রুদ্র-মূর্ত্তি সমস্ত শোভনীয়তা লুপ্ত করিয়া দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। সতীনাথের বিরুদ্ধাচরণ যতক্ষণ কল্পনায় ছিল, ততক্ষণ তাহার বিরুদ্ধাচরণের পথে কোন গোলযোগ ঘটায় নাই। রুদ্রকান্ত ও সতীনাথের সংঘর্ষ মুরারির পক্ষে যতই লাভজনক হউক, সে বিপ্লবের অংশ গ্রহণে তাহাকেও ত বঞ্চিত থাকিতে হইবে না! যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হইলে গোলাগুলির আঘাত লাগা কিছুই বিচিত্র নয়। রামেই মারুক আর রাবণেই মারুক, হতভাগা মারীচের মত তাহার অবস্থাও যেন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতের রঙ্গীন ছবি যতই মনোহারিতায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটুক, বর্ত্তমান তাহাকে যেন ক্রমশঃই পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। কুরুক্ষেত্রের জ্ঞাতিযুদ্ধে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে তবে না রাজ্যভোগ?

সতীনাথের ফিরিবার বার্ত্তা বহিয়া যেদিন রুদ্রকান্তের কাছে চিঠি আসিয়া তাঁহাকে হর্ষোৎফুল্ল করিয়া তুলিল, সেদিন মুরারির এতদিনের সঞ্চিত আনন্দের

দীপ যেন অকস্মাৎ বর্ষার দমকা বাতাসে এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়াই সতীনাথের মনোক্ষোভের কল্পনায় সে যে আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, সে কল্পনাও এখন তাহাকে খুব বেশী খুসী করিতে পারিল না। আসলে,—মুরারির চিত্তের কোন দৃঢ়তা ছিল না। সে যেমন অল্পেই উত্তেজিত হইয়া উঠে, অল্পেই আশা পায়, তেমনি অতি সামান্য কারণেই আবার ভরসা হারাইয়া বসে। ঝড়ঝাপ্‌টা এড়াইয়া সুখী লক্কা পায়রার মত ঘুরিয়া বেড়ানই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। নিজের সাজসজ্জা আমোদ-প্রমোদ লইয়াই তার দিন কাটিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের নীতি এতদিন তাহার আদর্শ থাকায়, পরীক্ষাগারের দ্বারে তাহাকে পদপ্রবেশ করাইতে হয় নাই। সারা বৎসর গাড়ী চড়িয়া স্কুল করিয়া সেই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে চিরদিনই সে সরিয়া পড়িয়াছে।

আজও সে সনাতন নীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা গেল না। তারাসুন্দরীর অতর্কিত অন্তর্ধানে সে মনে মনে খুসীই হইল। যাক্, উপস্থিত বিপ্লবের দায় এড়াইল। তার পর সতীদা' তাহাদের খোঁজ করিয়া বাহির করিতে পারে, তখনকার আত্মরক্ষার উপায় তখন মিলিবে। সতীনাথের বিবাহ-সংবাদ রটনার কৈফিয়ৎ যদি তাহাকে দিতেই হয়, সে সব দোষ জ্যেঠামহাশয়ের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে। তিনি অবশ্যই অস্বীকার করিতে যাইবেন না, সতীনাথও সে সম্বন্ধে তাহার কাছে কৈফিয়ৎ লইতে পারিবে না। এখন ত সে খুঁজিয়া বাহির করুক— প্রয়োজন হয় মুরারিও না হয় তাহার সাহায্য করিবে। ইহাতে এক ঢিলেই দুই পাখীই মরিবে। সতীও হাতে আসিবে, জ্যেঠামহাশয়ও হাতে থাকিবেন।

উপস্থিত ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। তাই বুদ্ধিমান মুরারি বাহাদুরী লইবার জন্য বিষয়টা রুদ্রকান্তের গোচর করিতে বিলম্ব করিল না। রুদ্রকান্ত শুনিয়া খুসীর চেয়ে বিস্মিতই বেশী হইলেন। এত সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে, তিনি আশাও করেন নাই। শত্রু এত দুর্ব্বল জানিলে তিনি হয়ত নিজের হাতে অস্ত্রধারণও করিতেন না। বহুদিনের পর গৃহে প্রত্যাগত পুত্রের সহিত আশু মনোমালিন্য ঘটিবার প্রবল অন্তরায় নিজে হইতেই সরিয়া যাওয়ায় খুসীই হইলেন। মুরারি এই সুযোগে একটি ম্যাকেবের ঘড়ি ও নতন প্যাটার্ণের চেন কিনিয়া আনিলে, মূল্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই চেক সহি করিয়া দিলেন। এবং সারাদিন দাবার বড়ে টিপিয়া টিপিয়া মুরারির প্রাণান্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম ঘটিলেও তাঁহাকে এতটুকু ক্লান্ত হইতে দেখা গেল না।

বাড়ী ফিরিয়া অপ্রকৃতিস্থ সতীনাথ যখন বিপিনের দ্বারা অসুস্থতার সংবাদে

কাহাকেও বিশ্রামে বাধা জন্মাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচাব করিয়া দিয়া শয়ন কক্ষে বিছানাব ভিতব আশ্রয় লইল, তখন অপ্রয়োজন বোধে মুবাবিব মনে কোন দুর্ভাবনাই জাগে নাই। মনে কবিল, প্রিয়বজ্জিত বাড়ীখানাব অবস্থা দেখিয়াই সে বুঝিয়াছে, পাখী শিকল কাটিযাছে। থাক, দুই দণ্ড কাঁদিযা লউক।

কিন্তু সাবাদিনের মধ্যেও যখন তাহাকে খোঁজ পড়িল না, তাহাব। "কোথা গেল,' "কেন গেল" জিজ্ঞাসাব পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইল না, তখন বিস্ময়েব সহিত মুবাবিব চিন্তাও হইল। ব্যাপাব কি? একটা খবব পর্য্যন্ত না? এতটা বৈবাগ্য ত সম্ভব নয। একবাব মনে হইল, তাবাসুন্দবী হয়ত পত্র দ্বাবা সকল কথা তাহাকে জানাইযাছেন। কিন্তু তাহাই বা কেমন কবিয়া হইবে? গতকল্যও যে সে সতীনাথেব পত্র পাইয়াছিল। সকল বিষযে সে যে অনভিজ্ঞ, পত্রেব ভাষায় তাহাই ত প্রমাণ হয। আব, তাবাসুন্দরা তাহাব ঠিকানা জানেন না, সতীদা' নিশ্চয়ই পত্র লেখে নাই। তবে?

জল অগ্রসব না হইলে তৃষ্ণার্তকেই অগ্রসব হইতে হয়, সতীনাথেব নিকট হইতে আহ্বান আসিবাব আশা ছাড়িয়া দিয়া মুবাবি নিজেই তাহাব কাছে গেল, গিয়া বিস্মিত হইল। সতীনাথকে শয্যাগত 'হা হুতোশ' কান্নাকাটি কবিতে দেখা ত গেলই না, ববং তাহাকে টেবিলেব উপবে সোজা হইযা বসিযা একখানা বদ্ধ লোফাফায় ডাকটিকিট আঁটিতে দেখা গেল।

বিস্ময়বিমূঢ় মুবাবি একখানা চেয়াব টানিযা কাছে আসিযা বসিয়া কহিল,—"অসুখ শুনে ভাবনা হল, ভাল আছ ত এখন?

সতীনাথ খামেব উপব ঠিকানা লিখিতে লিখিতে কহিল,—"চমৎকাব।'

মুবাবি একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবিয়া কণ্ঠস্বরে কাতবতা মাখাইয়া, সহানুভূতিব ভাবে কহিল,—"নিজেও ও ব্যবসায়ী না হই, তবু বুঝি সব সতীদা'। এত বড বিশ্বাসঘাতকতার কাজ, এ কি আব তাদেব মত মহাত্মা লোকেব উপযুক্ত হয়েচে।

কোন বিশেষ বিষয়েব আলোচনা কবিতে হইলে, বিষযের গুরুত্ব বক্ষাব জন্য মুরাবি সাধুভাষা ব্যবহাব কবিত। নহিলে বিষয় হাল্‌কা হইয়া যায় বলিয়াই তাহাব বিশ্বাস। সতীনাথ বিপিনকে ডাকিয়া চিঠিখানা ডাকে ফেলিয়া দিবাব আদেশ দিয়া, একখানা অনাবশ্যক বই খুলিযা কহিল,—"ও কথা ছেডে দাও মুরারি। যিনি যা ভাল বুঝবেন, তা না কব্‌তে পাব্‌বেন কেন? তিনি এখন রইলেন কোথায়? জামাইবাডী?"

প্রশ্নে মুবাবি আকাশ হইতে যেন মাটীতে পডিল। তবু বিস্ময়সূচক প্রশ্নটাকে

সে ওষ্ঠের বাহির করিতে দিল না। পুস্তক পৃষ্ঠায় বদ্ধদৃষ্টি সতীনাথের নত মুখের উপর বিস্ময়-বিস্তারিত দৃষ্টি স্থির করিয়া সে কহিল,—"খবর সব শুন্‌লে কোথায়? আমি ত ভয়ে তোমায় জানাতেই সাহস করি নি।"

সতীনাথ মুখ না তুলিয়াই তীব্রস্বরে কহিল,—"ঐটুকুই তোমার বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। ভয়টা কিসের? মনে করেছিলে, খবর পেলে বুক ফেটে মরে যাব?"

তারাসুন্দরীর আকস্মিক অন্তর্ধান সংবাদে, ঠিক অতটা না হউক, উপস্থিত অবস্থার মত সতীনাথকে সুস্থ দেখিবার আশা সত্যই মুরারির ছিল না। তাই বিনা প্রতিবাদে সে নিরুত্তর রহিল। তাহাকে অধিকক্ষণ কৌতূহল সহ্য না করাইয়া সতীনাথ আপনা হইতেই কহিল,—"এ ত আর রামা শ্যামার বিয়ে নয়, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিয়ে খবরের কাগজেই খবর দিয়েচে। ভালই হল। মনে একজনকে রেখে বাইরে অন্যের স্ত্রী হওয়া তার উচিত হয় না। আমিও সে কর্ম্মভোগের দায় থেকে বেঁচেছি—বলিয়া মৃদু হাসিয়া, জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হাসি যে হাসি নয়- রোদনেরই রূপান্তর, মুরারির চোখেও তাহা ধরা পড়িল।

হতভম্ব মুরারি বুঝিতে পারিল না, সে এখন কি বলিবে বা কি করিবে। কল্যাণী ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী? তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে? অসম্ভব! নিজের চোখে দেখিলেও যে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এত অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হয়? তারাসুন্দরীর সে দিনের সেই হতাশান্বিত মুখ তাহার মনে পড়িল। সে মুখ দেখিয়া স্বার্থপর মুরারিরও যে মায়া হইয়াছিল, মিথ্যা বলিতে অনুতাপ হইয়েছিল। তিনি যে সতীনাথকে কতখানি বিশ্বাসের সহিত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে মুখে যে স্পষ্ট করিয়া তাহার সংবাদ লেখা ছিল। তবে এত শীঘ্র এমন অসম্ভব সম্ভব হইল কিসে? সতীকে বিবাহিত জানিয়া, মেয়ের বিবাহের অন্য চেষ্টা করা অবশ্যই আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট পাত্র আসিয়া জুটিল কোথা হইতে? এ সংযোগ করিয়া দিল কে? অবশ্য সতীনাথকে ঈর্ষান্বিত করিয়া দুঃখ দিবার ইচ্ছায় সেও একবার এক নবনিযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটি-পদ-প্রাপ্তের সংবাদ দিয়াছিল। কিন্তু সে ত মিথ্যা। তাহার ত কোন ভিত্তিই নাই। তবে সংবাদ-পত্র এ মিথ্যা সংবাদ দিবে কেন? তিনিই বা এমন অতর্কিতভাবে অন্তর্হিত হইলেন কেন? তবে সত্যই কি ইহার ভিত্তি আছে? মুরারি মনকে বুঝাইয়া প্রবোধ দিল, ভবিতব্যতা ইহাকেই বলে। এই জন্যই হয় ত, সে উপলক্ষ হইয়া, ইহাদের মিলনপথে প্রতিবন্ধকতা ঘটাইতে চাহিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একবার সংসারের উপর গভীর বৈরাগ্যে সে গীতাপাঠ ও পূজার্চ্চনায় মন দিয়াছিল। কিন্তু

বৈরাগ্য স্থায়ী না হওয়ায় এখন সে সব ছাড়িয়া দিয়াছে। আজ গীতারই একটা বিস্মৃতপ্রায় পদ তাহার মনে পড়িয়া গেল—"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্।" স্বয়ং ভগবানই এই কথা বলিতেছেন। মানুষ কি নিজে কিছু করে?—তিনি যা করান তাই করা যায়।

সহসাগত ভগবদ্ বিশ্বাসে সে পুলকিত হইল। পিসীমাও বলেন, —"জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।" আজ এ কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া মন তাহার শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। নিজের অপরাধের ভার নির্বাক বিধাতাপুরুষের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার এমন সুন্দর সুযোগ আবিষ্কার করিয়া সে খুসী হইল। শুধু মুরারি কেন, জগতের এক-তৃতীয়াংশ লোকেই এমন সুযোগ লইতে পাইলে সহজে ছাড়ে না। 'আমার কর্ম্মফল' বলা অপেক্ষা 'ভগবানের লেখা' বলিতে আমরা অধিক তৃপ্তি পাইয়া থাকি। যেন আমার কোন দোষই ছিল না, ভগবান আড়ি করিয়া আমার উপর বাদ সাধিতেছেন—এমনি ভাবখানাই ইহার ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকায়, নিরুপায় স্থলে মনও সান্ত্বনা পায়।

রুদ্রকান্ত ও সতীনাথের মধ্যে বিবাদের আশু সম্ভাবনা না ঘটায় উপস্থিত বিপ্লবের দায় এড়াইয়া মুরারি খুসী হইল। বিলম্বেও সে বিপ্লবের সম্ভাবনা আর নাই জানিয়াও, সে এখন খুব বেশী দুঃখিত হইল না। কিছু না হোক, সতীনাথ ত দিন কতক 'হতাশের আক্ষেপ' গাহিয়া বেড়াক! সেও নিমিত্তের ভাগী হইল না, ভালই হইল। যেদিক দিয়াই হউক, সতীর ক্ষতি ত হইয়াছে, উপস্থিত ক্ষেত্রে এইটুকুই তাহার লাভ।

১৩

বিবাহ যাত্রা

রুদ্রকান্ত শুনিলেন, সতীনাথ বাড়ী ফিরিয়াছে। সারাদিন উৎকণ্ঠিত আগ্রহে তাহার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া থাকিয়াও যখন দেখিলেন, সতী নিজে হইতে কাছে আসিল না, তখন নিজেই তাহার সন্ধানে গেলেন। অসুখের খবরের সত্যতায় তাঁহার বিশ্বাস না থাকায়, ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন মনে হইল না।

শয্যাশায়িত বক্ষঃসংলগ্নহস্ত সতীনাথের চিত্ত ছাদের কড়িকাঠ গণনা বা অঙ্ক-শাস্ত্রের অপর কোনও দুরূহ মীমাংসায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল কি না বলা যায় না। রুদ্রকান্তের আগমনে তাহার গভীর চিন্তা ভঙ্গ করিতে পারিল না। রুদ্রকান্ত কাছে বসিয়া তাহার ললাটে স্নেহহস্ত স্পর্শ করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। প্রণাম করিতে গেলে জ্যেঠামহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন,—

"থাক্ বাবা।" ললাটের তাপ পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন রোগ শরীরের নয়, তখন একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"ঘুমোবার চেষ্টাই কর, ওতেই সেরে যাবে। কাকেও ডেকে দেব কি ?"

সতীনাথ তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—"দরকার নেই।"—সেই ম্লান হাসিটিতেই রুদ্রকান্ত তাঁহার অনেক অব্যক্ত-প্রশ্নের উত্তর পাইলেন।

স্নেহপাত্রকে অনেক সময় আমাদের বাধ্য হইয়াই তাহার ঈপ্সিত পথে চলিতে বাধা দিতে হয়, তাই বলিয়া তাহার ব্যর্থতার ব্যথা কি আমাদের বুকেও বাজে না ? কর্ত্তব্যের কঠিন বর্ত্মে চলিতে আঘাত অবশ্যম্ভাবী, তাই তাহার বেদনাদুঃখ সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই।

রুদ্রকান্ত চিন্তিত মুখে বাহিরে আসিয়া মুরারিকে দেখিয়া, অনুবর্ত্তী হইবার ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। মুরারি তাহার অনুসরণ করিল।

অন্য কক্ষে আসিয়া রুদ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে মাগী, মেয়ে নিয়ে গেল কোথায় ?"

'মাগী'-বিশেষ্যে বিশেষিতাকে চিনিতে মুরারির অবশ্যই বাধিল না। সে কহিল,- "খবর নিতে গিয়ে দেখ্‌লাম, বাড়ীতে তালা দেওয়া, কেউ কিছু বল্‌তে পার্লে না. বাড়ীওয়ালাও জানে না।"

"ওঃ" বলিয়া রুদ্রকান্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি যাও। ভাল কথা তোমার মাকে চিঠির জবাব দিয়েছ ?"

মুরারি, তাহার অনুমতি পায় নাই জানাইলে, তিনি কহিলেন,—"বটে! এত বাধ্য ? বেশ বেশ, খুসী হলাম। আচ্ছা লিখে দাও, হাজার টাকার একটি পয়সাও বেশী আমি দিতে পারব না। ওরে বাপ্‌রে, পাঁচ-হাজার টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব—আমায় বেচ্‌লেও তা আস্‌বে না। কেন রে বাবু, গরীবের মেয়ের অত কেন ? জন্ম গেল ঘর নিকিয়ে, এখন হাকিম জামাই এসে প্রণাম না কল্লে আর চল্‌চে না! কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ বড় ভয়ানক রোগ, বুঝ্‌লে ? লিখে দিও তোমার মাকে।"

মুরারি বিনীতভাবে মুখে "যে আজ্ঞে" বলিয়া সম্মতি জানাইয়া তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া আসিল। মনে মনে সে চটিয়া গেল। "ওঁকে বেচ্‌লেও পাঁচ হাজার হবে না"—একচোখো! সতীদা' যে কত হাজার জলে দিয়ে এল, তার বেলা বুক কর্‌কর্ কল্লো না ত ? এ যে আমার বোন্ কি না, তাই টাকা জলে পড়্‌বে!" ভগিনী-স্নেহে মুরারির এ যাবৎ আহার-নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটিলেও,

রুদ্রকান্তের একদেশ-দর্শিতায় তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল —"ছেলের মুখ শুক্‌নো দেখে মেজাজ গরম হয়ে গেছে। কে মুখ শুখোবার কাজ করাতে চেয়েছিল? তখন বলা হল—এ বিয়ে হ'তে পার্‌বে না, যেমন করে হোক বন্ধ কর্‌। এখন তাল পড়্‌ল আমার ওপর! ভগবান ত আছেন, তিনি ত আর একচোখো নন্‌। সতী বেম্মই বিয়ে করুক, আর খিষ্টানীই বিয়ে করুক, আমার কি দায় পড়ে গেছ্‌ল? চোরকে বলেন চুরী কর্‌তে, গৃহস্থকে বলেন সাবধান হ'তে! এখন হাতছাড়া হয়ে গেল কি না, তাই যত অপরাধ মুরারির!"

তারাসুন্দরীর প্রতি মনে মনে মুরারি কৃতজ্ঞ হইল। রুদ্রকান্ত হেন জনের যিনি দর্পচূর্ণ করিতে পারেন, তিনি বড় সামান্যা নারী নহেন। এ বেশ হইয়াছে —এক ঢিলে দুই পাখী মরিয়াছে। সতীনাথের দুঃখে মুরারির মনে যেটুকু সহানুভূতি আসিয়াছিল, রুদ্রকান্তের পক্ষপাতিতার বিষে সেটুকু জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল। কল্যাণীর বিবাহ সংবাদের অভ্যন্তরে কোন গোলযোগ আছে কি না জানিবার কৌতূহলটাকে সে তৎক্ষণাৎ বিসর্জ্জন দিল। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ আছে, এমন ভাবটুকুও সতীনাথের কাছে ব্যক্ত করিল না। নির্ব্বাক দর্শকের ন্যায় সকৌতুকে তাহার কার্য্য দেখিতে লাগিল।

পরদিন মঞ্জুভূষণ আসিয়া সতীনাথকে হুগলী লইয়া গেল। সতীনাথ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে মঞ্জুভূষণ মুরারিকে জানাইল, তাহারা পাত্রী দেখিবার জন্য যাইতেছে, পছন্দ হইলে একেবারে আশীর্ব্বাদ করিয়াই আসিবে। ২৬শে ছাড়া ত দিন নাই, মধ্যে চারিদিন বাকী।

গাড়ী হাঁকাইয়া দিলে সতীনাথ মুরারিকে ডাকিয়া বলিল, -"মেয়ে কুলীনেরই। জ্যেঠামহাশয়ের ভয়ের কারণ নেই।" শুনিয়া মুরারির বিস্ময় মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিল।

গাড়ী চলিয়া গেলে মুরারি ভাবিতে লাগিল—ছিঃ, সতীদা' এত হালকা! এই উহার ভালবাসা? দুইদিন সবুর সহিল না! পাছে অকাল আসিয়া বিলম্ব ঘটায়, তাই নিজেই কর্ত্তা হইয়া পাত্রী দেখিতে চলিল। ইহারই প্রেমের গভীরতার শ্রদ্ধায় তারাসুন্দরী প্রতারিত হইয়া কত আশা করিয়াছিলেন। আহাম্মক সে, সেও যে কত অসম্ভব সম্ভব করিতে চাহিয়াছিল। সতীনাথের চরিত্রের লঘুতার পরিচয় পাইয়া আজ তাহার স্বার্থের ক্ষতিও যেন তুচ্ছ হইয়া গেল।

১৪

নববধূ

আমাদের প্রবীণা গৃহিণীরা নববধূর মুখ দেখিবার পূর্ব্বে স্বর্ণধৌত জলে নিজের চোখ ধুইয়া, বধূর চোখ রোয়াইয়া, তবে তাহার মুখ দেখিয়া থাকেন। ওষ্ঠে মিষ্টান্ন ও কর্ণে মধু দিয়া তাহার দুরবস্থার একশেষ করিয়া তোলেন। প্রথাটা বর্ব্বরোচিত অসভ্যতা কি না, সে সম্বন্ধে বোধ হয় ভাবিবার কিছু আছে। আজকাল এ প্রথাটাকে কেবল প্রথা-হিসাবে অন্ধ আজ্ঞা প্রতিপালনের মত ব্যবহার করা হইলেও, ইহার প্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্য যে অসাধু ছিল না সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এই যে বধূকে সোনার দৃষ্টিতে দেখিবার, তাহার কথাগুলি মধুর মিষ্টান্নের মত মিষ্টরস শুনিবার জন্য ব্যাকুলতা,—কৃত্রিমতার অন্তর্নিবিষ্ট এই ভাবটুকু বড়ই মধুর।

ছেলে হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া বড় হইবে, অনেক বাধা বিপত্তি কাটাইয়া বিবাহ করিয়া বধূ ঘরে আনিবে, তবে বধূর মুখ দেখিতে পাইব। সুতরাং বধূ যে বড় অনায়াসলভ্য হেলার জিনিস—তাহা নহে। মনুষ্যজন্মে পুত্রবধূর মুখদর্শন কয়জনের ভাগ্যেই বা ঘটিয়া থাকে। পরের মেয়েটিকে ঘরে আনিলেই কর্ত্তব্য ফুরাইয়া গেল না, তাহাকে ঘরের জিনিষটি করিয়া লইতে হইলে, নিজেকেও বিলাইয়া দিতে হয়। ভালবাসার আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইবে কে? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত ভালবাসার শক্তিতে বশীভূত হয়। ভগবানের সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ মানবেই কি ইহার অলঙ্ঘ্য নিয়ম ব্যর্থ হইবে? 'ভালবাস কেমন' এর উত্তর—'ভালবাস যেমন।' ভালবাসা কেবল একতরফা হওয়ার উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য না হইলেও, তাহার সংখ্যা খুব অধিক নয়।

বধূ পরের মেয়ে, সে তোমার বাড়ী আসিয়াই কর্ত্তব্যবোধে যে একেবারে তোমায় ভালবাসিয়া আপন হইয়া যাইবে, এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট জীবন-পথে সোজা চলিতে পারিবে, এমন আশা করা সঙ্গত নয়। ইচ্ছা থাকিলেও, সে ইচ্ছার পূরণ হওয়া বড়ই কঠিন। কর্ত্তব্যের ভার তাহার মাথায় চাপাইয়া দাও ক্ষতি নাই, কিন্তু ভারবোধ করিতে দিও না। তবেই সে ক্লান্তিবোধ করিলেও মাথাঝাড়া দিয়া ভার ফেলিয়া দিবে না—অন্ততঃ ভারবহনে ক্লান্ত দেখিলে সাহায্য কর, একটুখানি স্নেহ মমতার সিঞ্চনে তাহার শ্রমক্লান্তি অপনোদন করিতে চাও, দেখিবে সে আপনা হইতেই ভার তুলিয়া লইবে। সেই-ই একদিন 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর' বলিতে পারিবে। মিষ্ট কথার যতটা ফল

পাওয়া যায়, রক্তনেত্রে কর্ত্তব্যপালনের উপদেশে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। তোমার মনে প্রচ্ছন্ন অভিমান সঞ্চিত থাকিলেও সে অজ্ঞ—জ্ঞানলাভ করিবে না। তাহাকে তোমার মনের কথা বুঝিতে দেওয়াই তাহার ও তোমার পক্ষে মঙ্গলকর। পরগাছাকে গায়ে জড়াইবার জন্য গাছের যে সহিষ্ণুতা আছে, পরের মেয়েকে আপন করিতে হইলে আমাদেরও বোধ করি সেইরূপ সহনশক্তির প্রয়োজন। নিমেষের দৃষ্টিতে মনের টান না হইলেও, মুখের মিষ্ট কথার খরচে কোন পরিশ্রম নাই। ভালবাসিব মনে রাখিলে, ক্রমে ভালবাসা পাইতে ও দিতে পারা সম্ভব। 'আমার দ্বারা হইল না' বলিয়া গোড়াতেই যদি হাল ছাড়িয়া দিই, তবে স্রোতের মুখে তরী বানচাল হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। যে ভাগ্যবতী বধূ জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে গুরুজনের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়, তাহার জীবনপথে বিধিদত্ত যতই ঝড়ঝঞ্ঝা আসুক, মানুষের দেওয়া দুঃখের হাত এড়াইয়া সে সুখ শান্তিতে কাটাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে দুর্ভাগিনীর ভাগ্যে সে সুযোগ না আসে, বিধাতা তাহার জন্য স্বহস্তে যতই সুখের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিউন, ভাগ্যগুণে তাহার দুঃখের অন্ত থাকে না।

উমার অদৃষ্টেও এই বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল। জীবনে এই প্রথম সে কলিকাতা দেখিল। হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। কি প্রকাণ্ড ষ্টেশন, কত লোকজন,—ষণ্ডেশ্বরতলার বৈশাখী বা ত্রিবেণীর উত্তরায়ণ সংক্রান্তির মেলাতেও বুঝি এমন ভীড় হয় না। মাঘমাসের ভিতর এইটাই ছিল শেষ লগ্ন, তাই এ তারিখে বিবাহ বড় কম ঘটে নাই। আরও অনেক জোড়া বরবধূ গাড়ী হইতে নামিল। কাহারও কাহারও সঙ্গে বাদ্যভাণ্ডও রহিয়াছে।

তকমা-আঁটা সুসজ্জিত সহিস কোচম্যান যুক্ত প্রকাণ্ড ফেটন গাড়ী আমাদের বরবধূর জন্য ষ্টেশনে প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাবার, অমর ও মঞ্জুর আদেশে সতীনাথ উমার সহিত তাহাতেই উঠিয়া বসিল। পথে দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড অট্টালিকা শ্রেণী, সুসজ্জিত বিপণি, ট্রামগাড়ী, মোটর গাড়ী অবগুণ্ঠনের মধ্যেও উমার বিস্মিত দৃষ্টি আত্মীয়বিরহ-বেদনা ভুলাইয়া ক্ষণেকের জন্য তাহাকে যেন মোহাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। এই কলিকাতা— বাঙ্গালার রাজধানী! ইহার এত শোভা? গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, পশ্চাতের দৃশ্যাবলী অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, তবু দ্রষ্টব্যের অভাব ঘটিতেছে না। সে যেন যাদুকরের যাদুমন্ত্রে অনবরত ইন্দ্রজাল দেখাইয়া চলিয়াছে। উমা কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা দেখিবে বুঝিতে পারিতেছিল না।

উদ্যানবেষ্টিত প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটীর ভিতরে গিয়া গাড়ী থামিলে উমার বিস্ময়

সহস্রগুণে বৰ্দ্ধিত হইল। এইখানেই তাহাকে নামিতে হইবে? এই তাহার স্বামিগৃহ? এই রাজপ্রাসাদের বধূ সে, মনে করিয়া নিজের ক্ষুদ্রতায় যেন সে লজ্জায় জড়ীভূত হইয়া পড়িল। তোরণদ্বারে পত্রপুষ্পের মালা ছিল না, রসনচৌকী মিলনরাগিণী বাজাইল না। শাঁক একটা বাজিল বটে, তাহাও অত্যন্ত মৃদুস্বরে। দাস দাসী রঙ্গীন কাপড় পরিয়া না আসুক, তবু তাহাদের উৎসাহের অভাব ছিল না, একমাত্র তাহারাই এ উৎসবের দর্শক।

একজন প্রাচীনা বিধবা এবং লাল কস্তা পেড়ে শাড়ী পরা একজন বর্ষীয়সী সধব উমাকে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইয়া লইলেন। পিসীমার আদেশে গাড়ীর নীচে রামদীন এক ঘড়া জল ঢালিয়া দিল। ভিতরের দালানে একটি ছোট মেয়ে দুইখানা ইট দিয়া চুল্লীতে এক ভাড় দুধ বসাইয়া, নারিকেল পাতার ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছিল। সে জ্বাল বাড়াইয়া দিলে দুধ উথলিয়া পড়িয়া গেল। আদেশপ্রাপ্তা উমা, স্বামিগৃহের সৌভাগ্য উথলিল স্বীকার করিলে, তাহাকে উঠানে আনা হইল। অসহিষ্ণু সতীনাথ গ্রন্থিবদ্ধ কৌশেয় চাদরখানা ফেলিয়া দিয়া উমার সঙ্গ ছাড়াইবে কি না চেষ্টায় বারকতক ইতস্ততঃ করিয়া, নীরবে উমার অগ্রে চলিয়া পিসীমা-নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইল। উঠান যোড়া আলিপনায় পদ্ম ভ্রমর রাজহংস প্রভৃতির চিত্রকলা, পুরোহিত নারাণঠাকুরের পত্নীর চিত্রবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। অনুষ্ঠেয় বরণাদি তাহারই দ্বারা সম্পন্ন হইয়া গেল, কড়ি খেলা প্রভৃতি বাদ দিয়া সতীনাথ ত্রিতলে জ্যেঠামহাশয়ের কাছে চলিল। উমাকেও তাহার অনুবর্ত্তিনী হইতে হইল।

কার্পেট-মোড়া অনেকগুলা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উমা একখানা প্রকাণ্ড কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার কতক ক্লান্তিতে কতক ভয়ে তাহার দেহ যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। এত বড় জাঁকজমকের মধ্যে সে তাহার জীবনে আর কখনও প্রবেশ করে নাই। এখানকার সমস্তটাই যে তাহার অপরিচিত। প্রশস্ত কক্ষে একখানা ভেলভেট-মণ্ডিত স্প্রিংএর গদিযুক্ত আরাম কেদারায় এক গৌরবর্ণ লোলচর্ম্ম কুঞ্চিতভ্রূ গুম্ফশ্মশ্রুহীন বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। উমা বুঝিল, ইনিই জ্যেঠামহাশয়, গৃহস্বামী।

সুবেশভূষিত উন্নতকায় সতীনাথের পার্শ্বে লজ্জাকুণ্ঠিতা স্বল্পাভরণা সাবগুণ্ঠনা ক্ষীণাঙ্গী বালিকাবধূটি রুদ্রকান্তের পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

রুদ্রকান্তের শরীর মন ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল, এমন বিড়ম্বনা, এত বড় অযোগ্য বিবাহ বুঝি জগতে আর কখনও কোথাও ঘটে নাই। সুসজ্জিত গৃহের দুই পার্শ্বে দুইখানা প্রকাণ্ড দর্পণের ভিতর দিয়াও এই অযোগ্য

মিলনের ছবি প্রকাশ পাইল। বরের চোখেও তাহা অদৃশ্য না থাকিয়া, তাহার মুখে তীব্র বিদ্রূপপূর্ণ মৃদু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। সে হাসি যেন বলিতেছিল, কুলগর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেমন বিবাহ করিয়া আসিয়াছি দেখ! সুন্দরী বিদুষী বধূ ঘরে আনিতে বড় যে ভয় পাইয়াছিলে, এখন খুসী হইয়াছ ত?

রুদ্রকান্ত সেদিক হইতে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলেন। বধূর দৃষ্টান্ত অনুকরণে সতীনাথও জ্যেঠামহাশয়ের পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। বিবাহের পর দেবতা পুরোহিত গুরুজন কাহারও কাছে মাথা নত না করিলেও, এই প্রথম সে জ্যেঠামহাশয়ের পায়ে মাথা নত করিল।

রুদ্রকান্ত দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। আজ আর সে স্নেহের স্পর্শে আলিঙ্গিতের রুদ্ধ অন্তর্জ্বালা নিবারিত হইল না। পুত্রের ম্লান গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া রুদ্রকান্তের মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল, বধূর পানে আর চাহিয়াও দেখিলেন না। মাটি চাপা যুঁই ফুলটির ভিতর কতটুকু সুগন্ধি, কতখানি শোভা লুকান রহিয়াছে, তাহার পরিচয় লওয়া প্রয়োজন বলিয়াও মনে হইল না। ফুলের মালাগাছি যখন জীবন-মূল্যে বিকাইয়াছে, তখন তাহাকে শুধু পরখ করিয়া ফেলিয়া না দিয়া, এতটুকু স্নেহধারা সিঞ্চনে মৃদু সুরভিটুকু গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় কি না, সে কথা ভাবিয়াও দেখিলেন না। মনে হইল,—"এ কি সতীর যোগ্য স্ত্রী? এ যে ওর পা মুছাইবার বাঁদীর যোগ্যও নয়।" কেবল মনে পড়িল না যে, এ অযোগ্যকে এ আসনে আনিয়া বসাইল কে। যে রুদ্রকান্ত, সতীনাথের শিক্ষিতা সুন্দরী পত্নী নির্ব্বাচনে ছেলে হারাইবার ভয়ে আতঙ্কিত হইয়াছিলেন, সেই তিনিই আজ পুত্রের হতাশাঙ্কিত মুখ দেখিয়া নিজের কাছে নিজেই প্রতারিত হইলেন। হায় রে মানুষের স্নেহান্ধ দুর্ব্বল মন, পল্লীপ্রান্তে যে ক্ষুদ্র বনফুলটি আপনার স্নিগ্ধগন্ধে পথবাহীকে সচকিত করিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দিতেছিল, সহরের সুরম্য হর্ম্ম্যে বসিয়াও সতীনাথের কর্ণে যাহার সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সত্যই তাহার কোন মূল্য আছে কি না এ সন্দেহ মনে উঠিল না। ক্রোধে ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া মন কেবলই বলিতে লাগিল,—"ছি ছি, সতী এ করিল কি? কত রাজা, রায় বাহাদুরের প্রার্থিত পাত্র, রূপে গুণে বিদ্যায় চরিত্রে ধনীগৃহের দুর্ল্লভ রত্ন, কোথাকার কোন্ অজ্ঞাতনামা চালচুলা হীন টুলো পণ্ডিতের ঘরে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া আসিল! উচ্চ শিক্ষা, আদর্শ—এ সব অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া লোকের কাছে তাঁহার মুখ দেখাইবার পথ পর্য্যন্ত রাখিল না! বন্ধুমহলে পুত্রের এই হীনরুচির বিবাহের বার্ত্তা প্রকাশ করা ত পরের কথা, নিজের কাছে স্বীকার

করিতেও যে লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।—তাই ধূমধামের সমস্ত আশা কল্পনা বিসর্জ্জন দিয়া, বিনা আড়ম্বরে নিতান্ত দীনহীনের মত বিবাহের নিয়ম পর্ব্ব সম্পন্ন করা হইল। বাড়ীর বাহিরে একটা কাকপক্ষীও উৎসব গৃহের উচ্ছিষ্ট পাত্রের সন্ধান পাইল না। কুটুম্বের মধ্যে সকন্যা পুরোহিত গৃহিণী সধবার অধিকার ও নিয়ম পালনের জন্য কেবল দুইদিন থাকিয়া, কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। শোকার্ত্ত পিতৃগৃহ উৎসবের বেশে সাজিয়া উমাকে বিদায় দিয়াছিল। ধনী স্বামী-গৃহ আনন্দের অভিনন্দনে গৃহলক্ষ্মীর গৌরব জানাইয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইল না। বালিকা উমা কিন্তু ততটা বুঝিতে পারিল না। গৃহের আটপৌরে সাধারণ সজ্জাই তাহার চক্ষে উৎসব সজ্জা বলিয়া মনে হইল।

কুশণ্ডিকা, পাকস্পর্শ প্রভৃতি যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গেল। কি ভাবিয়া সতীনাথ ইহাতে বাধা জন্মাইল না। রুদ্রকান্তে বধূর জন্য কোন আদেশ না জানাইলেও, অমর ও পিসীমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মুরারি দুই একখানা মূল্যবান্ অলঙ্কার সতীনাথের অর্থে সংগ্রহ করিয়া আনিল। ফুলশয্যার রাত্রিটাও পত্নীর সহিত একগৃহে ভিন্ন শয্যায় কোন মতে কাটাইয়া, সতীনাথ বিবাহবন্ধন স্বীকার করিয়া লইল। তার পর সম্পূর্ণরূপে পত্নীর সহিত নিজেকে সংস্রবহীন করিয়া লইয়া বাহিরের মহল আশ্রয় করিল।

পিসীমা বকাবকি করিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। রুদ্রকান্ত শুনিয়া খুসী হইলেন। ছেলে যে বউএর গোলামীতে ইহারই মধ্যে নাম লিখাইল না—এ ত ভালই; বিশেষতঃ অমন বউয়ের! উহাকে ভালবাসা কি সতীর কর্ম্ম? বিবাহ যে করিয়াছে, এই না উহার চতুর্দ্দশ পুরুষের ভাগ্য!

১৫

উমার সুখদুঃখ

অল্পদিনের মধ্যেই উমা বুঝিল, এখানে চলিবার জন্য নিজের হাতে পাথর ভাঙ্গিয়া তাহাকে পথ গড়িয়া লইতে হইবে। এই যে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত, দাসদাসী-পূর্ণ সুসজ্জিত প্রাসাদতুল্য ত্রিতল বাড়ীখানা, ইহার ভিতর প্রাণের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। এখানকার পৃথিবী সীমাবদ্ধ, কথা কহিয়া প্রিয়বিরহব্যাকুল চিত্তকে শান্ত করিবার একজন সঙ্গীমাত্র নাই। তাহার মনে হয়, বদ্ধ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করিবার জন্যও বুঝি যথেষ্ট স্থানাভাব। হাসিবার প্রয়োজন হয় না, চলাফেরা করিবার প্রয়োজনও সংক্ষিপ্ত। স্বামী তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিলেন না। সম্বন্ধের অধিকারে যাঁহার সহিত রাখাইলেন, তাঁহার প্রকৃতির পরিচয়ে উমা স্তম্ভিত

হইয়া গেল। রুদ্রকান্তের কোপন স্বভাব বয়সের সহিত ক্রমেই বাড়িতেছিল। বেতনভুক্ চাকর বাকর কর্ম্মচারীরাও বিনা প্রতিবাদে সর্ব্বদা সে স্বভাবের পরিচয় সহ্য করিতে নারাজ। কেহ ছাড়িয়া যায়, কেহ যাইবার ভয় দেখায়। মুরারি আজকাল আর কাছে ঘেঁসিতে চায় না, সুধীরও অনেকটা তাই। উমাই কেবল সর্ব্বংসহা হইয়া বিনা আপত্তিতে মাথা নত করিয়া সকল লাঞ্ছনা সহিয়া লয়। স্বামিপরিত্যক্তা অনাদৃতা গরীবের মেয়ে—কিসের অধিকারে সে আপত্তি করিবে? তাই উমার সঙ্গ, প্রয়োজন বোধেই, রুদ্রকান্ত পূর্ণ অধিকারে গ্রহণ করিলেন। আকস্মিক নিষ্ফলতার তীব্রবেদনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্রুদ্ধ সতীনাথ যে দিল্লীর লাড্ডু ক্রয় করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে পরীক্ষা না করিয়াই ঘৃণায় সে সরিয়া দাঁড়াইল। সতীনাথের মানসিক ক্ষোভের কারণ নিজেকে মনে করিয়া, রুদ্রকান্তের আক্রোশ জন্মিল উমার উপর। তিনি না হয় তারাসুন্দরীকে বিবাহভঙ্গের নোটিশ দিয়াছিলেন,—উপস্থিত ইচ্ছা না থাকিলেও, শেষ নিষ্পত্তিও ত করিয়া ফেলেন নাই। বাতাসের গতি দেখিয়া, যেমন বুঝিতেন, ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করিয়া তরী তীরে আনিবার বা বাহিবার হুকুম দেওয়া তাহার হাতের মধ্যেই ত ছিল। কোথা হইতে প্রবল বাধা উমা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া তাঁহার সোনার ছেলের সারা জীবনটা অসুখ ও অশান্তির আলয় করিয়া তুলিল! অপরাধ তাহার নয় ত কাহার?—তাই উমার স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইয়া নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়া, রুদ্রকান্ত নিশ্চিন্ত চিত্তে তাহার ছল ত্রুটি খুঁজিতে লাগিলেন।

তিনি যে কর্ত্তব্যবোধে তারাসুন্দরীকে কন্যার দ্বিতীয় পাত্র অন্বেষণে মনোযোগী হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন, সে কথা সতীনাথকে খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া সতীনাথ চুপ করিয়া রহিল।

সতীনাথ ভাবিতে লাগিল,—কল্যাণীদের কথা। ঝড়-ঝাপ্‌টা যে নিশ্চয়ই উঠিবে, উঠাই যে সম্ভব ও সঙ্গত, সে কথা ত সে তাঁহাদের অজ্ঞাত রাখে নাই। সে যে কল্যাণীর জন্য এই রাজৈশ্বর্য্য প্রয়োজন হইলে অক্ষুব্ধচিত্তে তৃণমুষ্টির মত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, এ কথা ত স্পষ্টাক্ষরেই তাঁহাদিগকে বলিয়াছিল। তাহাকে জানাইবার, তাহার সম্মতি বা অসম্মতি শুনিবার এতটুকু বিলম্বও কি তাঁহাদের সহিল না? বিশ্বাসের কি কোনই মূল্য নাই?

কিন্তু আবার সে ভাবে—তাঁহারা প্রার্থিত নির্ম্মলচন্দ্রের পথ চাহিয়া তাহাকে বোধ হয় কেবল 'হাতে রাখিয়াছিলেন।' নির্ম্মলচন্দ্র তাহার নবার্জ্জিত যশোরশ্মিতে উজ্জ্বল হইয়া, সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া 'অক্ষত' মনে ফিরিয়া আসিয়াছে, তবে আর প্রার্থিত হস্ত তাহাকে বঞ্চিত করিবে কেন? তাই, এই

একটা ছুতার সুযোগ পাইয়া তাঁহারা অনায়াসে সরিয়া পড়িলেন। মুখের কথাও একটা জানাইয়া গেলেন না। নিদ্রিতের বক্ষে এমন করিয়া ছোরা বসাইতে, কশাইয়েরও বুঝি হাত কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহাদের সেটুকুও হইল না। সেই অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের মত স্নিগ্ধজ্যোতিঃশালিনী সারল্যের প্রতিমা, তাহার ভিতরেও এত কপটতা। ভগবান্ জগতে নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন কেন? এই নারী? ঋষিরা যাঁহাদের দেবী আখ্যা দিয়াছেন, যাঁহাদের শীতল ছায়ায় বসিয়া সংসারতাপদগ্ধ জীব শান্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই নারী এমন সর্পিণীর জাতি? ইহাদের চক্ষু, মনের দর্পণ নয়—মুখ, বিশ্বাসের আশ্রয় নয়; জিহ্বা, সত্য উচ্চারণেও অশক্ত। ইহারা জগতের ধ্বংসরূপিণী মহাশক্তির অবতার। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই।

তবু—সতীনাথের মনের সুদৃঢ় ভিত্তিমূল টলাইয়া একটা ক্ষুদ্র "তবু" যেন মাথা ঠেলা দিয়া উঠিতে চায়, মনে হয়, তবু বুঝি কোথায় কি গোল রহিয়া গেল। কল্যাণী—সেই কল্যাণী! সে কেমন করিয়া এমন কাজ করিতে পারিল! কল্যাণী অবশ্যই বাচনিক কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবার শপথ করে নাই, তবু সেই যে বিশ্বাসদীপ্ত জ্ঞানজ্যোতিঃ-মণ্ডিত যুগল নক্ষত্রের মতই চক্ষু দুইটি, তাহারা যে ভাষাতীত অনেক সংবাদই দিয়াছিল। সেও যে ভালবাসে, সেও যে এ বিবাহ সংবাদে অসুখী নয়, এ সত্য যে তাহারই চোখে মুখে সলজ্জ হাসিতে, প্রত্যেক গতিভঙ্গিতে সে প্রকাশ করিয়াছে,—আশা দিয়াছে, নৈরাশ্যকে মাথা তুলিতে দেয় নাই। তবে এমন অঘটন ঘটিল কিসে? সুধু পদ-গৌরবের প্রলোভন,—সে কি এত বড়, যাহার কাছে আত্মা ধর্ম্ম সত্য বিশ্বাস—জগতের যাবতীয় মহৎ মনোবৃত্তি বিক্রীত হইয়া যায়? এতই যদি দুর্জ্জয় সে প্রলোভন, সে কথা এতদিন সে জানিতে দেয় নাই কেন? সমুদ্রপারের অমূল্যনিধির অন্বেষণে সেও ত একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া আসিতে পারিত! হায় নারী, শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা, শুধু পদ-মর্য্যাদাই চিনিয়াছিলে?

মাঝে মাঝে সতীনাথের ইচ্ছা হইত, একবার নির্ম্মলচন্দ্রের ঠিকানা জানিয়া তাহাকে গিয়া দেখিয়া আসে। কেমন সে ভাগ্যবান্ পুরুষ, যাহার আবেদন অলঙ্ঘনীয়—অনতিক্রম্য? খবর লওয়া এমন কিছু কঠিন নয়, চেষ্টা করিলে সিভিল লিষ্ট হইতে পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আর প্রয়োজন কি? সে যে নিজের চোখে কল্যাণীকে দেখিয়া আসিয়াছে। নিজের অপরাধের ভারে সে যে ভারাক্রান্ত নয়, সে কথা ত স্পষ্টই বুঝা যায়। সেদিনের সেই নিমেষের দৃষ্টিতেই ত সারাজীবনের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। দণ্ডদাতা নিজে দাঁড়াইয়া

দণ্ডিতের ফাঁসী দেখিয়া লইয়াছেন। তবে আর কিসের অনুসন্ধান?—সতীনাথের অধরে একটু মৃদু হাসি দেখা দিল। মনে হইল, তাহার পন্থা অনুসরণে সেও ত অবহেলা করে নাই। মুখের হাসিটুকু, চিন্তার সঙ্গেই মিলাইয়া গেল। সকল সমস্যার মীমাংসা সহজ, কেবল এই বিবাহরূপ সমুদ্রমন্থনের স্ত্রীরূপী কালকূটটুকু, নীলকণ্ঠের মত পান করাই যে বিষম সমস্যা! সে ত মৃত্যুঞ্জয় নহে যে, কণ্ঠে ধারণ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা উপলব্ধ হইবে না। ইহাকে এখন ফেলিবে কোথায়? মনকে ভুলাইবার জন্য যুক্তি খুঁজিলে যুক্তিরও অভাব হয় না। 'গরীবের মেয়ে—বড় ঘরের বউ হয়েছে, ঠাকুর্দ্দার পয়সা খরচ হল না, ঢের করা গ্যাছে। থাক্ দাক্, সুখে থাক্, সতীনাথের কাছে স্নেহ ভালবাসার দাবী আবার কিসের? যে স্বামী তার মুখ দেখ্‌তে নারাজ, তার কাছে কি জোর করে দাবী করা কারও সাজে? সেও অবশ্য এমন হৃদয়হীন স্বামীর সঙ্গ ছেড়ে থাক্‌তে পাওয়ায় খুসীই আছে'— মনকে বুঝাইবার যুক্তিতর্কের অভাব ছিল না, তবু সমস্যা, অবুঝকে বুঝানর মত দুরূহ হইয়া উঠিতে থাকিল।

স্বামী ও শ্বশুরের মনে এমনই স্নেহ জাগাইয়া রাখিয়াও উমার দিন কাটিতেছিল। অবিমিশ্র সুখ বা একটানা দুঃখ বিধাতা কাহারও ভাগ্যে ঘটান না। উমারও দুঃখের জীবনে সহস্র অসুখ অশান্তির মধ্যেও একটুখানি জুড়াইবার আশ্রয় মিলিয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহের স্পর্শে তাহার নিরানন্দ একঘেয়ে অন্ধকার অপরিসর জীবনপথে তরুণ-রবির কনকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া, অন্ধকারের গাঢ়ত্ব হ্রাস করিয়াছিল। সে শান্তিসুখের আধারটুকু সতীনাথের ছোট ভাই সুধীর। আজন্ম ক্ষীণদেহ দুর্ব্বল বালকটি, উমার চেয়ে বয়সে খুব ছোট না হইলেও বুদ্ধি বিবেচনায় অনেকখানি খাটো। শরীরের ক্ষীণতা, ভারচাপা গাছের মত উপরের দিকে তাহাকে মাথা তুলিতে না দিয়া, একটি অকুণ্ঠিত করুণ কোমল শ্রীতে তাহার মুখখানি ভরাইয়া রাখিয়াছিল। চেহারাটিও অত্যন্ত ছেলেমানুষের মত, স্বভাবটুকুও তাই। প্রথম দর্শনেই শৈশবে মাতৃহীন স্নেহ-বুভুক্ষু চিত্তটি সমবয়সী বউদিদির উপর এমন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইল যে, দুইজনেই বিস্মিত হইল। আনন্দও পাইল। স্নেহাকাঙ্ক্ষী রুগ্ন দেবরটিকে ভগিনীস্নেহে কাছে টানিতে উমার একটুও বাধিল না। বরং অন্ধকারের অতল সমুদ্রে তলাইয়া, অবলম্বনের তৃণগুচ্ছটিকে পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

আত্মীয়ের মধ্যে সতীনাথের পিসীমা আছেন। তিনি তাঁহার সংসার লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তা'ছাড়া ছেলের মনের বাতাস যে কোন্ পথে বহিতেছিল, তাহার খবরও তিনি বড় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি নিতান্ত সাদাসিধা মানুষ।

সংসারের চিরপরিচিত চিরপ্রবর্তিত নীতিশাস্ত্রের যে আবার উল্লঙ্ঘন চলিতে পারে, সে জ্ঞান তাঁহার ছিল না। বিবাহ করিল, এখন তাহার কর্ত্তব্য সে নিশ্চয়ই পালন করিবে, এই তিনি জানেন। দেখিয়া শুনিয়া ভালঘরের মেয়ে আনিল, বধূও শান্তশিষ্ট বিনীত, ইহাকে লইয়া ঘর করনা করায় কোনখানে কোন বাধা ঘটিতে পারে, এ ধারণাই তাঁহার ছিল না। তাই অবসর মত টানিয়া টুনিয়া চুল বাঁধিয়া, স্নানের সময় প্রচুর তৈল লেপনে চুলের যত্ন লইয়া, কাছে বসিয়া অনিচ্ছুককে জোর জবরদস্তিতে খাওয়াইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হইতে তিনি মুক্ত হন। সতী তাহাকে কি চোখে দেখে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও মনে উঠে না। এমন অকারণ কৌতূহল কেনই বা জাগিবে? তাই উমা ও সুধীরের মধ্যে বিনা বাধায় সখ্য জন্মিয়া দুইখানি স্নেহাকাঙ্ক্ষী চিত্তকে প্রগাঢ়ভাবে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলিবার পথে কোন বাধা পাইল না।

বউদিদির সহিত দাদার ব্যবহার—সুধীরের মত সংসারজ্ঞানহীন বালকের চক্ষেও কেমন বিসদৃশ ঠেকিত। দাদা যে বউদির প্রতি প্রসন্ন নহেন এবং বউদিও যে তাঁহার সংস্রব এড়াইয়া চলেন, এটুকু বুঝিয়া পর্য্যন্ত, সে তাঁহাদের পরস্পরের আলোচনা হইতে বিরত থাকিত। তাঁহাদের এই বন্ধনহীন দূরত্বভাব তাহাকেও ব্যথিত করিত। দাদার বিবাহের পূর্ব্বে, ভবিষ্য-জীবনেব যে সুখের ছবিখানা আঁকিয়া তিন জনের একত্র সঙ্গসুখের কল্পনায় মনকে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেখানাকেও আবার মুছিয়া নূতন করিয়া আঁকিতে হইল। তা হউক, ইহাতে খুব বেশী ক্ষতি হয় নাই। দাদা বউদির সহিত নাই মিশুন, তাহাকে যে কেহ মিশিতে বাধা দেয় না ইহাতেই সে খুসী। বউদির নিকট হইতে দাদার বিরুদ্ধে যখন কোন অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় না, তখন তাহারই বা ও চিন্তার বা আক্ষেপের প্রয়োজন কি?

বন্ধুত্ব গাঢ় হইয়া আসিলে সে যখন উমার অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইতে লাগিল, তখন একেবারেই বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে হইল, সতীদা' সেদিন অমরের সাক্ষাতে উমাকে সে সব মিথ্যা অপবাদ দিতেছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে অমোঘ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা একেবারে সে তাঁহার মতটাকে যদি খণ্ডিত করিয়া দিতে পারিত! কিন্তু উমার সহিত এইখানেই যে তাহার বিরোধ। উমার-স্বোপার্জ্জিত-সম্পত্তি বা তদ্বিষয়ক কোন আলোচনা না করিবার জন্ত সে তাহার কাছে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাজেই মনের ইচ্ছা মনেই রাখিয়া চুপ করিয়া দাদার নির্ম্মম মন্তব্যগুলি তাহাকে হজম করিতে হয়। অমরবাবু অবশ্য দাদার কথা বিশ্বাস করেন না, তিনি বলিয়াছিলেন,—"কক্ষণো নয়, বউদি নিশ্চয় লেখাপড়া

জানেন।" দাদা বলিলেন,—"পণ্ডিতের বাড়ীর মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌লে বিধবা হয়, তাই পণ্ডিতেরা তাঁদের মেয়েদের কেবল ঘর নিকুতে, বাসন মাজতে আর রান্না করতে শেখান্।" সুধীরের ইচ্ছা করিত সে চীৎকার করিয়া বলে, কখনই তা নয়, বউদির মত লেখাপড়া সেও জানে না। কিন্তু বলিবে কি করিয়া, বউদি যে আড়ি করিবার ভয় দেখাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তবু সে চুপি চুপি এক সময় অমরনাথকে জানাইয়াছে,—"দাদার কথা শুন্‌বেন না, দাদা কিছু জানেন না।" অমরনাথও হাসিয়া সে কথায় সায় দিয়াছিল, এইটুকুই তাহার সান্ত্বনা।

সুধীর উমার কাছে আসিয়া রাগ করিত, কেন সে দাদার কাছে তাঁহার কথা বলিতে পাইবে না। এ ভারী অন্যায়, দাদা খালি নিন্দা করেন, এইবার সে বলিবে।—উমা সলজ্জ অনুযোগের দৃষ্টিতে বলে,—"লক্ষীটি ঠাকুরপো, আমার কথা কিছু বোলো না ভাই। বল যদি, জান্‌ব তুমি আমায় একটুও ভালবাস না।" উমা বুঝিয়াছিল, সুধীরকে বাধ্য করিবার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্ত্র। সে ভালবাসে না, এতবড় অন্যায় অপবাদ কেমন করিয়া সে স্বীকার করিয়া লইবে, কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তবু এই একমাত্র স্নেহতরুর ছায়াটুকু, তা যতই ক্ষুদ্র হউক, দীপ্তরৌদ্রে মাথা বাঁচাইবার এইটুকুই উমার পরম আশ্রয়, ইহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহার বৈচিত্র্যহীন একটানা জীবন বহিয়া যাইতেছিল।

সুধীর ছাড়া আরও এক যায়গায় সে সম্মান ও শ্রদ্ধা যথেষ্টই পাইয়াছিল। উমা বুঝিয়াছিল, মুরারিও তাহাকে স্নেহ করিতে চায়। কিন্তু মুরারির শ্রদ্ধা মনে মনে গ্রহণ করিলেও, প্রকাশ্যে সে তাহাকে উৎসাহ দিত না। স্বামি-পরিত্যক্তার পক্ষে দূরসম্পর্কীয় বয়োজ্যেষ্ঠ দেবরের কতটুকু স্নেহ মমতার অধিকার চলিতে পারে, সে তাহা জানে না। মুরারী সতীনাথের চেয়ে দুই চারিমাসের বয়ঃকনিষ্ঠ, এই সম্পর্কে সে দেবর। তাই উমা তাহাকে লজ্জা করিয়া অবগুণ্ঠন না দিলেও কথাবার্ত্তা কহিত না। আবশ্যক হইলে অপরের সাহায্যে কথা বলিত। মুরারি এ জন্য রাগ করিত, অভিমান করিত। কিন্তু উমা বুঝিয়াছিল, মুরারির সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করা জ্যেঠামহাশয়ের অভিপ্রেত নয়। উমা অনেক সময় রুদ্রকান্তের কাছে থেকে, তাই মুরারিও আজকাল তাহার মূল্যবান্ সময় বেশী বেশী জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গসুখে কাটাইতে সুরু করিয়াছে। সরলা উমা ইহার অর্থ না বুঝিলেও, ইহা রুদ্রকান্তের চোখ এড়াইল না। চতুরতায় রুদ্রকান্ত মুরারির চেয়ে হাজার গুণ বড়। মুরারিকে দেখিলেই আজকাল তাঁহার জমিদারীসংক্রান্ত পরামর্শ, চিঠিপত্র লেখান এবং দাবার

নেশা এমনি অসংযতরূপে বাড়িয়া উঠে যে উমাকে আব সেখানে প্রয়োজন হয় না। মুবাবিকে মুগ্ধ করিয়া উমা যে নিজেব পাছে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, একদিন কথাচ্ছলে রুদ্রকান্ত এমনি অস্পষ্ট ইঙ্গিত কবায় উমা ক্ষুব্ধ হইয়া মুরারিব সাক্ষাতে বাহিব হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিল। ভিতবেব ঘটনা জানা না থাকায়, মুবাবি উমাব অত্যধিক সাবধানতায বিবক্ত ও ব্যথিত হইল। মুরাবি পান ভালবাসে, অনেক সময় পানেব ছুতায় সে 'বৌঠান', 'বৌঠান' কবিযা, উমাব শয়ন ঘবে প্রবেশ না করিলেও, বাহিব হইতে হাঁকাহাঁকি লাগায়। তাই উমা পান সাজিযা পিসীমার জিম্মায় বাখিয়া আসিতে লাগিল। মুবারি একদিন পান চাহিলে সুধীব কহিল,—"পান কি এ ঘবে থাকে মুবাবিদা'—পিসীমাব কাছে যাও।"

মুবাবি বিস্মিত হইয়া বলিল—"থাকে না কেন, এই ঘবেই ত থাকৃত?" উমাব জবানি সুধীব কহিল,—"এসব কার্পেট মোড়া ঘব, নোংরা হবে, তাই বাখা হয় না।"

মুবাবি "বেশ' বলিয়া চলিযা গেল। যাইবাব সময় একবাব তীক্ষ্ণ কটাক্ষে ঘবেব অভ্যন্তবভাগে চাহিয়া গেল, নেপথ্যবর্ত্তিনীর মুখখানা দেখাও গেল না। সে মনে মনে বাগ কবিযা বলিল,— 'এত বোকা আমি তা বলে নই। এটুকু দিতেও তোমাব আপত্তি? তবু যদি দেনদাব না ইনসলভেণ্ট হোত।' সতীনাথ যে উমাকে চাহে না, একথা শুধু মুবাবি কেন বাড়ীব মশা মাছিটিও জানিযাছিল। কিন্তু সে যে একদিনেব জন্যও স্ত্রীব সহিত সুখেব আলাপ বাখে নাই, এতটা মুরাবি বিশ্বাস কবিত না। তাই পাছে তাহাব ব্যবহাবেব কোন ছুতা ধবিয়া উমা সতীব কাছে বলিযা দেয, এই ভযে সে উমাব সহিত সাবধানে কথা কহিত। নিজেব অবস্থা বিবেচনা কবিযাই উমা সাবধান হইযা চলিতে চেষ্টা কবিত, নতুবা, মুবাবিব সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ববং স্নেহাকাঙ্ক্ষী—আবদার বায়নার দাবী দাওয়া লইয়া মুবাবি যখন পিসীমার নিকট তাহাব নামে নালিশ আনিত, সে মনে মনে একটু তৃপ্তিই অনুভব কবিত। দূবসম্পর্কীয় হইয়াও সে যে আপনাব দাবী বাখে, এইটুকুই যে তাহাব নিকট যথেষ্ট। সেই সঙ্গে একটুখানি হাসিও আসিত,—যাঁহাকে লইয়া সম্পর্ক, কেবল তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা 'পব'।

একদিন খানকয়েক স্বর্ণাঙ্কিত বেশমী বাঁধাই উপন্যাসে অনেক চেষ্টায "বৌঠানকে উপহাব" লিখিয়া মুরাবি উমাকে বইগুলি দিতে গেল। উমা পিসীমার কাছে বইগুলি ফেরৎ দিয়া মৃদুস্বরে জানাইল, এ সব বই টই সে পড়ে না, সুতরাং লইবে না।

মুরারির আশাহত মুখেব পানে চাহিয়া পিসীমাব মায়া করিতেছিল। তিনি

মুরারির হইয়া ওকালতী করিলেন,—"তা বাছা যত্ন করে দিচ্ছে, নেবে না কেন?' না পড়, বাক্সয় তুলে রাখ্‌বে, ঘর সাজাবে?"

মুরারি আশ্বস্ত হইয়া কহিল,—"বলুন ত পিসীমা, কেনা যখন হয়ে গ্যাছে তখন ত আর ফেরৎ যাবে না। না পড়েন রেখে দেবেন। তবু দেখলে গরীব দেওরকে মনে পড়্‌বে।"

উমা মৃদুস্বরকে মুরারির শ্রুতিগোচর করিয়া পিসীমাকে কহিল,—"জ্যেঠামশাই রাগ করেন বই ছুঁলে—পিসীমা, ঠাকুরপোকে বল আমায় মাপ কর্‌বেন, আমি নেব না।"

উমা দ্বিতীয় অনুরোধের হাত এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগ করিলে ক্ষুণ্ণ মুরারি বইগুলি উঠাইয়া লইল। কিন্তু উমার কণ্ঠস্বরে সেই যে ঠাকুরপোকে মাপ করিতে বলিবার জন্য ক্ষুদ্র অনুরোধটুকু ধ্বনিত হইয়াছিল, সেদিনকার অর্থব্যয় ও মনঃক্লেশ নিবারণের এইটুকুই পরম পুরস্কার রূপে গ্রহণ করিয়া সে নীরবে সেখান হইতে চলিয়া গেল। পিসীমা অপ্রসন্ন মুখে ভাঁড়ারের মশলা বাহির কবিতে করিতে ভাবিলেন,—"বৌয়ের সব বাড়াবাড়ি। এত কেনরে বাপু! দেওর যত্ন করে দিচ্চে, দরকার থাক্ না থাক নে না কেন? জ্যেঠামশায়েব ভয়েই গেলেন! অত ভয় কিসের? কথাতেই ত আছে—'অতি বাড বেড না ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হয়োনা ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।' এত কেনরে বাবু! ঐ জন্যেই ত কেউ মানে না। অত মিন্‌মিনে হলে কি সাজে? ছোঁড়াও তাই গেরাজ্যি কবে না। অতি ছোট গাছ্‌ ছাগলেও যে মুড়িয়ে খায়। জোর করে নিজের দখল বুঝে নে। তা নয়, চোরের মত ভয়ে ভয়েই কাঁটা হয়ে আছেন! পাড়াগেঁয়ে মেয়ে এমন ভীতু ত কোথাও দেখিনি! কখনও মুখে একটা রা শুন্‌লাম না।"

১৬

ভুল ভাঙ্গিল

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ধরণীর বক্ষে ভাল করিয়া ছায়া বিস্তার করে নাই, সবে-মাত্র ঘরের কোণে জড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সুসজ্জিত গৃহ-ভিত্তিতল পুরু কার্পেটমোড়া। টেবিল চেয়ার ব্র্যাকেট আলমারী হোয়াট্‌নট্‌ এবং তাহার উপরও টুকিটাকি সৌখীন জিনিসে ঘরখানি সজ্জিত। নিম্নতলে এই গৃহেই সতীনাথ আজকাল অবস্থান করে। পাশের ঘরে তাহার শয্যা বিছানো রহিয়াছে। দুই খানা ঘরের ব্যবধান পথে সুচিত্রিত জাপানী পর্দ্দা। টেবিলের উপর রাশিকৃত দলিল দস্তাবেজ, কত অপঠিত খামে

মোড়া চিঠিপত্র জমা হইয়া পড়িয়া আছে। বৈদ্যুতিক আলোকে টেবিলের উপর ঈষৎ নত হইয়া সতীনাথ সেইগুলাই দেখিতেছিল। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কত আবেদন নিবেদন মোকদ্দমা মামলার সে সব দীর্ঘ দীর্ঘ ইতিহাস। প্রজাদের আবেদন নিবেদন ক্রন্দনের নালিশ কর্ম্মচারীদের দেখিবার অধিকার দেওয়া না থাকায়, এবং তাচ্ছিল্যে এতদিন খুলিয়া দেখা না হওয়ায় ক্ষতিও অনেক হইয়া গিয়াছে। উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে প্রশ্রয় দিয়া এমন ভাবে কাজে অবহেলা করা যে উচিত হয় নাই—এই ভাবের প্রেরণাতেই সে আজ অত্যন্ত চেষ্টার সহিত সেগুলার উপর মনোযোগ দিতে চাহিতেছিল। মন যে কর্ম্মের মধ্যে কোন্ সময় আপনা হইতেই আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে অনুভবও করিতে পারে নাই। কাজের লোকেরা কাজকে অবহেলা কবিতে চাহিলেও, কাজ আপনা হইতেই বল প্রয়োগে নিজেকে উদ্ধার করিয়া লইয়া থাকে।

সন্ধ্যা ডুবিয়া বাহিরে অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিল। আকাশে চাঁদ নাই, নক্ষত্রও দেখা যায় না। অনেকক্ষণের পর ঈষৎ ক্লান্তি অনুভূত হওয়ায়, আলস্য ত্যাগ করিয়া কেদারার পৃষ্ঠে হেলান দিতে গিয়াই সে দেখিল, নিকটে একখানা চেয়ার সরাইয়া লইয়া মুরারি সবেমাত্র বসিবার উপক্রম করিতেছে। কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাহার আগমন উপলব্ধি করিতে না পারার ত্রুটিটা ঈষৎ হাসির দ্বারা সংশোধন করিয়া সীতানাথ কহিল,—"মুরারি যে,—আজ তোমাদের দাবার ছক্ পড়্‌ল না বড় ?"

মুরারি অত্যন্ত ম্লানমুখে বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরে কহিল,—"আজ সমাজে গিছ্‌লাম কি না, এই ফিরছি।"

সতীনাথ বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। মুরারির মুখভাবে শোচনীয় বিষণ্ণতা লক্ষিত হইলেও, সে অভ্যস্ত বিদ্রূপের স্বর সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল, "সমাজের আজ হঠাৎ এমন কি সৌভাগ্য হল যে তোমার পা'ব ধূলো সেখানে পড়্‌ল ?"

মুরারি মুখের ভাব ঠিক রাখিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"গ্রহের ভোগ, মতিচ্ছন্ন ! এখন সেই অনুতাপই কচ্ছি, কেনই যে মর্‌তে গিছ্‌লাম !"

সতীনাথ তাহার মুখের উপর কৌতুকপূর্ণ হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল,—"অনুতাপেই পাপ ক্ষালন হয়, অনুতাপ কর, সমাজে যাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।"—বলিয়া সে পুনরায় আরব্ধ কার্য্যে মনোযোগ দিবার উপক্রম করিল।

মুরারি বুঝিল, আর অধিক গৌরচন্দ্রিকা করিতে গেলে শ্রোতার ধৈর্য্য রহিবে

না। স্বর নামাইয়া, যেন অন্যমনাভাবে কহিল,—"কি যে ঠাট্টা কর সতীদা,' সব সময় ভালও লাগে না। কি কেলেঙ্কারীটাই হল বল দেখি,—লোকের কাছে মুখ দেখাবারও পথ রহিল না।"

সতীনাথ বুঝিল, মুরারির বক্তব্যের গুরুতর বিষয় কিছু রহিয়াছে, এগুলা তাহারই ভণিতা। হাসি ছাড়িয়া সে গাম্ভীর্য্যের ভানে মুখখানাকে অত্যধিক ভারী করিয়া কহিল,—"তাই ত, ভাবিয়ে তুল্লে মুরারি! আমি বলি বুঝি এমনি কিছু সোজা কথা। তাহলে সমাজ তোমায় দীক্ষিত কবে নিয়েছে বল? তা, আগে ত এরকম সম্ভাবনার কথা কিছু বলনি?"

মুরারি মুখ ফিরাইয়া গাঢস্বরে কহিল,—"সে আর মন্দ কি ছিল বল? আছি বেল্লিক, ফাঁকতালে যদি ধার্ম্মিক হতে পার্‌তাম তাতে আব ক্ষতি কি ছিল? এমন ত নয় যে ধর্ম্ম বদ্‌লালেই কেউ বিষয় থেকে বঞ্চিত কর্ব্বে। বলে—'অন্ধ জাগোরে' না 'কিবা রাত্রি কিবা দিন'!"

সতীনাথ অসহিষ্ণুভাবে কতকগুলা ফিতাবাঁধা দলিলের তাডাব মধ্যে একটা তাড়া বাছিয়া লইয়া কহিল,—"তবে কি লাট গঙ্গামগুল বিকিয়ে গেল, সেটাই শুনি? উপক্রমণিকাতেই মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুল্লে যে! গ্রন্থপাঠের ধৈর্য্য রাখাই দায়।"

মুরারি মুখ না ফিরাইয়াই কহিল,—"কৃষ্ণনগবেব সিভিলিয়ান নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষালের নাম বোধ হয় তোমার মনে আছে?"

সতীনাথ উত্তর দিল না। নামটা যে তাহাব স্মরণাতীত হয় নাই, তাহাতে মুরারির সন্দেহ মাত্র না থাকায়, সে উত্তর না পাইয়াও কহিল,—"তাঁর শ্বশুব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হৃদয়মাধবকে দেখ্‌লাম যে সেখানে,—কল্যাণী দেবীব বাপ।"

সতীনাথ সবিস্ময়ে মুরারির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি বল্‌ছ তুমি! হৃদয়মাধব কে আবার?"

মুরারি গম্ভীরভাবে বলিল,—"কল্যাণীর বাপ হৃদযমাধববাবু।"

সতীনাথ উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"নন্‌সেন্স্।"

মুরারি বলিল—"নন্‌সেন্স্ নয়। খুবই সেন্সই বল্‌ছি। জগতে কল্যাণী নাম একাধিক ব্যক্তির থাকা আশ্চর্য্য নয়। আসলেই যে গোড়ায় গলদ্ করে বসেছ সতীদা'! ৺নবীনমাধব আর নির্ম্মলের শ্বশুর হৃদয়মাধব' সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। অবশ্য এঁর মেয়ের নামও কল্যাণী। খবরের কাগজে ছাপার ভুলে বিয়ের খবরে 'হৃদয়' স্থলে 'নবীন' হয়ে গিয়ে এতটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলেছে।"

সতীনাথ উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংশয়ে বিস্ময়ে পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া কহিল,—"পাগল! এমন ভুল কি কখনও হয়।" তাহার স্বরে

কিন্তু জোর ছিল না! যেন অর্থবোধহীন শেখাবুলির মতই নিস্তেজস্বরে কথাগুলা সে উচ্চারণ করিয়া গেল।

মুরারি অপাঙ্গদৃষ্টিপাতে তাহার মুখের ভাবখানা একবার দেখিয়া লইয়া কহিল,—"প্রমাণ না নিয়েই কি এসেছি মনে কর সতীদা'? যখন শুন্‌লাম এই হৃদয়মাধব, ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ম্মল ঘোষালের শ্বশুর, তখনই মনটা আমার ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। খবর নিয়ে জান্‌লাম, যা ভেবেছি তাই। ওঁর মেয়ের নামও কল্যাণী। এই যে দেখনা, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারেই খবব দিয়েছে"—বলিয়া টেবিলের উপর সে একখানা পুরাতন ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জাব সংবাদপত্র প্রসাবিত করিয়া দিল। সম্পাদক, 'হৃদয়মাধব' স্থলে ৺নবীনমাধব' নাম ভুলের সংশোধন করিয়া ক্রটি স্বীকাব কবিয়াছেন। ইহা প্রেস অথবা সংবাদদাতার ভুলে ঘটিয়াছিল। লাল পেন্‌সিলেব দাগ দিয়া মুরাবি স্থানটিকে চিহ্নিত করিযা বাখিযাছে, খুঁজিবার পরিশ্রমও লাগিল না।

সতীনাথ টেবিলের উপব ঝুঁকিয়া পডিযা সেই ছাপার অক্ষরগুলিব পানেই বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মঞ্জুভূষণের পরিত্যক্ত সেই তাবিখের সেই সংবাদ-পত্রের ক্রটি স্বীকাবই এ বটে। সম্পাদক ক্রটি স্বীকাব করিয়া অপরাধের ক্ষালন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ক্রটি কোথায় ক্ষালিত হইবে? প্রত্যেক অক্ষরটি যেন জীবন্ত হইযা নিষ্ঠুর বিদ্রূপেব হাসি হাসিতেছিল। ভাষা যেন চীৎকার করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিল।

সাপের দৃষ্টিতে পাখী যেমন করিয়া তাহারই পানে বদ্ধ হইযা চাহিয়া থাকে, নডিতেও পাবে না, সতীনাথও যেন তেমনি ভাবে চেষ্টা করিয়াও সেদিক হইতে মুখ ফিরাইতে পারিল না। তাহার মুখখানা মৃতেব মুখের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। চোখে সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। হাত পাযেব তলা অসাড হিম হইয়া কর্ণে শত শত অশ্রুত শব্দ শুনিতে লাগিল। অজ্ঞাতে তাহার বদ্ধ-ওষ্ঠ ভেদ করিয়া অস্ফুট কাতরোক্তি বাহিব হইয়া পড়িল।

আহতের সে মৃত্যু-যন্ত্রণা দাঁড়াইয়া দেখিতে সক্ষম না হওয়ায়, আঘাতকারী ইতঃপূর্ব্বেই নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। না গেলেও অপরের উপস্থিতির উপলব্ধিবোধও তখন আর আহতের ছিল না। কিছুক্ষণের জন্য সতীনাথ যেন চেতনা হারাইয়া সুখদুঃখ অনুভবের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিল। নিদারুণ হতাশার নিষ্পেষণে তাহার চিত্তবৃত্তি যেন অসাড় জড়পদার্থে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

ঘরের একটা বাজা-ঘড়িতে রাত্রির গভীরত্ব ঘোষণা করিয়া ১০টার ঘা বাজিয়া গেল, সেই শব্দে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। প্রথমেই মনে হইল, পরিশ্রান্ত

হওয়ায় সে বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে। স্বপ্ন—তবু কি আশ্চর্য্য সত্যের রূপ ধরিয়াই সে আসিয়াছিল! কিন্তু সে স্বপ্ন সুখের কি দুঃখের, শুভ বা অশুভ, এখন যেন তাহা আর বোধগম্য হয় না। সে চোখ মুছিয়া টেবিলের উপর হইতে মাথা তুলিতেই, লাল পেন্‌সিলের দাগ-টানা সংবাদপত্রখানা নির্ব্বাক চীৎকারে তাহার সত্যতা যেন বুঝাইয়া দিতে লাগিল। কালির অক্ষরগুলা বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল—"ওরে মূঢ়, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নিজের কাজ চাহিয়া দেখ্, কি করিয়াছিস্ বুঝিয়া নে।" অসহ্য যন্ত্রণায় তাহাব হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, দুই হাতে চুল ছিঁড়িয়া ছুটাছুটি করিয়া, ডাক ছাড়িয়া সে একবার কাঁদিয়া লয়।

তবু এ তিনটার একটাও সে করিল না। যেখানে বসিয়া ছিল, স্থাণুব মত নিশ্চলভাবে সেইখানেই সে বসিয়া রহিল। এবকম তীব্র দুঃখ স্থায়ী হইলে, দুঃখেই হয় ত মানুষ মরিয়া যাইত। সৃষ্টিকর্ত্তাব সৃজননীতি বিফল হইত, কারণ জগতে যে দুঃখের ভাগই বেশী, সুখের কাল সংক্ষিপ্ত। দুঃখে মৃত্যু ঘটিলে কর্ম্মফল-ভোক্তারূপে সংসাবের কার্য্য কবিবে কে? মানবেব দুঃখ যতই অফুবন্ত হউক, তাহার সহিষ্ণুতাও যে ততোধিক। জ্ঞানীজন শোকেব অবস্থাতেও মৃত্যুকামনা করেন না। অজ্ঞান শোকের তীব্র দাহ জুড়াইবার জন্য মৃত্যুকে কামনা করিয়া অনেক সময় আপাত শান্তিলাভের আশায় অনৈসর্গিক উপায়ে মৃত্যুকে আত্মসমর্পণ করিয়াও থাকে; এবং নিজের হাতেই কর্ম্মফল গঠন করিয়া তুলিয়া তাহাতে তীব্ররূপে জড়াইয়া তাহারই জন্মজন্মান্তবব্যাপী ফলভোগ কবে। তাই জগতেব সেই বিচারকৌশলী দেবতাটি মানুষের সহনশক্তিব পবিমাণ বাখিয়া, তাহাব শোকের তীব্রতা হ্রাস করিয়া থাকেন। ধিকি ধিকি অগ্নি যতই জ্বলুক, শীঘ্র ইন্ধনের অভাব ঘটিতে না পারায় নিবিয়া ত যাইতে পারে না।

সতীনাথেরও নৈবাশ্য, কৃতকার্য্যেব অনুশোচনা এবং অনভিপ্রেত কর্ম্মফলের ভীষণ ভার একত্র হইয়া তাহাব মনোবৃত্তিকে কিছুক্ষণেব জন্য তীব্রবেদনায় ব্যথিত করিয়া তাহাকে হতচেতন করিয়া দিয়াছিল। চৈতন্যোদযেও অন্তর্ব্যথা বোদনের অশ্রুধারা রূপে নির্গত হইল না। তবু সেই তীব্রতম দুঃখেব ভিতরেও একটা প্রচণ্ড সুখের অনুভূতি, ব্যথার মতই অন্তরে বিঁধিতেছিল। সে পরের নয়—দেবতা এখনও দেবতার যোগ্য আসনে পূজার অধিকার প্রতিষ্ঠিতা। এ পাওয়াই কি তাহার পক্ষে বড় কম পাওয়া? এত বড় দুঃখের ভিতবেও এই সুখের পুলক স্পর্শটুকু আত্মগ্লানির প্রচণ্ড ধিক্কারের সহিত অপূর্ব্ব আনন্দস্রোতের মত তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে কিছুক্ষণেব জন্য ওৎপ্রোত করিয়া তুলিল।

কিন্তু চিত্তের সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসিলে, সে সুখও স্থায়ী হইল না। কল্যাণী অপরের না হইলেও—তাহার নয়। সে যদি চিরদিন অপরের না-ও হয়, তথাপি তাহার সহিত সকল সম্বন্ধই জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধ, প্রতিহিংসার নির্ম্মম কুঠারাঘাতে নিজের হাতেই সে ছিন্ন করিয়াছে। তাহার কত বড় বিশ্বাসের উপর কি নিষ্ঠুরভাবে কতখানি আঘাতই সে দিয়াছে—এই কথাটা স্মরণ হইতেই সতীনাথের চোখ ফাটিয়া জল বহিতে চাহিল।

সে ভাবিয়া পাইল না যে এখন সে কি করিবে,—এ অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্যই বা কি? সে কি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে? সব কথা খুলিয়া বলিবে? বলিবে কি, কতবড় বেদনার আঘাতে কতবড ভুল সে করিয়া বসিয়াছে? কিন্তু এখন আর সে কৈফিয়তে প্রয়োজন কি? ইচ্ছায় হউক, রাগ করিয়াই হউক, শোধ লইবাব জন্যই হউক—যে কার্য্য সে করিয়াছে, তাহা ত এখন আর ফিরাইয়া দিতে পাবিবে না, অস্বীকার কবিবারও উপায় নাই। অপরাধ শুধু বিবাহ করায় যত না হউক, শেষোক্ত প্রতিহিংসাব নীচতাটাই যে অধিকতর লজ্জাজনক। সে কি বলিবে— কেবল শোধ দিবার জন্যই অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপরাকে সে বিবাহ করিয়াছে? এতদিন যে কার্য্য তাহাকে পীড়িত করিলেও আত্মপ্রসাদের অহঙ্কারে বাধা দেয় নাই, আজ তাহারই বীভৎস নগ্ন রূপ দেখিয়া আপনা-আপনি সে লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল। ইহাকে বলে প্রতিশোধ লওয়া? কল্যাণী যদি স্বেচ্ছায় কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী হইত, তবে সতীনাথ কোন দরিদ্র ভট্টাচার্য্যের দুহিতা বা কোন রাজপ্রাসাদের বাজকুমারীকে বিবাহ করিল বা না করিল তাহাতে তাহার কি আসিয়া যাইত? এ প্রতিশোধ সে কাহাকে দিতে চাহিয়াছিল? কল্যাণীকে না নিজেকে? প্রিয়তমার উপর প্রতিহিংসা-সাধন করিতে গিয়া নিজেকে সে আজ কোথায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে? শুধু নিজেকে নয়, কল্যাণীকেও কতবড় আঘাত দিয়াছে। বিশ্বস্তহৃদয়া বালিকার ভালবাসাপূর্ণ অন্তর লইয়া কি নিষ্ঠুর খেলাই সে খেলিয়াছে! শুধু ভুলেব উপব, অভিমানের তীব্র জ্বালায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, বালকের "কাণামাছি" খেলার মত চোখে কাপড় বাঁধিয়া, দিক্ নির্ণয়ে নিজের অক্ষমতা না বুঝিয়া ছুটিয়া সে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, এখন সেখান হইতে তাহার যে আর কূলে উঠিবার সাধ্য নাই। হতাশার উত্তপ্ত বাতাসে ঝলসিত হইয়া জীবনের সুখশূন্য অন্ধকারে কত সহস্র দিবা বিভাবরী এমনই করিয়াই তাহাকে কাটাইয়া যাইতে হইবে। অনন্তের বিরাট বক্ষে তাহার জন্য আর এতটুকুও সান্ত্বনার স্থান রহিল না।

১৭

দোষ কাহার ?

নিজের ক্ষতির অসহ্য ব্যথায় কল্যাণীর কথা প্রথমে তাহার মনে হয় নাই। যখন হইল, তখন সে ভাবিল, তাহার বিবাহের সংবাদ কল্যাণী যখন শুনিল—শুধু শুনিলই বা কেন, যখন বরবেশে তাহাকে দেখিল, তখন তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল? জগতের সমস্ত পুরুষজাতির উপর অপরিমেয় অবিশ্বাসেব ধিক্কারে তাহার চিত্ত কি তখন পূর্ণ হইয়া যায় নাই? এ আঘাত তাহাকে দিল কে? যাহার উপর একদিন পূর্ণ বিশ্বাসে সে তাহার কুমারী-জীবনের সকল ভার দিতে সম্মত হইয়াছিল, সেই বিশ্বাসী প্রিয়পাত্রেব হাতে এই পুরস্কার! হায়, কল্যাণীর প্রার্থিত স্থানে সে কাহাকে আনিয়া বসাইল! বিশ্বনাথ, এ কি করিলে? সে বন্ধন সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছে, গলবন্ধ মৃত্যুরজ্জুর মত সে বন্ধনপাশ তাহার পক্ষে যতই যন্ত্রণাদায়ক হউক, তাহার গ্রন্থি মোচন করিবার ত আর উপায় নাই। মৃত্যু ভিন্ন এ বন্ধন মুক্ত হইবে না। তবে কি চিরদিন এই মৃত্যুযন্ত্রণা বুকে বহিয়া পলে পলে মৃত্যুকেই সে কামনা করিতে থাকিবে?

কল্যাণী এত কাছে থাকিয়াও আজ আর তাহার কেহ নয়। এ ব্যবধানেব পাষাণ-প্রাচীর সে নিজহাতে গাঁথিয়া তুলিয়াছে। নিষ্ফলতাব বেদনার ভার পবের উপর চাপাইয়া মনের কাছে যেটুকু সান্ত্বনা পাওয়া যায়, সতীনাথের ভাগ্যে তাহাও যে যুটিবে না। নিজেই সে যে দুঃখের মূল; দোষ দিবে কাহাকে? রাগ করিবে কাহার উপরে? সে যে কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতির অপেক্ষা পর্য্যন্ত রাখে নাই, জোব করিয়া স্বেচ্ছায় নিজে কর্ত্তা হইয়া কার্য্য করিয়াছে!

মন তাহার বিদ্রোহী হইয়া হুগলীর সেই একখানা অসংস্কৃত ইট-বাহির-করা ক্ষুদ্র অট্টালিকার ভিতর ছুটিয়া যাইতে চাহিলেও, কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে বাধা দিতে লাগিল। সে এখন বিবাহিত, অপরার স্বামী! সে বিবাহের ফল স্ত্রীটিকে গ্রহণ না করুক, ভাল না বাসুক, তবু যে পদবী দিয়া তাহাকে আনিয়াছে, সে পদবী হইতে তাহাকে খারিজ করিবার সাধ্য, তাহার কেন, কাহারও আর নাই। সে তাহার গৃহের কর্ত্রী, সে তাহার স্ত্রী। একা কল্যাণীর নয়, সে আরও একটা নির্দ্দোষী বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহাকে কখনও ভালবাসিবে না, ভালবাসিতে পারিবে না—জানিয়াও দেব-মানব সাক্ষী রাখিয়া তাহার সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। লোকে তাহাকে যে আখ্যাই দিক, মনে সে তাহাকে কখনও স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবে না, করিবেও না। তবুও সে তাহার

স্ত্রী। লৌকিক আচারে, সমাজের চোখে, সেই তাহার বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী,—কল্যাণী তাহার কেহই নয়। তাহার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রাখিলেও কল্যাণী তাহার কেহ নয়। এমন কোনও আত্মীয়তার দাবী পর্য্যন্ত নাই, যাহা লইয়া সে তাহার পাশে গিয়া একবার দাঁড়াইতে পারে, নিজের অমার্জ্জনীয় ভ্রমের কথা স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা চাহিয়া লইতে পারে।

সতীনাথ জানিত, হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে কল্যাণীদের বাড়ী। কিন্তু কেন যে সে হুগলী গেল, আব গেল যদি ত বিদ্যানাথ বাচস্পতির বাড়ীর পাশেই গিয়া কেন রহিল, এ যেন একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। গল্প উপন্যাসে এমন রহস্যময় অদ্ভুত ঘটনা কতই ঘটিয়া থাকে, অবশেষে শেষ রক্ষা করিয়া তাহার মীমাংসাও হইয়া যায়। তাহারও জীবন-নাটকখানা তেমনই কোন অদ্ভুত উপায়ে শেষ-রক্ষাব পথ যদি বাখিত! অথবা যদি জানা যাইত, সে বিবাহ স্বপ্ন, সত্য নয়! বিবাহেব পরেব দিন দেখা না দিয়া কল্যাণী যদি সেই রাত্রেই দেখা দিত!

এইরূপ অনেকগুলা 'যদির' সম্ভাবনা সতীনাথের মনে উঠিতেছিল, আবার জলের তরঙ্গের মত মনেই মিলাইয়া যাইতেছিল। যে হৃদয়হীন গ্রন্থকার তাহার জীবন-গ্রন্থে শেষ অধ্যায়ের জন্য কিছুই সঞ্চিত রাখিলেন না, মনে মনে সে নিজের সহিত তাঁহাকেও বড় কম অপরাধী করিল না। সেই যদি ভুল জানিতেই দিলেন, তবে দুই দিন আগে দিলে ক্ষতি কি হইত? তাঁহার রাজ্যের কোন বিধিব্যবস্থা বন্ধ থাকিয়া যাইত কি?

মঞ্জুভূষণকে ক্রোধে তাহার অভিসম্পাত দিতে ইচ্ছা করিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশের ধূমকেতু বন্ধুবেশে উদিত হইয়া, সেই ত আজ তাহাকে পথের ভিখারীরও অধম করিয়া দিল। সে যদি আসিয়া না জুটিত, তবে উমার খবর জানিত কে? এত শীঘ্র বিবাহ করিয়া বন্দী হইবার কল্পনাই বা তাহার মাথায় আসিত কেন?

আর, সব চেয়ে রাগ হইতেছিল উমার উপর। সে তাহার স্ত্রী নয়,—জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু। আজ চিরজন্মের শত্রুতা-সাধনের সুযোগ লইয়া, স্ত্রীরূপে তাহার সুখের সূর্য্য গ্রাস করিয়া, তাহাকে অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছে। ইহজীবনে সে তাহার মুখদর্শন করিবে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, প্রহরের পর প্রহর সময়স্রোতে মিশাইয়া যাইতেছিল; চাঁদ আকাশের ঠিক মাঝখানে—জ্যোৎস্নালোক ঘরে আসিয়া ইলেকট্রিকের আলো ম্লান

করিয়া দিয়াছে। সতীনাথ উঠিয়া রুদ্ধদার ঘরের মধ্যে পরিক্রম করিতে লাগিল। কোলাহলময়ী নগরী, মায়াপুরীর রাজকন্যার মত রজনীর রূপার কাঠির স্পর্শে যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উষালোকের সোনার কাঠির স্পর্শ লাগিলে এখনি জাগিয়া আবার তাহার নির্লজ্জ চক্ষু মেলিয়া চাহিবে। জগতের বিশ্রামহীন কর্ম্ম-কোলাহল তাহার উদ্দাম গতি সংহত করিবে না। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, যথা নিয়মেই যাতায়াত করিতে থাকিবে।

সতীনাথ ভাবিতেছিল—তাহার জীবনে কতখানি ক্ষতি হইল—তাহাব হিসাব কোন কালেই হইবে না। লোকে ইহাকে প্রাত্যহিক ঘটনার মত অবহেলায় গ্রহণ করিবে। সহানুভূতিহীন জগৎ তাহার অসীম দুঃখ বুঝিবে না। সে কথা বলিতে গেলে, সে উন্মাদ আখ্যা পাইবে; অথবা তদপেক্ষাও কুৎসিত মন্তব্যের পাত্র হইবে। বুকভরা হাহাকার বুকেব ভিতর চাপিয়া বাখিয়া, সুদক্ষ অভিনেতাব মত, মুখে হাসি টানিয়া সংসারের সহিত তাহার ঈপ্সিত অভিনয় করিয়া তাহাকে চলিতে হইবে। মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা বুকে চাপিয়া সংসাবকে তাহাব পূরা পাওনা-গণ্ডা বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যে অদম্য ইচ্ছাটা ক্রমাগতই মনেব সূত্রে পাক লাগাইয়া তাহাকে জটাবদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল, সেটাকে সে কোন মতেই খুলিবার প্রশ্রয় দিল না। তাহাব সহিত দেখা না হওয়াই ভাল। কে জানে, সে দেখায় মনেব স্থৈর্য্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে কি না? সে যে সেখানে আজ অনাহূত, অনাত্মীয়, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা 'পর'। পুত্রের 'বন্ধুর' চিকিৎসকের দাবী লইয়া যেদিন অসঙ্কোচ মাথা তুলিয়া সেখানে সে দাঁড়াইয়াছিল, সে দিন ত আর আজ নাই। আজ যে সে তাঁহাদের শত্রু। অতীত জীবনটাকে মাটি চাপা দিয়া ব্যর্থ প্রেমেব নীবব পূজায় মরণকে আহ্বান করা ছাড়া তাহার আর অন্য গতি নাই।

নিজের অমার্জ্জনীয় নির্ব্বুদ্ধিতাকে সহস্রবাব ধিক্কার দিয়া সতীনাথ মনে করিল, কেন সে তাঁহাদের নিজেব চোখে দেখিয়া আসিল না! কি অপরাধে কল্যাণী তাহাকে ত্যাগ কবিল, কেন সে কথা জানিতে চাহিল না? তাঁহাবা সংবাদমাত্র না দিয়া চলিয়া গেলেন কেন, সে খবরও লইল না কেন? ইহারই নাম কি ভালবাসা? যে ভালবাসা প্রণয়িনীর প্রতি বিশ্বাস রাখিতে দিতে পারে না, ঈর্ষ্যায় জ্ঞানহারা করিয়া তুলে, প্রিয়তমার উপরে প্রতিশোধ লইতে প্ররোচিত করে, সে হেয় পঙ্কিল ভালবাসার পরিণাম এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? বিগ্রহহীন শূন্য মন্দিরের মত তাহার শূন্য হৃদয় চিরদিন আর্ত্ত হাহাকার তুলিতে থাকিলেও, সেখানে আর কল্যাণীকে প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার তাহার নাই। সে মন্দিরে

আব দেবতাব স্থান হইতে পারে না, তাহা ঘৃণিত মানবের নামে উৎসৃষ্ট হইয়া গিযাছে।

চাঁদ নামিয়া নামিয়া একেবাবে আকাশেব শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিল। বাহিবের ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া তাহার উত্তপ্ত ললাটের স্বেদ-জল মুছাইয়া দিয়া গেল। ক্ষীণপ্রভ তারাগুলি মিটি মিটি চাহিয়া চাহিয়া, হতাশ প্রেমিকের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিয়া একটি দুইটি করিয়া নিবিয়া গেল। দালানেব টাঙ্গান-খাঁচার দোয়েল, ভোবেব জ্যোৎস্নাকে দিনেব আলো ভ্রম করিয়া শিশ দিতে আরম্ভ কবিল। পাপিয়াটাও প্রিয়ের সন্ধান না পাইয়া ডাকিয়া সাবা হইয়া গেল।

সতীনাথেব অন্তবে, বাহিবের পরিবর্ত্তন কোন পার্থক্য জাগাইতে পাবিল না। তাহাব মনে হইতেছিল, অন্তরের গুরুভাব সে বুঝি আর বহিতে পাবিবে না। কৃতকার্য্যেব ক্ষমাহীন অপবাধেব চিন্তায় সে যেন পাগল হইযা যাইবে, এমনি তাহার মনে হইতেছিল। মাটীতে বসিয়া পড়িয়া খোলা জানালা দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া সে উর্দ্ধমুখে মনে মনে বলিল—"এ ভালই হইল কল্যাণী। এত বড অবিবেচক কাণ্ডজ্ঞান-হীন ঈর্ষ্যাপবায়ণ মূর্খেব হাত হইতে তুমি যে বক্ষা পাইলে, এ তোমার পক্ষে ভালই হইল। তুমি এ অযোগ্যেব যোগ্য ছিলে না, তাই ভগবান তোমায় আমাব হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তুমি যেন যোগ্য হস্তে পড়িয়া সুখী হইতে পার, তোমার সুখে যেন কোন বাধা বিঘ্ন না আসে। আমি যেন জানিতে পাবি, আমায় তুমি ভুলিয়া গিয়াছ।"

সতীনাথেব আচবিত ব্যবহাবে কল্যাণীর পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধার প্রমাণ পাওযা না গেলেও, এই চিন্তাব পরিণাম ফল যে সতীনাথেব পক্ষে ভালই হইল তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। সৃষ্টিধ্বংসকাবী প্রলয়েব মেঘ উপল বর্ষণ না কবিয়া, এইবার শীতলধাবা ঝরাইয়া ধবণীব তাপদগ্ধ বক্ষঃজ্বালা জুড়াইয়া দিল। এতক্ষণের পর অন্তরেব বেদনা অশ্রুব আকারে বাহির হইয়া পড়িল। দুঃখের তীব্র বেদনায় যাহাকে কাঁদিতে দেখ, তাহাব জন্য ভাবিও না। সে দুঃখকে জয় করিয়া ফেলিয়াছে। জলভরা মেঘ শীতল বাযুব স্পর্শে যেমন গলিয়া জল হইয়া ঝরিয়া পড়ে, দুঃখেব জমাট বাঁধা বাষ্পও তেমনি অশ্রুব তরল সলিলে অন্তর-ব্যথা শীতল কবিতে সমর্থ হয়। শোকার্ত্তকে কাঁদিতে দেখিলে বাধা দিও না। দিলে তাহার শোকেব তীব্রতা বাড়িবে মাত্র।

১৮

প্রবাসে

অশান্তচিত্তের ভার যখন বহন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল সতীনাথ তখন মনে করিল, দেশ ভ্রমণে গিয়া মনকে বিষয়ান্তরে লিপ্ত করিয়া মর্ম্মজ্বালার অবসান করিবে। তাহার শরীর ও মনের অবস্থা রুদ্রকান্তের অগোচর না থাকায়, সম্মতি পাইতেও বিলম্ব হইল না। রুদ্রকান্ত বলিয়া দিলেন—"আগ্রা, জয়পুর দেখিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসিও, বেশী বিলম্ব করিও না।" সতীনাথের এক সহাধ্যায়ী বন্ধু জুনাগড়ে নবাব সরকারে কাজ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগেব জন্য সাদর নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াও থাকে। তাই সে মনে করিল, এই সময় বন্ধুর অনুরোধ রাখিলেও মন্দ হয় না। জুনাগডটাও দেখিয়া আসা যায় এবং বন্ধুসঙ্গে প্রবাসেব একাকিত্ব দুঃখভোগও করিতে হয় না। একদিন বিপিন ও তেওয়ারীকে সঙ্গে লইয়া সতীনাথ অনির্দ্দিষ্ট কালেব জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পডিল। উপরের ঘবে জানালাব ধাবে দাঁড়াইয়া উমা গাড়ীব মাথায় জিনিষ বোঝাই দেখিতেছিল। আবোহী ক্রমে উমা ছাড়া বাড়ীর সকল লোকের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিযা বসিল। বাগানের ফটক পার হইয়া সশব্দে গাড়ী দৃষ্টিপথ ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। যাইবাব সময় সতীনাথ উমার সহিত একবার দেখাও করিল না, কবে ফিবিবে, ফিবিবে কি না, একটা কথাও বলিয়া গেল না—তাহার প্রয়োজনও ছিল না।

উমাকে যে কেন সে বিবাহ করিয়াছিল, কি যে তখন তাহার মনে হইয়াছিল, সে যেন সে সব কথা এখন ভুলিয়াই গিয়াছে। বিবাহেব পর কর্ত্তব্যবোধে সে এক এক সময় উমার কথা চিন্তাও করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে স্ত্রী বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। তার পর নিজের ভ্রম যখন বুঝিল, কল্যাণী তাহাকে প্রতারণা করে নাই—সেই তাহাকে করিয়াছে বলিয়া যখন মনে হইল—তখন ক্ষুদ্র উমা তৃণের মত সে বন্যার বিপুল টানে ভাসিয়া গেল। বিবাহের পর উমার প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে যেটুকু করুণার আভাস তাহার মনের ভিতর জাগিয়াছিল, কল্যাণীর সংবাদ জানিয়া তাহাও ফুরাইয়া গেল। সে তাহার স্ত্রী নয়, তাহার জীবনের অভিসম্পাত। দারুণ ঘৃণায় তাহার চিত্ত জলিয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল, তাই সে উমার দিক হইতে মুখ ও মন দুই ফিরাইয়া লইল। আত্মীয়সঙ্গ-বিচ্যুতা ক্ষুদ্রা বালিকা, যাহাকে সে খুঁজিয়া স্বেচ্ছায় গৃহলক্ষ্মীর আসন দিয়াছে, তাহারও কিছু অভিযোগ আছে কি না, জানিতে চাহিল না। যখন এক বাড়ীতে বাস করিয়া

তাহার সান্নিধ্যের বাতাসটা পর্য্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন স্বাস্থ্য-উন্নতির দোহাই দিয়া সে দেশভ্রমণে বাহির হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া গেল। যাইবার সময় ভদ্রতারক্ষার মত একটা মুখের কথাও জানাইয়া গেল না। জ্যেঠামহাশয় যে উমার প্রতি প্রসন্ন নহেন, এ সংবাদও সে জানে। কিন্তু তাতে সতীনাথের ক্ষতি কি? যে যাহার নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ভাবিয়া—সে ওদিক হইতে নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়া লইল। যে নিজেই অশান্ত, সে অপরকে শান্তি দিবে কিসে? যাহার নিজের অভাবের সীমা নাই, সে পরের অভাব মিটাইবে কি দিয়া?

প্রথমে বাঁকীপুরে ডাকবাঙ্গালায় উঠিয়া সতীনাথ সেখানকার দ্রষ্টব্যগুলি দেখিয়া লইল। এখানে পাটন দেবীর সিদ্ধপীঠ হিন্দুর তীর্থস্থান। আর একটি কালীমূর্ত্তি আছেন। প্রবাদ, ইনি ডাকাতের কালী। শত চণ্ডালের মস্তকের উপর দেবীর পীঠ স্থাপিত হইয়াছিল, এমনই গল্প শুনা যায়। এখনও অনেক সিদ্ধিকামী, অমাবস্যার গভীর রাত্রে মন্দিরে বসিয়া জপ তপ করিয়া থাকেন। শিখগুরু গুরুগোবিন্দের শৈশব-স্মৃতি-মন্দির "হরমন্দর", গোলঘর, কাছারী বাড়ী, পাটনা কলেজ দেখিয়া অবশেষে সতীনাথ সেখানকার গৌরবের জিনিষ খোদাবক্স লাইব্রেরী দেখিতে গেল। মৌলবী মহম্মদ খাঁ উকীলের পুত্র খোদাবক্স খাঁ, সাধারণের জন্য বাঁকীপুরে একটি পুস্তকাগার নির্ম্মাণে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বহু পুরাতন হস্তলিপি, মোগল সম্রাট্‌দিগের—বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পর্য্যন্ত হস্তলিপি উক্ত পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তৈমুরলঙ্গের সময়াবধি সমস্ত বাদশাহ্ ও অনেক বেগমদের তৈলচিত্র এই পুস্তকাগারে স্থানলাভ করিয়াছে। তরবারি, বন্দুক, বর্শা প্রভৃতি পুরাকালীন নানাবিধ অস্ত্রাদিও এখানে সংগৃহীত আছে। ১৮৯১ সালের ২৯শে অক্টোবর লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। বঙ্গের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বোধ হয় খোদাবক্স লাইব্রেরীর নিকট ঋণ-স্বীকারে গৌরবান্বিত হইতে পারেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আপনাদের যত্ন-রক্ষিত তৈলচিত্র ও পুরাতন হস্তলিপি দিয়া পুস্তকাগারে সাহায্য করিয়াছেন। এত মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুস্তকাবলী কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী-গৃহেও নাই। এখন খোদাবক্সের পার্থিব দেহ, পুস্তকাগারের সুন্দর পুষ্পোদ্যানে কবরের তলে চিরসুপ্ত। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি বুধজনের মনে চিরদিন অমর হইয়াই থাকিবে। বাঁকীপুর পাটনার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা হইয়া গেলে সতীনাথ আগ্রার উদ্দেশে বাহির হইল। সঙ্গে বিপিন ও তেওয়ারী থাকায় পথে কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

শাহাজানের প্রিয়তমা বেগম মমতাজমহলের চিরবিশ্রামাগার, স্থপতি শিল্পের

চমর উন্নতি, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্য আগ্রার তাজ সতীনাথ এই প্রথম দেখিল। পাথর কাটিয়া যে সব শিল্পী এমন করিয়া প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদের রূপ ফুটাইতে পারে, তাহাদের উপর গভীর শ্রদ্ধায় মন যেন ভরিয়া উঠে। এ সব শিল্পী আজ অতীতের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের বক্ষে সুপ্ত। বাস্তবে আর তাহাদের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের বংশধরেরা এখন মোট বহিয়া দিন কাটায়। একদিন জ্যোৎস্নালোকে মর্ম্মরময় তাজের শোভা দেখিয়া সতীনাথ মুগ্ধ হইয়া গেল। সহর হইতে তাজমহলে যাইবার একটি শাখাপথ গুল্মচ্ছাদিত ভগ্ন গৃহস্তূপের পার্শ্ব দিয়া যমুনার তীরে গিয়া মিশিয়াছে। বয়সে যমুনাও জরাজীর্ণ, শীর্ণকায়া হইয়া গিয়াছে। বর্ষা আসিয়াও এখন আর তাঁহার অতীত যৌবনের উদ্দাম চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিতে পারে না! তাজের প্রবেশ পথ, রক্ত-প্রস্তর-নিৰ্ম্মিত তোরণ-দ্বার। তাহার ভিতরে রাস্তার দুই ধারে বাগান। বাগানে গাছপালা বড় বেশী নাই, বিশেষ যত্ন লওয়া হয় বলিয়াও মনে হয় না।

মোতি মস্‌জিদের কারুশিল্প দেবগৃহোচিত। উপাসনাস্থল শ্বেত-মর্ম্মর-মণ্ডিত, প্রত্যেক লোকের জন্য স্বতন্ত্র প্রস্তরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতের স্থান রাখিয়া নিৰ্ম্মিত। সেখানে যাতায়াতের জন্য দুইদিকে দুইটি সোপানপথ নামিয়া গিয়াছে। প্রাচীর-গাত্রের কার্নিসের উপর যে সব কোরাণের বয়েদ লেখা আছে, সেগুলির সূক্ষ্ম শিল্প এমনি অনন্তসাধারণ যে, পাথরকাটা অক্ষর বলিয়া ধরিতে পাবা যায় না। মনে হয় যেন তুলি দিয়া রং ফলাইয়া আঁকা।

দুর্গের ভিতরে দাঁড়াইয়া অতীত যুগের ইতিহাস যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। হিন্দু মহিষী যোধাবাইয়ের মহলে কক্ষগাত্রে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি সকল ক্ষোদিত। সম্রাজ্ঞীর যমুনাস্নানের জন্য যে পথটি ব্যবহৃত হইত, এখন সেটির চিহ্নমাত্র রাখিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যমুনার অধীর তরঙ্গগুলি এখন আর পাষাণদুর্গের অঙ্গে আঘাত করিতে না পাইয়া, ব্যর্থ ক্ষোভে বহিয়া যায়। বৰ্ত্তমান যমুনা বহুদূরে সরিয়া তাহার পরিত্যক্ত বিশাল বক্ষে চাষ-আবাদের জন্য যথেষ্টই স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। দুর্গ মধ্যে অপরাধিনী বেগমদের ক্ষমাহীন দণ্ডের গুপ্তস্থান—অর্দ্ধ তিমিরাবৃত পাতালগর্ভে। সেখানে দাঁড়াইলে ভয়ে দেহ যেন শিহরিয়া উঠে। মনে হয়, তাহার পাষাণ-পঞ্জরের মধ্যে অনন্ত নিদ্রায় সুপ্তা কত শত সুন্দরীর বেদনাহত ভাষাতীত কাতর ধ্বনি বুঝি এখনও ঘুরিয়া ফিরিতেছে। বেগম-মহলের কোন কক্ষেই দরজা নাই। অস্ত্রধারিণী তাতার প্রহরিণীগণই সেই সকল দ্বার রক্ষা করিত। অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশলের আদর্শ সৃষ্টি আম-দরবার—বিচারের জ্বলন্ত পাষাণ-স্মৃতি বক্ষে লইয়া পড়িয়া আছে। ইহারই অধিকার লইয়া ভাই ভাইয়ের

বুকে ছুরী তুলিতে, পুত্র পিতার শোণিতে তর্পণ করিতে, ভার্য্যা স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাগ্নি জ্বালিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এইখানেই হিন্দু মুসলমানের সাম্যবাদ প্রচারিত, আবার এইখানেই কত স্বধর্ম্মরক্ষক হিন্দু সাধু-মহাত্মার মস্তক দেহবিচ্যুত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রস্তর-দুর্গ আজিও তেমনি অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বক্ষঃবাসীদেব দুই দিনেব লীলাভিনয় এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া, কেবল বিদ্যার্থী বালকদেব কৌতূহল বিস্ময় ও আনন্দ জন্মাইয়া অতীতকে স্মবণ কবাইতেছে। প্রস্তব প্রাচীবেব যে অংশ দিয়া প্রথমে বিজেতা ইংরাজরাজের গোলা এই দুর্গের ভিতব আসিয়া পড়ে, সে স্থানটুকু এখনও তেমনি ভগ্নাবস্থাতেই বহিয়া গিয়াছে। অন্দর মহলে প্রশস্ত অঙ্গনেব ধাবে ধারে সূক্ষ্ম প্রস্তব-নির্ম্মিত জাফ্‌বি। এই খানে বসিয়া 'পর্দ্দানসীন' বেগমেবা বিবিধ আনন্দোৎসবাদি দর্শন কবিতেন। সেখানে দাঁড়াইলে কবিচিত্ত এখনও কল্পনায় কালো চোখের আলো দেখিয়া কত কাব্যেব উপাদান সংগ্রহ কবিযা থাকেন। ঐতিহাসিক ধূলা জঞ্জালের মধ্যে তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির কবেন।

আগ্রার সৌন্দর্য্য পুরাতন হইয়া গেলে, সতীনাথ আগ্রা হইতে জয়পুর চলিয়া গেল। জয়পুর হিন্দুবাজত্ব। এখানকাব প্রধান দ্রষ্টব্য "গোবিন্দজী"। দেবতার মূর্ত্তি—যেন সজীব, চক্ষু দুটি যেন জীবন্তবৎ হাস্যোৎফুল্ল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয়, দেবতা যেন ভক্তের পানে চাহিয়া প্রসন্ন মধুর হাসি হাসিতেছেন। একজন পাণ্ডা একটি ভাল মানুষ যাত্রী ধবিয়া তাঁহাব হাতে একটুখানি দুধগোলা জল দিয়া মন্ত্র পডাইতেছিল—"বাপের দুঃখ মায়েব পীডা, এক পয়সার দুধ, এক পয়সার পেডা, দেও মায়ী পয়সা দেও।" বিশ্বাসিনী রমণী দুইটি পয়সা খরচ করিয়া বাপমায়ের দুঃখ পীডা নিবারণে তৃপ্ত হইতেছেন দেখিয়া সতীনাথের মুখে মৃদু হাসির বেখা ফুটিয়া উঠিল।

এখানে হিন্দুরাজাব বিচারালয় এবং বাজবাডী সতীনাথ দেখিল। সহর পুরাকালেব নিয়মে উচ্চ প্রাচীব-বেষ্টিত। প্রত্যেক দেউডীতে দ্বাররক্ষক দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেক রাস্তার ধাবে বাবান্দাওয়ালা সমস্ত বাড়ীর গঠন ও বর্ণ একই রকম, তাই বড সুন্দব দেখায়। সতীনাথ জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিল, এখানকার নিয়মই এই।

সে দিন সন্ধ্যাব পূর্ব্বে চিবপ্রথা অনুসারে মিছিল সমেত মৃগয়াবেশে রাজা অশ্বারোহণে বাহির হইয়া, সহর প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ী ফিবিয়া গেলেন। বাজার মিছিলে ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। একালেব সেকালের নানাবিধ যান বাহন হাতী ঘোড়ার সাজ এবং যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রাজার অগ্র ও

পশ্চাদ্‌গামী হইয়া চলিল। বাদ্যভাণ্ডেরও কোন অভাব দেখা গেল না। রাস্তার ধারের একখানা দোতালা বাড়ীর একটা জানালা ভাড়া লইয়া সতীনাথ রাজার কৃত্রিম অভিযান দেখিয়া অকৃত্রিম নিঃশ্বাস ফেলিল। শিশুরাও এমনি করিয়া তাহাদের খেলাঘরের ঘর সংসার পাতিয়া সংসার-খেলার সাধ মিটাইয়া লয়। উৎসব দর্শনে পথে ভিড়ের অন্ত ছিল না, তবু তাহার মধ্যে একটা বেশ শ্রেণীবদ্ধ সংযত ভাব বর্ত্তমান। মেয়ে পুরুষের একত্র সংঘর্ষ এখানকার আইনে দণ্ডনীয়। শীলতা রক্ষার এমন সুন্দর নিয়ম আর কোথাও প্রায় দেখা যায় না। এখানকার পুরাতন ফুটপাতসংযুক্ত প্রশস্ত রাজপথ ড্রেণ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রাচীন রাজা জয়পুর এখনকার সভ্য-জগতের কাছে অনুকরণ-ঋণে ঋণী না হইয়াও সমকক্ষভাবে তথায় দাঁড়াইবার অধিকার রাখে।

জয়পুর ছাড়িয়া সতীনাথ আজমীরে গেল। সেখানে দুই সপ্তাহ কাটিল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর অনলস কলতান অতীতের শতসহস্র গৌরবময় ইতিহাস গাথা মনে জাগাইয়া, তাহার দুর্ব্বহ অন্তরভাব যেন বর্ত্তমান হইতে অনেকখানি মুছিয়া দিল।

আজমীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরাতন সমৃদ্ধ নগর। উন্নত গিরিশ্রেণী ইহার চারিধারে দুর্গপ্রাকারের মত ইহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রবাহিনী-সলিলরচিত 'আনার সাগর'। মুসলমানের পুণ্যতীর্থ আজমীর সরিফে শাজাহানের মর্ম্মর মস্‌জিদ্‌ ও মহাত্মা আকবরের মস্‌জিদ্‌ দেখিয়া, রাজকুমার কলেজ, চিফ্‌ কমিশনারের আবাস বাটী, 'আড়াইয়া ঝোব্‌রা' প্রভৃতি নূতন ও পুরাতন দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া, সতীনাথ পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

১৯

নানা স্থানে

ভারতের প্রাচীন রাজ্য, শৌর্য্য-বীর্য্য বীরত্বের কীর্ত্তি-মন্দির চিতোর—ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতে আজিও বর্ত্তমান। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে চিতোরগড় তিন মাইল দূরে। ছোট নদীটি বঙ্কিম রেখায় গড়ের তিনদিকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। বাজার ও সহর গড়ের বাহিরে, আসল সহরটুকু উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনীর ভিতর আবদ্ধ। হুকুম লইয়া ভিতরে ঢুকিতে পাওয়া যায়। চিতোরদুর্গ পাহাড়ের উপর। সেখানে ছোট ছোট অনেকগুলি পুষ্করিণী। জল শৈবালাচ্ছন্ন। গড়ের মধ্যে মহারাণার প্রাসাদ ছাড়া কেবল ভগ্ন ইষ্টক ও প্রস্তরস্তূপ অতীত গৌরব-দিনের সাক্ষ্য

দিতে পড়িয়া আছে। গড়ের ভিতরে চিতোরেশ্বরী দেবীর মন্দির। মীরাবাইয়ের মন্দির, কুম্ভরাণার স্তম্ভ, অহল্যা বাইয়ের স্তম্ভ—এগুলি আজিও অতীতের অনেক সুখ দুঃখ ভক্তি প্রেমের উজ্জ্বল মহিমার ইতিহাস চিত্তে জাগাইয়া, দর্শককে ভক্তি শ্রদ্ধা আনন্দে মুগ্ধ করিয়া দেয়। স্তম্ভ দুইটি হরিদ্রা রঙের প্রস্তরনির্ম্মিত। স্তম্ভের উপর হইতে বহুদূরে অবস্থিত উদয়পুরের অস্পষ্ট দৃশ্যাবলী দেখা যায়। কুম্ভরাণার স্তম্ভের প্রাচীর গাত্রে বহুবিধ দেবদেবী, অস্ত্রশস্ত্রের সুন্দর সুন্দর প্রতিকৃতি নাম সহ ক্ষোদিত রহিয়াছে। পদ্মিনী মহলের একখানি মাত্র দেওয়াল পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কালের প্রতীক্ষা করিতেছে।

চিতোর দেখিয়া সতীনাথ ডাকোর যাত্রা করিল। ডাকোর হিন্দুর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান—প্রকাণ্ড হ্রদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিংবদন্তী—ভগবান বাসুদেব কোন কারণে একবার হ্রদের জলে আত্মগোপন করেন। সংবাদ পাইয়া দ্বারকাবাসী তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে আসিলে, দরিদ্র ডাকোরবাসীরা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিল না। উভয় দলের কলহ, ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হয় দেখিয়া ভগবান কহিলেন—'যাহারা সমভার সুবর্ণ-মূল্যে আমায় ক্রয় করিতে পারিবে, তাহাদের কাছেই আমি বাস করিব।' দ্বারকাবাসী দেশ উজাড় করিয়া বহুমূল্য ধনরত্ন আনিয়াও ভগবানের সহিত ভার-সমতা রক্ষা করিতে পারিল না। ভক্তিলুণ্ঠিত দরিদ্র গ্রামবাসী দুইটি সুবর্ণনির্ম্মিত নারী-কর্ণাভরণ দিয়া তাঁহাকে তৌলে বসাইলে সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, ভগবান কৃষ্ণ ভক্তিমতী দরিদ্রা গ্রামবাসিনীর কর্ণাভরণের মূল্যে বিকাইয়া গিয়াছেন। দ্বারকাবাসী মনের দুঃখে অপমানের ব্যথা বুকে করিয়া ফিরিয়া গেল। প্রচার—দ্বারকার মূর্ত্তি নকল, ডাকোরের দেবমূর্ত্তিই আদি মূর্ত্তি।

এখানে বরোদারাজ গাইকোয়াড়ের অধিকার। হ্রদের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ, সেখানে লোকে বাস করে। হ্রদের তীরে কতকগুলি চতুষ্পাঠী আছে। এখানে সংস্কৃতভাষার অত্যন্ত সমাদর। কাশী, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানের মহারাজাদের টোলও এখানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হিন্দুর হিন্দুত্ব, সাধুর সাধুত্ব এখানে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখানকার "ক্ষুধাশান্তি আশ্রম" নামক হিন্দুহোটেলে কোন দ্রব্য জলে সিদ্ধ করা হয় না—দুগ্ধের দ্বারা পাক করা হইয়া থাকে। প্রতি পূর্ণিমায় "রণছোড়্জী"র পূজা খুব ধূম করিয়াই হয়। মেলা বসে, দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসে, দ্রব্যসম্ভার ও বিপণির সংখ্যা থাকে না—প্রত্যেক মেলায় প্রায় দুই লক্ষ লোক সমবেত হয়।

ভারতের ম্যান্‌চেষ্টার আমেদাবাদ, কলকারখানার জন্য বিখ্যাত। আমেদাবাদ

ছাড়িয়া সতীনাথ ওয়াদোয়ানে গাড়ী বদল করিল এবং কাথিবাড়ের প্রসিদ্ধ ষ্টেশন জটিলেশ্বর হইয়া ভেরোয়ালে পৌছিল। ভেরোয়াল হইতে প্রভাস প্রায় দুই মাইল পথ। ছোট ঘোড়ার ট্রামে যাইতে হয়। ট্রাম প্রভাস সহরের ভিতর গিয়া দাঁড়ায়। ট্রামের পথের দুইধারে ভগ্ন অর্দ্ধভগ্ন অসংখ্য কবর। মহম্মদ গজ্‌নী যখন সোমনাথের ধনরত্ন লুণ্ঠনে আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তখনকার যুদ্ধে হত সৈন্যদেব সেই জনহীন স্থানে কবর দেওয়া হইয়াছিল। প্রভাস প্রাচীরবেষ্টিত সহর। সহরের বাহিরে পশ্চিম প্রান্তে সোমনাথের বিখ্যাত পুরাতন মন্দির, সমুদ্রগাত্রে প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপের ন্যায় মরণশীল জগতের প্রমাণ দেখাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমুদ্র মন্দিরের পাদদেশে অবস্থিত। দেবমন্দিরের চূড়া নাই, মন্দিরগাত্রস্থ ক্ষোদিত সুন্দর মূর্ত্তিগুলি সমস্তই হস্তপদ ও নাসিকাহীন। গজ্‌নীর ধর্ম্মোন্মত্ত সৈন্যদল ভাস্করশিল্পের চারুকলাগুলির উপর নির্ম্মম অত্যাচারের চিহ্ন চিরদিনের জন্য আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে।

কাথিবাড়ের স্ত্রী-স্বাধীনতা পশ্চিমের অনেক স্থানের মতই। তবে এখানকার স্ত্রীলোকদের শক্তি ও সৌন্দর্য্য অন্যান্য স্থানাপেক্ষা প্রশংসনীয়। ববিবর্ম্মাঙ্কিত সুন্দরীদের চিত্রের আদর্শ এখানে পথে ঘাটে,—জল তুলিয়া গম পিষিয়া দিন কাটাইয়া থাকে। চোখে মুখে তাহাদের এমনি একটা নির্ভীক ভাব, যাহাতে দর্শককে শ্রদ্ধান্বিত করা ছাডা তাহার মনে অন্য কোন ভাব আসিতে দেয় না। দুইটা জলপূর্ণ কলসী একসঙ্গে মাথায় বসাইয়া, হাতে একটা ঝুলাইয়া, ইহারা অনায়াসে হাসি গল্প করিতে করিতে পথ চলিয়া থাকে। তবু আকৃতিতে ইহারাও আমাদের দেশের "তুলিয়া ধরিতে ছাডিয়া" পড়া বাঙ্গালাব মতই কমনীয়া।

প্রভাস সহরের ভিতব আধুনিক সোমনাথের মন্দির। প্রকাণ্ড শাখাবহুল বাদাম গাছের তলায় মর্ম্মরময় ছোট মন্দিরটি, প্রকৃতির স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় ছায়াময়। মন্দিরমধ্যে ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ। ইনি সোমনাথ নহেন। মন্দিরগহ্বরে সোপানাবতরণ করিলে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহা অপূর্ব্ব! বিল্বপত্র ও করবী গন্ধরাজেব স্তবকে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গের গৌরীপীট সমাচ্ছন্ন। ভূগর্ভস্থ মন্দিরে ঘৃতের প্রদীপ উজ্জ্বল আলোক বিতরণে অন্ধকার নাশ করিতেছিল। পাতাল গর্ভে সমবেত ভক্তকণ্ঠ-বিনির্গত গভীর ও গম্ভীর "শিব শিব শম্ভো" রব যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি জীবনে সে ধ্বনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না। নিত্যকালের অনাদিধ্বনি সেখানে যেন প্রত্যক্ষ হইয়া সেই পাতালগর্ভস্থ উদাত্ত গম্ভীর মহাধ্বনির সহিত একত্র হইয়া গিয়া বিশ্বসঙ্গীতে মিশাইয়াছে। সতীনাথের দেহ রোমাঞ্চ হইয়া, সে মধুর গম্ভীর রব তাহার অজ্ঞাতেই যেন তাহাব মুখ দিয়া প্রতিধ্বনি বাহির করাইয়া লইল—'শিব শিব শম্ভো'।

প্রভাস-পত্তনের দক্ষিণ দেউড়ীর সন্নিকটে প্রভাসক্ষেত্র। যেখানে মুসলঘর্ষণজাত শরবৃক্ষের পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে যদুবংশীয়েরা হত হইয়াছিলেন, সেখানে এখনও অসংখ্য শরগাছ বায়ুতরঙ্গে নাচিতেছে। এখানকার সমুদ্রের বালীর রং লোহার রঙের মত কালো।

প্রভাস ও ভেরোয়াল ষ্টেশনের মাঝে "ভল্লতীর্থ"—ভালতীথ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবান কৃষ্ণ এইখানেই দেহ রাখিয়াছিলেন। ব্যাধহস্তনিক্ষিপ্ত শরাঘাতে রক্তকোকনদপদে যে শোণিতধারা ঝরিয়াছিল, সেই পবিত্র শোণিতচিহ্নিত স্থানটুকুই 'ভল্লতীর্থ' আখ্যায় আখ্যায়িত। মধ্যে মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী পরিব্রাজক এখানে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। ব্যাধ যেখান হইতে ভল্ল সন্ধান করিয়াছিল, এখন সেখানে একটি শিবমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। যে অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে ভগবান শয়ন করিয়াছিলেন, এখনও না কি সেই বৃক্ষ বর্ত্তমান। গাছটির এখন জীর্ণাবস্থা।

ভেরোয়াল হইতে ভোরে তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষে জাহাজে চড়িয়া সতীনাথ পোরবন্দরে পৌছিল। পোরবন্দরের আসল নাম সুদামাপুরী। নীল জল নীলাকাশের সহিত এক হইয়া গিয়া যেন সীমা হারাইয়া ফেলিয়াছে। তরঙ্গের তুলার রাশি ঠেলিয়া জল কাটিয়া সমুদ্রবক্ষে জাহাজগুলি রাজহংসের মত নাচিয়া চলিয়াছে, সেই সীমাহীন সন্ধিহীন অসীম নীল জলের পানে তাকাইয়া সতীনাথের মনে হইল, তাহার দুর্ভাগ্য জীবনেরও বুঝি সীমা নাই, তাহাও বুঝি এমনি অতল, এমনি উত্তাল তরঙ্গায়িত।

পূর্ব্বে যেখানে সুদামের পর্ণকুটীর ছিল, সেখানে বোম্বের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী দেশহিতৈষী 'ভাই কালিকা দাসের' চেষ্টায় সুন্দর মর্ম্মর মন্দিরে শ্রীসুদাম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরসংলগ্ন উদ্যানটিও দর্শনযোগ্য। যাত্রীদের দেখাইবার জন্য রেলিং ঘেরিয়া সুদামের প্রাচীন কুটীরটি রক্ষা করা হইয়াছে। মাদ্রাসা কলেজ এখানকার মধ্যে প্রধান দর্শনীয়। প্রস্তরসৌধ নির্ম্মাণার্থ এখানকার প্রস্তর দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয়। আর একটা জিনিষও এখানকার উল্লেখযোগ্য,—এখানে তালগাছগুলা বহুশীর্ষ। সমুদ্র-বেলায় তরঙ্গ-প্রহৃত মৃত সমুদ্রমৎস্যের দুর্গন্ধে কিন্তু এমন স্থানটিকেও অবস্থিতির পক্ষে কষ্টকর করিয়া তুলে। সর্ব্বধর্ম্মীদের জন্য এখানকার "ধরমশালার" বন্দোবস্তও চমৎকার।

সুদামাপুরী ছাড়িয়া জটিলেশ্বর হইয়া সতীনাথ জুনাগড়ে বন্ধু সুন্দরলালের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিল। বেহারী বন্ধু বঙ্গদেশীয় সতীনাথকে নিজের ভাইয়ের মতই সমাদরে সযত্নে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। বহুকাল বাঙ্গালা দেশে থাকায়, বাঙ্গালীর

আচার ব্যবহার সুন্দরলালের জানা ছিল। বন্ধুগৃহে সতীনাথের কোনও অসুবিধা হইল না।

২০

বন্ধুগৃহে

মানব মনের স্থিতিস্থাপকতা-গুণে অবসাদ চিরস্থায়ী হয় না। কালের ব্যবধানে সকল শোকের হ্রাস হয়, নৈরাশ্যের ব্যথাও সহিয়া যায়। সতীনাথেরও কৃতকার্য্যের নিষ্ফল বেদনা উপায়ান্তরে কমিয়া গেল। তবু বাড়ী ফিরিবার কথা সে মনে আনিল না। ফিরিয়াই বা কি হইবে?

সহরের অল্প দূরে রৈবতক পর্ব্বত। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' পাঠে বাঙ্গালার অনেক সাহিত্য-সেবীর কাছেই রৈবতকের নাম পরিচিত। রৈবতক রেবতী দেবীর জন্মস্থান। নির্ঝরিণীর অবিরল ধারা পর্ব্বত গাত্র বাহিয়া আসিয়া সেখানে প্রস্তরবেষ্টিত একটি ছোট সরোবর সৃষ্টি করিয়াছে। সরোবরের নিম্নে দামোদর-গঙ্গা—নির্ম্মল স্ফটিকস্বচ্ছ জল। নদীতে হাঁটু ডোবার বেশী জল নাই। পর্ব্বতগাত্রে সেগুন ও আমলকী বৃক্ষের সবুজ শোভা। কোথাও মধ্যাহ্নের খর রবিকরভীত পাখীরা আমলকীর ঝোপে লুকাইয়া কূজন করিতেছে। কোথাও ধূসর গিরিশ্রেণী ঊর্দ্ধে মেঘের পর মেঘের স্তর—পর্ব্বতের সহিত মেঘের মিলন দৃষ্টি-রেখাকে চতুর্দ্দিকে পরিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রজাত গুল্ম শষ্প হইতে মৃদু গন্ধ প্রকৃতির পূজাগৃহে ধূপের সুরভি ছড়াইয়া দিতেছে। পাহাড়ের গায়ে গাছের শ্রেণী সবুজ শীর্ষ সোপানের মত স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধপানে উঠিয়াছে। কোথাও কোন শীর্ণা গিরিনদী গেরুয়া রঙের ঢেউ তুলিয়া বনান্তরালে গিয়া লুকাইতেছে।

রৈবতক পর্ব্বত হইতে কিছুদূরে একটি অখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তূপ। স্তূপটি দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ হাত পরিমিত। প্রস্তরগাত্রে পালি ভাষায় চন্দ্রগুপ্তের ক্ষোদিত বৌদ্ধগাথা। জুনাগড়ের নবাবের চেষ্টায় রৌদ্র বৃষ্টি বাঁচাইবার জন্য প্রস্তরস্তূপের চারিধারে প্রাচীরবেষ্টনী তুলিয়া খিলান করা ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বর্ষা কাটিয়া শরৎঋতু দেখা দিল। কাশাংশুকপরিধৃতা শারদলক্ষ্মী শেফালি ফুলে অঞ্জলি ভরিয়া মহামায়ার অচির আগমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

একদিন সকালবেলা অনেকগুলা চিঠি পত্রের সহিত সতীনাথ, বন্ধু অমরনাথের একখানি পত্র পাইল। অমর তাহার প্রবাস বাসে অযথা বিলম্বের জন্য অনেক রাগ করিয়া শেষে লিখিয়াছে—"তোমাদের বাড়ী কাল গিয়াছিলাম। সুধীর কিছুতেই

ছাড়িয়া দিবে না; পুনরায় শীঘ্র যাইব প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে ছাড়ান পাইয়াছি। অন্দর হইতেও স্নেহের বাতাস লাগা কেয়াগন্ধি পান ও পিসীমার স্বহস্ত প্রস্তুত মধুমেয় মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া আসা গেল। সুধীর ভাল আছে। জ্যেঠামহাশয়ের শরীর মন্দ দেখিলাম না; মন তাঁহার তোমারই পথ চাহিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছে। অন্দরের উজ্জ্বল নক্ষত্রটির সম্বন্ধে বন্ধুর অভিজ্ঞতা অধিক থাকা বোধ হয় পছন্দ করিবে না; তবু আন্দাজী কবির ভাষায় বলিতেছি—'সা বিরহে তব দীনা।'

"বর্ষা ত প্রবাসেই কাটাইয়া দিলে। মেঘও বিদায় লইয়াছে। দৌত্য পদাভিষিক্ত করিয়া প্রণয়িণীর বার্ত্তাবহন করাইবার বন্ধুও অদৃশ্য হইল।

"ভারতের জয় জয়কার হউক। এখনকার দিনে কুটজকুসুমের অর্ঘ্য সাজাইয়া মেঘের উপাসনার যে আর প্রয়োজন হয় না, এ কি কম সৌভাগ্য! চঞ্চুপুটে পত্রবিহীন উড্ডীয়মানা পক্ষিণীর চিত্রসংযুক্ত রুলটানা কাগজে উচ্ছ্বসিত 'হা-হতোঽস্মি'-পূর্ণ ভাষায় মুক্তাপংক্তির অক্ষরাবলী সাজাইয়া এন্‌ভেলপে ভরিয়া দুই পয়সার টিকিট আঁটিয়া ঠিকানা দিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেই ব্যস্। তাই বিরহে আর বিরহিণীদের ভয় নাই, এমন সুযোগ মাঝে মাঝে ঘটিতে না দিলে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে একদম্ মাটী হইয়া যাইবে। এখনকার বিরহীরা—'মিলন হইতে সখী বরঞ্চ বিরহ ভাল' গাহিতে তাই ভয় পান না।

"যাক্—এসব বাজে কথা ছাড়িয়া এইবার কাজের কথা কহি। আর কেন ভাই, এইবার ফিরিয়া আইস। কতদিন আর টেগুাই মেণ্ডাই ছাতুখোরের দেশে বাস করিবে! জ্যেঠামহাশয়কে বড় ব্যস্ত দেখিলাম, পিসীমাও সুধীরকে দিয়া ফিরাইবার জন্য অনুরোধের আদেশ পাঠাইয়াছিলেন। অন্যত্রের নির্ব্বাক আদেশ বা অনুরোধ—সে ত বুঝিতেই পারিতেছ, বলা বাহুল্য। এস ভাই, এইবার ফিরে এস।"

চিঠি পড়িয়া সীতানাথের মুখে হাসির রেখা না ফুটিতেই মিলাইয়া গেল। অন্দরের উজ্জ্বল নক্ষত্রটির আলোকরশ্মি যদি কেরোসিন ডিবার ধূমরাশির মত মারাত্মক না হইত, তবে হয় ত ফিরিবার ত্বরা থাকিতে পারিত। এখন যে সেই 'উজ্জ্বল নক্ষত্রের' কেন্দ্রচ্যুতির ভয়েই ফিরিবার সাহস হয় না। যতটুকু সরিয়া থাকা যায় ততটুকুই তাহার পক্ষে নিরাপদ। জ্যেঠা মহাশয়ের ত্বরা না থাকিলে হয় ত চিরজীবনেও আর ফিরিবার প্রয়োজন হইত না। ঐ একমাত্র বন্ধনের স্থানে এখনও যে সে আবদ্ধ। ফিরিতে হইবেই, তবে যে ক'দিন বিনা বাধায় কটিয়া যায় সেই ক'দিনই তাহার পক্ষে ভাল। অমীমাংসিত জীবনের গণা দিনগুলার সংখ্যা যে জানিতে পারা যায় না। কতদিন কাটাইতে এখনও বাকী কে জানে?

'নওরাত্রি'র সময় সুন্দরলালের আগ্রহে সতীনাথ গির্ণার পর্ব্বতে ৺মহাপূজা দেখিতে গেল। পর্ব্বতারোহণ ও অবতরণ অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। নয় হাজার চারিশত সিঁড়ি আরোহণ বাঙ্গালাদেশজাত সুকুমার প্রাণীদের পক্ষে বড় সহজসাধ্য ব্যায়াম নয়। পর্ব্বতারোহণের জন্য ঝোলা পাওয়া যায়। ঝোলা ডুলিরই সুসভ্য-সংস্করণ। পর্ব্বতপথে গুহাগৃহে একজন সন্ন্যাসী থাকেন। পথশ্রান্ত আরোহীরা তাঁহার কৃপায় তৃষ্ণার জলের অভাব জানিতে পারে না। ক্ষুধাতুর গুড় ছোলা, সময় সময় ফল মূলটাও, পাইয়া থাকে।

বহু উচ্চে পর্ব্বতগাত্রে ঝর্ণা। ঝর্ণার নাম 'গোমুখী গঙ্গা'। জল কাচের মত স্বচ্ছ—প্রস্তর বেষ্টিত একটি কুণ্ডে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। নুড়ি পাথর বিছানো কুণ্ডের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। জলে আকাশের ছায়া পর্য্যন্ত পতিত হয় না। কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে শিবমন্দির। মন্দিরগুলির মধ্যে একটি বিস্তৃত সমতল 'চত্বর'। সে দিন ৺মহাষ্টমী। সেই 'চত্বরে' মহামায়ার পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হইতেছিল। এমন সুন্দর চণ্ডীপাঠ সতীনাথ জীবনে আর কখনও শুনে নাই। সমবেত পণ্ডিতদের কণ্ঠধ্বনিত বিশুদ্ধ গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত পাঠের গভীর রব যেন গম্ গম্ শব্দে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে একীভূত করিতেছিল। ভক্তিপ্লুত ভাবের আবেগে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে তাহারই প্রতিধ্বনি রণিয়া রণিয়া ধ্বনিতেছিল—

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

সতীনাথের মনে হইল, দেবী যদি কোথাও থাকেন তবে এই নির্জ্জন গিরিমন্দিরই তাঁহার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান। সংসারের কর্ম্ম কোলাহলের নৈরাশ্যের শোক দুঃখ বেদনার তীব্র হাহাকার এখানে পৌছিতে পারে না। দেবতা তাঁহার নিজের আসনে অটল হইয়াই বিরাজ করিতে পারেন। এখানে শুধু যোগের আনন্দ, বিয়োগের জ্বালা যন্ত্রণা নাই। তাই শান্তিহীন তাপদগ্ধ জীব এখানে আসিয়া সান্ত্বনা পাইয়া থাকে।

সুন্দরলাল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পূজারীদত্ত সিন্দূরের তিলক ও পুষ্পমাল্য গ্রহণ করিয়া প্রণামী দিল। সতীনাথও প্রণাম করিল, প্রণামী দিল.—প্রার্থনা জানাইল না। যাহার আকাঙ্ক্ষাপূরণের উপায় থাকে, সেই দেবতার পদে প্রার্থনা

করে। সতীনাথ কি চাহিবে? তাহার অভাব পূর্ণ করার সাধ্য যে আর দেবতারও নাই!

পর্ব্বতপথে নামিতে নামিতেও সেই সুগম্ভীর স্তবের ধ্বনি তাহারা শুনিতে পাইতেছিল। পর্ব্বতের পরতে পরতে সে ধ্বনি বাজিতেছিল—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

সতীনাথ মনে মনে কহিল—"হে শক্তিমুক্তিভক্তিরূপিণী মহাদেবি, আমি তোমায় প্রণাম করি। তোমার সর্ব্বসংহারিণী শক্তিকে প্রণাম করি। অঘটন-ঘটনকারী মহাশক্তিকে প্রণাম করি। কে বলে তুমি শক্তিময়ী দয়াময়ী করুণা-ময়ী মা—আমি এ কথা কখনও স্বীকার করিব না। তুমি অনাদি অনন্ত অব্যয় হইতে পার, তবু তোমার শক্তিও যে সীমাবদ্ধ। কর্ম্মফলের অদ্ভুত শক্তি চালনাকারিণী তুমিও যে কর্ম্মফলভোক্তা মানবের মতই শক্তিহীনা। তুমি কর্ম্মফলদাত্রী সৃষ্টিলয়কর্ত্রী হইতে পার—স্নেহময়ী সর্ব্বংসহা ভ্রমপ্রমাদনিবারিণী রক্ষাকর্ত্রী মা নও। তা যদি হইতে, তোমার সৃষ্ট জীবের প্রতি এমন অকরুণ হইতে কখনও পারিতে না।"

দেবতার দয়ায় সন্দিহান মানব কর্ম্মফল-রূপ অমোঘ দণ্ডের হাত এড়াইতে না পারিলে দেবতার দয়ায় দোষারোপ করে। প্রবলের উপর দুর্ব্বলের অভিমানের মতই এ ক্ষোভের বেদনা। মনকে কৃত কার্য্যের অপরাধ হইতে মুক্তি দিবার ইহাই তখন একমাত্র যুক্তি হইয়া দাঁড়ায়। কেহ প্রতিবাদ করিবে না, কলহ করিবে না, অস্বীকার পর্য্যন্ত করিবে না। এমন সুলভ সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

সতীনাথ ভগবানে বিশ্বাস না হারাইলেও, তাঁহার সর্ব্বব্যাপী করুণায় সন্দিহান হইয়াছিল। কি পাপে, কি অপরাধে তিনি তাহার সমস্ত জীবনটাকে এমন নিষ্ঠুর প্রহসনে পরিণত করিয়া দিয়াছেন? সে অজ্ঞ মূর্খ অবিবেচক যাহাই হউক—তিনি যদি অন্তর্য্যামী, তবে তাহার অন্তরের ভাষাও ত তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। হৃদয়স্থ হৃষীকেশ তাহাকে যে পথে চালাইয়াছেন, সে যে সেই পথেই চলিয়াছে—তবে অপরাধী সে হইল কেন? অন্তর রহস্যে অনভিজ্ঞ কে তাঁহাকে অন্তর্য্যামী আখ্যা দিয়াছিল—এ শুধু ভাষার উপর যথেচ্ছাচার, সত্যের অপলাপ।

সতীনাথ শীতের পূর্ব্বে জুনাগড়ে আসিয়াছিল। এখন শীত কাটিয়া বসন্ত আসিল, তবুও তাহার বাড়ী ফিরিবার ত্বরা দেখা গেল না। রুদ্রকান্ত যদি বা চিঠির উপর চিঠি দিয়া ফিরিবার কথা স্মরণ করাইয়া দেন,—সুন্দরলাল বলে'—'আরও দুদিন যাক্, এত শীতে কি পথে বাহির হইতে আছে?'

পার্ব্বত্যপ্রদেশেও বসন্তের শুভাগমন অপ্রকাশ রহিল না। শীতশীর্ণা কর্ণিকাব নবপুষ্পপত্রের ভারে হেলিয়া গাছের তলায় বসন্তের পুষ্পশয্যা বিছাইয়া দিল। দেবদারু ও সেগুন গাছের জীর্ণ পত্র ঝরাইয়া নবকিশলয়ে ফুলধনুর চাপ নির্ম্মিত হইল। বক্র বালেন্দুর শোভায় পলাশেব গাছে ফুল ফুটিযা লালে লালে "হোলী" খেলিল। ফুলে ফুলে গুঞ্জনমত্ত মধুব্রতের মধুর ঝঙ্কাব উঠিল।' নানাজাতি পার্ব্বত্যলতা ও বৃক্ষে সুন্দব সুন্দর ফুল ফুটিল। বর্ণ গন্ধেব অন্ত রহিল না। রঙ্গীন পরিচ্ছদ পরিহিত প্রজাপতির দল ফুলে ফুলে লঘু পদক্ষেপে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। পাখীরা সকাল সন্ধ্যায় নানা সুবে প্রকৃতিব বন্দনাগীতি গাহিয়া পথ-বাহীকে মুগ্ধ করিয়া দিল। পথেব ধারে গাছেব শাখায় প্রকৃতিদেবী নিজেব হাতে সবুজে চাঁদোয়া খাটাইয়া দিয়া বৌদ্রতাপ নিবাবণ কবিযা দিলেন। শঙ্কাহীন মৃগশিশু স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছ খেলিযা বেড়াইতে লাগিল—মানুষকে যে ভয় কাবতে হয়, এ শিক্ষা তাহাবা কখনও পায় নাই। সতীনাথের মনে হইল, এ যেন পুবাকালেব ঋষি-প্রতিষ্ঠিত পুণ্য তপোবন। হিংসাদ্বেষহীন জীবজন্তু এখানে তাই নিভয়ে বিচরণশীল। ফলভাবাবনত গাছেব শাখায পাতা দুলাইযা পাব্বত্যবায়ু শিব্ শিব শব্দ তুলিয়া অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনিল।

সুন্দরলালেব সাহচর্য্য ও প্রকৃতিব রূপ-সৌন্দর্য্যে সতীনাথেব মুগ্ধচিত্ত ক্ষোভেব ব্যথা অল্পে অল্পে যেন বিস্মবণ হইতেছিল। সন্ধ্যাব সময় দুই বন্ধুতে গান কবিতে করিতে পর্ব্বতপথে জ্যোৎস্নার আলোকে প্রকৃতিব সৌন্দয্য উপভোগ কবিত কখনও ভুট্টাব ক্ষেতের ধাবে ধাবে ঘুবিয়া আসিত। সুন্দবলাল ভজন গান করিত, সতীনাথ চুপ কবিয়া বসিয়া শুনিত- তাহাব লক্ষ্যশূন্য উদ্দেশ্যহীন জীবন যে কেবল দিন কাটাইযা চলিতেছিল।

রুদ্রকান্ত শীঘ্র ফিরিবার জন্য চিঠি লিখিতেছেন—সুধীব আড়ি দিবাব ভয় দেখাইয়া পাঠাইয়াছে, পিসীমাও পরেব সাহায্যে চিঠি লেখাইয়া, ফিবিবাব জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। কেবল একস্থান হইতে কোন অনুরোধ আসিল না। আসিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না।

সুধীর, জ্যেঠামহাশয়, পিসীমা—তাঁহারা যে তাহারই প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছেন। আজ অনেক দিনের পর প্রথম তাহার মনে হইল—তাহার অনেক গিয়াছে সত্য, তবু সব যায় নাই। এখনও যা আছে তাই বা ক'জনের থাকে? ভক্তি স্নেহের অধিকার ত তাহার হারায় নাই! প্রেম উপন্যাস নাটকেই শুনিতে ভাল, বাস্তব জীবনে তাহার দর্শন কয়জনেই বা পাইয়া থাকে?

পার্ব্বত্যপ্রদেশে গ্রীষ্মকাল সুখের নয়, এইবার দেশে ফিরিতেই হইবে।

অনুচিত বোধে সুন্দরলালও আর থাকিবার জন্য জেদ করিল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সতীনাথ ভাবিল, এবার নিতান্তই ফিরিতে হইবে।

২১

উমার কথা

দীর্ঘদিনের প্রবাস-বাসান্তে সতীনাথ বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, পিসীমা আনন্দাশ্রু মুছিতে মুছিতে সত্যনারায়ণ সুবচনী পূজার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াও তাহার স্বাস্থ্যোন্নতির শোচনীয়তার দুঃখ ভুলিতে পারিতেছিলেন না। হর্ষ বিষাদের যুগপৎ মিশ্রণে তাঁহার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। রুদ্রকান্ত গম্ভীর মুখে কেবল একবার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া স্নেহের তিরস্কারে কহিলেন—"এমন হয়ে গেছিস্! এজন্যে কি সেখানে এতদিন না থাক্‌লেই চল্‌ত না?" সতীনাথ মৃদু হাসিল, জবাব দিল না। সুধীর রাগ করিল—"এই বুঝি তোমার শরীর সারা দাদা? এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল এখানে। কি হল এতদিন সেখানে থেকে?" সতীনাথ ভাইটিকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া হাসিয়া কহিল,—শুধু কি মোটা হলেই শরীর সারে রে?' মুরারি কহিল—"তাই ত সতীদা', শরীরটাকে তাচ্ছিল্য করে মাটি কর্‌তে বসেছ যে, এমন কল্লে কদিন টেঁকবে বল দেখি?" সতীনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—"ঠিক যতদিন গোণা আছে—তার একদিনও বেশী কম নয় মুরারি—ও এমন জিনিষই নয়। যতই যত্ন কর আর অগ্রাহ্য কর, তার জন্যে ওর ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না কিছু।" উমাও অন্তরাল হইতে গোপনে তাহাকে দেখিয়া লইয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিল—"হয়ত সেখানে খুব অসুখ করেছিল। কেই বা সেখানে যত্ন কর্‌বে। বিদেশ বিভূঁয়ে অতদিন একলা গিয়ে রইলেন!"

সতীনাথ যে উমার প্রতি প্রসন্ন নয়, এ সংবাদ দাসদাসীদেরও অজ্ঞাত ছিল না। তবু এতদিনের পর বাড়ী ফেরায় সকলেই কিছু পরিবর্ত্তন আশা করিয়াছিল বই কি। চিরদিনই কি আর এক নিয়ম চলিয়া থাকে? এতদিন উমার শয়নকক্ষে মেঝের উপর শয্যা বিছাইয়া নন্দর মা রাত্রে একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে, আজ বাবুর আগমনে সে তাহার দখলিস্বত্ব ত্যাগ করিয়া ঝি মহলে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং অনাবশ্যকবোধে পরদিন বাবুর অবস্থানের সংবাদ লইতেও কৌতূহলী মাত্র হইল না।

তবু সেদিন না হউক, তাহার দুই চারিদিনের মধ্যে উমার অনাদৃত অবস্থা তাহাদের মনে বিস্ময় কৌতূহলের সহিত, একটুখানি সহানুভূতিও জাগাইয়া তুলিল। "আহা এমন সোনার পিতিমে ঘরে, তবু বাবু ঘরবাসী হল না! বড়লোকদের

রুচিও কি তেমনি ?” সে সব সহানুভূতির স্পষ্ট ও অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি সময় সময় উমার কানেও আসিয়া পৌছায়। তাহার নিজের বর্ত্তমান অবস্থার চেয়েও এই সব সমবেদনার কথা শুনা তাহার পক্ষে অধিকতর কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল।

অল্পদিনের মধ্যেই সতীনাথের অন্তরের পরিবর্ত্তন বাহিরে প্রকাশ পাইয়া বাড়ীর লোকের বিস্ময় জাগাইয়া তুলিল। মুরারি লেখাপড়ায় তাচ্ছীল্য করিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে মনোযোগী হইলে ও বিদ্যাটার বিরুদ্ধে রুদ্রকান্তের মুখ নিঃসৃত তীব্র তীব্র মন্তব্য শুনিয়া, ও বিদ্যাটার প্রতি বাড়ীর লোকদেরও হেয় সংস্কার জন্মাইয়া গিয়াছিল। গান বাজনা করা “বখা ছেলের” লক্ষণ বলিয়াই জানা ছিল। তাই আদর্শ চরিত্র সতীবাবু যখন পুরাদমে গাওনা বাজনার মজ্‌লিস বসাইয়া নানা কণ্ঠের সুরতরঙ্গে সান্ধ্য নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রতিবাসীদের সচকিত করিয়া তুলিল, তখন সকলেই মনে করিল, সে সতীনাথ আব নাই। বিদেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সে এখন সম্পূর্ণই বদল হইয়া আসিয়াছে। সঙ্গীত-বিদ্যায় সতীনাথও সম্পূর্ণ আনাড়ী নয়, বরং সাধনার অনুপাতে তাহার সিদ্ধি সমধিক অগ্রগামিনী! সঙ্গীতজ্ঞ সুন্দরলালের শিক্ষায় এখন তাহা আরও দুরস্ত হইয়াছে। মুরারিও বিস্মিত হইল— এত শীঘ্র সে এতখানি উৎকর্ষলাভ করিল কিরূপে? ভগবান যাহাকে শক্তি দেন, তাহাকে কি সকল বিষয়েই দিয়া থাকেন!—রুদ্রকান্ত নিজে সঙ্গীতপ্রিয়, উৎসাহ না দিলেও দূর হইতে শুনিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না। সতীনাথ যে বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল খেয়াল লইয়া রহিল, ইহা তাঁহার ভাল না লাগিলেও তিনি বাধা দিলেন না। মনে করিলেন, যার যা প্রকৃতিগত নয়, সে তাহাতে কতদিন অনুরাগী থাকিতে পারিবে? সখ মিটিয়া গেলে আপনিই ছাড়িয়া দিবে।—তাই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। উমা অভিযোগের কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া, ভালমন্দ কিছুই ভাবিল না।

সন্ধ্যার সময় কাজ সারিয়া মোহিনী আসিয়া উমাব ঘরের মেঝেয় পা মেলিয়া বসিয়া কহিল—“হেঁ গা মা, বাবু যে রাতদিন কেবল গাওনা বাজনা নিয়ে রইল, তা তুমি মানা করনি কেনে গা?”

উমা মৃদু হাসিল। বাবু যেন তাহার ‘মানা’ মানিবার জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন! মানা করিবে সে কাহাকে? করিবার অধিকারই বা তাহাকে কে দিয়াছে? সে কথা ইহার কাছে না তুলিয়া কহিল—“কেন, তাতে দোষ কি?”

মোহিনী বিস্ফারিত চক্ষে মা ঠাকুরাণীর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া বিস্ময় পূর্ণ কণ্ঠে কহিল—“ওমা সে কি গো! দোষ নেই আবার? তবে যে কাকামশাই বল্‌ছ্যালো বাবু বয়ে যাচ্চে।”

কাকামশাই অর্থে মুরারি—যে এতদিন গাওনা বাজনা করিয়া বিশ্বের নিন্দা কুড়াইয়াছে! আজ তাহার প্রতিশোধ লইবার পালা, কেনই বা সে ছাড়িয়া কথা কহিবে?

উমা চুপ করিয়া রহিল! বাবু "বহিয়া" গেলেই বা তাঁহাকে রক্ষা করিবার সাধ্য তাহার কোথায়?

উমাকে নিরুত্তর দেখিয়া দাসী উৎসাহের সহিত পুনরায় আরম্ভ করিল—"আমরাও সব তাই বলাবলি করি! বলি, এমন যে ঠাকরুণ পিত্তিমে ঘরে, তা বাবু একবার চোখ মেলে তাকায়নি গা! রাগ কোরনি মা, হক্ কথা বল্‌বো—বাইরে মন না থাক্‌লে কি আর এমন ধারা হয়? বিপ্‌নে বলে—'অমন কথা বলুস্‌নি, জিব খসে যাবে, বাবু আমাদেব মহাদেব'। কেন বল্‌বুনি? বল্‌বার কথা থাকলিই নোকে বলে। কপালের নীচে চোখ দুটো যে জ্বলজ্বল কচ্ছে, তাদের ঠ্যাকাবে কে? তাদের কাছে ত আর কিছু ছাপা থাকে না। এই কাকামশাই যখন রেতে বাড়ী ফির্‌তো না, ছিয়েচার দেখে রাত কাটাতো, তখন ঐ গোঁয়ার বিপ্‌নেই কত ব্যাখ্যানা করেচে। বলেচে—ঐ জন্যেই কর্ত্তাবাবু দেখ্‌তে পারে না, বিষয় দেবে না বলে নেখাপড়া করেচে'। আর এখন উল্টো গাইলে নোকে শুন্‌বে কেনে? তুমি ত ভাল মানুষের ঝি, তুমিই কেনে বল না, এক যাত্তারায় কি আর পেথ্যক ফল হবে? ঐ যে ছিয়েচারের মেয়ে নোকেরা, জান গা মা, সেই যে কামরূপ কামিখ্যে আছেন না, সেইখেনে ওনাদের ঘর। ওনারা না কি ভদ্দর ভদ্দর ঘরের ছেলেদের ভেড়া বানাবার জন্যে সহরের মধ্যে ছিয়েচারের কল বানিয়ে রেখেছে?"

মোহিনী বর্ণিত কামাখ্যাবাসিনী 'মোহিনী'দের অবিশ্বাস্য কাহিনীতে উমার আস্থা না থাকায় সে প্রসঙ্গ ফিরাইবার জন্য কহিল—"পিসীমা কি কচ্চেন মোহিনী, সন্ধ্যে করা হয়ে গেছে তাঁর?"

মোহিনী হাই তুলিয়া ঘরের মেঝেয় কার্পেটের উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া কহিল—"হরি বল! এখুনি তাঁর হবে! সেই যার নাম গে রাত আট্‌টা। খোকাবাবু খেতে এলে তবে না সিন্ তিনি মালা ছেড়ে উঠ্‌বে।—হেঁ গা মা, যাবে একদিন ছিয়েচার দেখ্‌তে? বিন্‌লি রমুণী কদম নন্দর মা—সবাই দেখেচে। মুখপোড়া বিপ্‌নে বলে, তুই উপরের মানুষ, তোর আবার ছিয়েচার দেখ্‌বার ভাবনা কেনে? যা না, মা ঠাকরুণকে ধরে করে একদিন দেখে আয়গা না। সেখানে না কি ভারি তামাসা হয়। বাবুর সঙ্গে বিপ্‌নে ত হামেসাই যায়। বল্‌ব মা সরকার মশাইকে, যাবার উয্যুগ কর্‌তে?"

উমা ছেলেবেলা হইতে থিয়েটারের নাম শুনিয়া আসিতেছে। মোহিনী বর্ণিত

তামাসার ইতিহাসে তাহার মনেও একটুখানি কৌতূহল জাগাইয়াছিল, কিন্তু দেখিতে যাইবার আগ্রহ হইল না। দাদা মহাশয় থিয়েটার দেখা ভালবাসেন না, তাই দুই একবার কলিকাতা হইতে থিয়েটারের দল হুগলীতে গেলেও, তাহারা দেখিতে পায় নাই। আব্দার বায়না করিয়া অনুমতি আদায় করিবার পন্থা তাহারা জানিত না। তাঁহার অনিচ্ছাই যে নিষেধ—তাহার উপর আবার জোর জবরদস্তি কিসের? আজ তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে, তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য করিবে? তাঁহার নিষেধের মূল্য তাঁহার অসাক্ষাতে ত কমিয়া যায় নাই। মোহিনীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া একবার তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য পিসীমার কাছে অনুরোধ করে, কিন্তু সে ইচ্ছা তখনি মনেই চাপিয়া ফেলিল। সে ত স্বাধীন নয়, তাহার অনুরোধ উপরোধে কিসের অধিকার? হয়ত এ কথা রুদ্রকান্ত বা সতীনাথের কানে উঠিবে, তাঁহারা মনে করিবেন কর্ত্রী হইয়া সে আবার কর্তৃত্ব করিতে বসিয়াছে, কাজ নাই!- তাই সে কেবল সংক্ষেপে জানাইল, তাহার ও সব ভাল লাগে না, সে যাইবেও না।

মোহিনীর অচির-নাসিকাধ্বনিতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, নিরাশার ব্যথা তাহার সান্ধ্য-নিদ্রায় ব্যাঘাত আনিতে পারে নাই। উমা উঠিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। এই যে চন্দ্র নক্ষত্রহীন অন্ধকার অমারজনী, ইহারও সময়ের নির্দ্দেশ আছে। অন্ধকারের অন্তে আবার আলোর বাতি জ্বলিবে। জগতে সকল জিনিষেরই সীমা নির্দ্দিষ্ট। কেবল তাহারই দুঃখময় জীবন অনির্দ্দিষ্ট ও সীমাহীন।

অতীত না থাকিলে মানুষ বর্ত্তমানের দুঃখ সহিতে পারিত না। অতীত ছিল বলিয়াই ভবিষ্যৎ মানুষের মনে আশার আলোয় উজ্জ্বল। বর্ত্তমান যখন দুর্ভিক্ষ পীড়িত, তখন অতীতের স্বচ্ছলতা স্মরণে ভবিষ্যতের আশায় সুখ। কেহ কেহ বলেন—ছেলে হইয়া বাঁচিয়া না থাকার চেয়ে বন্ধ্যা হওয়াই ভাল। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা পুত্রের মর্ম্ম বুঝেন না। সে আমার ছিল, এমনটি ছিল এই কথা বলিয়াছিল, এই সব কাজ করিয়াছিল, এত ভালবাসিয়াছিল— এমন কত ছোট বড় সুখের স্মৃতি তাহার বিয়োগব্যথাকেও সহনীয় করিয়া, তাহাকে আমাদের মনের ভিতর বাঁচাইয়া রাখে। কেহ আমার ছিল না, এ চিন্তায় দুঃখ না থাক, সুখও নাই, তৃপ্তিও নাই। দুঃখ আছে, তাই সুখের মূল্য, অতীত আছে, তাই স্মৃতির সুখ। সূর্য্যালোক দেখিয়া যে অন্ধ হয়, তাহার বাকী জীবন "জবাকুসুমসঙ্কাশের" উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ধ্যানে অতিবাহিত হইতে পারে, কিন্তু যে হতভাগ্য জন্মান্ধ, সূর্য্যের স্বরূপ ধারণায় অক্ষম, তাহার জীবন চির-অন্ধকার—নিতান্তই দুর্ব্বহ।

উমার দুঃখের জীবনেও অতীতের সুখের স্মৃতি ফুরায় নাই, তাই দুঃখের মধ্যেও তার সুখ ছিল। কৃপণের গোপন ধনের মত লোকচক্ষে তাহাকে লুকাইয়া রাখিলেও, অবসর কালে খুলিয়া দেখিতে এখানকার পরিমিত স্বাধীনতাতেও বাধিত না। ঘরের কাজকর্ম্মের জন্য উপরের ঝি নন্দর মা ও মোহিনী, আত্মীয়ের মধ্যে সুধীর, ইহারা ব্যতীত তাহার শয়নকক্ষে কেহই প্রবেশ করে না—সতীনাথও না। পিসীমা নিজের পূজার্চ্চনা সংসার লইয়াই ব্যস্ত, উপরে উঠিবার তাঁহার অবসরই হয় না। যদিই বা কখন সময় পান, এই অনাচারদুষ্ট কার্পেটমণ্ডিত ম্লেচ্ছাচারসম্পন্ন ঘরগুলার সংশ্রব বাঁচাইয়া অত্যন্ত সাবধানেই চলিয়া থাকেন। উমা সে সময় নিজের ঘর ছাড়িয়া সাম্নের দালানে বা কার্পেটহীন অপর কোন ঘরে মাদুর বিছাইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসে, পাকাচুল তুলিয়া দেয়, এবং তাঁহাদের পল্লীগ্রামের গল্প শুনিবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু সে ঘটনা এতই কদাচিৎ যে, তাহার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাই করিতে হয় না। একটা কথা কহিবার সঙ্গী পাইলেও সে তাহার মনের ভার নামাইয়া নিঃশ্বাসটা সহজ করিয়া লইতে পারে,—সেটুকু সুযোগও পাওয়া যায় না। খাঁচার পাখীর মত প্রকাণ্ড বাড়ীখানার ভিতর উমার সঙ্গীহীন চিত্ত কেবলই হাঁফাইয়া উঠিতে থাকে।

মানুষ যখন বাহির হইতে সাহায্য না পায়, তখন অন্তরের দৈন্যকে সে নিজের চেষ্টাতেই ভরাইয়া রাখিতে চায়। তাই বর্ত্তমানের অসুখ অশান্তির জ্বালা জুড়াইবার জন্য অনেক সময় অতীতের স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিয়া সে প্রতিদিনের প্রত্যেক ঘটনাটি মনের পটে স্মৃতির তুলিতে নিপুণ চিত্রকরের মত আঁকিয়া ধরিয়া, তৃপ্তিপূর্ণ আনন্দে চাহিয়া দেখে। সেই আনন্দনিকেতন, স্নেহাধার পিতামহ, শান্তিময়ী মায়ের কোল, আনন্দদায়িনী প্রীতিস্বরূপিণী দিদি, খেলার সাথী পাঠের প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দার-বায়না শুনিবার স্নেহময় অনাথ দাদা, সে বাড়ীর "মুংলী গাই", মেনি বিড়াল, কৃষাণ-বালক বৃন্দাবন, দাসী মাতি পর্য্যন্ত তাহার কাছে আজ আর উপেক্ষণীয় নহে। প্রত্যেকের প্রত্যেক স্নেহব্যবহারগুলি সে আজ চেষ্টা করিয়া মনে জাগাইয়া ভাবিয়া দেখে। কোন্ কোন্ দিন কে কি বলিয়াছিল, কি করিয়াছিল, আজ যেন নূতন আবিষ্কৃত রহস্যের মতই অপরূপ আনন্দ লইয়া সেগুলি মনের চোখে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার অসাড় হৃদয়ে আনন্দের দোলা দিয়া যায়। স্মৃতির সুখে বর্ত্তমানের কঠোরতাকে সহনীয় করিয়া লইতে সক্ষম হয়। তুচ্ছের ভিতরেও যে কত বড় বৃহৎ শক্তি নিহিত থাকে, উমা তাহার নূতনলব্ধ জ্ঞানে অনেক সময় অবাক হইয়া তাহাই ভাবে। তখনকার সেই সব সুখের দিনগুলি কত অকিঞ্চিৎরূপেই আনাড়ীর মত খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, সে কথা মনে করিয়া আজ ক্ষোভে তাহার

দুই চোখে জল ভরিয়া দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসে। সে দিন যদি আবার ফিরিয়া পাওয়া যাইত! যাহার স্মৃতিতেও এত সুখ, এত আনন্দ—তাহাকে সত্যকার উপভোগ করা হয় নাই। সুদীর্ঘ জীবনপথে সেইগুলিই যে পাথেয়, এ কথা আগে যদি জানিত, তবে খেলা ধূলায় সমস্ত নষ্ট করিয়া সঞ্চয়ের পথে নিজের হাতেই কি সে এমন করিয়া বাধা জন্মাইত। সেই সঙ্গে মনে পড়িত, তাঁহাদের সহিত সে কি ব্যবহার করিয়া চলিতেছে। তাহার মনের ভিতর যাহাই থাকুক, সে হাহাকার ত বাহিরে পৌঁছিল না। তাঁহারা জানেন, পাষাণী উমা বড়লোকের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আজন্মের স্নেহবন্ধন মা বোন দাদামহাশয়কে ভুলিয়া গিয়াছে। পত্র দিয়াও একটা খবর লয় না, এমনই সে স্বার্থপর। সত্যই কি তাঁহারা তাহাই মনে করেন? কেন করিবেন না! উমা যে এই কথাই তাঁহাদের বুঝিতে দিয়াছে। সে যে সুখী, এ কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, তাহার স্বাস্থ্য যে খুব ভালই আছে, এ কথা সে বিশেষভাবেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

এই স্বাস্থ্য ভাল থাকাটার উপরই তাহার সব চেয়ে রাগ। তাই সেই কথারই পুনঃপুনঃ প্রকাশে ত্রুটি হয় নাই। উমার মনে হইত, তাহার স্বাস্থ্য যদি অবাধ্যতা করিয়া এমন ভাল না থাকিয়া, খুব ঘটা করিয়া একটা কঠিন ব্যারামের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইত, আর সেই রোগে তাহার মৃত্যু ঘটিত, তবে কেমন হইত? মৃত্যুকালে সে তাহার আত্মীয়দের দেখিতে চাহিলে, বোধ হয় রুদ্রকান্তও আপত্তি করিতে পারিতেন না। কিন্তু এই মৃত্যুচিন্তাটাও তাহাকে খুব বেশী সান্ত্বনা দিত না। অনিচ্ছাতেও চোখের জল বহিয়া গণ্ড ভিজাইয়া তুলিত। সে মরিলে তাহারই জ্বালা ফুরাইবে, কিন্তু তাঁহাদের দুঃখ বাড়িবে বই ত কমিবে না।

অত্যন্ত অনিচ্ছাতেও আর একটা সম্ভাবনার চিত্র তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিত। তাহার অবর্ত্তমানে এই পদ লইয়া, এই ঘরেই আর একজন আসিয়া বাস করিবে। হয় ত সে ভাগ্যবতী, তাহার পদমর্য্যাদার অধিকারও প্রাপ্ত হইবে। এ চিন্তাটাকে সে সলজ্জে সরাইয়া দিত।

অবশেষে অনেক ভাবিয়া উমা স্থির করিল, শুধু আলস্যের আশ্রয়ে এই সব চিন্তায় দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর দিনগুলা কাটাইয়া তোলা সহজ নয়। শুধু দিন ত নয়, ততোধিক দীর্ঘ রাত্রিও যে আছে। মনে পড়িত, এই দীর্ঘ রাত্রি সেখানে কত শীঘ্রই কাটিয়া যাইত; ভোরে বিছানা ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে দিদি যখন তাহাকে ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেন, মনে হইত এই ত সবেমাত্র সে চোখ বুজিয়াছে, ইহারই মধ্যে সকাল হইল কেমন করিয়া? ভোরের আলো জ্যোৎস্না

বলিয়া দিদির সহিত তর্ক করিয়া পুনরায় ঘুমাইতে ইচ্ছা করিত। কিন্তু এখানকার এই নিঃসঙ্গ দীর্ঘ রাত্রি—ইহার যেন আর শেষ নাই, সীমাও নাই; মৃত্যু-রজনীর মতই বিভীষিকাময়ী। ভোরের আলো চোখে লাগিয়া যখন রুদ্রকান্তের রুদ্রমুখ তাহার মনে পড়ে, সেই নিদ্রাহীন ভয়াবহ নিঃসঙ্গ রাত্রি কাটানর চেয়েও তাঁহার সঙ্গও যেন তাহার প্রার্থনীয় বলিয়া মনে হয়। উমাকে রুদ্রকান্তের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, কাছে রাখিয়া ছল ছুতা অথবা অকারণে বাক্যবাণ বর্ষণে কৃপণতা ছিল না। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে যেমন সকল জিনিষই সহজ হইয়া আসে, রুদ্রকান্তের কটুকাটব্যও উমার তেমনি সহিয়া গিয়াছিল। রুদ্রকান্তের কটু কথায় এখন আর উমার বেশী কষ্ট হয় না। বরং যে দিন তাহাকে 'কথা শুনিতে' হয় না, সে দিন মনে হয়, আজিকার দিনটা বিনা আড়ম্বরেই চলিয়া গেল। তাহার অপরাধে যে দিন তাহার মৃত পিতার উদ্দেশ্যে আক্রমণ হইত, সেই দিনই তাহার বুকে বাজিত। সে এমনি দুর্ভাগিনী কন্যা যে, মৃত পিতার লাঞ্ছনার কারণ না হইয়া তাহার দিন কাটাইতে পারে না। এই ভয়েই সে অপরাধ বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিত। তবু অপরাধ যে কোন্ দিন, কোন্ মূর্ত্তিতে, কোথা দিয়া, কেমন করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িত, তাহা জানিবার সাধ্য না থাকায়, সাবধান হওয়াও সব সময় সম্ভব হইত না।

দাদামহাশয় তাহাকে দেখিতে আসিয়া, শুধু মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত হইয়া বাহির হইতেই ফিরিয়া গিয়াছেন। অনাথদাদা লইতে আসিয়া রূঢ়ভাষায় দূরীভূত হইয়াছেন। জ্যেঠামহাশয় স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন—"কুলীনের ছেলে স্ত্রীকে লইয়া ঘর করিতেছে, ইহাই তাহার ভাগ্য। যদি এতই মেয়ের আদর, মেয়ে লইয়া গিয়া চিরকালের জন্য টাটে তুলিয়া রাখুন। যে বাড়ীর বাহিরে একবার পা দিবে, সে আর ঢুকিবে না।" এ কথার পর, তাহারই ভবিষ্যৎকে নিরাপদ রাখিতে, তাঁহারা স্নেহের ভাণ্ডারে কুলুপ আঁটিয়া তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন। সে যে কত দুঃখে, তাহা কি আর উমা বুঝে না? তাহার দাদামহাশয়, যাঁহাকে দেখিলে পথের লোকে প্রণাম করিয়া দিনটা সুদিন হইল মনে করে, সেই ঋষিতুল্য উদারচরিত্র মহাপুরুষ এখানে যে কত হেয়, কত অবজ্ঞেয়! একটা ক্ষুদ্র বালিকার স্নেহেই না তাঁহাকে এত অপমান সহিতে হয়!

উমা বুক বাঁধিয়া, অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে দিদিকে চিঠি লিখিল,—এখানে সে ভালই আছে, তাঁহাদের দেখিতে পায় না, এইটুকুই তাহার অভাব। তা ছাড়া কোন ক্ষোভই তাহার নাই। তাঁহারা যেন তাহার জন্য কোন চিন্তা না করেন, 'তত্ত্বতাবাস' পাঠাইয়া অকারণ অপমানিত না হয়েন, এইটুকুই তাহার

প্রার্থনা। তাঁহারা যখন উমার সুখই আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন চোখের দেখা না-ই বা হইল, মন হইতে ত মুছিবে না।

চিঠিখানা লিখিয়া, পাঠাইবার জন্য সুধীরের কাছে দিয়া চোখ মুছিয়া নিজের অবাধ্য চিত্তকে কাজের মধ্যে সে বন্দী করিবার চেষ্টা করিল। শুধু বসিয়া বসিয়া কি মানুষের দিন কাটে? সে বড়লোকের স্ত্রী, দাসী চাকরেব অভাব নাই, তাহার হাতে কোন কাজেরই ভার ছিল না। পাণ সাজিবার ভার সে নিজেই লইয়াছিল। প্রথম প্রথম নন্দর মা ইহাতে আপত্তি তুলিত— "হাত নোংরা হবে, কাপড়ে দাগ্ লাগবে, তোমার কেন এ সব মা? আমরা রয়েচি কি করতে? খামকাই বসে থাক্‌ব?" উমা মৃদু হাসিত, বলিত—"হাত পা না নেড়ে আমিও যে বাতে ধরে গেলুম, নন্দর মা! তোমাদের কাজ না থাকে, বাইরে খানিক ঘুরে এস বরং।" নন্দর মা কৃপাকরুণকটাক্ষে বধূঠাকুরাণীর পানে চাহিয়া মনে মনে কহিল—"আহা, গরীবের মেয়ে, চিরকাল খেটেচে, এখন বসে থাক্‌তে পারবে কেন?" উমার নিবহঙ্কার মৃদু স্বভাব ও সকলেব সহিত সমভাব, দাসী-মহলে তাহাকে ঠিক গৃহিণীর পদ দিতে পাবে নাই। বাড়ীর গিন্নী 'বাশভাবি' না হইলে কি মানায়?—তা ছাড়া দাসীদের অভিযোগেব আবও একটা কাবণ ছিল, আর সেইটাই প্রধান। উমার নিকট তাহাদেব কিছুই পাওনা ছিল না, ভবিষ্যতের আশাও না। একখানা প্রসাদী কাপড পর্য্যন্ত না। তাহাবা পবস্পব বলাবলি করিত—"এ আবার কি ঢং বাবু, মোটা মোটা গড়া পবে থাকা কেন? সাজো গোজো, গয়না গাঁটি পর, তবে না পুরুষ মানুষের মন ভুল্‌বে? কাব ওপবেই যে অভিমান করেন! বাবুকে ত চোখের কোণে চাইতে দেখি না। কে জানে বাবু, বড় মানুষের ঘরে সবই সাজে। আমাদের গরীবেব ঘবে হলে এই নিয়ে কত টিটিক্কার পড়ে যেত।"

উমা স্পষ্ট না হউক, তাহাদের মনের কথার অস্পষ্ট কাণাকাণি শুনিতেও পায়। মনকে সে ফিরাইয়া লয়, শুনিয়াই বা তাহার লাভ কি?

২২

উমা মন বাঁধিল

দিন কাটাইবার উপায় স্বরূপ উমা স্থির করিল, রুদ্রকান্ত ও সতীনাথের শান্তিসুখের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া লেখাপড়া করিয়া আপনার দুর্ব্বহ চিন্তার ভার কমাইবে। মনে পড়িল—এই লেখাপড়ার জন্য দাদামহাশয় কত চেষ্টা কত পরিশ্রম না করিয়াছেন, কত স্নেহে কেমন সহজভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। সকাল বেলা ফুল

তুলিবার সময় উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাহাকে কাণ্ড বলে, কাহাকে রেণু বলে, কেমন করিয়া পাতার বর্ণ জন্মে, পাতাই আবার কেমন করিয়া ফুলে রূপান্তরিত হয়, ফুল হইতে কেমন করিয়া বীজ জন্মে, ফুল কত অংশে বিভক্ত, কাণ্ডের ও পাতার কত রকম আকার, কত ভিন্ন ভিন্ন নাম—এই সকলই তখনকার মৌখিক শিক্ষার বিষয় ছিল। মনে পড়িল, রচনার জন্য তিনি পুরস্কার ঘোষণা করিয়া কেমন করিয়া তাহাকে প্রলোভিত করিতেন, উৎসাহিত করিতেন! পুরস্কার—সে হয় ত নারায়ণে নিবেদিত বাগানের একটি গোলাপ, অথবা নৌকারোহণে এক দিন ষণ্ডেশ্বর তলায় পূজা দিতে যাওয়া, অথবা একখানা ব্যঞ্জন বাঁধিয়া খাওয়াইবার অনুমতি—এমনই কিছু। তবু সেই সব পুরস্কারই কত না লোভনীয় ছিল! আজ তাহার হীরামুক্তার অলঙ্কার, যাহা বিবাহের পরই সে বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া আজ পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখিতেও ইচ্ছা করে নাই, সেগুলা কত মূল্যহীন! হায়, সে সব দিন আবার যদি ফিরিয়া আসিত! সুখের দিন এমনি করিয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে যে, সেগুলিব প্রতি চাহিয়া দেখিতেও সময় হয় নাই।

নিঃসঙ্গ রাত্রি বা দীর্ঘ দিন যখন কাটিতে চাহিত না, উমা তাহার রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসিয়া কখনও প্রবন্ধ লিখিত, কখনও কবিতা লিখিত,—কতক লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত, কতক বা স্নেহবশে পাশের ছোট কুঠারীতে তুলিয়া রাখিত। স্বামী তাহাকে গৃহ এবং গৃহের সমস্ত স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলেও, অনধিকার বোধে তাঁহার কোন জিনিষই সে ব্যবহার করিত না। যে স্বামী—স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতেই কুণ্ঠিত রহিলেন, মুখের আলাপও রাখিলেন না, তাঁহার তাচ্ছিল্যের দান কেনই বা সে লইবে? প্রয়োজনই বা তাহার কতটুকু?

মনে পড়িল ফুলশয্যার দিনের কথা। পিসীমা কতরাত্রি পর্য্যন্ত সতীনাথকে ডাকিয়া পাঠাইয়া, বকিয়া শ্রান্ত হইয়া অবশেষে উমাকে ঘুমাইবার অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলেন।—সেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভোরের আলো চোখে পড়িয়া ঘুম ভাঙ্গিতেই, অপরিচিত শয্যা ও অপরিচিত গৃহ তাহাকে তাহার নূতন জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। সে বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিতেই প্রথমে যাহা চোখে পড়িয়াছিল, তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে নাই। কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া সেই দিকেই চাহিয়াছিল। একখানা সোফার উপর একখানি পাতলা কাপড় গায়ে দিয়া স্বামী ঘুমাইতেছেন। তাঁহার পায়ের কাছে মৃত সর্পের মত একগাছা মোটা ফুলের মালা কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। প্রভাতের আলো ম্লান করিয়া দিয়াও সে অর্দ্ধাবৃত গৌরতনুর অমল লাবণ্য যেন উমার চোখে

রূপকথার রাজপুত্রের মত অপূর্ব্ব সুন্দর বলিয়া মনে হইয়াছিল। নিজ লজ্জিত কুণ্ঠিত দৃষ্টি তাড়াতাড়ি সে ফিরাইয়া লইয়াছিল, পাছে স্বামী দেখিতে পান। স্বামীর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞও হইয়াছিল। তিনি যে তাহাকে ঘুমাইতে দিয়া নিজে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন, তখন এ তাঁহার খুবই মহত্ত্ব বলিয়া মনে হইয়াছিল। ধীরে ধীরে শয্যা ছাড়িয়া নীচে নামিতেই তাহার চাবি বা অলঙ্কারের মৃদু শিঞ্জন শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একমুহূর্ত্ত স্থিরভাবে অপেক্ষা করিয়া, তার পর টেবিলের উপর হইতে এক থোলো চাবি উঠাইয়া তাহার পদতল লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"এ ঘরের সব জিনিষ-পত্রই আজ থেকে তোমার। যখন যা দরকার হবে—যা ইচ্ছে নিতে পার। ঐ ক্যাসবাক্সে টাকাকড়িও আছে"—বলিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সে আজ কত দিনের কথা। উমার মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড যুগ চলিয়া গিয়াছে। দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন কতবার আসিয়াছে, ফিরিয়াও গিয়াছে,—কিন্তু তিনি আর এ কক্ষে বা কক্ষাধিকারিণীর কাছে ফিরিয়া আসিলেন না।

তার পর শীত গিয়া বসন্ত আসিল। কত শুষ্ক তরুতে ফুল ফুটিল, ফল ধরিল, মঞ্জুরিত নবপত্রিকায় ঈষদারক্ত হরিতাভায় নয়ন মন জুড়াইয়া গেল, আমের গাছে "বউল" ধরিয়া মদগন্ধে দিক্ পূর্ণ করিল। বসন্তের সাড়া পাইয়া কোকিল ডাকিল, পাপিয়া শিস্ দিল, বৌ-কথা কও মানিনী বধূর মানভঞ্জনের পালা গাহিল। রক্তকুসুমের স্তবকভারে নম্রদেহ অশোক-তরু বনস্থলীর শোভা বাড়াইয়া তুলিল।

উমার অজ্ঞাতে তাহার শরীর মনে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বসন্ত স্বীয় সুষমার ছায়া বিস্তার করিয়া আবার ফিরিয়াও গেল। তবুও সে সতীনাথের অন্তর বাহিরের কোন সাড়া পাইল না। সে বিস্মিত হইল, ব্যথিতও হইল। তবু মুখ ফুটিয়া ভাবে ইঙ্গিতে তাহার এতটুকু আভাসও জানাইল না—জানাইবেই বা কাহাকে? স্বামী তাহার জন্যই অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া বাহিরের মহলে আশ্রয় লইয়াছেন। সেইখানে শয়ন, সেইখানেই অবস্থান, দুই বেলা আহারের জন্য যখন ভিতরে আসেন, সেখানে পিসীমা উপস্থিত থাকেন; উমা বালিকা বধূ, সেখানে থাকিবার অধিকারও তাহার নাই। ইচ্ছা থাকিলেও লজ্জায় অগ্রসর হইতে পারে না। কাজেই তাহার ভাগ্যে স্বামী সন্দর্শনের সময় মিলিত না। বিবাহের পর দেশ ভ্রমণে চলিয়া গিয়া দীর্ঘকাল কাটাইয়া যে দিন তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, সেই স্মরণীয় দিনের কথাও উমার বেশ মনে আছে। উমা সে রাত্রে কত না আশা উৎকণ্ঠাপূর্ণ চিত্তে স্বামী দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত

জাগিয়া কাটাইয়াছিল। এতদিনের পর ফিরিলেন, সত্যই কি আর দেখা করিবেন না? এমনি একটা লুব্ধ আশার বাণী ক্রমাগতই তাহার কানের কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া একই কথা শুনাইয়াছিল। নিদ্রাভঙ্গের সহিত দিবালোকে আপনার অনাদৃত অবস্থা যখন তাহার সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল, নিজের অজ্ঞাতে বুঝি সেইদিন—সেই প্রথম দিন—তাহার গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল নীরবে ঝরিয়া পড়িয়াছিল। তার পর, সে চোখ মুছিয়া নিজেকে শান্ত করিয়া লইয়া সকল আশার সমাধি দিয়াছে। কর্ত্তব্যের জীবনহীন যন্ত্রের মত সে তাহার দেহ মন সংসারের কাজে সংসারের লোকদের স্বচ্ছন্দতাবিধানকল্পে উৎসর্গীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। অবসরকালে নিজের রুদ্ধ গৃহে বসিয়া প্রবন্ধ লেখে, কবিতা রচনা করে—এমনি করিয়া সে নিজের মনের খোরাক নিজেই যোগাইয়া লয়।

বৈশাখ মাস উপলক্ষে পিসীমা এক দিন তাহার ব্রত উদ্‌যাপনের কথা রুদ্রকান্তের নিকট জানাইয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে এ সংসারের নিজের স্থান সম্বন্ধে উমার দ্বিধা কাটিয়া গেল। পিসীমার ইচ্ছা ছিল একটু 'ঘটা পটা' করিয়া উমার ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়। "এ সাহেব বাড়ীতে অকারণে ব্রাহ্মণ সজ্জনের পা'র ধূলা পড়িবার সম্ভাবনা ত আর নাই"—তাই মুরারিকে দিয়া কর্ত্তার কানে কথাটা তুলাইয়া দিলেন। রুদ্রকান্ত শুনিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"ও সব ভট্‌চায্যিগিরি এখানে ফলান হবে না। যেমন ঘরের মেয়ে, তেমনি ত প্রবৃত্তি হবে! ব্রত কল্লি, তাই না হয় ভাল কিছু কর্। গরীব দুঃখীকে শীতবস্ত্র দে, গ্রীষ্মের দিনে জলছত্র কর্'—তা নয় ভট্‌চায্যি নিমন্ত্রণ করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাও! যদি এই সুযোগে গরীব ঠাকুদ্দার কিছু লাভ হয়ে যায়। ব্রত নেবার লোক পান নি—অনাথদা'কে ব্রত কর্‌তে হবে? গেছি আর কি! না না—বলে দাও, ও সব মৎলব চল্‌বে না। অনাথ ফনাতের এখানে আসা টাসা হবে না।" পিসীমা উমাকে মনঃপীড়িত করিবার আশঙ্কায় সব কথা খুলিয়া না বলিলেও, রুদ্রকান্তের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরই তাহাকে সব কথা শুনাইয়াছিল। ব্রত 'পচিবার' ভয়ে পিসীমা গোপনে যথাসাধ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম সংক্ষেপে সারিয়া লইলেন। অনাথের অবশ্য প্রাপ্য ছত্র পাদুকা বস্ত্রাদি তুলিয়া রাখা হইল। জন কয়েক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেও ত্রুটি হইল না। উমা একটা দানের জিনিষ স্পর্শও করিল না। পিসীমা ইহাতে দমিলেন না। কহিলেন—"ও তোমারই করা হয়েছে, আমার উপর ভার দেওয়া রইল, ওতে তোমারই ফল হবে।" উমা তখন অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সুপারি কাটিয়া স্তূপাকৃতি করিতেছিল। ফলাকাঙ্ক্ষায় তাহার চিত্ত কতখানি যে লুব্ধ, তাহার রেখাহীন ললাটে, অচঞ্চল মুখভাবে বা বদ্ধ-ওষ্ঠের বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইল না।

অভিমানিনী আত্মমর্য্যাদাশালিনী উমা সেই দিন হইতেই নিজের সম্বন্ধে সাবধানতা গ্রহণ করিয়াছে। তার জন্য কোন আবেদন নিবেদন পাছে কর্ত্তার কানে পৌঁছায়, এই ভয়ে সে তাহার সকল প্রয়োজন সংক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। তবু বিক্ষিপ্ত চিত্তটাকে জোর করিয়া টানিয়া আপনার গভীর ঔদাসীন্যের মধ্যে শান্ত সমাহিত করিয়া লইলেও সময় সময় দুঃসহ ক্লান্তিতে তাহার দেহ মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। চারিদিকের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার চিত্ত-বীণার তার ছিঁড়িয়া বেসুরা বেতালা বাজিয়া উঠে। তাই এই অতীতের স্মৃতিই তাহার নির্জীব হৃদয়ে সজীবতা, দ্বন্দ্বের মীমাংসায় সহনশক্তি যোগাইয়া দিয়া অচল ধ্যানাসনে তাহাকে অটল রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। আকাশ কুসুমে মালা গাঁথিবার প্রলোভনে সে নিজের চিত্তকে আর বিভ্রান্ত করিয়া তুলে না।

উমা যতটুকু দেখিতে পায়, কথাচ্ছলে সুধীরের নিকট যেটুকু জানিতে পারে, তাহাতে সতীনাথকে পিসীমা মুরারি বা দাসীদের বর্ণিত স্বেচ্ছাচারী বিলাসপরায়ণ প্রজাপতি-দলভুক্ত জীব বলিয়া কোন মতেই তাহার বিশ্বাস হয় না। অথচ তিনি নারীদ্বেষী শঙ্করাচার্য্যও যে নহেন, তাহাও ত সর্ব্বদা থিয়েটার প্রভৃতি দেখিতে যাওয়াতেই প্রমাণ। থিয়েটার সম্বন্ধে উমা নিজে অনভিজ্ঞ, মোহিনী বর্ণিত মানবের মেষত্ব প্রাপ্তির যুক্তিগুলি খাটাইতেও সে অসম্মত। তবু সেই বিশেষ নামবিশিষ্ট স্থানগুলি যে নারীবর্জ্জিত নহে, এ সংবাদটুকু সে ভালই জানে। গান বাজনায় উমার কোন আপত্তি ছিল না। দাদামহাশয়ও ত গান শুনিতে ভালবাসেন। কত দিন সন্ধ্যার সময়ে সেখানে কীর্ত্তন গান হয়। দাদামহাশয় নিজেও গান করেন। সে সব দেবসঙ্গীতে ভাবের স্রোত বহাইয়া শ্রোতা ও গায়কদের কি রকম মাতাইয়া তুলিত! এখানকার গায়ক বাদকের দল অধিকাংশই সতীনাথের সহাধ্যায়ী বা সমবয়সী। উমা লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাদের আনন্দ উৎসব কখনও শীলতা বা ভদ্রতার গণ্ডী ছাড়ায় না। ছাড়াইলে রুদ্রকান্তই যে সহ্য করিতেন, ইহাও কিছু সম্ভব নয়। রাত্রি দশটার পর মজলিস ভাঙ্গিয়া যায়।

খোলা জানালা দিয়া গানের সুর সময়ে ও অসময়ে উপরেও ভাসিয়া আসে। সুকণ্ঠ সতীনাথের মিষ্ট গলার সুরটুকু অনেক সময় উমাকে যেন উন্মনা করিয়াও তুলে, অজ্ঞাতে কখনও দুইটি মুক্তাধারা তাহার গণ্ড বাহিয়া মাটীতে ঝরিয়াও পড়ে। সে অনভিজ্ঞা, তবু মনে হয়, সে যেন বড় করুণ বেদনার সুর—গায়কের হৃদয়-বেদনারই সকরুণ অভিব্যক্তি। কিন্তু কেন? এত কি তাঁহার মনের ব্যথা। সে বুঝিতে চায়, কিছুই বুঝিতে পারে না। অন্ধকারে অজ্ঞাত অন্বেষণে হাতড়াইয়া বেড়ায়। শেষে অনেক ভাবিয়া সে একটা যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিল —বোধ হয়

স্ত্রী পছন্দ হয় নাই, এই তাঁহার দুঃখ। তাহার সহিত বিবাহ হওয়াই তাঁহার যত আপদের মূল।

দিনান্তে স্বামিসন্দর্শন সৌভাগ্য লাভেও উমা বঞ্চিতা। সতীনাথ যে সময় রুদ্রকান্তের নিকট আসিত, দৈবাৎ উমা সেখানে উপস্থিত ও কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, তবেই সে স্বামিদর্শনলাভে কৃতার্থ হইতে পারিত। তাই বা লজ্জাহীনার মত সাহস করিয়া কেমন করিয়া সেও চাহিয়া দেখিবে? মনের অদম্য বাসনা মনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়া অবগুণ্ঠনের মধ্যে নতনেত্রে কেবল ইষ্টদেবের চরণ দু'খানি দেখিয়াই সে তুষ্ট হইত। কণ্ঠস্বরসুধায় কর্ণ তাহার পরিতৃপ্তিলাভ করিত। পাছে চোখ তুলিলে তিনি দেখিতে পান, কত বেহায়াই না মনে করিবেন! তাই নত মস্তকেই বসিয়া লজ্জায় লাল হইয়া ঘামিয়া সারা হইত। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝিল, যাহার জন্য এত আড়ম্বর, তিনি এমনি উদাসীন যে উমা-নামধারিণী কোন বিশেষ সম্পর্কীয়া নারী যে তাহারই বিশ পঁচিশ হাত দূরে তাঁহার দৃষ্টিপাত সম্ভাবনার ভয়ে ঘামিয়া রাঙিয়া ও দ্রষ্টব্য হইবার গোপন ইচ্ছায় দুরু দুরু বক্ষে নিজের মনের কাছেই প্রাণের ভাষা লুকাইতে চাহিতেছে, তিনি যেন সুগভীর ঔদাসীন্যে বা তাচ্ছীল্যে তাহার উপস্থিতিটুকুও স্বীকার করিতে অসম্মত।

ক্রমে অভ্যাসে সতীনাথের অবহেলা তাহার সহিয়া গেল। এতদিন সে লজ্জায় জড়ীভূত হইয়া কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্যের মত নিজের দিকে তাঁহাকে মনোযোগী করিবার সুযোগ দিয়াছিল; ক্রমে এইটুকুই তাহার নিজের কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। যে স্বামী চাহিয়াও দেখেন না, দেখা অপরাধ বলিয়া মনে করেন, কথা কহিতে ঘৃণা বোধ করেন, পরের চেয়েও পর ভাবেন, দাসী চাকরের অধিকার দিতেও অসম্মত, তাঁহার সহিত আমারই বা কিসের এমন প্রয়োজন? ভিক্ষুকের মত কিসের প্রার্থনা? তিনি যেন মনে না করেন, গরীবের মেয়ের স্পর্দ্ধাও ত কম নয়—ছিঃ! তাই নিজের কোন ব্যথা, কোন দৈন্য সে বাহিরে প্রকাশ হইতে দিত না, মনের কাছে অস্বীকার করিতে চাহিত, মনকে ধমক দিয়া বলিত— সে কিছুরই প্রত্যাশী নয়; স্বামী ভালবাসেন না, নাই বা বাসিলেন! তাহাতে তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। সে কৈশোর হইতে শুনিয়া আসিয়াছে স্বামী শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজার পাত্র; তাই সে তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে—ভালবাসে না নিশ্চয়ই—মন তার এখনও শৈশবের মতই নির্ম্মল, রেখাহীন। আজ যদি ইঁহারা ছুটি দেন, সে হাসিমুখে অক্ষত মনে চলিয়া যাইবে, পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার মত কিছুই ফেলিয়া যাইবে না।

এইরূপ মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে গিয়া উমার চোখের পাতা

ভিজিয়া উঠে, বক্ষঃ কাঁপাইয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া যায়। এখানেও তাহার পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার আছে। সুধীরকে সে ভালবাসে। সে যখন দুই চোখে স্নেহ ভরিয়া একমুখ হাসি লইয়া 'বৌদি' বলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কখন মনোরঞ্জনের নানা উপায় গ্রহণে, কখনও আব্দার বায়নায় ব্যস্ত করিয়া তুলে, তখনই তাহার মনে হয় এখানেও সে একা নয়, এখানেও তাহার ভালবাসিবার, ভালবাসা পাইবার অভাব হয় নাই—তাহার ব্যর্থ জীবনও কাহারও কাজে লাগিয়া সার্থক হইযাছে।

২৩

উমার সান্ত্বনা

লেখাপড়ার কাজে যাহা কিছু উমাব প্রয়োজন, তাহা বালক-দেবর সুধীরের দ্বারাই পূর্ণ হইত। বৌদির কোন কাজ করিবার ভার পাইলে সেই ত বর্ত্তাইয়া যায়, বৌদির কিছু দরকার হয় না বলিয়াই তাহাব দুঃখ! এজন্য কতদিন সে রাগ করিত, আড়ি দিত, আবার সাধিয়া ভাব করিয়া ফেলিত। অনাথের কাছে উমা ছবি আঁকিতে শিখিয়াছিল, এখন সুবিধামত সুধীরের খাতা লইয়া তাহার ড্রয়িং আঁকার নকল করিত, কোন দিন দেয়ালে টাঙ্গান কোন দৃশ্যাবলীর ছবি আঁকিত। ছবি আঁকার দক্ষতায় সে সুধীরকে একেবারে বিস্ময়ে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। সুধীরের ইচ্ছা করিত, ছবিগুলি সে সতীনাথকে দেখাইয়া বৌদিব গুণপনা প্রচার করিয়া তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। কিন্তু বৌদি কিছুতেই রাজি হন না, এই জন্যই বিরোধ।

সুধীর 'কিশলয়' মাসিক পত্রের গ্রাহক। তাহাব নামে প্রতি মাসে কাগজ আসে। কোন মাসে তারিখের এতটুকু এদিক-ওদিক হইলেই কড়া তাগাদা যায়, কেন বিলম্ব হইল। এক দিন উমার নিকট সুধীর অনেক দিনের গোপন ইচ্ছাটি প্রকাশ করিয়া বলিল—"বৌদি, 'কিশলযে' তোমার লেখা দিতে হবে।"

উমার ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইযা উঠিল। বলিল—"মাপ কর ঠাকুরপো, ঐটি হবে না।"

সুধীর কহিল—"কেন, তাতে দোষ কি? এই ত নির্ম্মলা সেন, জ্যোৎস্নাবালা বসু, নীহারবালা ভঞ্জ—কত মেয়ে লেখে; তোমার লেখা দিলে কি দোষ শুনি?"

কি দোষ তাহা উমার বুঝান কঠিন। সে লজ্জিত নতমুখে বলিল—"মেয়ে মানুষের লেখা—ছিঃ, কেউ দেখ্‌বে যে?"

"বা রে, দেখ্‌বার জন্যেই ত লেখা। সে হবে না, তোমায় দিতেই হবে।"

নাছোড়বান্দা সুধীরের সঙ্গে না পারিয়া অবশেষে উমা সম্মত হইল। বলিল—"আচ্ছা দেব, নাম কিন্তু বদ্‌লাতে হবে। আমার নামে দেব না, মাগো! না, সে হবে না।"—সতীনাথের পাছে চোখে পড়ে, এইটুকুই উমার সর্ব্বাপেক্ষা ভয়।

সুধীর হাসিয়া কহিল—"আচ্ছা, আমার নামেই দিও, দাদাকে একেবারে চম্‌কে দেওয়া যাবে। জান বৌদি, সেদিন অমরবাবু তোমার কথা দাদাকে জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন, তুমি লেখাপড়া কেমন জান, এই সব। দাদা কি বল্লেন জান?—'ভট্‌চায্যি' বাড়ীর মেয়েরা টোলের ছাত্রদের ভাত বাঁধ্‌তে আর ঠাকুর পূজো করতে শেখে, আর কিছু শেখে না।' তুমি দাদাকে কিছু বল্‌তে দাও না,—আমার এমন রাগ হয় তোমার ওপর!"

উমা হাসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে কহিল—"ঐ ত মস্ত প্রশংসাপত্র ঠাকুরপো। কিন্তু আমি যে তাও শিখলুম না। এইবার পিসীমাকে বলতে হবে—আমায় রাঁধ্‌তে শেখাতে।"

সুধীরও হাসিল। বলিল—"কিন্তু আমরা ত কেউ টোল কর্‌ব না, খাবে কে?"

"আমাব রান্না? কুকুর বেরালে।"

উমা কথাটা পরিহাসের ভাবে কহিলেও, তাহার কণ্ঠস্বরের ঈষৎ কম্পনে হাসির সহিত নেত্র তাবকার সজল আর্দ্রতায় বেশ মিল খাইল না। বালক সুধীর বিস্মিতভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে নতমুখে হাসিয়া বলিল—"নিজেব রান্না ঠাকুর কুকুর আর নিজের কাছেই ভাল। তুমি যদি খেতে রাজী থাক ঠাকুরপো, আমি রাঁধ্‌তে শিখি।"

সুধীর উমাকে হাসিতে দেখিয়া খুসী হইল। বলিল—"বাহবা, খেতে রাজী থাক্‌ব না কি রকম? পেলে ত বেঁচে যাই।"

উমা সত্যই খুসী হইল। সেও কাজ খুঁজিতেছিল, উপবপড়া হইয়া কাহারও নিকট জবরদস্তি করিতে তাহার সাহস হয় না। সুধীরের দোহাই থাকিলে কাজটা সহজ হইয়া যাইবে। কেহ না মনে কবেন যেন, সতীনাথের জন্য তাহার কাজ করিতে চাওয়া। অনাসক্ত থাকিয়াও অহরহ সতীনাথ যে পূজারিণীর সেবা গ্রহণ করিতেছিল, সে তাহাতে অনভিজ্ঞ। স্বার্থবোধহীনা উমা দান করিয়াই তৃপ্তি পাইতে চায়, প্রতিদিন পাইবার কোন আশাই ত সে রাখে না।

উমা এখন আর নিতান্ত বালিকা নয়, অবস্থাই তাহাকে বয়সের অধিক অভিজ্ঞতা আনিয়া দিয়াছে। স্বামীর ব্যবহার যে সাধারণের সহিত একশ্রেণীর নয়, বরং সম্পূর্ণই বিপরীত, তাহা সে ভালই বুঝিতে পারে। কারণ খুঁজিতে গিয়া অনেক সময় অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া বেড়ায়, ধরিতে পারে না। তবু মনে হয়,

সতীনাথের মনে যেন কি একটা আছে, কিন্তু সেটা যে কি, সেইটুকুই তাহার বোধগম্য হয় না।

রুদ্রকান্তের কাছে অনেক সময়ই তাহাকে হাজির থাকিতে হয়। বার্দ্ধক্যে যত না হউক, কার্য্যাভাবে তাঁহার শরীরে একটা না একটা বৃহৎ ব্যাধি লাগিয়াই আছে। বাড়ীশুদ্ধ চাকর দাসী সরকার গোমস্তা হইতে বালিকা বধূ উমাকে পর্য্যন্ত এজন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়। কখন তাঁহার রোগের গতি কোন পথে প্রধাবিত হইবে, তাহার জন্য সতর্ক সাবধানতার সেবার সহিত প্রয়োজন। সেবাপরায়ণা কর্ত্তব্যে অনলস শিক্ষাপ্রাপ্তা উমা ইহাতে ক্লেশ অনুভব করিত না, বরং খুসীই হইত। তাহার দুঃখ, রুদ্রকান্তের তীব্র বাক্যাবলীতে। উমার অপরাধে উমাকে যত খুসী বকুন, গালি দিন, কিছুই যায় আসে না। কিন্তু রুদ্রকান্ত যে তাহার ৺পিতা এবং দেবতুল্য দাদামহাশয়ের উদ্দেশে অযথা কটুকথা শুনাইয়া দেন, সেই ব্যথা তাহার বুকে বাজিতে থাকে। পিতৃগৃহে অবস্থান কালে বধূর লাঞ্ছনা সে কখনও দেখিবার সুযোগ পায় নাই। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ও কলহশিক্ষা বাঁচাইয়া বিদ্যানাথ তাঁহার পৌত্রীকে অধিকাংশ কাল পাঠে ও গৃহকার্য্যে বদ্ধ রাখিতেন। সকাল বেলা নিজ বাগানে ফুল তুলিবার সময় সঙ্গে লইয়া কত মৌখিক শিক্ষা দিতেন, সন্ধ্যায় নিজের সঙ্গেই বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। দাদামহাশয় তাহার মাকে মা বলিয়া ডাকেন, কন্যার মতই স্নেহ করেন, তাই যে সব মেয়ে ছোট বেলায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া অপরিপুষ্ট অবস্থাতেই পাকিয়া উঠে, উমার ভাগ্যে তেমন সুযোগ না ঘটায়, পিতৃ-পিতামহের লাঞ্ছনাভোগ অনেক বধূর ভাগ্যেই যে ভাত কাপড়ের মতই স্বামিগৃহে অবশ্য প্রাপ্য, সে সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে রুদ্রকান্তের কটু-কাটব্য হয় ত তাহার এত অসহনীয় মনে হইত না। সতীনাথের অদ্ভুত ব্যবহারও তাই অন্যের মনে যত শীঘ্র প্রকাশ পাইত, সংসারজ্ঞানহীনা উমার মনে সহজে ও তত শীঘ্র ধরা পড়ে নাই। তাঁহার অবহেলার ভাবটুকু সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলেও, কারণ নির্ণয়ে বা অধিকার স্থাপনের ব্যগ্রতায় তাহাকে ব্যাকুল করিতে পারে নাই। স্বামীর চরিত্রে কোন গভীর রহস্য অথবা ঘৃণিত পঙ্কিলতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কি না, সে প্রশ্ন তাহার মনে উঠিতও না। অযোগ্য বোধে স্বামী ভালবাসেন না, এইটুকু ভাবিয়াই সে মনের কাছে সাফাই দিয়া রাখিয়াছিল। ভালবাসা ত আর জোরজবরদস্তিতে হয় না। সেদিন পিসীমার সহিত এই সম্বন্ধে কি বচসা হওয়ায় সতীনাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কথা বলিয়াছিলেন। উমার দুর্ভাগ্যক্রমে পাশের ঘরে থাকায় সেটুকুও তাহার কান এড়ায় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—"গরীবকে বিনাপণে কন্যাদায়ে উদ্ধার করা হয়েছে, ঐ ঢের হয়েছে। তোমরাও

কুলীনের মেয়ে বৌ পেয়েচ। এর উপর যদি নিত্য এমন করে জ্বালাতন কর, হয় ওকে পাঠিয়ে দেব, নয় দেশত্যাগী হয়ে চলে যাব—এই বলে দিলাম দেখে নিও।"

ভয় পাইয়া পিসীমা সেই হইতে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করা ছাড়িয়া দেওয়ায় উমাও যেন হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। তাহার ভাগ্য লইয়া চারিদিক হইতে যখন সহানুভূতির 'আহা উহু' শব্দ উঠে, তখনই লজ্জায় মাটীর সহিত মাটী হইয়া মিশাইতে ইচ্ছা করে। নতুবা স্বামীর উপর তাহার কোন রাগ নাই—ক্ষোভের ব্যথা আছে কি না সে তাহা বুঝিতে চাহে না। সতীনাথের মুখে এমন কোন অপরাধের চিহ্ন সে দেখিতে পায় না, যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে মনকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে পারে। রুদ্রকান্তের সঙ্গ কঠোর হইলেও সে এড়াইয়া চলিতে চাহিত না। ইহাকে ছাড়িয়াই বা দীর্ঘদিনরাত্রি সে কি অবলম্বনে কাটাইতে সক্ষম হইবে? বরং কোন দিন কাজে বদ্ধ থাকিয়া কাছে না আসিলে তিনি যে 'খোঁটা' দেন, সেইটুকুই তাহার মনে আত্মীয়তার দাবী বলিয়া মনে হয়। ঐ যে একজন তাহার পানে চাহিয়া দেখেন না, দেখা উচিত মনে করেন না, বাঁচিল কি মরিল খবর লন না, তাহা অপেক্ষা যিনি কাছে থাকিতে দিয়া দুইটা কড়া কথা শুনাইতে চান, তিনি কি অধিক পর? বয়স বেশী হইলে মানুষ খিটখিটে হয়—সবাই ত আর দাদামহাশয়ের মত হইতে পারে না।

এই বলিয়া নিজ মনকে উমা সান্ত্বনা দেয়। রুদ্রকান্তের কটুকথাও সে অনেক সময় উদাসীনভাবে সহিয়া যায়, নিতান্ত মর্ম্মান্তিক না হইলে চোখে জল আসে না।

২৪

উমার চিঠি

সেদিন একাদশী, রান্না খাওয়ার ঝঞ্ঝাট নাই। বিদ্যানাথ একাদশীর দিন সারাদিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রে সামান্য একটু দুগ্ধ ও কিছু ফল গ্রহণ করেন। অনাথ কোথায় নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছে। রাজলক্ষ্মী ঠাকুরঘরে। অন্নপূর্ণা পৈতা তুলিবার সরঞ্জাম-পত্র ও একটা ছোট তামার টাটে একটুখানি জল লইয়া দাওয়ার একপাশে চুপ করিয়া একা বসিয়াছিল। যে কাজের জন্য আড়ম্বর, তখনও পর্য্যন্ত সে তাহাতে হাত দেয় নাই। তাহার কোলের উপর একখানা আধখোলা চিঠি—দৃষ্টি মেঘরঞ্জিত আকাশেরও উর্দ্ধে। সে কি ভাবিতেছিল, অথবা কিছুই ভাবিতেছিল কি না, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না।

চিঠিখানি উমার হাতের লেখা; সেইদিন সকাল বেলা আসিয়াছে, এবং খুব কম হয় ত বার কুড়ি পড়া হইয়া গিয়াছে। তবুও অন্নপূর্ণার মনে হইতেছিল,

সবটুকু বুঝি ভাল করিয়া এখনও পড়িয়া দেখা হয় নাই, তাড়াতাড়ি কোন অংশ হয় ত ছাড়িয়া গিয়া থাকিবে। এই দুপুর বেলার দীর্ঘ অবসরকালে তাই আর একবার ভাল করিয়া পড়িবার জন্য চিঠিখানি হাতে করিয়া সে বসিয়াছিল।

চিঠি পড়া শেষ হইয়া গেল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অসাবধানতায় কোন লিখিত অংশ যে অপঠিত রহিয়া গিয়াছে, এমনও মনে হইল না। তবু প্রত্যেক বারের মত এবারও তাহার সারাদেহ কণ্টকিত করিয়া, উমার হাতে লেখা এক একটি কালির অক্ষর উমাকেই যেন ফুটাইয়া তুলিয়া তাহার সেই স্পর্শসুখটুকু চিত্তে যেন জাগাইয়া দিল। সেই উমা, তাহার বুকের অস্থিপঞ্জরের সহিত মিশান, যাহাকে সে এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল করিতে জগৎ শূন্য দেখিত, সে আজ দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ—দুই বৎসরেরও অধিক কাল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। হয় ত চিরদিনের জন্যই সে চলিয়া গিয়াছে, আর কখনও এ গৃহে ফিরিবে না। এই নীরস প্রাণহীন গৃহখানা হয় ত তাহার কলহাস্যে মিষ্ট কথার কাকলিতে আর কখনও প্রাণ ফিরিয়া পাইবে না। কেন সে আসিবে? সে যে যাইবার দিনে জোর করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়াছিল—"আমায় তোমরা কোথাও পাঠিয়ো না দিদি, তোমাদের ছেড়ে একদিনও আমি কোথাও থাকতে পারব না"- তবু তাহারা তাহাকে জোর করিয়া বক্ষঃচ্যুত করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াছে। তখন আশ্বাস দিয়াছিল, দিন দুই তিন পরেই তাহাকে লইয়া আসিবে। সেই তিন দিন প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল; কে জানে আরও কত বৎসর হইবে!

অনিচ্ছাতেও অন্নপূর্ণা মন হইতে একটা চিন্তাকে কিছুতেই তাড়াইতে পারিতেছিল না। ধনী কুটুম্বের আশায় লুব্ধচিত্ত হইয়া তাহারা মা ও মেয়ে দুজনে মিলিয়া স্নেহের ধনকে যে ইচ্ছা করিয়াই নির্ব্বাসন দিয়া স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিয়াছে! নতুবা এ গৃহ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইবার উমার ত প্রয়োজন ছিল না! ভবিষ্যদ্দর্শী দাদামহাশয় ত এ দিনের কথা আগেই ভাবিয়াছিলেন। তাহার উপায়ও তিনি ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনাথের মত স্বামী—সেও কি অল্প তপস্যার ফল?

অন্নপূর্ণা এই চিন্তাটাকে এইখানেই তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া ফেলিল। বিবাহিতা উমার সম্বন্ধে এ চিন্তাও মনে আনা উচিত নহে। উমা কেমন আছে, সুখে আছে কি না, এই প্রশ্নটিই তাহাকে দিনরাত পীড়িত করিয়া তুলিতে থাকে। সতীনাথ তাহাকে ভালবাসে কি না? স্বামিসৌভাগ্যে ভাগ্যবতী সে,—এইটুকু জানিতে পারিলে যে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও ত মনে হয় না। তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া এ আশা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়। তাহারা কি উমার

মূল্য বোঝে—তাহাকে তাহার যোগ্য প্রাপ্য দিতে পারে? সেই হৃদয়হীন সংসারে কে তাহার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইবে? কে তাহার আত্মীয়বিরহ বেদনাকে ভালবাসা দিয়া ভরাইয়া পুরাতনের স্থান নূতনে পূর্ণ করিয়া তুলিবে? হয় ত না খাইয়া পড়িয়া থাকিলেও কেহ ডাকিয়া খাওয়ায় না। স্বামী! কে জানে সতীনাথের ব্যবহার কেমন! উমাকে সাহস করিয়া এ কথা সে চিঠিতে জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। উমার চিঠিতে শুধু যে উমারই সম্পূর্ণ অধিকার নাই, বুদ্ধিমতী অন্নপূর্ণার তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। অর্দ্ধেক চিঠি উমা যে পায় না, তাহার চিঠিতেই ইহার প্রমাণ। উমা যে সব কথা খুলিয়া বলে না, তাহার বুকের ভিতর যে গোপন ব্যথা লুকান রহিয়াছে—তাহার গোপনতার চেষ্টাতেই যে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। গানে যেমন ভাষার অপেক্ষা সুরের প্রয়োজন অধিক, অর্থ না থাকিলেও গান করা চলে, কিন্তু সুর এতটুকু বিকৃত হইলে গানের সরসতা মধুরতা সব ফুরাইয়া যায়, উমার চিঠিতেও তেমনি ভাষার আড়ম্বর যতই থাক—'সুখে আছি', 'সুখে আছি' শব্দ বহন করিয়া কালির অক্ষরগুলা যতই চীৎকার করিতে থাকুক, অন্নপূর্ণার কানে সে সুর যেন বেসুরাই বাজিতে থাকে। দাদামহাশয় তাহাদের খবর লইতে গিয়া যতটুকু বুঝিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে এই আশঙ্কারই যে পোষকতা করে। সতীনাথের সাক্ষাৎই ত মিলে না। হয় দেশ ভ্রমণে, নয় অন্য কোথাও—বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকাই যেন তাহার অভ্যাস। কদাচিৎ দেখা হইয়া গেলেও যেন দেখে নাই এমনিভাবে চলিয়া যায়, একটা প্রণাম পর্য্যন্ত করে না—করিতে বোধ হয় ঘৃণা বোধ করে। যাঁহার সহিত কথা কহিতেও তাহাদের ঘৃণা হয়, তাঁহারই পৌত্রী উমা—সে কি তাহাদের স্নেহ সম্মান পাইতে পারিয়াছে? মনে ত হয় না।

মনে পড়িল অতীতের সেই পুরাতন কথা। বিবাহের পর দিন সতীনাথ বন্ধুর নিকট যে কথা বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছিল, সেই কথাই কি তবে সত্য? উমা তাহাদের গৃহের কর্ত্রী, কুলমর্য্যাদা-রক্ষাকারিণী স্ত্রী, স্বামীর প্রণয়ভাগিনী সহধর্ম্মিণী নয়! অন্নপূর্ণা মনকে বুঝাইতে চাহিল—সে তামাসার কথা,—তাও কখন হয়? 'নিজের নাসিকাচ্ছেদনে পরের যাত্রাভঙ্গের' মত এ যে একান্তই শিশু-চাপল্য!

উমার চিঠি শুনিয়া রাজলক্ষ্মী বার বার অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন, তবু চোখের জল শুকাইতে চাহিতেছিল না। এ অশ্রু ঠিক আনন্দাশ্রু নয়, তবু বেদনার ভিতরেও অনেকখানি আনন্দের গোপন-ধারা অন্তঃসলিলা নদীটির মতই ভিতরে ভিতরে বহিতেছিল। মনে মনে কহিলেন—"মা আমার যেখানেই থাকুন—সুখে থাকুন; সিঁদুর নোয়া বজায় রেখে সেই ঘরই করুন।" জামাতার উপর ঈষৎ অভিমানও হইত; জোর করিয়া সে অভিমান দূর করিতে চেষ্টা করিতেন।

গুরুজনের চোখের জলে অকল্যাণ আনে। সতীনাথ কেন, অতিবড শত্রুও যেন কখনও সন্তান-মুখ দর্শন-সুখে বঞ্চিত না হয়। উমার যখন মেয়ে হইবে, উমা যেন বৎসরান্তে তাহার কন্যা-জামাতার মুখ দেখিয়া সারা বছরের বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলিয়া যাইতে পায়। সরলচিত্তা রাজলক্ষ্মী শুধু বর্ত্তমান নয়, ভবিষ্যতেব জন্যও কন্যা-জামাতার কল্যাণ কামনায় তাহাদের ভবিষ্যজীবন-পথের বাধা বিপত্তি ধূলা জঞ্জাল সাফ করিয়া রাখিলেন। উমা লিখিয়াছে, সে সুখে আছে, এই টুকুই যে যথেষ্ট। সে সুখে থাকিলেই হইল। তিনি ত যাত্রা করিয়াই বসিয়া আছেন, ডাক আসিতেই যেটুকু বিলম্ব। নিজের জন্য সংসারের লাভলোকসানের হিসাব লইবার তাঁহার আর প্রয়োজনই বা কি ?

এ জগতে বিশ্বাসী চিত্তই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। তাই রাজলক্ষ্মী যাহাতে মনে শান্তি পাইয়াছিলেন, অন্নপূর্ণা তাহাকে পাইল না। উমা ভাল আছে, সুখে আছে, স্বামীর প্রেমে সে এখানকাব বিবহক্ষোভ ভুলিতে পাবিয়াছে—এই সত্যটুকু তাহাকে কে বুঝাইয়া দিবে। যাহা অত্যন্ত সম্ভব, বিধিনির্দ্দিষ্ট নিযম, তাহা যে উমার ভাগ্যেই ঘটিবে না, এ কথা, এ সন্দেহ কেন কেবলই তাহাব মনে জাগিয়া উঠিতে চায়, সে তাহা বুঝিতে পারে না।

অনেক সময় সে ভাবিতে চেষ্টা করে, সকল মেয়েই ত বিবাহেব পর স্বামিগৃহে যায়, তাহাদের ত আত্মীয় স্বজনকে ছাডিয়া থাকিতে হয়, দুঃখ ব্যথা হবে বৈ কি, কিন্তু ক্রমে তাহাও সহিয়া যায়। জ্ঞানবৃদ্ধিব সহিত যখন স্বামিপ্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে শিখে, তখন চিরদিনের আত্মীয়দের বিরহ-ব্যথা স্বামীর প্রেমে, স্বামীব যত্নে ভুলিতে পারে—সেই ঘরকেই আপন করিয়া লয়। আর সেইরূপ কবিয়া লইতে পাবাই যে তাহাদের জীবনের সার্থকতা। উমার জীবনও কি তবে সার্থক হইয়াছে ? শুধু এই কথাটুকুই যদি জানিতে পারিত, যদি একবার উমাব হাসিমাখা মুখখানা দেখিয়া, তাহার সলজ্জ কণ্ঠের আনন্দ সঙ্গীতে শুনিতে পাইত সে সুখী, তাব পব চিবজীবনের জন্য বিচ্ছেদ, সেও সহনীয়। তা কি হয় না ?

"দিদি!"—ডাক শুনিয়া অত্যধিক রূপে চমকাইয়া অন্নপূর্ণা স্বপ্নাভিভূতদৃষ্টি নামাইল।

"ক রে, কল্যাণি!"

"দিদি, অমন করে কি ভাব্‌ছিলে ভাই ?"

"ভাব্‌ছিলুম"—বলিয়া একটুখানি হাসিয়া অন্নপূর্ণা কল্যাণীর সমবেদনাব্যঞ্জক মুখের পানে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল। বলিল—"কতক্ষণ এসেছিস্ কল্যাণি ? কাকীমা কি কচ্চেন রে ?"

"মা রামায়ণ শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন, তাই মোক্ষদাকে সঙ্গে করে চলে এলাম। দিদি, আজ যাওনি যে? ওঃ—আজ যে একাদশী"—বলিয়া সে নিজের প্রশ্নের মীমাংসা নিজেই করিয়া লইল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিল—"তাই বুঝি যাইনি। একাদশীতেই ত আরো সুবিধে রে; রান্না খাওয়ার ল্যাটা নেই, সময় পাওয়া যায় কত? মনে করেচি কাল দ্বাদশীতে বামুনের হাতে দুটো হাতে-কাটা পৈতে দেব। পাঁজটা পাকিয়ে দে ত ভাই।"

কল্যাণী খানিকটা তুলা লইয়া পিঁজিতে পিঁজিতে কহিল,—"গাছের তুলো বুঝি? এখনও বিচি ছাড়ান হয়নি যে! এই রকম করে বুঝি পৈতে তুল্‌বে? তবেই তোমার বামুন পরেচে দিদি! বল্লে না, কি ভাব্‌ছিলে?"

তাহার সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে অন্নপূর্ণা বেদনা পাইল। ভাবিল, আহা কল্যাণী কেন সাধ করিয়া তাহাদের দুঃখের ভাগ লইতে চায়!

"আজ উমার একখানা চিঠি পেয়েছি"—বলিয়া অন্নপূর্ণা চিঠিখানি পাশে রাখিয়া দিয়া কল্যাণীর নিকট হইতে একটা পাঁজ লইয়া টেকোয় সূতা কাটিতে সুরু করিল।

কল্যাণীর মনটা সেই চারি ভাঁজ করা ফিকানীলরঙের কাগজখানার ভিতরকার গোপন সংবাদটুকু জানিবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিয়া মধুলোভাতুর মধুমক্ষিকার মত তাহারই আশে পাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। তবু সে তাহার বিদ্রোহী চক্ষুকে তৎক্ষণাৎ শাসন করিয়া সেদিক হইতে ফিরাইয়া লইল। কোন প্রশ্ন না করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তুলার পাঁজ পাকাইতে লাগিল। কিন্তু মন যত চেষ্টা করিতে চাহিতেছিল, হাত অবাধ্যতা করিয়া ততই পিছাইয়া পড়িতেছিল—কে জানে উমা কি লিখিয়াছে, কাহার কথা কেমন করিয়া কোন্ রাগিণীতে বাজিয়া উঠিয়াছে?

এক সময় কাজের মধ্যেই অন্নপূর্ণা মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। তাহার অসম্ভব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ দেখিয়া তাহাকে অন্যমনা করিবার ইচ্ছায় কহিল—"আচ্ছা কল্যাণি, সতীনাথ কি উমাকে সত্যি সত্যিই ভালবাসে? বাসে বোধ হয়—না রে? তাকে ভাল না বেসে কেউ কি থাক্‌তে পারে?"

অন্নপূর্ণা শত সহস্র বার মনের ভিতরকার উত্থাপিত এই প্রশ্নটা কল্যাণীকে মীমাংসা করিবার ভার দিতে গিয়া তাহা অন্য অন্য বারের মত আপনিই মীমাংসা করিয়া লইল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"যে যেমন স্বামীই হোক্‌, বিয়ের পর সবারই বোধ হয় পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। কি বলিস্‌ কল্যাণি, হয় না রে?"

বিবাহিতের কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে মনের ভাব কি প্রকার হওয়া সম্ভব, এবিষয়ে কল্যাণীর অভিজ্ঞতা তাহার অপেক্ষা যে সমধিক অগ্রগামিনী নয়, অন্নপূর্ণার তাহা মনে হইল না। কিন্তু কল্যাণী গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া মুখখানাকে অত্যধিক লোহিতাভায় রঞ্জিত করিয়া নতমুখে তূলার চুপড়ীতে মনোনিবেশ করিল। তাহার কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিয়া কেবলই মনে হইতেছিল—এ কি প্রশ্ন ? অন্নপূর্ণা কি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া তাহার মন জানিতে চাহিতেছে ? না, না—তাহা সম্ভব নয়।

কল্যাণী জোর করিয়া নিজের সহসাগত দুর্ব্বলতাকে তাড়াইয়া দিবাব চেষ্টা করিল। দিদি কখনও ইচ্ছা করিয়া যে তাহার মনে কষ্ট দিবে না, এ বিশ্বাস তাহার যথেষ্ট ছিল। সে জোর করিয়া এই আলোচ্য বিষয়টাকেই সহজ করিয়া দিবার ইচ্ছায় কহিল—"উমা কি লিখেচে দিদি ? তা—সে ভাল আছে ত ?"—বহুবচনান্ত 'তাহারা' কথাটা বলিতে গিয়াও তাহার মুখে বাধিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—"ঐ খানেই ত গলদ রে, তাদের বাড়ীর কুকুরটা বেড়ালটার পর্য্যন্ত খবর আছে, কেবল তারা দুজন বাদ। সেই মিষ্টি স্বভাব বুড়োটির বাতের অসুখ বেড়েচে, ডাক্তার কি বলেচে, সব কথাই সে লিখেচে। যেন সেই চমৎকার স্বভাব মানুষটির ভাল থাকা না থাকার চিন্তায় আমাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হয়েছিল। সতীনাথের কথা বল্‌তে যদি তার লজ্জাই করে, নিজের কথা ত বল্‌তে পার্‌ত ? নাঃ, তাব স্বভাব এতদিনে এতটুকুও বদ্‌লাল না। নিজের কথা সে কখনও ভাব্‌লে না।" একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিল—"সেখানে তার কথা ভাব্‌বার কেউ আছে, শুধু এইটুকুই যদি সে জানাতে পার্‌ত।"—বলিতে চক্ষু-পল্লব ভিজিয়া কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইয়া তুলিল। সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া পার্শ্বের চিঠিখানার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"এই যে চিঠিখানা, পড়ে ছাখ্‌না। এ যেন তার ছেলেমানুষ দিদিকে সান্ত্বনা দেওয়া। সেই যেন বুড়ো হয়ে গেছে, তার দিদি দিন দিন ছোটই হচ্চে।"

কল্যাণী উঠিয়া অস্বাভাবিক দ্রুততার সহিত কহিল—"জ্যেঠাইমা বুঝি ঠাকুরঘরে ? যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি আগে।"

কল্যাণী চলিয়া গেলে অন্নপূর্ণা প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ঐ সুকুমার কুসুমপেলব ক্ষীণ দেহখানির ভিতর কত বড় উদার অন্তঃকরণই না জাগিয়া রহিয়াছে ! যে জগৎকে আপন ভাবিয়া জগতের সুখ দুঃখকে নিজের অন্তরে লইয়া ভালবাসিতে শিখিয়াছে, সেই না মানুষ ? নিজের নিজের সুখ দুঃখ লইয়া যাহারা জীবন যাপন করে, তাহারা যে চিরদুঃখী। যে পরের সুখ দুঃখকে নিজের সহিত যোগ করিয়া লইতে পারে, তাহার দুঃখ যত

বড়ই হোক্, সুখও যে অপরিসীম। বিশ্বব্যাপী আনন্দের সে অধিকারী। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল—"বুঝি দাদামশায়ের অমন সব অমূল্য উপদেশও আমার কাছে বৃথা হয়ে যায়! কই মনে রাখ্‌তে পারি? মনে ত হয় না, জগতের সকল মেয়ে আমার উমা! কল্যাণীতেই যখন তাকে মিশিয়ে দিতে পাল্লাম না, তখন আর কিসে পারব? মা কল্যাণীকে পেয়ে অনেকখানি সান্ত্বনা পেয়েছেন। দাদাও ওকে খুব স্নেহ করেন। আমিও কি ভালবাসি না? বাসি বই কি; তবু কল্যাণী—কল্যাণী। তাকে বুকে টান্‌লে বুক জুড়িয়ে যায় না। সে আমার সকল দুঃখ দূর করা উমা নয়।"

২৫

উমা সান্ত্বনা পাইল

উমা যখন পিসীমার কাছে কাজের জন্য আবেদন জানাইল, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"থাক্ থাক্, তুমি আবার কি কাজ করবে? ছেলেমানুষ, উপরে যাও।"

উমা অনুনয়ের স্বরে কহিল—"কেন করব না পিসীমা, তুমি কি বার মাসই খাট্‌বে, আর আমি চুপ করে কেবল বসে থাকব?"

পিসীমা আর্দ্র হইয়া কহিলেন—"করবে বৈ কি মা, আমি মরে গেলে তোমাকেই ত সব করতে ধরতে হবে; তুমি ছাড়া কে আর ওদের যত্ন নেবে বল? রাঁধুনী বামুনের রান্না আর চাকর-দাসীর যত্ন, এতে কি আর বাছাদের শরীর টেঁক্‌বে! তা যে ক'দিন আমি আছি, তোমায় কোন কষ্ট করতে হবে না মা, তুমি উপরে যাও।"

উমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল—"কাজ করতে কষ্ট কেন হবে পিসীমা! তা হলে তুমি কি করে কর?"

পিসীমা খুসী হইলেন; সত্যই ত, কাজ না করিয়া হস্তবিহীন দেবতাটির সহিত উপমেয় হইয়া বসিয়া থাকার মত কষ্টকর অবস্থা তাঁহার কর্ম্মঠ প্রকৃতিতে একেবারেই সহনাতীত। তাঁহারা পল্লীগ্রামের মানুষ, সেখানে গরীব বড়লোক সকল ঘরের মেয়েদেরই কাজ করিতে হয়, স্বামী-পুত্রের জন্য সে পরিশ্রমে তাহারা কষ্ট ত অনুভব করেই না, বরং আনন্দই পাইয়া থাকে। কিন্তু এ সহর, এখানকার আইন-কানুন যে স্বতন্ত্র। এখানে ৫০৲ টাকা মাহিনার বাবুকেও বামুন চাকর রাখিয়া সংসার চালাইতে হয়, অগ্নিতাপে স্ত্রীর মাথা ধরে, অম্বলের বেদনা বৃদ্ধি হয়—আরও কত কি! বড় ঘরের ত কথাই নাই, তাঁহাদের বধূ-কন্যারা বিধাতা-পুরুষের কাছে গৃহকর্ম্মের ও স্বামী-পুত্রের সেবার ভার দাসী চাকরদের উপর

মৌরসী পাট্টা দিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাজে মধ্যে কেশ-বেশ তদারক, নভেল পড়া, তাস খেলা, থিয়েটার দেখা, বড় যদি বেশী করিলেন ত লেশ বোনা, কার্পেটে ফুল তোলা পর্য্যন্তই যথেষ্ট—এবং বৎসরান্তে একটি করিয়া রুগ্নদেহ ক্ষীণ আয়ু পুত্র প্রসব করিয়া পরিজনবর্গকে কৃতার্থ করা। কদাচিৎ কোন বধূর ভাগ্যে যদি ইহার বিপরীত ফল ঘটিয়া যায়, অর্থাৎ নীচপ্রকৃতি শাশুড়ী বা শরীরতত্ত্বে অনভিজ্ঞ স্বামী বা অপর কোন অভিভাবক যদি জোর করিয়া অকারণে খাটাইয়া লইতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাকে সখীমহলে দুর্ভাগিনী আখ্যাই দেওয়া হয়! যাহার অর্থ আছে, সে কেন পরিশ্রম করিবে? অক্ষম স্বামীর স্ত্রীই ঘরকন্নাব কাজ করিয়া খাটিয়া মরে। একবার কোন বড়লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়া সেখানকার জাঁকজমক দেখিয়া ধনী ব্যক্তিব ভ্রাতৃবধূ-সম্পর্কীয়া এক তরুণী আক্ষেপ কবিয়া বলিয়াছিলেন—"যে স্বামী এমন মার্ব্বেল বিছানো তেতলা বাড়ীতে স্ত্রীকে না রাখ্‌তে পার্‌লে, তার গলায় মালা দেওয়ার চেয়ে যমের গলায় মালা দেওয়া ভাল।" ভাগ্যবতী ভাসুরপত্নীর সমক্ষেই এ কথা উল্লেখেও লজ্জাবোধ করেন নাই—বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষা এমনই শোচনীয়রূপে সমাজবক্ষে আশ্রয় লইয়াছে।

পিসীমা তাঁহার বধূকে ঈদৃশ দুর্ভাগিনীদের দলভুক্ত কবিতে ইচ্ছুক না থাকায় কহিলেন—"আমাদের কথা ছেড়ে দাও বাছা, আমাদেব হল সেকেলে হাড়। এসব হাড় কি ঝড়ে ভাঙ্গে, না আগুনে পোড়ে? তোমরা দুধেব ছেলে, কষ্ট পাবে কেন? যাও মা, ঘবে বসে পশম টশম বোনগে, নয় ত বই টই পড়গে। একটা সমবয়সী ত নেই! একি আমাদের পাড়াগাঁ, যে দুপুর বেলা পাড়াব মেয়েয় বাড়ী ভবে যাবে? তাস খেল, দশ-পঁচিশ খেল, গল্প গুজব কব,—এ যেন পিঁজ্‌রেব মধ্যে ভবে থাকা! মুয়ে আগুন সহরের। তাই কি ছেলেই ঘরবাসী হল। কোন্ ডাইনি কানে যে কি মন্তর দিলে—"

লজ্জায় আপাদমস্তক রাঙ্গা হইয়া উমা এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দিবাব ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি কহিল—"সেখানে মা আমায় সব কাজই করতে দিতেন। মা বল্‌তেন,—'মেয়েমানুষের কাজকর্ম্ম করে সময় থাকলে তবে ওসব কর্‌তে হয়।" —বলিল না যে, পুস্তক পাঠের স্বাধীনতাও তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ। মেয়েমানুষের লেখাপড়া রুদ্রকান্ত দেখিতে পারেন না। উমার নামে কোন চিঠি আসিলেই তিনি তাহাকে সজাগ করিয়া সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন! পশম বোনায় রুদ্রকান্তের খুব বেশী আপত্তি না থাকিলেও তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কতটুকু। স্বামীর জন্য এ সব কাজ করিবার তাহার অধিকার নাই! রুদ্রকান্ত ও সুধীর—তাহাদের কত বেশীই বা প্রয়োজন!

উমা যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা তাহার কথার স্বরেই বুঝা গেল। পিসীমা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"এই ত মানুষের মেয়ের মত কথা। কত বড় পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে, হবে না কেন বল? মুরারিও ঐ কথা বলে যে—'পিসিমা, ভট্‌চায্যিমশাই যখন স্তব পাঠ করেন, গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে; মনে হয় ভগবানের মুখের বাক্যি শুনচি'।"

উমার হাসি আসিল। এ বাড়ীতে এই প্রথম সে শুনিল যে সে ভাল বংশেরই কন্যা। এখন এ কথা শুনিলে তাহার হাসিই পায়; মনে হয়, এ যেন উপহাস। সেই সঙ্গে মুরারির প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধানুভবও করিল—দাদামহাশয়কে তিনিই কেবল চিনিয়াছেন। এ বাড়ীর আর কেহ চিনিল না!

পিসীমা পুনবায় আরম্ভ করিলেন—"তা সতী এদিকে না হিঁদু, না খৃষ্টান যাই হোক্‌গে, তার উচিত-অনুচিত জ্ঞান আছে, সে কথা এক্‌শোবার বলতে হবে। সে যে নিজে দেখে বামুন পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে আন্‌বে—তা ত আমরা কেউ মনেই করিনি। যেদিন কারুকে কিছু না বলে, ও তোমায় দেখে আশীর্ব্বাদ করে এল, মুবারির কাছে সেই খবব না পেয়ে কর্ত্তা ত একেবারে গরম তেলে কৈ মাছের মত তুড়িলাফ খেতে আরম্ভ করে দিলেন। সে এক দিনই গেছে মা; কি লঙ্কাকাণ্ডেব ব্যাপারই সে। চাকর বাকর সরকার গোমস্তা ভয়ে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে সব দাঁড়িয়ে বইল। আমি তখন ভাঁড়ার ঘরে হাঁড়ীতে বড়ী তুলছি, কর্ত্তার গালাগালি চেঁচানি শুনে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে আর বাঁচিনে। হাত থেকে বড়ীর হাঁড়ী পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সর্দ্দি গরমী হয় আব কি। কর্ত্তা চীৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌লেন—'আগাছা দুটোকে এক্ষুণি উপড়ে ফেল্‌ব, ওদের এক পয়সাও দেব না, এত বড আস্পর্দ্ধা, আমার হুকুম না নিয়ে টুলো ভট্‌চায্যির মেয়ে বাড়ী আনে? নিজে কর্ত্তা হয়ে বিয়ে করে? দেখ্‌ব সে থাকে কোথায়।' শেষে ঐ মুরারিই গিয়ে ফের শান্ত করে, বলে—যাই করুক তবু আপন জন। নিয়ে ঘর কর্‌তে না পারেন, ওদেব দেশে পাঠিয়ে দিন, সেখানে কিছু কিছু মাসহারা দেবেন। আপনার লোক, একেবারে ত্যাগ কর্‌লে প্রত্যবায় হবে। ও অধুম্মে বলে আপনি কেন অধর্ম্ম করবেন!' এমনি ধারা আরো কত কি বুঝুতে লাগ্‌ল। কর্ত্তা কি সে সব কথা বোঝেন, না শোনেন? বল্লেন—'মাসহারা দেব? এক কড়া কাণা কড়িও দেব না। আমি রুদ্রকান্ত, যার ভয়ে বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খায়, তার উপর চাল;' তার ওপর জান মা, সন্ধ্যের সময় ছেলে ত বাড়ী ফিরে এল। সাহস করে চাকর বাকরে কর্ত্তার ঘরে তখন পর্য্যন্ত আলো জেলে দিতে যায়নি। সতীর সাড়া পেয়ে মুরারি আমায় চুপি চুপি

ডেকে বল্লে—'পিসীমা,আজ কি ঘটে কে জানে, জ্যেঠা ভাইপোয় খুনোখুনী হবে, না কি হবে, আমি সেই ভয়েই অস্থির হচ্চি।' আমি তার হাত দুটো ধরে বল্লাম —'বাবা আমার, তুমি সতীকে বলে এসো সে আজ যেন বাইরের ঘরেই থাকে। তার ফিরে আসার খবর যেন কর্ত্তার কানে কেউ না তোলে—মানা করে দাও সকলকে।' মুরারি বল্লে—'তা কি হয় পিসীমা? আজ বাদে কাল বিয়ে, সে খবর ত আর চাপা থাকবে না, তখন কি ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা কেলেঙ্কারী হবে? যা হবার মুখোমুখীই হয়ে যাক্' বলে, সে ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সতী ত বাড়ী ঢুকেই 'জ্যেঠামশায়' বলে একেবারে উপরে গিয়ে উঠ্ল। আমরা ভাব্‌চি, এইবার একটা কারখানা হয় আর কি! আমি ত কালীঘাটের মা কালীকে জোড়া পাঁঠা, সত্যনারায়ণের সিন্নী মানসিক করে ভয়ে কাঁপচি যে—'হে ঠাকুর, মুখ রেখো' তা ঠাকুর আমাব খুব মুখ রক্ষে করেচেন"—বলিয়া পিসীমা যুক্তকরে উদ্দেশে বিপদত্রাতাকে প্রণাম করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া আবাব বলিতে আরম্ভ করিলেন—"তার পর জান মা, ছেলে তো গিয়ে উপবে উঠল, আর সব চুপচাপ। আমি বলি—হল কি, ও মুরারি! এত যে নাচুনি কুঁদুনি, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন? কাণ্ড কারখানা কি?' মন কতখানাই মন্দ গাইছিল, এমন সময় তারক পা টিপে টিপে নেমে এল, চুপি চুপি বল্লে—'পিসীমা, ঝড থেমে গেছে, সব মিটে গেছে। ছেলেকে দেখেই বাবু একেবারে ঠাণ্ডা—উঁকি দিয়ে দেখে এলাম, বাবুর কোলের উপর পডে ছোট বাবু ছেলেমানুষের মত কান্না কাঁদ্‌তে নেগেছে। বাবু কত মিষ্টি মিষ্টি করে বুঝুচ্ছে'। আমার ত ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমি বল্লাম—'বেশ হয়েছে। যেমন উনি বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল পড়েছে! পাছে ছেলে রাগ করে কোথাও চলে যায় এই ভয়ে ও ছেলেকে অত মেনে চলে। সতী ত আমার সোনার ছেলে। বাছার আমার কোন দোষটুকু ছিল না, ওঁর আস্কারা পেয়ে পেয়ে না এমন করে বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে।"—বলিয়া উমাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে উপসংহারে আশ্বাস দিলেন যে, চিরদিন সে এমন থাকিবেও না। বয়স দোষে এমন অনেকেরই ঘটিয়া থাকে; একটু জ্ঞান হইলে ও সব দোষ আপনি সারিয়া যাইবে। তিনিও তাহার সুমতির জন্য সত্যনারায়ণ সুবচনীর পূজা মানসিক করিয়াছেন; মানসিকের ফল যে বৃথা যাইবার নহে সে প্রমাণ ত ইতঃপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

পিসীমার কাহিনীর রুদ্র ও করুণরসে উমার চিত্তটা যতই দ্রব না হউক, সে আজ অন্ধকারের মধ্যে আলোক-শিখা ও অকূলে কূল পাইল। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেন আজ পথের সন্ধান খুঁজিয়া পাইল। ইহাই তবে কারণ—স্বামী তবে এই কারণেই

তাহাকে দূরে ছাঁটিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে করিল—'উচিতও হয় ত এই। স্ত্রীর জন্য কি গুরুজনের মনে কষ্ট দিবেন? নাই বা তাহাকে ভালবাসিলেন'।

সরলা উমা যুক্তি পাইয়া হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। সতীনাথের অদ্ভুত ব্যবহার সেই মুহূর্ত্তেই প্রহেলিকা কাটাইয়া সূর্য্যালোকের মতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যাহাকে বিবাহ করিবার অপরাধেই এত বড বিদ্রোহের সূচনা, তাহাকে স্নেহ করিয়া বিডম্বনা ঘটাইতে কে চাহিবে? স্বামীর হইয়া মনে মনে সে ওকালতী করিয়া মনের ভারটাকে অনেকখানি হাল্‌কা করিযাও ফেলিল। জ্যেঠামহাশয়ের ক্রোধ সে ত আর তাহার অজ্ঞাত নয়। তা ছাড়া জ্যেঠামহাশয়ের মত ভালবাসা তাঁহাকে আর কে দিবে? তাঁহার স্নেহ হারাইয়া, উমাকে ভালবাসিয়া তাঁহার কাজও নাই। উমার মা আছেন, দিদি, দাদামহাশয়, অনাথ দাদা—তাহার ত আর ভালবাসিবার লোকের অভাব হয় নাই! ওঁর যে জ্যেঠামহাশয়-ই সব। স্বামীর প্রতি গভীর করুণায় তাহার চিত্ত দ্রব হইয়া আসিল।

ইহার পর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে তাঁহাকে এড়াইয়া না গিয়া একটুখানি শ্রদ্ধার সহিত চাহিয়া দেখিল। "আমার জন্যে ওঁকেও বড় কম সইতে হয় নি"—এই ভাবের প্রেরণায় শ্রদ্ধাও জাগিল। উমার মনে হইল জ্যেঠামহাশয়ের ইচ্ছানুসারে কোনও ধনীগৃহেব কন্যাকে যদি উনি গ্রহণ করিতেন! আহা, কেন তা কবিলেন না? তা হইলে ত নিজে সুখী হইতেন, জ্যেঠামহাশয়ও সুখী হইতেন। হতভাগিনী আমার জন্যই তাহাব যত অশান্তি! আমার উপর রাগ হইবে—এ আব আশ্চর্য্য কি? জ্যেঠামহাশয় অবশ্যই স্ত্রী ত্যাগ করিতে বলেন নাই। উমা ভাবিয়া লইল, হঠাৎ কাজ করিয়া তাহার ফল উল্টো হওয়ায় রাগের কারণ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। সে মনে মনে স্থির করিল, এখন হইতে প্রকাশ্যে না হউক, অলক্ষ্যে থাকিয়া সে স্বামীর সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করিবে। সেবার অধিকার নাই থাকিলে, যত্নের অধিকার ত কেহ কাড়িয়া লয় নাই। মনে হইল, সংসারেও তাঁহার যেমন টান নাই, শরীরেও যেন তেমনি অযত্ন। অসুখের খবর নিত্যই ত শুনিতে পাওয়া যায়। ডাক্তাব দেখানও ত গ্রাহ্য করেন না। কেন এমন করিয়া নিজের শরীরে তাচ্ছীল্য করেন? তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করা তাহার সাধ্য নয়, তাই সে যত্ন করিয়া সে অভাবের ত্রুটি সারিতে চাহিল।

এতদিন সতীনাথের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উমা কিছু ভাবিত না। এখন একা থাকিলে অনেক সময় তাঁহার কথাই মনে পড়ে। সে মনকে প্রশ্রয় দিতে না চাহিলেও মন তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে বিরত হয় না। সতীনাথের কার্য্য সে

যখন মনে মনে অনেকখানিই সমর্থন করিল, তখন বাহিরে ছলনা বা লজ্জা অভিমান দেখাইয়া সম্বন্ধের জটিলতা স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজনই বা কি? কিছু না হোক, তিনি যে তাহাব পিতামহকে দায় উদ্ধারের পণে উমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, ঋণমোচকরূপে সে কৃতজ্ঞতা ত তাঁহার প্রাপ্য। সেটুকু সে কেনই বা না দিবে? সবাই কি সব পায়। যাহা পাইয়াছে, তাহাতেই খুসী না হইয়া অপ্রাপ্তের আশায় বৃথা দুঃখ বাড়ায় কেন?

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

১

অনাথের কথা

কাশীধামে স্মৃতির পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইল। অনাথ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে।

নিজের হাতে রোপণ-করা চারাগাছ যদি বৃক্ষরূপে ফলবান্ হইতে দেখা যায়, আর সে গাছের ফল যদি সুস্বাদু হয়, তবে রোপণকারীর আনন্দের সীমা থাকে না। এ সংবাদে অনাথের চেয়ে অধিক সুখী হইয়াছিলেন বিদ্যানাথ। সে যে তাহার স্বহস্তপ্রোথিত চারাগাছ। পিতৃমাতৃহীন অনাথ যেদিন পোষ্যরূপে তাঁহার অঙ্কে স্থান পাইয়াছিল, সেদিন বর্ত্তমানের এ সাফল্য সম্ভাবনার কথা কেই বা ভাবিতে পারিয়াছিল? তবু সে দিনও সে যেমন স্নেহে ক্রোড়ের অধিকার লইয়াছিল, আজও তাহার সে স্থান তেমনি অব্যাহতই রহিয়াছে।

বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়া গেল, এইবার সে কোন্ পথ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, অনাথকে এই প্রশ্ন করায় সে বিদ্যানাথেরই অনুমতি চাহিল—তিনি তাহার জন্য যে পথ বাছিয়া দিবেন সে তাহাই গ্রহণ করিবে। অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যায় জন্মগত আকর্ষণহীনতায় অনাথ অধিকদূর অগ্রসর হইতে না পারিলেও, প্রবেশিকা ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া রাখিয়াছে। বিদ্যানাথ তাহার মন বুঝিবার জন্য, পুনরায় সে ইংরাজী শিক্ষায় ইচ্ছুক আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। অনাথ অস্বীকার করিল। দুই তিন স্থানের টোল হইতে তাহাকে অধ্যাপকের পদ লইবার জন্য অনুরোধও আসিয়াছিল। বর্দ্ধমান-রাজটোলের অধ্যাপকের পদও সে সময় খালি হওয়ায় তাহার আবেদন সাদরে মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা ছিল। বিদ্যানাথ বুঝিলেন, অনাথ তাহার আদেশ পালনের জন্য যে কোন স্থানে কার্য্য গ্রহণে প্রস্তুত থাকিলেও, তাঁহাদের ছাড়িয়া যাওয়া তাহার মনোগত অভিপ্রায় নয়। কম বয়সে যে সব ছোট খাট জিনিষগুলিকে আমরা অত্যন্ত সহজে উপেক্ষা করিয়া অবহেলায় চলিতে পারি, অধিক বয়সের মানসিক দুর্ব্বলতায় সেই সব ছোট খাট মনোবৃত্তি স্নেহ ভক্তি মমতার জন্যই মনটা হাহাকার করিতে থাকে। সেইগুলির অভাবই বড় বেশী অভাব বলিয়া মনে হয়। আজন্মের স্নেহবন্ধন কাটাইয়া অনাথ যখন স্বেচ্ছায় তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না, তখন তিনিই বা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া

সুগভীর শূন্যতার মধ্যে পড়িয়া থাকিবেন কেন? কিছুদিন ভাবিয়া অনাথের জন্ম চতুষ্পাঠী স্থাপন করাই উচিত মনে হইল।

বিদ্যানাথের সাবেক টোল-ঘরে চণ্ডীচরণের মৃত্যুর বহুদিন পরে অনেকগুলি তরুণ ও গম্ভীর কণ্ঠ—ন্যায়-স্মৃতি-সাংখ্যের শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যার গুঞ্জনে আবার অতীতের দিন স্মরণ করাইয়া দিল। অল্পদিনেব মধ্যেই অনাথেব পাণ্ডিত্য উদারতা স্নেহশীল স্বভাব ও শিক্ষা দিবার নৈপুণ্যের যশঃসৌরভ দূরান্তর পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়া তুলিল। দূর দূরান্ত হইতেও বিদ্যার্থীর আগমন হইতেছিল,—স্থানাভাব ও অর্থাভাবে কাহাকে কাহাকেও ফিরাইতে হইল। মাসিক ও বাৎসরিক বৃত্তি কয়েক স্থানে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এতগুলি ছাত্রের ভার লইতে তাঁহাবা সাহস করিয়াছিলেন। অধ্যাপক বিদায়েও যথেষ্ট সাহায্য হইতেছিল। বিদ্যানাথেব পুরাতন যজমানগণ তাঁহাকে পুনরায় যজন কার্য্য গ্রহণের অনুবোধ জানাইতে লাগিল। অনাথ ব্রতী হইয়া কোথাও কোথাও কার্য্য করিয়া দিয়া আসিতে লাগিল, বিদ্যানাথ চাকুবে মানুষ, তাঁহার সময় কোথায়?

ছোট রান্নাঘরখানি কয়েকটি বিদ্যার্থীর বাসেব জন্য ছাডিয়া দিয়া উঠানে এক অংশে চালা তুলিয়া রান্নাঘর করিয়া লওয়া হইল। একেবাবে পাকা কবিতে গেলে খরচ অনেক, আপাততঃ ইহাতেই কাজ চলিবে। ভোক্তাব সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলেই খাদ্যদ্রব্যও বাডিয়া থাকে, বন্ধনেব স্থান একটু প্রশস্ত না হইলেই বা চলিবে কেন? যজ্ঞশালার ভার প্রধানতঃ রাজলক্ষ্মীর উপব থাকিলেও যাজ্ঞিকেব সমস্ত দায়িত্বই লইয়াছিল অন্নপূর্ণা। কর্ম্মহীন অবসাদগ্রস্ত জীবন—কর্ম্মের আনন্দে যেন দশটা হইয়া খাটিতে থাকে। পরিশ্রমও তাহাকে ক্লান্ত করিতে পারে না। অন্নপূর্ণা যেন আজ অন্নপূর্ণার মতই অন্নবিতরণের সুখলাভে পরিতৃপ্ত। মাকে সে পূজা পাঠে অনেক সময় জোর কবিয়াই ছুটি লওয়াইত।—"চিবকালই কি তুমি খাট্‌বে মা—আমি তবে কোন্ কাজে লাগ্‌ব?"—বাজলক্ষ্মী হাসিয়া ঠাকুব ঘরে চলিয়া যাইতেন, সেখানে অবারিত অশ্রুধারায় কোন বাধা পড়িত না।

দুইটা চুল্লী ধরাইয়া মাথার উপর ভিজা চুলের রাশি চুড়াকারে বাঁধিয়া অন্নপূর্ণা প্রসন্নমুখে নিত্যকার যজ্ঞ সম্পন্ন করিত। পরিবেশনের ভার ছিল বাজলক্ষ্মীব উপর।

ঠাকুরের ভোগ দিবার জন্য রান্নাঘরে আসিয়া অন্নপূর্ণার অগ্নিতাপে ঘর্ম্মাক্ত মুখের পানে চাহিয়া অনাথ কুণ্ঠিত মৃদু হাসির সহিত একদিন তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের কথা তুলিলে অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিল—"সেই জন্যেই ত বলি ভাই, একটি বৌঠাকরুণ এনে দিয়ে কাজের দোসর করে দাও। এখন 'হাত মুড়কুট'

সাহায্য করুক, আবার দরকার হলে হাঁড়ীও ধর্‌বে। এখন থেকে শিখে না নিলে শেখাবার লোক পাবে কি না কে জানে? জান ত, পরিবর্ত্তনই হচ্ছে জগতের ধর্ম্ম। এখনকার ছোট বৌটি আবার একদিন এতগুলি ছাত্রের মা হয়ে তাদের ভার নেবে ত?"

অনাথ এ কথার উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলে অন্নপূর্ণা দাদামহাশয়ের শবণ লইল—"এইবার ত অনাথেব শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, গুরুগিরিও আরম্ভ হয়েচে, এইবার তাকে সংসারী করে দিন না দাদামশাই?"

বিদ্যানাথও কিছুদিন হইতে এই কথাই ভাবিতেছিলেন। ভাবনার প্রথমেই কল্যাণীব কথা তাঁহার মনে পডিযাছিল। কল্যাণীকে এই কয় মাসের পরিচয়ে যতটুকু তিনি বুঝিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে অনাথের যোগ্য বলিয়াই ধারণা জন্মিযাছিল। তারাসুন্দরীর পক্ষ হইতে অনূঢ়া কন্যার বিবাহের জন্য কোন ত্বরা দেখা না গেলেও, তাঁহার নিজের মনেব কাছে ত্ববার অভাব ছিল না। কন্যার কন্যাকাল বহুদিনই উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অন্যত্র চেষ্টা করিতে গেলেও যথেষ্ট বাধা উঠিতে পারে। এ ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনাব গোলযোগও নাই। তা ছাড়া, অল্পদিনের পবিচয়ে কল্যাণী তাহার মনেব মধ্যেও বড অল্প আধিপত্য বিস্তার করে নাই। বিদ্যানুবাগিণী কল্যাণীর বিদ্যাশিক্ষাব শক্তিতেও তাঁহাকে খুসী করিয়াছিল। ইচ্ছা কবিয়াই তাই খানিকটা সময় তাহার অধ্যাপনা করিতেন। জমির উর্ব্বরতা দেখিলে বীজ বপনে জল সেচনে স্বতঃই প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, ঊষর ভূমিতে পণ্ডশ্রম কবিবাব প্রবৃত্তি কাহারই বা হইয়া থাকে? সেই সঙ্গে মনে পডিল আর একখানা মুখেব কথা। সে চোখেও এমনি জ্ঞানের উজ্জ্বলতা, মুখখানাও এমনি বুদ্ধিদীপ্ত। সে অন্তবও বুঝি ইহার চেয়ে কোন অংশে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতিতে হীন ছিল না। তা ছাড়া, আরও কিছু ছিল, যাহা এ মুখে নাই। সে একখানি স্বর্গীয় মুখের অমব ছায়াটুকু। অন্নপূর্ণা—মাতৃপ্রতিকৃতি! সে ছিল তাহার পিতার প্রতিবিম্ব!

তবু কল্যাণীকে তাহার বড ভাল লাগিত। ভালবাসার বশীকরণ মন্ত্র দিয়া কল্যাণী যে তাঁহাকে বশ করিযা লইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক ব্যবহারেই তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিতেন। তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিদ্যানাথের মনে একটু ভয়ও যে না ছিল এমন নয়। নবীন-মাধব ক্ষয়কারী যক্ষ্মারোগে দেহত্যাগ কবিয়াছেন; কল্যাণীর স্বাস্থ্যও তেমন ভাল বোধ হয় না।

একদিন তারাসুন্দরীর কাছে অনাথেব সহিত কল্যাণীর বিবাহের কথা তুলিয়া বিদ্যানাথ যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে শুধু তাঁহার নবোদ্গত আশা-তরুরই যে মূলোচ্ছেদ হইল এমন নয়, উপরন্তু একটা দুঃখের বেদনাও সেই সঙ্গে অনুভব

করিলেন। তারাসুন্দরী গুরুপদে প্রণতা হইয়া দীনভাবে জানাইলেন, তাহার মত দুর্ভাগিনীর অদৃষ্টে এমন সৌভাগ্য সম্ভব নয়। কল্যাণী অন্য পাত্রে বাগদত্তা হইয়াছিল, তাঁহাকেই সে স্বামী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে; তিনি এখন বিবাহিত, তবু সে উৎসৃষ্ট ফুল,—জীবনে স্বামি-পূজার অধিকার তাহার না ঘটিলেও অপর কাহাকেও স্বামী বলিয়া মনে করিতে সে পারিবে না, ব্রহ্মচারিণী ব্রতধারিণী হইয়াই সে জীবন কাটাইতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।—বিদ্যানাথ ক্ষুণ্ণ হইলেন। ভাবিলেন, এই জন্যই সমাজকার দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত কন্যার কন্যাকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বয়ঃপ্রাপ্তা যুবতী কন্যার স্বয়ম্বরা হইয়া স্বামী নির্ব্বাচন প্রথা এই জন্যই হিন্দু সমাজে রহিত করা হইয়াছে। এ ব্যবস্থার পরিণাম ফল এমনি সকরুণ হওয়াই অধিকাংশ স্থলে অবশ্যম্ভাবী।

কল্যাণীর নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনের চিন্তায় বিদ্যানাথের মনে ক্ষোভ জন্মিলেও তাহার চরিত্রের দৃঢ়তায় অন্তরের মহদৈশ্বর্য্যের সংবাদ প্রাপ্তিতে মুগ্ধও হইলেন। যে নারী মনের কাছে ছলনা না কবিয়া এমন ভাবে ত্যাগের মধ্যে জীবনোৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়, সে ত দ্বিতীয়া সাবিত্রীস্থানীয়া। মনে মনে মাতাপুত্রীকে প্রশংসাও করিলেন। কোন্ মা, মেয়ের এমন আজগুবি সংকল্পের অনুমোদন করিয়া তাহার মতানুবর্ত্তিনী হন? মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখ, সমাজের নিন্দা—এ সব প্রলোভন ও বাধা জয় করা—এও কি যেমন তেমন মনের সাধ্য?

বিদ্যানাথের মনে পড়িল, এই তারাসুন্দরীই একদিন ধর্ম্মমত বদল করিতে পারেন নাই বলিয়া স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেমসম্পন্না থাকিয়াও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইতে পারেন নাই। যিনি ধর্ম্মকেই জীবনের সারভূত করিয়াছেন, তাঁহার কাছে সংসারের লাভ ক্ষতিতে ছোট বড় খুব বেশী পার্থক্য থাকে না। এমন শিষ্যার গুরু তিনি—মনে হওয়ায় নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। এ জগতে দুঃখ বেদনা যে অন্তর্জগতের সম্পদ—আজীবন দুঃখকে বরণ করিয়া বিদ্যানাথের তাহা ঠেকিয়া শেখার মতই শিক্ষা হইয়াছিল। ত্যাগ যে কত মধুর, দুঃখ যে কত আনন্দময়, যে ত্যাগী সেই তাহা বুঝিতে পারে। কল্যাণীর ত্যাগশীল নির্ম্মল অন্তঃকরণটুকু সুমার্জ্জিত দর্পণখানির মতই বিদ্যানাথের চোখের উপর ফুটিয়া, তাহার অন্তরের ধর্ম্মভাবটিকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল।

বিদ্যানাথ মনে করিলেন, তাহার হৃদয়ের শূন্য অংশটিতে জ্ঞানের আলোক জ্বালাইয়া আনন্দময়ের আনন্দরূপে পূর্ণ করাইবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা বৃথা হইবে না। দেবতা যে এমনি সিংহাসনই খুঁজিয়া থাকেন! জীবনসঙ্গীতের ঠিক সুরটি একবার বাজাইয়া দিতে পারিলে আর ভাবনা কিসের? সঙ্গীত তখন আপনিই

সুখের স্রোতে ভাসিয়া চলিতে পারিবে। জ্ঞানের প্রসার বর্দ্ধিত হইলে অভাব বোধও সেই অনুপাতে কমিয়া যাইবে।

এই স্নেহময় ছায়াতরুকে অবলম্বনরূপে পাইয়া কল্যাণীও যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছিল। তাহার হৃদয়ের শূন্যতার ভাব ধীরে ধীরে যেন কমিয়া আসিতেছিল। ক্ষোভের দুঃখ সে মনে উঠিতে দেয় না, তবু লজ্জার হাত এড়ান যে বিষম দায়। তিনি যে উমার স্বামী, দিদির ভগ্নিপতি, দাদামহাশয়ের প্রিয়তম আত্মীয়—এ লজ্জা লুকাইবার যে তাহার কোথাও ঠাঁই নাই। ভগবান তাহার জীবনটাকে এমন করিয়া জটিলতার জালে কেন জড়াইয়া দিলেন—এই কথাই সে ভাবে।

বিশ্বনাথ কল্যাণীর মানস-স্বামীর পরিচয়—অপ্রয়োজনীয়বোধে জানিতে চাহেন নাই। তারাসুন্দরীও মেয়ের লজ্জা ও অনিচ্ছা বুঝিয়া নাম প্রকাশ করেন নাই। ধনী সন্তান আশা দিয়াছিল, তার পর অন্যত্র বিবাহ করিল, এইমাত্র জানাইয়াছিলেন। সবটুকু খুলিয়া বলিতে না পারায় এই যে লুকোচুরীর অভিনয়, এটুকু মাতাপুত্রীর অন্তরে শেলের মতই বিঁধিতে থাকে। গুরুদেবের কাছে এই যে কপটতা ও মিথ্যাচরণ—এও যে মহাপাপ। তবু কেমন করিয়া সে মহাপাপের কথা স্বীকার করিবেন? সতীনাথ যদি তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিত, উমাকে স্নেহ যত্ন করে—তাহার প্রমাণ দিত, তবে হয় ত সকল কথা প্রকাশে তাহাদের বাধা থাকিত না। কিন্তু উমার বর্ত্তমান অসুখ অশান্তির মূল যে কল্যাণী, এ বিষয়ের কিছু প্রমাণ না থাকিলেও সতীনাথের ব্যবহারই যে প্রমাণ। হয় ত বাধ্য হইয়াই সে তাঁহাদের সহিত মিথ্যাচরণ করিয়াছে—তাহাতে নিজেও সুখী হইতে পারে নাই, স্ত্রীকে সুখী করিতে পারে নাই। তারাসুন্দরীর ইচ্ছা হইত, তাহাকে যদি একবার দেখিতে পান ত তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বলেন—"তুমি বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী, নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না, উমা তোমার যোগ্যা পত্নী, তাহাতে সুখে রাখিও, ভালবাসিও।"—তাহার কাছে যে অনেক কথাই জানিবার ছিল। সেও ত জানে তাহারা কোথায় রহিয়াছেন, তবু খবরও লইল না। হয় ত তিনিই ভুল বুঝিয়াছেন! সতীনাথকে তাঁহার যে ধাতুর নির্ম্মিত বলিয়া বিশ্বাস ছিল—আজিও যে বিশ্বাস রহিয়াছে—হয় ত সে তাহা নয়। হয় ত সে খেয়ালী যুবক। উমাকে তাচ্ছীল্য করা, এও তাহার একটা খেয়ালের অংশ। কল্যাণীকেও ভালবাসে নাই, উমাকেও বাসে না।

কল্যাণীকে পাইয়া অন্নপূর্ণা অনেকখানি সান্ত্বনা পাইয়াছিল। তাহার কোমল হৃদয়টুকু যে ভালবাসার প্রস্রবণ, সে স্নিগ্ধ সুধাধারায় শীতল না হইবে কে? অন্নপূর্ণার প্রিয়বিরহব্যাকুল চিত্তের তাপজ্বালাও তাহাতে জুড়াইয়া শীতল হইয়া

আসিল। কল্যাণীর সখিত্বে মুগ্ধ হইয়া আংশিকভাবে নিজের মনে শান্তি পাইলেও সে যে তাহাতে কিছু দিতে পারে না, কেবল মনের ক্ষোভ ইহাতে বাড়িয়া উঠিত। কল্যাণী মুখে যতই হাসুক, যে প্রতিবাদই করুক, মন যে তাহার শান্তিহারা—অন্নপূর্ণার পরহৃদয়গ্রাহী চিত্তে তাহার ছায়া পড়িয়াছিল। কল্যাণী স্বীকার করিত না—তাহার আবার কিসের দুঃখ? অন্নপূর্ণারও সে কথার বিরুদ্ধে কোন তর্ক ছিল না। সত্যই ত, তাহার কিসের দুঃখ? বাপের কথা সে ভাল জানেও না, তাঁহার জন্য অভাববোধও সেই কারণে থাকা সম্ভব নয়। মা?—তাহার মত স্নেহশালিনী কন্যাগতপ্রাণা মা কাহার? স্বাস্থ্য ভাল নয়, তাই বিবাহের বিলম্ব ঘটিতেছে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? অন্নপূর্ণা সূত্র খুঁজিয়া পায় না, অথচ মনের সংশয়াচ্ছন্ন ভাবটাকেও তাড়াইতে পারে না।

এমন সময় অনাথের বিবাহ প্রস্তাবে তারাসুন্দরীর নির্ম্মম মত প্রকাশে সে একেবারে নৈরাশ্যের অতল জলে তলাইয়া গেল। কল্যাণীকে প্রথম দর্শনাবধিই সে যে এই সম্ভাবনার আশা ধরিয়া, দীর্ঘ দিন কেবল অনাথের পাঠসমাপ্তি চাহিয়া বসিয়াছিল! পাছে কল্যাণীর অন্যত্র সম্বন্ধ আসে, তাই চক্ষুকর্ণ সদা সজাগ রাখিয়া যেন চৌকি দিয়া বেড়াইতেছিল। তারাসুন্দরী বা দাদামহাশয়কে কল্যাণীর বিবাহ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া সে আশাতরু বর্দ্ধিত হইয়া এখন ফুলে মুকুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এখন তাহার মূলোচ্ছেদ করিবে কি করিয়া? যেদিন দাদামহাশয়ের মনের ইচ্ছা প্রথমে সে অনুভব করিতে পারিয়াছিল, সেদিন কি বিশ্বস্ত আনন্দেই ঠাকুরঘরে হরিরলুট মানসিক করিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়াছে! সে তাহাকে এতদিন শুধু সখী নয়, এ গৃহের লক্ষ্মীরূপা বধূমূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া আসিয়াছে। কল্পনা যখন বাস্তবরূপে প্রকাশ হইবার সময় আসিল, তখন এ কি আকস্মিক বজ্রাঘাত!

অন্নপূর্ণার আশাপ্রবণ চিত্ত সহজে দমিতে চাহিল না।—'এও বুঝি একটা কথা? কে কবে বিয়ে করবে বলেছিল, তা বলে সত্যি বিয়ে হবে না?' বাল-বিধবা অন্নপূর্ণা এ সব প্রণয়তত্ত্বের খবর রাখে না—সে বুঝিতে পারিল না—বিবাহের নাম শুনিয়াই কল্যাণী তাহাকে স্বামী বলিয়া মনে করিল কিরূপে?—'তাও বুঝি হয় কখনও? ও সব বিয়ে না কর্‌বার ফন্দী!'

২

তারাসুন্দরীর নির্ভর

ঝক্‌ঝকে নিকানো পোছানো উঠানটুকুর এক পাশে ভজহরির প্রস্তুত লাউমাচা। গাছে ফল, ও ঝিঙ্গা করলায় যথেষ্টই ফুল ধরিয়াছে—পুষ্ট অপুষ্ট ফলেরও অভাব নাই। সাদা ও হলুদ রঙের ফুলে বড় বাহার খুলিয়াছে। মাচার পাশে মৃত্তিকা লেপিত বেদীতে তুলসীচারা। কয়েকটা নিত্যসেবা ও চন্দ্রমল্লিকায় কুঁড়ি ধরিয়াছে, এখনও ফুল ফুটে নাই। উঠানের যে অংশটুকুতে রোদ আসিয়াছিল, সেখানে চটের উপর কাপড় বিছাইয়া তারাসুন্দরীর ঘণ্টা দুইয়ের পরিশ্রম-জাত বড়ী শুকাইতেছিল। কর্ম্মপ্রিয়া তারাসুন্দরী নিজের হাতে ডাল বাটিয়া, বড়ী দিয়া, চাল বাছিয়া যতটুকু পারেন গুরু পরিবারের সেবা করিয়া তৃপ্ত হন। পাছে কাক পক্ষীতে বড়ীগুলি উচ্ছিষ্ট করে, তাই নিজেই তাহার নিরাপদ প্রহরায় নীচের দালানে রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া একরাশ ছেঁড়া কাপড় জমা করিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। কাঁথার উপর পেন্‌সিলে কল্যাণীর আঁকা ফুলপাতার নক্সা। ছেঁড়া কাপড়ের পাড়ের রঙ্গিন সূতা খুলিয়া সেইগুলিই এখন ভরাইতেছিলেন।

কল্যাণী রোদের ছায়ায় দেওয়ালের ধারে একখানা আসনে বসিয়া চার কাঠিতে পশমের ফ্রক বুনিতেছিল। এমন সময় অন্নপূর্ণাকে আসিতে দেখিয়া সে হাসিমুখে কহিল—"এখুনি মাকে বল্‌ছিলুম—দিদির কাজ আর দেখ্‌ছি শেষ হবে না।" তারাসুন্দরী একটু সরিয়া—ছিন্ন বস্ত্রের স্তূপ সরাইয়া অন্নপূর্ণাকে বসিবার স্থান করিয়া দিলে সে বসিয়া হাসিমুখে কহিল—"অনেক দিন বাঁচ্‌ব দেখ্‌চি তাহলে! আজ কেমন আছিস্ রে কলি, জ্বর নেই ত?" কল্যাণী মাথা নাড়িয়া 'না' বলিয়া বোনায় মন দিল দেখিয়া অন্নপূর্ণা—"কি বুনছিস্ দেখি" বলিয়া কল্যাণীর হাতের বোনাটা টানিয়া লইয়া, প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—"বাঃ, চমৎকার হচ্চে ত! কার জন্যে রে? ছোট ছেলের দেখ্‌চি যে?" কল্যাণী স্মিতমুখে কহিল—'আন্দাজ কর দেখি কার?" অন্নপূর্ণা একটুখানি ভাবিয়া কহিল—"নৈহাটির প্রকাশ দা'র ছেলের বুঝি, কিন্তু তার ছোট হবে না? সে ত বছর খানেকের।" কল্যাণী হাসিতে লাগিল—"পাল্লে না দিদি।"—তারাসুন্দরীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল—"ও তেমনি মেয়ে কি না, বলে—'কেন, তাদের ত অভাব কিছু নেই।' সেদিন রামদয়াল বোসের নাতিকে দেখে এসে পর্য্যন্ত জ্বালাতন করে তুলেচে। তার বিছানা চাই, জামা চাই, তাকে পেতলের ঝিনুকে দুধ খাওয়ায়—কাঁসার

ঝিনুক চাই—আর কি কি চাই রে? এই দেখ না—আমাকে দিয়েই চার খানা কাঁথা সেলাই করালে।" কল্যাণী হাসিয়া কহিল—"এই শীতে ছেলেটি শুধু ন্যাকড়া গায়ে দিয়ে শুয়ে রয়েচে—বৌটিকে খড়ের বিছানায় একখানা তবু কম্বল গায়ে দিতে দিয়েচে। কি কষ্ট বল দেখি দিদি?" অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিল—"তুই জ্বালালি কল্যাণী, জগৎ শুদ্দু ছেলেই ত এম্‌নি করে মানুষ হচ্চে! রোদের সময় তেল মাখিয়ে রোদে পিঁড়ীতে ফেলে রাখে—সকাল সন্ধ্যায় আঁতুড়ঘরে আগুন থাকে, কষ্ট আবার কি হবে?" কল্যাণী বলিল—"না দিদি, বাচ্ছাটি শীতে যেন কুণ্ডুলী পাকিয়ে রয়েছিল। আমার ইচ্ছে কর্‌ছিল বুকের ভেতর তাকে গরমে চেপে রাখি।" একটা চাপা নিঃশ্বাস তারাসুন্দরীর বুকে উদ্গত হইল—বাহির হইল না। অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিল—"তুমি দিলেই তাকে দেবে কি না? আঁতুড়ের ও সব জিনিস অপ্‌চ হবে না?" তারাসুন্দরী কহিলেন—"আমিও ত তাই বল্‌ছিলেম—'ষষ্ঠী পূজো হোক্, তখন দিস্ এখন—তাড়াতাড়ি নাই হোল'।" কল্যাণী বিষণ্ণস্বরে কহিল—"ততদিন বাচ্ছাটি টেঁকে থাক্‌লে ত দেব! এই শীতে—ঐ যত্নে ক'দিন থাক্‌বে বল ত? তবু তার ঠাকুরমা হাজার বার বল্‌চেন—ঐ তার ছিষ্টিধর, টাকার চেয়ে টাকার সুদ মিষ্টি, আরো কত কি—না মা?" কল্যাণী জননীকে সাক্ষী মানিলে তারাসুন্দরী কহিলেন—"তা বল্‌বেন না, বংশের মধ্যে ঐ হোল প্রথম নাতি।" "মুখে ঐ সব বল্লেই বুঝি আদর হয়" বলিয়া কল্যাণী একটা সরু বেতের বাক্সের ভিতর হইতে ছোট ছেলের উপযোগী কয়েকটি জামা মোজা প্রভৃতি বাহির করিয়া অন্নপূর্ণাকে দেখিতে দিল—"এ সব ত পশমের জিনিষ—এ পর্‌লে লোকসান হবে কি দিদি? কেমন হয়েচে বল্লে না?" অন্নপূর্ণা জিনিষগুলি পরীক্ষান্তে রাখিয়া দিয়া কহিল—"বেশ হয়েচে। আহা—উমার আমাদের কবে ছেলে হবে কে জানে। শুনেচেন কাকী মা, বুড় নাকি মঞ্জু বাবুকে বলেচে—"মায়ের ছেলে হয়নি, আঁটকুড়ো ঘরের মেয়ে।" তারাসুন্দরী 'ষাট-ষাট' বলিয়া উদ্দেশে উমার কল্যাণ কামনা করিলেন।

এমন সময়ে এক ঝুড়ি ঘুঁটে আনিয়া রান্নাঘরের বকে ঝুড়ি নামাইয়া তামাক সাজিবার জন্য হুঁকা কলিকা বাহির করিতে করিতে ভজহরি ডাকিয়া কহিল—"বড়ীগুলো তুলে ফেলেন মা। হিম নাগ্‌বেন এখুনি—আজ ডাক্তার মশায়ের ওখানে ওষুধের নেগে যেতে হবেন কি না, দাদাঠাকুর শুদুলেন?"

অন্নপূর্ণা ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল—"ওমা, বেলা যে একেবারে পড়ে গ্যাছে, ঠাওর হয়নি ত—আসি তবে কাকীমা, আসি ভাই কল্যাণি! মা এতক্ষণ হয়ত অর্দ্ধেক কাজ সেরে ফেলেচেন" বলিতে বলিতেই সে অপব্যয়িত সময়ের ক্ষতি

পূরণার্থ ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলে, কল্যাণী তাহার সেলায়ের জিনিষপত্র উঠাইয়া উপরে চলিয়া গেল।

তারাসুন্দরী হাতের কাজ ফেলিয়া শূন্যনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। নীল আকাশের বুকে পাখীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া সাদা কালো ডানা মেলিয়া চক্রাকারে উড়িয়া চলিয়াছে। অস্তগামী-সূর্য্যের রাঙ্গা আলো নারিকেল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোর বাতি জ্বালাইয়া দিয়াছে। বাতাসে গাছের পাতা দুলাইয়া মাঝে মাঝে আলোর থালাখানা দেখা যাইতেছিল—আবার পাতার আড়ালে লুকাইতেছিল। তারাসুন্দরী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন—কবে এ কারাগারের মমতা ছাড়িয়া সেই অভয় পদে আশ্রয় পাইবেন! অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ—কে জানে তাঁহাব জন্য কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে! মন তাই সময় সময় ছুটির দিনের প্রতীক্ষায় অধীব আগ্রহে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতে চায়। তবু চিরদিনের অভ্যস্ত প্রার্থনা এখনও বলিতে থাকে—'তুমি আমায় যা দেবে, হে ভগবান্, তোমাব দয়া বলেই যেন তা আমি নিতে পারি। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান তোমাব কার্য্যেব বহস্য না বুঝে তোমার করুণায় যেন কখনও সন্দেহ না আনে।'

৩

অন্নপূর্ণার নৈরাশ্য

দুপুব বেলা দালানে বঁটী পাতিয়া তারাসুন্দরী তেঁতুল কাটিয়া জমা করিতেছিলেন। তাহাব নিজের প্রয়োজন সামান্য, ইহা গুরুদেবের বাড়ীর সম্বৎসরের খরচের সঞ্চয়। পাড়ার একটি ছোট মেয়ে কাছে বসিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে প্রত্যেক কোষমুক্ত বীজটির পতন পরীক্ষা করিতেছিল। বঁটীব গা বাহিয়া সেটি মাটিতে পড়িবার সময় দিতেও তাহার অনিচ্ছা। অল্প-পরিসর ডুরে শাড়ীখানির অঞ্চলপ্রান্তে বন্দীকৃত হইয়া এগুলি যখন সঙ্গী মহলে আত্মপ্রকাশ করিবে, তখনই ইহাদের যথার্থ গৌরব বুঝা যাইবে। এখন এগুলি স্তূপের মধ্যে জমা হইতেছিল মাত্র।

অন্নপূর্ণা হাসিমুখে দালানে উঠিয়াই কহিল—"কাকীমা, আজ যে কল্যাণী ওখানে গেল না! কোথায় সে?"

তারাসুন্দরী তাহাকে বসিতে বলিয়া তেঁতুল কাটা বন্ধ রাখিয়া চিন্তিত মুখে কহিলেন—"কাল আবার জ্বর হয়েচে। বর্ষা থেকে আর ত সার্‌তে পারচে না, কেবলই ত ভুগ্‌চে।"

অন্নপূর্ণা আর একখানা বঁটীর জন্য ইতস্ততঃ চাহিয়া কহিল—"আমায় দিন না

কাকীমা, আমি খানিকটা কাটি।" তারাসুন্দরী কহিলেন—"থাক্ মা, তুমি একটু জিরোও। এই ত খেটে খুটে এলে।"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিল—"ভাবি ত খাটা! না খেটেই বা কর্‌ব কি বলুন? দিন রাত কাট্‌বে কেন? কুম্ভকর্ণের খুব সুবিধে ছিল, না কাকীমা? সময় কাটাবার ভাবনা ছিল না। আমাদের এইটুকু রাত, তাও যেন কাটতে চায় না।"

তারাসুন্দরী ম্লানভাবে হাসিয়া কহিলেন—"পাগল!—যদি একেবারে জাগতে না হত, কথা ছিল না। কিন্তু যখন জাগ্‌তেই হবে, তখন ছ'মাস পরে জেগে আর সুখটা কি? বেঁচে যদি থাক্‌তে হয়, বাঁচার মত বাঁচাই ভাল—মরে বেঁচে থেকে ফল নেই! বেচাবা ছ'মাস বাদে একবার করে জাগ্‌বে, আব দশটা কি দুশোটা দুঃখের খবর তার জন্যে জমা হয়ে থাক্‌বে। সুখের স্বাদ পাবে না, কেবল দুঃখেবই ভাগ নিতে হবে।"

অন্নপূর্ণা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তা সত্যি।"

তাবপর কিছুক্ষণ দুজনেরই বিভিন্ন চিন্তার ভিতব নীববে সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। তারাসুন্দবীর হাতেব কাজ ফুরাইয়া যাওযায় আর লাভেব আশা না থাকায় তেঁতুল-বীজসংগ্রহকারিণী মেয়েটি তাহার অঞ্চলবদ্ধ রত্নভাণ্ডাব লইয়া প্রসন্ন মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা তাহাব পানে চাহিয়া কহিল—"হ্যাবে কুসি; তোর বাপ শনিবারে আস্‌বে না?"

মেয়েটি মাথা হেলাইয়া কহিল—"আস্‌বে ত।"

"এলে তাঁকে আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দিস্। দেখিস্—ভুলিস্‌নে। বলিস্—'উমার মা ডেকেচেন'।"

মেয়েটি তাড়াতাড়ি সম্মতি জানাইয়া পলাইয়া গেলে তারাসুন্দরী কহিলেন—"নাজীর মশায়ের দৌহিত্রী না?"

অন্নপূর্ণা সম্বিত নিঃশ্বাস লইয়া কহিল—"হ্যাঁ, মঞ্জুবাবুব মেয়ে। তিনিই ত উমার বিয়ের ঘটক। কেবা চিন্‌ত সতীনাথকে—আর কেই বা বামন হয়ে চাঁদ ধর্‌বার সাধ কর্‌তে যেত! তাদের একটা খবরও পাওয়া যায় না। যদি উনি কিছু বল্‌তে পারেন—কেমন আছে এ টুকুও যদি জানা যায়। হ্যাঁ কাকীমা, গরীব হোলে কি আপনার লোকের ওপর তাদের মায়াও থাকে না? গরীবের মেয়ে যদি নিতে পারা যায়, তবে তাদের মেয়ে কেমন আছে—খবরটি দিতে এতই কি দোষ!"

তারাসুন্দরীর চিন্তাচ্ছন্ন ললাটে ছায়া ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—"মঞ্জু বুঝি?

তা তিনি কিছু বলেন না কেন ? তিনি ত বন্ধুমানুষ, আব তাঁর কথা যখন অত মানেন, তাঁবও ত বুঝিয়ে বলা উচিত।"

অন্নপূর্ণা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তিনি চুপ করিয়া থাকেন, বলেন—সতী তাঁকে কোন কথাই বলে না। 'স্ত্রী মনে ধরেনি' বল্‌বে বা কি করে ? নিজে যে দেখে বিয়ে কবেচে। কুসীব মা বলছিল, মঞ্জুবাবু না কি বলেচেন, তাঁর বন্ধুকে তিনি চিন্‌তে পারেন নি, ভুল বুঝেছিলেন। সে বড লোকের ছেলে, খামখেয়ালি—তা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

উঠানেব আমগাছেব শাখা দুলাইয়া একটা দমকা বাতাস 'হা হা' করিয়া হাসির লহব তুলিয়া বহিয়া গেল। কযেকটা বৌদ্রশুষ্ক অপুষ্ট আম গাছেব তলায় ঝরিয়া পডিল। তারাসুন্দবী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ কবিযা বহিলেন, দেখিয়া অন্নপূর্ণা কহিল—"অনাথেব কিন্তু ওব উপবে ভাবি শ্রদ্ধা। বলে—'সে খেয়ালি হোক, যাই হোক, মানুষেব মত মানুষ।' ও যখন পবীক্ষা দিতে কাশী গেছ্‌ল, ফেববাব সময আগ্রা দেখে এল না ? সেখানে নাকি তার সঙ্গে ওব দেখা হয়েছিল। সে বোধ হয অনাথকে দেখেনি, দেখলেও হয়ত চিন্‌তে পাবেনি। অনাথও সাহস কবে পবিচয দেযনি, বলে—'পাগলকে ঘাঁটিয়ে কি শেষে হিতে বিপবীত হবে ?' তখন সেখানে ভয়ানক কলেবা হচ্ছিল। বাস্তাব ধাবে রুগী পডে থাকত, মডা ফেল্‌বাব, দাহ কববাব লোক পয্যন্ত ছিল না, হাসপাতালে রুগী নিচ্ছিল না, জাযগা নেই তা নেবে কোথায় ? অনাথেব ত দেখেচেন, অন্ধ আতুর রুগী ভুগীব খবব পেলে হয়। ও সেখানেও সেবাব্রত কবে বেডাত। সতীনাথও শুনলুম গবীব দুঃখীদেব ওপব ভাবি দযালু। সে তাব লোকজন দিযে, নিজে সঙ্গে থেকে, অনেক জায়গায় নিজে হাতেও পথেব ভিকিবী কুডিযে সেবা যত্ন চিকিৎসা কবেছে। পয়সাতেও কম সাহায্য করেনি। অথচ সেও বেডাতে গেছ্‌ল, যে কদিন ছিল, লোকেবও যেমন কবেচে, আশীর্ব্বাদও তেম্‌নি কুডিয়েচে। অনাথ বলে—'যাব মনুষ্যত্ব আছে, কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে, সে কি স্ত্রীব উপব নিষ্ঠুব হতে পাবে ? তোমরা মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ, উমা সত্যিই সুখে আছে'।"

তাবাসুন্দবী প্রসন্নমুখে ছলছল-নেত্রে কহিলেন—"গুরুদেবেব আশীর্ব্বাদে সে ত অসম্ভব নয় মা ! আজ যদিও সতীনাথ কিছু ছেলেমানুষী কবেন, সে ভাব তাঁর চিরদিন কখনও থাক্‌বে না। উমা অসুখী হবে, এ কি একটা কথা ? বাবা যে তাকে বাতদিন মনের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ কচ্চেন, সে সুখী হবে বৈ কি।"

অন্নপূর্ণা খুসী হইয়া তাডাতাডি তারাসুন্দবীব পাযেব ধূলা লইতে গেলে তিনি ব্যস্তভাবে তাহার হাত দু'খানা ধবিযা ফেলিয়া বাধা দিলেন। ভক্তি করিয়া

ভালবাসিয়া তাহারা যে সম্বন্ধই পাতাক, আসলে তাহারা যে গুরুগোষ্ঠি—তাঁহাব নমস্যা। তাবাসুন্দবী গুরুগৃহেব কাকপক্ষীটির কাছেও প্রণাম গ্রহণ করেন না, অন্নপূর্ণাব তাহা জানা ছিল। আজ আনন্দের আতিশয্যে সে কথা সে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল।

তারাসুন্দরী ঈষৎ আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন—"উমাকে আমি বাত দিনই আশীর্ব্বাদ কচ্চি মা, সে বাজবাজেশ্ববী হোক, স্বামীসৌভাগ্যে সুখ শান্তিতে চিবজীবী হয়ে বেঁচে থাক্। সতী—সেও যে আমাব বড আদবেব—ভগবান্ ওঁদের দু'টিকে সুখে রাখুন"—বলিয়া তিনি কাটা তেঁতুলের তালটা লইয়া ভাঁড়াব ঘরে উঠাইয়া বাখিবাব জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা কল্যাণীব উদ্দেশে উপবে গিয়া দেখিল—সে তখনও বিছানায চুপ করিয়া একা শুইয়া আছে। হাতেব কাছে একখানি পাতা-খোলা বই। অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সে হাসিমুখে বইখানি মুডিযা বাখিয়া কহিল—"দিদি, এলে যে বড ?"

মুখে হাসিলেও তাহাব কণ্ঠস্ববে অভিমানেব সুব স্পষ্ট হইযা বাজিল। অন্নপূর্ণা তাহাব ললাটের তাপ-পবীক্ষা কবিয়া কহিল—"কেমন আছিস বে ?'

কল্যাণী সবিয়া শুইয়া তাহাকে বসিবাব স্থান কবিযা দিয়া কহিল—"নিত্যি বোগেব আবার কেমন থাকা দিদি।"

একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্নপূর্ণা কহিল—"কি বোগা হয়ে যাচ্ছিস ভাই ' কণ্ঠাব হাড উঠে পডেচে। কেবল জ্বর হতে লাগ্‌ল যে।"

কল্যাণী অন্নপূর্ণাব আঙ্গুলগুলি লইয়া খেলা কবিতেছিল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা কবিল—"বুকেব ব্যথাটা আব বাডে নি ত ?"

কল্যাণী সম্পূর্ণরূপে স্বীকাব না কবিযা কহিল—"বিশেষ নয। নিত্যি বোগে পডা শোনা সবই বন্ধ হল দিদি। দাদামশায়কেও সকল সময় দেখ্‌তে পাইনে, এইটুকুই আমাব সব চেয়ে কষ্ট।"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া তাহাব কপালে ধীবে ধীবে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"একটা সুখবব যদি দিই, কি দিবি বল ?"

কল্যাণী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাহাব পানে চাহিয়া বহিল। সুখবব—কি তাহাব সুখবব ? সে জানে, দিদিব কাছে উমা ও উমাব স্বামীব সংবাদই জগতেব মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সু—তাহাই বুঝি ? হয় ত তাহার কাছেও এই খববটুকুই স্পৃহনীয়। তাঁহারা ভাল আছেন, এটুকু মাঝে মাঝে তাহার জানিতে ইচ্ছা কবে। জীবনে অনেক অপূর্ণ ইচ্ছাব মধ্যে এ ইচ্ছাটুকুও মিশাইয়া যায়—সে এ খবরটিও পায় না।

কল্যাণীর দৃষ্টিতে উদ্বেগের ছায়া ফুটিতে দেখিয়া অন্নপূর্ণা তাহাকে ব্যস্ত কবিতে

ইচ্ছা করিল না। কহিল—"দাদামশায় চাক্‌রী ছেড়ে দিয়েচেন, এইবার সব সময়ই তাঁকে পাওয়া যাবে রে ;—সুখবর নয় ?"

কল্যাণীর শুষ্ক অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সুখবর বই কি, তাহার কাছে এই একমাত্র স্থান—একমাত্র সঙ্গই প্রার্থিত! তাঁহারই স্নেহে সে যে সকল অভাব, সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইবার মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ পাইয়াছে—সংসারের ক্ষোভ দৈন্য বিসর্জ্জন দিতে শিখিয়াছে। সে আনন্দোৎফুল্ল-কণ্ঠে কহিল—"ছাড়্‌লেন যে ?"

"অনাথের নিতান্ত ইচ্ছে দেখে। আর তার আয়ও ত এখন মন্দ নয়, সংসার চালাবার জন্যে যখন চাক্‌রী করার দরকার নেই, তখন অনাথকে ক্ষুণ্ণ কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌লেন না।"

কল্যাণী খুসী হইয়া কহিল—"অনাথ দাদার 'স্মৃতিতত্ত্বসুধা' ও 'স্মৃতিসর্ব্বস্ব' দু'খানি বইয়েরই খুব সুখ্যাতি হয়েচে। বিক্রীও খুব হচ্চে—দাদামশায় বল্‌ছিলেন। অনাথ দাদার ইচ্ছে, দাদামহাশয়ের লেখা বইগুলি এইবার ছাপাবেন—তা হলে বেশ হবে। স্কুলের বইয়ের ব্যাখ্যাও দাদামহাশয়ের কিছু কম বিক্রী হয় না। দাদামশায়কে বল না দিদি, এইবার অনাথ দাদার বিয়ে দিন। বেশ একটি বউ হবে, আমরা দুজনে তাকে খুব আদর যত্ন কর্‌ব, সাজাব, লেখাপড়া শেখাব—কবে তা হবে দিদি ?"

অন্নপূর্ণা উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসটাকে চাপিয়া ফেলিয়া কহিল—"যে দিন যার বিয়ের ফুল ফুটবে, কারো ইচ্ছেয় কি কিছু হয় রে ?"

অন্নপূর্ণা আজ কোমর বাঁধিয়া কল্যাণীর সহিত লড়িতে আসিয়াছিল। ছেলে-মানুষের আবার বিয়ের মতামত কি ? বিশেষতঃ মেয়েমানুষের! কর্ত্তৃপক্ষ যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহারা কেবল তাহাই মানিয়া লইবে। সে যে এতদিন ধরিয়া মনে মনে এত আশা জমাইয়া রাখিয়াছে, সত্যই কি তাহার সেই আশার দীপ এক ফুৎকারেই নিবাইয়া ফেলিবে ? বিবাহের কথা কত লোকের সঙ্গে হয়। কথাই আছে—লক্ষ কথায় বিয়ে। কথা হইয়াছিল, তাহাতে কি ? কোন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ত হয় নাই! কেন সে অনাথকে বিবাহ করিবে না ? লোকেও যে নিন্দা করে। স্বাস্থ্য ভাল না-ই হইল, তাহাদের ঘরে বধূ হইলে কোনও ধনীগৃহের চেয়ে কম আদরে সে থাকিবে না। অন্নপূর্ণা তাহাকে নড়িয়া বসিতে, জলঘটিটি গড়াইয়া লইতে, সংসারের কুটাটুকু দুইখানি করিতে দিবে না। আর অনাথের মত স্বামী যে কত তপস্যায় মেলে, সে কথা বিবাহের পর সে নিজেই স্বীকার করিবে।

যে প্রবল যুক্তিগুলি মনের মধ্যে জমা করা ছিল, সেগুলি মনের মধ্যেই পাক খাইতে লাগিল। বাহিরে তাহার আভাসটুকুও বাহির হইল না। কল্যাণী এমনি

অসঙ্কোচ আত্মীয়তায় অনাথকে 'দাদা' বলিয়া গ্রহণ কবিযাছে যে, তাহাকে ভিন্ন পথে চলিতে অনুবোধ কবা যেন সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না। অন্নপূর্ণা 'বলি' 'বলি' কবিয়াও তাই মনেব কথাটা মুখে ফুটাইতে পারিল না।

কিছুক্ষণ অন্য কথায় কাটাইয়া সে নীচে নামিযা আসিল। মনে কবিল—'আজ পাবিলাম না, কাল নিশ্চয়ই বলিব।'

৪

সম্পাদকের পত্র

সকালবেলা রুদ্রকান্তেব জলযোগ, চা পান হইয়া গিযাছে। উমা কাছে বসিয়া পাখা লইয়া বাতাস কবিতেছিল। তাবক কতকগুলি ডাকেব চিঠি, কাগজ প্রভৃতি বাবুব চেয়াবের হাতাব উপর বাখিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ কলিকাটি উঠাইয়া লইযা, পুনরায় সাজা কলিকা গুডগুডিব মাথায় বসাইয়া দিযা চলিয়া গেল।

উমা একবাব চকিত কটাক্ষে ডাকের চিঠিগুলিব উপব মুগ্ধদৃষ্টি বুলাইয়া লইল। কতদিন—সে কতদিন তাহাদেব কোন খববই পায় নাই। তাঁহাবা যে উমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, এ ত আব সম্ভব নয়। তবে একখানি চিঠি দিতেও এত কৃপণতা কেন? মা না হয় লেখাপডা জানেন না, দিদি, দাদামণি, অনাথ দাদা ইহাবা ত লিখিতে পাবেন। উমাব মত তাঁহাবা ত আব পববশ নহেন, তবে চিঠি লেখেন না কেন? উমা জানিত না যে তাঁহাবা নিয়মিতই চিঠি লিখিয়া থাকেন, কেবল সেগুলি তাহাব কাছে আসিযা পৌছায় না। রুদ্রকান্তেব আদেশে, উমাব চিঠি পত্র প্রথমে তাঁহাব নিকট আসে। তিনি পডিয়া, যদি কোনও খানা ইচ্ছা হয় তাহাকে পাঠাইযা দেন, নচেৎ ফেলিযা দেন।

গবীব মাব কাছে সে কুশিক্ষা পাইতেছে কি না বুঝিবাব জন্য রুদ্রকান্ত প্রথম একদিন তাহার পত্র খুলিয়াই আতঙ্কিত হইযাছিলেন। ব্যাঘ্রভীতিসঙ্কুল স্থানেই সন্ধ্যা আসন্ন হইবার যে নীতি আছে, তাহাবই সার্থকতা দেখাইবাব জন্যই যেন অন্নপূর্ণা সে চিঠিতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচাবক নবীন বাবুব কন্যা কল্যাণীব কথাতেই তিন পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ কবিয়াছিল। রুদ্রকান্ত উমাব প্রতি প্রসন্ন নহেন, তথাপি মনে হইয়াছিল, এ চিঠি সতী দেখিলে উমার অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন থাকিবে না। চিঠিতে রুদ্রকান্ত বুঝিয়াছিলেন, কল্যাণীর এখন পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। বিস্মিতও হইয়াছিলেন। সতী নিজ মুখে বলিয়াছে, কোথাকার কোন সিভিলিয়ানেব সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে যাহাই হউক, সতীর শুনিবার ও বুঝিবার এটা যে প্রকাণ্ড ভ্রম, তাহা নিশ্চয। এ অবস্থায় কল্যাণীর সন্ধান পাইলে, সে কি

করিয়া বসিবে বলা যায় না। শেষে কি তাঁহার উঁচু মাথা হেঁট করিয়া শিক্ষিত পুত্র আর একটা বিবাহ করিয়া লোক হাসাইবে? এইটুকুই এখন বাকী আছে। সেই অবধি রুদ্রকান্ত সাবধান হইলেন। যে সব পত্রে কল্যাণীর নামোল্লেখ থাকে, সেগুলি আর উমার হাত পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।

উমা অন্যমনে পাখার বাতাস করিয়া যাইতেছে, রুদ্রকান্ত চিঠিগুলি এক একখানি করিয়া খুলিয়া পাঠ করিতেছেন। সহসা রুদ্রকান্তের সগর্জ্জন চীৎকারে উমা সচকিত হইয়া উঠিল।—"পাজী ছোট লোকের মেয়ে, কোথা থেকে মড়ী-পোড়া ভট্চার্য্যের মেয়ে কুড়িয়ে এনে সতী বংশটাকে ছারেখারে দিলে! ভেবে-ছিলাম ছোট ঘরের সংশ্রব বাঁচিয়ে চল্‌তে পাল্লে বুঝি স্বভাব শোধ্‌রাবে। আম্‌ড়া গাছে কি আর ল্যাংড়া আম ফলে? 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।' যেমন ঘরে জন্ম তেমনি না রীত-চরিত্র হবে! ওরে বাপ্‌রে, যাব কোথা! অ্যা—মেয়েমানুষে খবরের কাগজে লেখে—আমার চৌদ্দ পুরুষে কখন এমন কথা শোনেওনি। সাধ করে সতী দেখ্‌তে পাবে না! মন্দ মেয়ে যে তার দু'চোখের বালাই! ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ—গলায় দড়ি জোটেনা, ঘুঁটে কুড়ুনীর ঝিকে রাণী করে নিয়ে এল—এঁ্যা!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে হস্তান্দোলন ও গর্জ্জন চলিতেছিল। ভীতা সঙ্কুচিতা কুণ্ঠিতা উমা ভাবিয়া পাইল না যে, ঐ একখানা চারকোণা দুই পয়সার ডাক্‌টিকিটে ছাপমারা লেফাফার ভিতর দিয়া কি অদ্ভুত রহস্য তাহার অজ্ঞাত অপরাধের প্রকাণ্ড বোঝা বহন করিয়া আনিয়াছে। কুণ্ঠিত সঙ্কোচের সহিত তাহাকে চিঠিখানার পানে চাহিতে দেখিয়া রুদ্রকান্ত সেখানাকে সজোরে তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

চিঠিখানা উঠাইয়া লইতে শুধু হাত নয়, উমার সমস্ত দেহই বায়ুতাড়িত কাশ কুসুমের মত থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তবুও সে অন্তিম সাহসে সেখানা তুলিয়া অর্থশূন্য দৃষ্টি বুলাইয়া গেল। যদি পাঠ করিতে দ্বিধা করে, হয় ত এখনি তাহার অজ্ঞাত অপরাধের বোঝা আদেশ অমান্যের অপরাধে আরও ভারী হইয়া পড়িবে। চিঠিখানার মর্ম্মগ্রহণে তাহার বিলম্ব হইল। কেবল চোখ বুলাইয়া গেলে ভাবার্থ যেন হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। সেখানা "কিশলয়" মাসিকপত্রের অফিস হইতে আসিতেছে—সবিনয় নিবেদনে সম্পাদক উমাদেবীর লিখিত প্রবন্ধ সমেত পত্রিকা পাঠাইয়া, পুনরায় লেখা পাইবার আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

চিঠিখানা পড়িয়া তাহার ভাব উপলব্ধি হইলে লজ্জায় উমার আপাদমস্তক পূর্ণ হইয়া গেল। মনে পড়িল, দুইমাস পূর্ব্বে সে একটা প্রবন্ধ রচনা করিয়া সেটা

সুধীরের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, তাহারই নিজ নামে প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে দিয়াছিল। তারপর আর সে কথা তাহার মনেও ছিল না। বউদিদিকে অতর্কিতে আশ্চর্য্য করিবার প্রলোভনে সুধীর নিজের নাম না দিয়া উহার নামই রাখিয়া দিয়াছে, এখন এই বিভ্রাট্।

ব্যাপার বুঝিয়া দুঃখে উমার হাসি আসিল। সুধীর যদি এখানে উপস্থিত থাকিত, বোধ হয় উমাকে খুসী করিবার ইচ্ছা তাহার জন্মের মত ফুরাইয়া যাইত। হায় অবোধ বালক, উমাকে খুসী করিবাব সাধ্য স্বয়ং বিধাতার যে নাই, কেন এ বৃথা প্রয়াস!

রুদ্রকান্ত কুঞ্চিতভ্রূ তীব্র দৃষ্টিতে অপবাধিনীর নত মুখের পানে চাহিয়া তাহাব লজ্জা-জড়িত বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য কবিতেছিলেন। সে মুখ দেখিলে অতিবড পাষাণের মনেও বুঝি দয়ার উদ্রেক করিত; রুদ্রকান্তের দযা হইল না। কেনই বা হইবে? স্ত্রীলোকের এত স্বাধীনতা—বিশেষ তাঁহার পুত্রবধূব—সে কি সাধারণের সহিত সমশ্রেণীর? শ্লেষের স্বরে পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"এখনকার ছেলেপুলে গুরুজনের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করে না, এর ফলে ভুগ্‌তে হবে না? ভুগুন এখন। কিগো মেমসাহেব, প্রবন্ধ লিখে কত টাকা বোজগাব হল শুনি? তাই ত ভাবি, সতী যে কাজকর্ম্মে মন দেয় না, এমন করে গায়ে ফুঁ দিয়ে বাইরে আমোদ করে বেড়ায়; এর মানেটা কি? এমন রোজগেরে স্ত্রী থাক্‌তে ভাবনা কি তাব, কেন খাট্‌বে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!"

সেই অসহ্য ব্যঙ্গ ও শ্লেষের হাসির ভিতর হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষার জন্য উমার মন ভিতবে ভিতবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেও সে সবিল না। সাহসী যোদ্ধার মত তোপের মুখে অটলভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল!

রুদ্রকান্ত বকিতে বকিতে অন্য চিঠিগুলাব উপর মন দিলে, উমা উঠিয়া বারান্দার ধারেব জানালার দিকে চাহিয়াই সহসা শিহরিয়া দুই পা পিছাইযা আসিল। জানালার নীচেই সরু বারান্দা, যাতায়াতের সেই পথ। বারান্দায় অনেকগুলা বিচিত্র চিনামাটির টবে গাছ, তাহারই একটা পুষ্পিত শাখায় বেতের ছড়ির অগ্রভাগ দিয়া সতীনাথ আঘাত করিতেছিল। আঘাতটা যে ঠিক আদরের হিসাবে নয়, তাহা তাহাদের সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুমদলের শত ছিন্নাংশেই সূচিত। কিন্তু উমার তখন এত তত্ত্ব ভাবিবার উপযোগী মনের অবস্থা না থাকায়, সে কম্পিত বক্ষে প্রতি মুহূর্ত্তে একটা আকস্মিক ঝড়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, ঝড় উঠিল না। তিনি চলিয়া গেলেন। উমার সব লাঞ্ছনা, সব অপরাধ স্বকর্ণে শুনিয়াও চলিয়া গেলেন। অসহ্য বেদনার মত

তাহার মনে হইল—তিনি চলিয়া গেলেন, সব জানিয়া গেলেন। লজ্জায় ক্ষোভে তাহার মুখখানি অস্তগামী তপনের রাঙ্গা আলোর মত যেন রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

উমার অপরাধ খুব বেশী খুঁজিয়া না মেলায়, রুদ্রকান্তের পক্ষে অনেক সময় অসুবিধার কারণ ঘটিত। তাই এত বড় সুযোগটাকে সহজে নিভিতে না দিয়া তিনি কিছুদিন তৈলদানে ইহাকে সতেজে জ্বালাইয়া রাখিলেন ও উমার মনকে বিঁধিয়া বিঁধিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিলেন।

রুদ্রকান্ত উমার সহিত যেমন ব্যবহারই করুন, সতীনাথের কাছে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতেন না—উমার অপরাধ পাইলেও না। তাহার কারণ, নির্য্যাতিতের প্রতি সতীনাথের স্বাভাবিক করুণার বিষয় স্মরণ করিয়া ভাবিতেন—"এখনকার ছেলেরা কি আর এসব দোষ দোষ বল্‌বে? নাই দিয়ে আরও মাথায় তুলে দেবে।" কৈশোরে মাতৃহীন আত্মীয় স্বজনের স্নেহবিচ্ছিন্ন সুদূর পোশোয়ারে জীবনের ভূরিভাগ কাটাইয়া, পত্নী কন্যাহীন রুদ্রকান্তের মনে স্ত্রীজাতির উপর বড় বেশী শ্রদ্ধা ছিল না। উহাদের খেলার পুতুল, ঘরের সাজ, সংসার যাত্রার সুনির্ম্মিত যন্ত্ররূপেই তাহার মনের অনেকটা ধারণা—উমার সম্বন্ধেও তাই তাহার মনে স্নেহের অভাব এত অধিক।

৮

শুভ-দৃষ্টি

সেদিন জ্যেঠামহাশয়ের কাছে যাইতে গিয়া সহসা বাহির হইতেই তাঁহার গর্জ্জন শব্দে সতীনাথ বিমূঢ় হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। ভর্ৎসনার লক্ষ্য উমাকে বুঝিয়া তাহার লজ্জা স্মরণ করিয়াই সে ভিতরে গেল না। তার পর যখন অপরাধিনী উমার সহিত নিজের নামটাও জড়িত হইতে শুনিল, ভিতরে পা বাড়ান তখন আর সম্ভবপর হইল না; সকাল বেলার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু তীব্ররসে তিক্ত হইয়া গেল। লোকচক্ষে তাহার নিজের অবস্থা আজ কি দাঁড়াইয়াছে, রুদ্রকান্তের মুখে তাহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়া সে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। লোকের চোখে সে তবে একটা আমোদপ্রয়াসী বওয়াটে যুবায় পরিণত হইয়া গিয়াছে! জ্যেঠামহাশয়ও এই কথা বিশ্বাস করিয়াছেন! একটা অপমান ও ক্রোধের ব্যথায় তাহার মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার বন্ধু-বান্ধব লইয়া গান বাজনা বা কখন কখন থিয়েটার দেখিয়া শূন্য মনটাকে ক্ষণিকের তৃপ্তি দিবার চেষ্টা তবে—'বাহিরে আনন্দ লুণ্ঠনের' গোপন রহস্যের ইঙ্গিতে এমনি করিয়াই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে? ছিঃ ছিঃ—এই জন্যই কি সে এতদিন প্রাণপণ পরিশ্রমে বীণাবাদিনীর উপাসনা করিয়া আসিল?

আজীবন সাধনাব এই কি পুরস্কার? উমা তাহাকে যাহা ইচ্ছা মনে করুক, ক্ষতি নাই, কিন্তু জ্যেঠামহাশয় কি সত্য সত্যই এই কথাই মনে করেন? অন্য পাঁচজনও ত তবে এই বিশ্বাসই ধরিয়া বাখিয়াছে!

প্রথমটা রাগ হইলেও, সে রাগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। স্ত্রীর সহিত ব্যবহাবই যে তাহাব অপবাদের প্রকাণ্ড নিদর্শন! বিবাহিতা স্ত্রীকে কে কবে এমন করিয়া ঠেলিয়া বাখে? দীর্ঘকাল এক বাড়ীতে বাস কবিয়াও সে আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীকে ভাল কবিযা চিনেই না, সে 'কালো' কি 'ধলো' চাহিয়াও দেখে নাই। এটা তাহাব পক্ষে আশ্চর্য্য না হইলেও, লোকের চক্ষে অদ্ভুত বৈ কি। তবে লোকেই বা তাহাদেব কর্ত্তব্য ছাডিবে কেন? পবনিন্দার এত বড সুযোগ কি কেহ কখনও বিনা কারণে ত্যাগ করিতে পাবে?

স্ত্রীর কথা আজ প্রথম যেন তাহাব মনে পডিল। যখন পডিল, তখন একটুখানি করুণাব সহিতই মনে হইল—"আহা বেচাবী!" তখন পর্য্যন্ত রুদ্রকান্তেব ভৎর্সনাব বেগ সমান চলিতেছিল। সতীনাথের পর-দুঃখ-অসহিষ্ণু চিত্ত উমাব জন্যও তাই ঈষৎ বেদনানুভব কবিল। সেই সঙ্গে সে নিজেই যে তাহাব নিগ্রহের মূল, এ কথাটা অনিচ্ছাতেও মন হইতে ঠেলিযা ফেলিতে পাবিল না। কোথায় কোন্ পল্লীপ্রান্তে ক্ষুদ্র বনফুলটি ফুটিযাছিল, তাহাকে তুলিয়া আনিবাব জন্য তাহাব কি-ই এমন বা প্রযোজন পডিয়া গিয়াছিল? তুলিলই যদি, তবে পদদলিত কবিবাব অধিকাব তাহাকে কে দিল? একটুখানি অনুতপ্ত বেদনাবোধেব সহিত আত্মগ্লানি জাগিযা উঠিল।

তার পর যখন উমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে তাহাকে অগ্রাহ্য কবিযা তাহাব দিক হইতে চোখ না ফিরাইযা লইয়া, ভাল করিয়া চাহিযা দেখিল—দেখিয়া বিস্মিত হইল। বিবাহের পূর্ব্বে অবস্থা বুঝিয়া প্রকৃতি যেন তাহাকে অনূঢ়া কবিবাব জন্যই যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিলেন, তাই বয়সোচিত স্ফূর্ত্তিতে তাহাব দেহ ভরিয়া উঠিতে সময় লাগিযাছিল। কিন্তু কৌমারের পব লোকচক্ষে অনাদৃতা থাকিয়াও বাতারাতি ক্ষুদ্র মুকুলটি যে কখন সৌন্দর্য্যসম্ভারে পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপে পবিণত হইয়া গিয়াছে, সে ঘটনা কাহারও কাহারও চোখে পডিলেও, সতীনাথেব পড়ে নাই। তাই বিস্ময়েব সহিত মনে হইল, এই উমা তাহার পবিত্যক্তা নির্য্যাতিতা অনাদৃতা স্ত্রী! সেই সঙ্গে মনে মনে উমার প্রতি একটুখানি বিস্ময়পূর্ণ শ্রদ্ধানুভবও করিল। উমা যাচিয়া তাহার সহিত কথা না কহিলেও অত্যধিক অবগুণ্ঠনেব আডম্বরে সঙ্কোচ প্রকাশও কবিত না। তাহাদের উভয়ের মধ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা সে যেন ভুলিয়াই গিয়াছে, এমনি অগ্রাহ্যভাবে মুখের প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কোন দাবী দাওয়া না করিয়াই

সংসারে একজনের মত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার অসঙ্কোচ চালচলনে সতীনাথও আপনার অপরাধের কুণ্ঠা যেন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিত না। সময় সময় উমা উপস্থিত থাকিলেও ইদানীং সতীনাথ তাই জ্যেঠামহাশয়ের কাছে প্রয়োজনীয় কাজে আসিয়া বসিত। অন্যদিকে লক্ষ্যও রাখিত না। কার্য্যে ব্যস্ততার মধ্যে কখন যে উমা ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে জানিতে পারিতও না, চাহিতও না।

এমনি করিয়াই তাহাদের বিবাহিত জীবনের দিনগুলি কোথা দিয়া কাটিয়া সাধারণ প্রথার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে বুঝিতেই পারে নাই। যে দিন পারিল, মনে হইল, অন্য অনেক বিষয়ে ঠকিলেও এইখানটায় সে ঠকে নাই। পত্নী-নির্ব্বাচন যখন ভাগ্যদেবতা তাহাকে দিয়াই করাইয়া লইয়াছিলেন, তখন সাধারণ মেয়েদের মত না হইয়া উমা যে স্বতন্ত্র ধাতুর সৃষ্ট, এইটুকুই তাহার রক্ষা। সহস্র যন্ত্রণার উপর যদি আবার পত্নীর দাবী-দাওয়ার যন্ত্রণা বাড়িত, তবে সংসার ছাড়িয়া 'কৌপীনবন্ত' হওয়া ছাড়া তাহার আর কোন উপায় থাকিত না।

তাই সে দিন গোধূলির আরক্ত আলোকে দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে কোন শুভ মুহূর্ত্তে সতীনাথের কৌতূহলী দৃষ্টি যখন অন্তরের নির্ম্মলতায় স্বচ্ছ বিস্ময়জড়িত কালো দুইটি চোখের উজ্জ্বল তারায় বদ্ধ হইয়া পড়িল, তখনই যেন তাহাদের অসম্পূর্ণ শুভ-দৃষ্টির সম্পূর্ণতা সাধন হইয়া গেল। বিস্মিত হইয়া নিজেকে মনে মনে কহিল—"কবির ভাষায় যাহাকে ক্ষুদ্র বনফুল বলিতেও সে কুণ্ঠিত হইতেছিল, বুঝি সে বনফুল নয়, তাহাকে পদ্ম বা গোলাপও বলিতে পারা যায়। এ যদি বনফুল হয়, তবে ইহাকে লাভ করিতে পাওয়া যে বনেরও ভাগ্য।"

বিকাল বেলা কাপড় কাচিয়া সাজা পানগুলি পিসীমার কাছে রাখিয়া উমা আনমনে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই, উপরের সিঁড়ির মাথায়, নীচে নামিতে উদ্যত সতীনাথকে দেখিয়া একটুখানি পাশ কাটাইয়া তাহাকে চলিয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট পথ ছাড়িয়া দিল। আজ স্বামী অন্য দিনের মত নতমুখে চলিয়া গেলেন না, বরং তাহার মুখেই বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন,—যখন সে বুঝিল, তখন লজ্জায় যে রক্তরাগ তাহার মুখখানিকে রাঙ্গাইয়া তুলিল, চেষ্টা করিয়াও তাহা সে গোপন করিতে পারিল না। সতীনাথকে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রথমটা সে না বুঝিয়াই তাঁহার পানে চোখ তুলিয়া চাহিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল তিনিও তাহারই পানে বিস্মিত চোখে চাহিয়া আছেন, তখন আপনা হইতেই তাহার চোখের পাতা নামিয়া পড়িল। স্বামীর সেই প্রথম দৃষ্টিপাতে যেন নববধূর সরম-রাগে তাহার দেহমন রাঙ্গাইয়া কি একটা বিস্ময়ানন্দের পুলক সঞ্চার জাগাইয়া

দিল। সেই সঙ্গে সকাল বেলার ঘটনাটিও মনে পড়িল। হয়ত এখনি এই বিষয়েই উনি কি জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিয়া, উত্তরের লজ্জা এড়াইবার জন্যই তাড়াতাড়ি সে সতীনাথের সান্নিধ্য ত্যাগের চেষ্টায় তাহার পাশ দিয়াই নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া উমা চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়া রহিল। সতীনাথের সেই সপ্রশংস বিস্মিত দৃষ্টির অর্থবোধ করিতে না পারিয়া সে যেন মনের ভিতর কেমন একটা ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছিল। কি একটা অজ্ঞাত ভাবের স্পর্শে তাহার দেহ-মন যেন অভিভূত ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িল। ষ্টীমার চলিয়া গেলে তাহার গমন-সংবাদ নদীর সমস্ত জল আলোড়িত করিয়া তটের প্রান্তে আঘাত দিয়া যেমন করিয়া জানাইয়া দিয়া যায়, সতীনাথের মনের অস্ফুট চাঞ্চল্যটুকু বিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহার তাড়িত স্পর্শ যেন উমার ঘুমন্ত চিত্তটিকে তেমনি করিয়া দোলাইয়া আলোড়িত করিয়া দিয়া গেল। সে স্তব্ধভাবে কণ্টকিত দেহে অননুভূতপূর্ব্ব বেদনা বক্ষে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা কাটাইয়া যখন অন্ধকার রাত্রি আসিল, সুধীর আসিয়া 'নিত্যকার পাওনা' গল্পের তাগিদ দিল, বিদ্যুতালোকে কক্ষ আলোকিত হইল—তখন সে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া চকিতে জাগিয়া চাহিল। সুধীর হাসিয়া কহিল—"কি এমন করে ভাবছিলে বৌদিদি? আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, বুঝ্‌তেই পাল্লে না।"

উমা অপ্রতিভ হইয়া সলজ্জভাবে কহিল—"কিই বা ভাববো ঠাকুরপো হয়ত ঘুম এসে গেছ্‌ল।"

সত্যই সে বিশেষ কিছু ভাবে নাই। সে রাত্রে উমা ভাল ঘুমাইতে পারিল না। অন্ধকার কক্ষে খোলা জানালার বাহিরে যে অগণ্য নক্ষত্র আগুনের ফুলের মত আকাশের বুক জুড়িয়া জ্বলিতেছিল, তাহারই পানে চাহিয়া সতীনাথের উজ্জ্বল আঁখিতারা যুগল নক্ষত্রের মতই তাহার অন্ধকার মনের আকাশে যেন ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছিল।

মনের সেই বিচলিত ভাবের আভাসে উমা বিস্মিত হইল। কেন আজ তাহার মন এমন হইল? এমন ভাব ত সে কোন দিনই অনুভব করে নাই? মনের সে অস্ফুট ব্যাকুল চঞ্চল ধ্বনিকে সে আজ নির্দ্দয় পীড়নেও বন্ধ করিতে পারিল না। কি একটা অভাবের ব্যথায় সুখে বা দুঃখে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

৬

রুদ্রকান্তের অসন্তোষ

বাহিরে একটা চেঁচামেচি গোলমাল শুনিতে পাওয়া গেল। সকাল বেলা জলযোগান্তে রুদ্রকান্ত সবে মাত্র সংবাদপত্রের মোড়ক খুলিয়াছেন, উমা তাহার নিত্যকার পাওনা মিষ্ট কথায় মিষ্ট মুখ করিয়া তখন বিদায় গ্রহণ করে নাই। আদেশপ্রাপ্ত বিহারী জানাইল, মালীর ছেলে রঘুয়া বাগানের এক মর্ম্মরময়ী উড্ডীয়মানা পরীমূর্ত্তির পক্ষ ধারণে দোল খাইতে গিয়া তাহার পক্ষচ্ছেদ ঘটাইয়া বসিয়াছে এবং বাগানে ছোটবাবুর নিকট তাহারই বিচারকার্য্য চলিতেছে।

শুনিয়া রাগে রুদ্রকান্তের আপাদমস্তক জলিয়া গেল। ছোট লোকের এত বড় স্পর্দ্ধা! ভয় নাই, গ্রাহ্য নাই—এমন খেলার প্রশ্রয় পায় কোথা হইতে? শরীরেও ন তবে অসুরের বল বলিতে হইবে। আজ যে পাথর ভাঙ্গিতে পারিল, কাল সে সিঁদ কাটিতে বা ডাকাতি করিতে না পারিবে কেন?

রুদ্রকান্ত তাঁহার বাতের বেদনা ভুলিয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীচেই বাগান, দৃশ্যটি বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বিচারক এইমাত্র অশ্বারোহণে বেড়াইয়া ফিরিয়াছে, তখনও তাহার অঙ্গে অশ্বারোহীর পোষাক, হাতে চাবুক। অপরাধী বালক ম্লানমুখে যূপবদ্ধ ছাগশিশুর ন্যায় বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। বিচারস্থলে লোকও জমিয়াছিল বিস্তর। তবে খুব বেশী কাছে ঘেঁসিবার সাহস কাহারও ছিল না, আশে পাশে দাঁড়াইয়া কেহ সকৌতুকে, কেহ করুণার সহিত দেখিতেছিল। তাহাদের আশা ছিল, বিচারটা ছোটবাবুর হাতে চুকিয়া গেলে, অপরাধের দণ্ড যথেষ্ট লঘুভাবেই সম্পন্ন হইবে।

অপরাধী ভয়ে নানা প্রকার মিথ্যা বলিয়া সতীনাথকে আরও রাগাইয়া তুলিতেছিল। একবার বলে—আপনি ভাঙ্গিয়াছে, একবার বলে ঝড়ে ভাঙ্গিয়াছে, আবার বলে ভাঙ্গা ছিল—তাহার হস্তস্পর্শে খসিয়া পড়িয়াছে মাত্র।

বালকের অপরাধে সতীনাথের তেমন রাগ না হইলেও মিথ্যাচরণে অপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা দেখিয়া, সে ক্রুদ্ধভাবে শূন্যে কশা আস্ফালন করিতেই, বালক ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

অপর জানালার ধারে দাঁড়াইয়া উমাও সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। সতীনাথ চাবুক উঠাইতেই তাহার পরদুঃখকাতর অন্তঃকরণ ব্যথিত হইল—সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল।

রুদ্রকান্ত খুসী হইয়া কহিলেন—"আঃ, সতী যদি একটু কড়া হতে শেখে, আমার আর কোন কষ্টই থাকে না।—কিন্তু এ কি! কেবল চাবুক উঠিয়েই, ওটার কান্না দেখে ছেড়ে দিলে! ছি ছি, এমন অপদার্থ মন নিয়ে ও জমিদারী রাখবে কেমন করে? বিষয়-আশয় কিছুই আর থাকবে না দেখ্‌চি।"

উমার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি সতীনাথ সেই ঘরে আসায়। সে মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া, সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রুদ্রকান্ত বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন—"এ তোমার কোন দেশী দয়া সতী? তুমি তাকে ছেড়ে দিলে?"

সতীনাথ হাসিমুখে কহিল—"আপনি ত' হ'লে দেখেছেন জ্যেঠামশাই। আমি মারতে যেতেই সে যে রকম ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, মার্‌লে বোধ হয় মরেই যেত। তার চেঁচানোতে ভয় হল—আপনার হয় ত—'

রুদ্রকান্ত বাধা দিয়া কহিলেন—"মরে যেত ত কি হত! অমন হতভাগা ছেলের মরাই ভাল। আমার জন্যে তোমার আবার কিসের ভাবনাটা হল শুনি—আমার মন যদি তোমার মত হত তা হ'লে আর করে খেতুম না।

জ্যেষ্ঠতাতের কুঞ্চিত-ভ্রূ ক্রুদ্ধ মুখের পানে চাহিয়া সতীনাথের মনে হইল, সে কথা সত্য। লক্ষ্মীর উপাসনার জন্য যতখানি কঠোর হইতে হয়, সে তাহার কোন সংবাদই রাখে না। হয় ত তাহার দ্বারা রাখার সুযোগও কখনও ঘটিবে না।

ইহার পর কথাবার্ত্তা আর ভাল করিয়া জমিল না। অল্পক্ষণের পর পোষাক বদল করিবার ছুতায় সতীনাথ উঠিয়া চলিয়া গেল।

উমা স্বামীকে এমন বেশে আর কখনও দেখে নাই। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে সে তাহার বীরত্বপূর্ণ মহিমাব্যঞ্জক মুখের পানে চাহিয়া মনে মনে শ্রদ্ধাস্তুত কবিল। শ্রদ্ধার সহিত অন্য কোন ভাব মিশ্রিত ছিল কি না বলা যায় না—উমাকে জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই সে অস্বীকার করিত। সতীনাথের কাহিরের মত অন্তরের সৌন্দর্য্য আছে কি না, উমা তাহার বড় বেশী পরিচয় পাইত না,—তাই সে সংবাদ তাহাকে পুলকিত করিল। মনে মনে স্বামীর সম্বন্ধে যে ভুল বিচার করিতে বসিয়াছিল, সে অপবাদের জন্য তাহার পায়ে সে মনে মনেই ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বাহিরে এতটুকু কৃতজ্ঞ দৃষ্টি প্রেরণের সাহসও তাহার কুলাইল না।

আহারান্তে রুদ্রকান্ত সবেমাত্র দিবানিদ্রার উপক্রম করিতেছেন। বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া তাঁহার বাতের শরীরে সহ্য হয় না, তাই উমা কাছে বসিয়া বাতাস

করিতেছিল। এ সকল বিষয়ে তাহার প্রতি কোন আদেশ না থাকিলেও, তাহার সেবাগুণবিশিষ্ট প্রকৃতিই তাহাকে এ সব কাজে লিপ্ত করে। সতীনাথ বা মুরারী এ সময় কখনও আসে না, তাই এই সময়টাই সে জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গ-গ্রহণের নিরাপদ কাল স্থির করিয়াছিল। বুড়া মানুষ, বিশেষতঃ গুরুজন, তাহার নিকট অপ্রতিরস্কার লাভে উমার মনে এখন আর খুব বেশী কষ্ট হয় না, তথাপি একজন নিরপেক্ষ বা স্বপক্ষ দর্শক কেহ সেখানে হাজির থাকিয়া তাহার লাঞ্ছনা দেখে, এইটুকুর লজ্জা সে এখনও অতিক্রম করিতে পারে নাই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিয়া দরজার কাছে অগ্রসর হইল। সে পদশব্দ উমার অপরিচিত নয়। অন্ধদিগের যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে ঐ ইন্দ্রিয়টাই অধিক উৎকর্ষলাভ করে, সতীনাথের সম্বন্ধে উমারও অনেকটা সেই রকম অভ্যাস জন্মিয়াছিল। তাহার পায়ের শব্দ, হাসি, কথার সুর আগেই তাহার কানে আসিয়া পৌঁছায়। সে একটুখানি কুণ্ঠিতভাবে মাথার কাপড় অল্প টানিয়া দিল।

সতীনাথ আসন গ্রহণ না করিয়া, বিনা ভূমিকাতেই কহিল—"এ যে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিলেন জ্যেঠামশাই। বুড়োমানুষ, এতগুলি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে বিদেশে কেন কোথায় থাকবে? ছেলেমানুষ, দোষ করেচে, তাকে নাহয় জুতো পেটা করুন। বাপ মাকে মেরে কি হবে?"

এসময়ে ভ্রাতুষ্পুত্রকে আসিতে দেখিয়া রুদ্রকান্ত এমনি একটা সম্ভাবনাই মনে করিয়াছিলেন। তাহার প্রকৃতি ত তাহার এত অজ্ঞাত নয়। একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লিষ্টস্বরে কহিলেন—"এই? আমি বলি কার ঘরে না জানি আগুন দেবার হুকুমই দিয়েছি বা? অমন ছেলের বাপ মারও ছেলেকে সহবৎ না শেখাবার জন্যে শিক্ষা হওয়া চাই বই কি। ছেলেও এক দিন ত বুড়া হবে। আজ ইচ্ছে হল পাথরের পুঁতুল ভাঙ্গতে, কাল ইচ্ছে হবে বাড়ী ঘর ভাঙ্গতে।—তা দেখ বাপু—এবার থেকে এসব বিচার টিচারগুলো তোমরাই কোরো।"

'তোমরা' বলিবার সময় রুদ্রকান্ত কথাটার উপর একটু জোর দিয়া সাবগুণ্ঠনা উমার প্রতি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে লক্ষ্য করিলেন। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল দিয়া সে দৃষ্টিটুকু উমার চোখে না পড়িলেও, সতীনাথের পড়িল।

সে যেন স্ত্রীর পরামর্শেই জ্যেঠার কাজের কৈফিয়ৎ চাহিতেছে, এমনি ভাবে পুনরায় রুদ্রকান্ত আরম্ভ করিলেন—"তখনই জানি, যখন টুলো পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে এনেচি, তখনই কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে সরকারদের ঘরে আস্তানা নেওয়াই আমার উচিত ছিল। যাকে যেখানে সাজে, সময় থাকতে মানে মানে,

তার সেখানে সরে যাওয়াই ভাল। তা হলে আর এই সব অপমানগুলো সইতে হয় না। তা দাও বাপু, তোমার চাকরদের দিয়ে আমায় সেইখানেই পাঠিয়ে দাও। বাতের ব্যথায় উঠ্‌তে ত পাচ্চি নে, তা না হলে নিজেই যেতুম। বুড়ো হলে মানুষের ভীমরতি হয়, আবার কোন দিন কি অন্যায় করে বস্‌বো।"

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্রকান্ত চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া ক্লান্তভাবে পড়িয়া রহিলেন। বিপন্ন সতীনাথ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল—'এ বড় বাড়াবাড়ি। কি কথায় কি কথা আনিয়া বসিলেন।' উমার সাক্ষাতে তাহাকে প্রকারান্তরে স্ত্রীর বশীভূত বলায়, লজ্জা ও বিরক্তিতে সতীনাথের মন ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার দুর্ব্বলতাও যে এইখানেই। জ্যেঠামহাশয়ের রাগে সে ভয় করে না—বরং নিজের জেদ বজায় রাখিতেই মনোযোগী হয়, কিন্তু তাঁহার অভিমান সহিতে সে অক্ষম। রুদ্রকান্ত মুখে যাহাই বলুন, আসলে সে যে কে, তাহা ত তাহার আর অজ্ঞাত নয়। তাহার মত বৈমাত্রেয় সম্পর্কের আত্মীয়ের ত কোন অভাব নাই। তবে শুধু ভালবাসিয়াই তিনি যে তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া বুকে তুলিয়া লইয়াছেন, সে স্নেহের ঋণ শুধিবে কি দিয়া। তাহার বয়সের কথা, অসুস্থ শরীরের কথা ভুলিয়া গিয়া সে কেন এমন করিয়া তাঁহাকে মনঃপীড়া দিয়া বসে, ভাবিয়া মনে মনে ব্যথিত বোধ মনে হইল। মনে করিল, এমন সব অবস্থায় জ্যেঠামহাশয়ের কাছে পুনর্ব্বিচারের আশা না রাখিয়া, যতটুকু উচিত সে গোপনেই ক্ষতিগ্রস্তকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিবে।

সকাল বেলা পুত্রের সেই মর্ম্মরময়ী পরীমূর্ত্তির অঙ্গহানি করার অপরাধে বাগানের মালী লক্ষ্মণের চাকরীতে জবাব হইয়াছিল। বিদেশে স্ত্রী পুত্র লইয়া তখনই কোথায় কাজ পাইবে, তা ছাড়া এমন পাওনা থোওনার বাড়ী। পুত্রের পৃষ্ঠে সে তাহার আক্রোশ পূরণ করিয়া লইয়া বাবুর কাছে কাঁদিয়া পড়িল— "এবার কসুর মাপ করিতে আজ্ঞা হউক, এমন কাজ আর কখনও হইবে না।" সতীনাথ আশ্বাস দিল, জ্যেঠামহাশয়কে কহিয়া সে হুকুম ফিরাইয়া লইবে। কাজটা কঠিন মনে হইবার তাহার কারণও কিছু ছিল না; এমন ঘটনা আরও কতবার ঘটিয়াছে, এবং তাহার অনুরোধে হাইকোর্টের রায় বদল হইতেও দেখা গিয়াছে।

কিন্তু জ্যেঠামহাশয়ের কাছে আসিয়াই সতীনাথ বুঝিল,—কাজটা সে যত সোজা মনে করিয়াছিল তাহা নহে। সে যে গরীবকে আশ্বাস দিয়াও কথা রাখিতে পারিল না, এইটুকুই তাহার বিশেষ দুঃখ। ভবিষ্যতে তাহার জন্য যে

উপায়ই করা যাউক, উপস্থিত তাহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। হাকিমের রায় ফিরিবে না, ফিরাইবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিবার ইচ্ছাও আর উমার সাক্ষাতে হইল না। জ্যেঠামহাশয় যে কি অপরাধে তাহার উপর বিরূপ হইলেন, এইটুকুই কেবল তাহার বোধগম্য না হওয়ায় সে দুঃখিত হইল। তাহার পরাজয়ে উমা কি মনে করিল, যেন সেইটুকু বুঝিবার জন্যই বারেক অলক্ষ্যে তাহার নত মুখের পানে চাহিয়া সতীনাথ নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রুদ্রকান্ত মুদ্রিত নেত্রে ভাবিতে লাগিলেন—আজকালকার ছেলেগুলা হইল কি? স্ত্রীর মুখ দেখিলে গুরু-লঘু জ্ঞান থাকে না। হায়, হায়, এত করিয়াও সাধারণের সহিত সতীনাথের স্বাতন্ত্র্য রাখিতে পারা গেল না। জ্যেঠার কথার উপর কথা কহিবে, কাজের ছুতা ধরিবে, নিজের জেদ বজায় রাখিতে চাহিবে, সে ছেলে ত সতী নয়। এ পরামর্শ উহাকে তবে দিল কে? নিশ্চয়ই ঐ ছোট লোকের মেয়ে উমা। এই জন্যই কথা আছে—'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।' সঙ্গগুণে স্বামী নাকি অনেক স্থলে স্ত্রীর অনুরূপ হইয়া যায়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। উমার সঙ্গে, উমার মত তাহারও মতিগতি নিম্নাভিমুখে চলিয়াছে।"

সতীনাথ যে গরীবের প্রতি আর কখনও দয়া প্রদর্শন করিতে গিয়া জ্যেঠা-মহাশয়ের চিত্তে তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তার বিভীষিকা উৎপাদন করে নাই এমন নয়। বরং এমন 'হ্যান্‌হেনে প্যান্‌পেনে' মন লইয়া সে যে কেমন করিয়া বিষয় রক্ষা করিবে, সে চিন্তায় তাহাকে যথেষ্টই ভাবাইয়া রাখিয়াছে।—"এই সে বছর খালাসিয়ায় কি টাকার শ্রাদ্ধটাই না করিয়া আসিল। দেশে বন্যা আসে, গ্রামে স্কুল নাই, নদীতে পাকা পুল চাই—কেন রে বাপু, তোর এত মাথা ব্যথা কেন? তুই যদি দান করিয়া আজ ফতুর হোস্, ওরা কি তোকে দাতা বলিয়া দয়া করিবে। বলির দানের পাগলামি দেখিয়া, চোখ ফুটাবার জন্য স্বয়ং ভগবানই যে তাহাকে বন্দী করিয়া দাতার দুরবস্থার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রাখিয়াছেন"—এই সব ছোট বড় নানাপ্রকারে পুত্রের বৈষয়িক বুদ্ধির অভাব তাঁহার যথেষ্টই মনঃক্ষোভের হেতু জন্মাইত।

কিন্তু সে সকল হইল অতীত কালের কথা। বর্ত্তমানের কথা স্বতন্ত্র। তিনি বুঝিয়াছিলেন—সতী এখন উমার প্রতি অনুরক্ত। সে স্ত্রীকে প্রসন্ন করিতে চায়। গরীবের উপর দয়া দেখাইয়া বড়াই করা নিশ্চয়ই তাহার উদ্দেশ্য। আর এ সকল বিষয়ে গরীবের মেয়ে উমার সমবস্থের প্রতি সহানুভূতি থাকা ত স্বাভাবিক।

ন্যায়ের সিদ্ধান্তে ফাঁকি খাটিবে কেন? কার্য্য কারণেব সমন্বয় মিলিয়া গেল। শুধু আজিকাব ঘটনাটিই নয়, ক'দিনেব ভিতর সতীনাথেব দবিদ্রপ্রীতিব আবও কয়েকটি প্রমাণও যে তিনি পাইয়াছেন। আজিকাব ঘটনা তাহাতে ইন্ধন যোগ কবিল মাত্র, কবিযা, উমাব প্রতি তাঁহাব বাঁকা মনটাকে আব একটুখানি বাকাইয়া দিল।

৭

দাদা মহাশয়

একদিন লাল কালীব অক্ষবে হাতে লেখা নিমন্ত্রণপত্রে অনাথেব শুভবিবাহেব ঘোষণা পাঠাইযা বিদ্যানাথ কর্ত্তব্য বোধে কন্যা জামাতাকে নিমন্ত্রণ কবিতে নিজেই আসিযা উপস্থিত হইলেন। বাজলক্ষ্মী ষোল আনা, অন্নপূর্ণা দশ আনা আশা বাখিলেও, তিনি নিজে অর্দ্ধ আনা আশা লইযা উমাকে দুই চাবিদিনের জন্য একবাব বিবাহ দেখিতে পাঠাইবাব জন্য কর্ত্তাব কাছে অনুরোধ কবিতে আসিয়াছিলেন।

কর্ত্তা থাকেন ত্রিতলে, বহিভাগেব সোপান বাহিযা সেখানে তাহাব বন্ধুবান্ধব কর্ম্মচাবীবর্গ ডাক্তাব বৈদ্য সকলেই যাওযা আসা কবিবাব অনুমতি পাইযা থাকেন। কিন্তু বিদ্যানাথেব সেখান হইতে আহ্বান না আসায় তিনি সাহস কবি[illegible] কবিবার কথা নিজ হইতে তুলিতেই পাবিলেন না। যখন আগমন সংবাদ অশ্রুত নাই, তখন তিনি না ডাকিলে গাযে পডিযা কেমন কবিযাই বা দেখা কবিতে চাহিবেন?

সতীনাথ বাড়ী ছিল না, সে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়াছে। মুবাবিকে দিযা রুদ্রকান্ত বলিয়া পাঠাইলেন—"কোথাকাব কুডানো ছেলে অনাথ, তাহাব বিবাহে তাহাব পুত্র পুত্রবধূ নিমন্ত্রণ বক্ষায যাইতে পাবে না।'

মনেব গোপন ইচ্ছাটা মনেব মধ্যে চাপিয়া বাখিয়া বিদ্যানাথ বিদায লইলেন। মুবাবি মানুষ যেমনই হউক, তাঁহাব মুখ দেখিয়া তাহাবও মায়া কবিতেছিল। সেও জ্যেঠামহাশযের ব্যবহারেব নিন্দা না কবিয়া থাকিতে পাবিল না। সুধীব তাহাব কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বাড়ীব খবব সব জানিযা লইল—মেনী বিডাল মঙ্গলি গাই, অনাথ দাদা, তাঁব ছাত্র সভা—সকল বিষয়েবই খোঁজ লইল। উমাব কাছে গল্প শুনিয়া শুনিয়া ইহাবা ত আব তাহাব অপবিচিত নাই। মৃদুস্ববে কহিল—"আমাব পৈতের সময় জানেন দাদামশাই, আমি নিজে গিয়ে বড দিদিকে আব মাকে নিয়ে আস্‌ব। আপনাকেও আস্‌তে হবে কিন্তু—বুঝ্‌লেন? নূতন যে

বৌদিদি হবেন, তাঁকেও নিয়ে আস্‌ব। জ্যেঠামশাই আমার পৈতে দেবার কথাই কন না, বৌদি বলেন—'এখন না হলে আর পৈতে হবার বয়স থাক্‌বে না। একটা দিন দেখে দেবেন দাদামশাই। সব্বাইকে কিন্তু আস্‌তে হবে, মনে থাকে যেন, বুঝ্‌লেন?

বিশ্বনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া আদর করিয়া কহিলেন—"আস্‌বে বৈ কি দাদাভাই, সেও যে তোমার বাড়ী।" মুরারি মৃদুস্বরে একবার উমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রস্তাবও তুলিল। বিশ্বনাথের মনটা ক্ষণেকের জন্য প্রলোভিত হইয়া উঠিল, কিন্তু মনের সে সাধটিকে বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিতে সাহস হইল না। মৃদুভাবে হাসিয়া, একটু কাশিয়া, ডিবা খুলিয়া নস্য লইয়া বলিলেন—"থাক্ ভাই, আজ আর কাজ নেই, এখন তা হলে আমি যাই। দু'পাঁচ জায়গায় আবার বলতেও হবে। হাতীবাগান হয়ে ভবানীপুর ফিরতে হবে।"—বলিয়া পিছনে ফিরিয়া না তাকাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। মুরারি জলযোগের অনুরোধ করিতে সাহস না করিলেও, পিসীমা খবর পাইয়া সরকারকে দিয়ে সে অনুরোধ করাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ অস্বীকার করিলেন,—সন্ধ্যা বন্দনার কাল উপস্থিত, এখন ত আর জলযোগের সময় নাই। তা ছাড়া তিনি কন্যাদান করিয়াছেন, উমার পুত্র হইলে আহার চলিতে পারিত, জামার গৃহে ভোজন করা অসামাজিকতা। তাহার মুখের পানে চাহিয়া মুরারিও দ্বিতীয়বার সে অনুরোধ করিতে সাহস করিল না।

বিশ্বনাথ যে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া বাহির হইতেই বিনা আতিথ্যে ফিরিয়া গেলেন, অন্দরে বসিয়া তাহার সংবাদ উমার কর্ণে পৌঁছিল। উমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার জন্য মুরারি যে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ সে উমার শ্রুতিগোচর করিয়া দিল। তবুও তিনি দেখা করিয়া গেলেন না, দেখা দিলেনও না। কেন যে দেখা করিলেন না তাহা বুঝিতে উমার সময় লাগিল না। গৃহ কর্ত্তাদের বিনানুমতিতে বলিলেও ঠিক হয় না—তাদের আপত্তি সত্ত্বেও—চোরের মত লুকাইয়া কেন তিনি দেখা করিবেন? সে লুকোচুরির নীচতা কি তাহার দ্বারা সম্ভব! অনাথের বিবাহের সংবাদে উমা মনে মনে একটুখানি আশা পাইয়াছিল, তাই সে পিসীমার আশে পাশে তাহারই মহলে ঘুরিতেছিল। দুষ্ট আশা যখন তাহাকে মরীচিকার মত দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া বুঝাইয়া দিল যে—ইহা প্রতারণা, তখন বিশ্বনাথ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন। উপরের কোন কক্ষের বাতায়নে গোপনে দাঁড়াইয়া আর দাদামহাশয়ের সে সৌম্যমূর্ত্তিখানি চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইবারও সুযোগ নাই। সংসারের ছোট বড় অনেক আঘাতের মত এ আঘাতটাও উমা নীরবে সহিয়া লইল।

৮

নূতন সুর

রবিবার সুধীরের ছুটি। দুপুরবেলা উপরের দালানে মাদুর বিছাইয়া পিসীমা গৃহাগত রৌদ্রে ভিজা চুল কয়গাছি মেলিয়া দিয়া সুধীরের কাছে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান শুনিতেছিলেন। পাঠকের উৎসাহ যতই থাক্, আহারান্তে দিবানিদ্রার অভ্যাসে পিসীমার চোখ, ভাবে যত না হউক, ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছিল। মাদুরের প্রান্তে বসিয়া উমা সুধীরের জন্য একজোড়া মখমলের জুতার প্যাটার্নে রেশমের ফুল তুলিতেছিল। প্রথমতঃ এই রেশম বোনাটাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলেও, কোন সময় গল্পে মন লাগিয়া গিয়া সেটা এখন হাতেই রহিয়া গিয়াছে। দেব কোপানলে পতিত দুরবস্থ সম্রাটের শোচনীয় পরিণামে মন যে কখন সহানুভূতিতে সমবস্থ হইয়া গিয়াছে তাহা সে অনুভব করিতেও পারে নাই। শ্মশানে মৃত পুত্র বক্ষে ধরিয়া রাজমহিষী শৈব্যা 'হা পুত্র, হা পুত্র' রবে শ্মশানবাসী মৃত আত্মাদেরও যেন জাগাইয়া তুলিতেছিলেন। কলনাদিনী উত্তরবাহিনী জাহ্নবীও যেন সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনির সহিত প্রতিধ্বনি মিলাইতেছিল। দূরে বৃক্ষশাখায় পাখীরা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, উড়িবার কথা মনে পড়ে নাই। শ্মশানচারী বায়স, শিবা, শকুন, বালকের আশে পাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, লোভের চিহ্ন দেখাইতেছে না। সর্পবিষে স্বর্ণকমল নীল হইয়া গিয়াছে। আত্মবিস্মৃতির বশে চণ্ডালবেশী রাজা—দাহের মূল্যের জন্য মুদ্গর হস্তে অভাগিনী রাজমহিষীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। নীচকার্য্যে মানুষের চিত্তবৃত্তি কতদূর নিম্নগামী হইতে পারে, তাহারই জ্বলন্ত উদাহরণ দিতেই যেন তাহার মনে মৃত শিশুর মুখ, রাণীর বিলাপধ্বনি আঘাত করিতেও সক্ষম হয় নাই।

পিসীমার নাসিকাধ্বনিতে বুঝাইয়া দিল, এখন তাহাকে কাব্যরসাস্বাদন করাইবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু পাঠকের চিত্ত তখন এমনই উৎসাহদীপ্ত যে এই তুচ্ছ বাধায় সে নামিতে পারিল না। তা ছাড়া পিসীমা ব্যতীত অন্য শ্রোত্রীও ত সেখানে উপস্থিত। উমার চোখ দিয়া তাহার অজ্ঞাতেই মুক্তার মত স্বচ্ছ জলের ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছিল। ক্রমে রাজা রাণীকে ও রাণী রাজাকে চিনিতে পারিলেন—

তখন চন্দন কাষ্ঠে সাজাইয়া চিতা।
মধ্যেতে রাখিয়া পুত্র পাশে মাতা পিতা॥
অগ্নি প্রজ্বালিতে যান—ধর্ম্ম ডাকি কন।
ক্ষান্ত হও রাজা তব জিয়াব নন্দন॥

সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিয়া কখন তাহা তাহাদেরই কক্ষদ্বারে আসিয়া থামিয়াছিল, পাঠক ও জাগ্রত শোত্রী ভাবের তন্ময়তায় তাহা উপলব্ধি করিতেও পারে নাই। হঠাৎ রাজার অতর্কিত বিপদ শাস্তিতে শান্তচিত্তে উমা চোখ মুছিতে গিয়া দেখিল—সতীনাথ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার পানেই চাহিয়া আছে। উমাকে চাহিতে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া সুধীরের উদ্দেশে কহিল—"পিসীমাকে পড়া শোনাচ্ছিস না কি রে?"

সতীনাথের কণ্ঠস্বর অথবা পাঠ থামিয়া যাওয়ায় পিসীমার তন্দ্রা ছাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—"এস না বাবা, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? সুধীর, সেইখানটা পড়্‌ত রে, সেই অঙ্গদ রাবণের কথা।' পিসীমা জানিতেন—এই স্থানটিই সুধীরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

সতীনাথ একটুখানি যেন ইতস্ততঃ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। পিসীমা তাহাকে বসিবার জন্য মাদুরে স্থান করিয়া দিলেন। উমা নীচে মেঝেয় নামিয়া বসিল, উঠিয়া যাইবে কি না দ্বিধায় পড়িয়া উঠিতে পারিল না। হয় ত সেটা পিসীমার চোখে এবং উহার চোখেও বিসদৃশ ঠেকিতে পারে। সতীনাথ এখন আর অন্দরে আসে না, আসিলেও তাহাদের সান্নিধ্য মাড়ায় না। আজও সে জ্যেঠামহাশয়ের কাছে ত্রিতলে যাইতে গিয়া সুধীরের পাঠের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া এ দিক আসিয়া পড়িয়াছিল এবং কেন যে ফিরিয়া না গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে সেও বোধ হয় ঠিক বলিতে পারিত না। এখন কাছে আসিয়া আসন গ্রহণ করায় পিসীমার অনেক দিনের অভিমানের ব্যথা জাগিয়া উঠিতে চাহিল। যখন ঐ অবগুণ্ঠনাবৃতা নির্ব্বাক ব্যক্তিটি এ সংসারে স্থান গ্রহণ করে নাই, তখনকার অলস মধ্যাহ্নগুলা এমনভাবে সতীনাথকে বাদ দিয়া কখনও চলিয়া যাইত না। কলেজ হইতে ফিরিয়া বই রাখিবার বিলম্বটুকুও তাহার সহিত না, বইগুলি কক্ষের মুক্ত দ্বারপথে ছুঁড়িয়া দিয়া সে পিসীমার কাছে আসিত। কলেজে কত মড়া ঘাঁটিয়া, কত অস্পৃশ্যজাতি স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে, তাহারই বিস্তারিত বিবরণ বলিতে বলিতে তাহাকে ছুঁইয়া দিবার ভয় দেখাইয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিত। ছুটির দিনে এ সব বিড়ম্বনা বড় অধিক না ঘটিতে পাওয়ায়, সে দিনটি সে তাহার কোলে মাথা রাখিয়া কত গল্প করিত—ও অন্য দিনগুলায় যে ছাড়িত এমন নয়, তবে নিতান্ত অসময়ে ছুঁইয়া দিত না। দিলেও বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া তবে ছুঁইত। প্রথম প্রথম যখন মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে হইত, সে নিজ হাতে ভাত খাইতে পারিত না—লক্ষবার ধৌত করিলেও মনে হইত হাতের গন্ধ গেল না। তখন পিসীমাই তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেন। সে এই ছুতায়

সুধীরের সহিত পিসীমার স্নেহের পক্ষপাতিত্ব লইয়া কত কৃত্রিম কলহের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে রাগাইয়া কাঁদাইয়া পিসীমার কাছে স্নেহের তিরস্কার শুনিত। সে সব অতীত দিনগুলি এখন বিস্মৃতির গর্ভে স্বপ্ন হইয়া রহিয়াছে। এখন সে আর তেমন ছেলেমানুষের মত হাসি খুসী করে না। বাড়ীর ভিতরে ত আসেই না, কেবল যা দুই বেলা খাবার সময় তিনি তাহাকে দেখিতে পান। তাই বা ক দিন বাড়ী থাকে — আজ এখানে কাল সেখানে করিয়াই ত বেড়ায়।

আজ পলাতককে কাছে পাইয়া, কথার কৌশলে কিছুক্ষণ বন্দী করিয়া কাছে রাখিবার চেষ্টায় পিসীমা গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন—"আমাদের গাঁয়ে একবার বর্দ্ধমান থেকে এক কথকঠাকুর এসেছিলেন, রুক্মিণীহরণ পালা হইয়াছিল। সে যে কি চমৎকার কথকতা, তা আর তোকে কি বলব! তুই তখন ছোটটি সুধীর জন্মাযও নি। কথা হল গিয়ে বোশেখ মাসে, আর আমার কপাল পড়ল সেই জষ্টিতেই। আহা সেই বারেই চন্দরনাথকে শেষ দেখা দেখে আসি।

পিসীমার পুরাতন কাহিনীকে একবার আরম্ভ হইতে দিলে তাহা শীঘ্র থামিবে, সতীনাথের সে সম্বন্ধে বড় বেশী ভরসা না থাকায় সে মাদুরের উপর জাঁকিয়া বসিয়া সুধীরের উদ্দেশে কহিল—"তার পর কথক মশাই, তোমার কথা আরম্ভ হোক।"

আত্মপ্রশংসার আকাঙ্ক্ষায় সুধীর তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাইয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটি বাহির করিয়া মহা উৎসাহে পড়া সুরু করিয়া দিল।

অঙ্গদ রাবণের কলহ শ্রবণে সতীনাথের কিছুমাত্র উৎসাহ না [illegible] অধিকক্ষণ ধৈর্য্য রক্ষা করা তাহার দায় হইয়া পড়িল। সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিতে মনোযোগ দিবার ভান করিতেছে দেখিয়া উমা মনে মনে ও পিসীমা প্রকাশ্যে হাসিতেছিলেন। সুধীর রাগ করিয়া কহিল—"তবে যাও, তোমরা মন দেবে না, তবে আমি পড়ব না।" রাগ করিয়া যে কাজটায় সে অস্বীকার জানাইল, তাহাই করিবার ইচ্ছা যে তাহার তখনও ষোল আনা বর্ত্তমান, সতীনাথের তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। মুখভার করিয়া কৃত্রিম বিস্ময়ের স্বরে সে কহিল— "দেখ ত পিসীমা, এত মন দিচ্ছি তবু বাবুর রাগ! ঐ জন্যেই ত শুনি না।" পিসীমা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"তাই ত—সতী ত খুব মন দিয়ে শুনছে, পড় না সুধীর—তোর বাছা, সবেতেই খুঁত খুঁতুনি।" সুধীরও অগত্যা অধিক তোষামোদের আশা না রাখিয়াই রাগ মিটাইয়া পাঠ্যস্থানে মনোযোগ দিল।

সুধীর পড়িতে লাগিল—

রাবণ বলে আমার তরে ধর্‌বি রামের পায়।
যুদ্ধ করে মর্‌ব আমি তোদের কিসের দায়॥
অঙ্গদ বলে হিতোপদেশ কি বুঝবি বেটা গরু।
তুই বাঁচ্‌লে আমার বাপের কীর্ত্তি কল্পতরু॥
নৈলে তোরে বেঁচে থাক্‌তে সাধ করে কি বলি।
লোকে বল্‌বে এই বেটাকে বেঁধেছিল বালী।
যে থাকে বাসনা তোর এই বেলা তা কর।
রাজ আভরণ লয়ে তুই সর্ব্বাঙ্গেতে পর॥
তুই মরিলে এসব আর ভোগ করিবে কে।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন দরিদ্রকে দে॥
বুদ্ধিমান হয়ে জ্ঞান হারালি অভাগা।
শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথা বাঁধ্‌বি তাগা॥
স্ত্রী সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর্ কথা।
কেবা যাবে তোর সনে হয় অনুমৃতা॥

উনানের উপর দুগ্ধপূর্ণ কটাহ স্থাপিত রাখিয়া পিসীমা এতক্ষণ নিশ্চিন্ত বিশ্রামে একঘুম ঘুমাইয়া লইলেও, এখন কি মনে হওয়ায় হঠাৎ সেই তপ্ত দুগ্ধের শোচনীয় পরিণাম আশঙ্কায় তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অগ্নিতাপে এতক্ষণ হয় ত দুধটুক্ সব মরিয়া গিয়াছে, অথবা অপর কোন দুর্ঘটনাও ঘটিয়া থাকিতে পারে! পিসীমা নীচে যাইবার প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য বুঝাইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন, এবং তাহার অত্যল্পকাল পরেই নীচে হইতে ডাক পড়িল—"সুধীর, চিনের কৌটোটা দিয়ে যা ত বাবা।"

পাঠে বাধা পড়ায় অনিচ্ছুক সুধীর তাহার মনের বিরক্তিভাব 'দুপ্‌দাপ' পদশব্দে প্রকাশ করিয়া বই ফেলিয়া কৌটা লইয়া নীচে নামিয়া গেল। তার পর তাহার আর শীঘ্র ফিরিবার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। পিসীমার এই স্নেহের ছলনাটুকু সতীনাথ বুঝিল কি না বলা যায় না, উমা কিন্তু বুঝিল। বুঝিয়া নিদারুণ লজ্জার সহিত তাহার কেবলি মনে হইতেছিল- এ বিড়ম্বনা কেন? পিসীমা জানিয়া শুনিয়াও কেন তাহাকে এমন করিয়া অকারণ লজ্জায় ফেলিয়া গেলেন! তিনি ত সব কথাই শুনিয়াছেন, তবে আবার এ সব লুকোচুরি খেলা কেন? পিসীমা উমার মনের অভিমান ব্যথা না বুঝিয়া আরও দুই একবার এমন সুযোগ তাহাকে পাইতে দিয়াছেন; মনে করিয়াছেন, কাছে পাইলে সে নিশ্চয়ই কাঁদাকাটা করিয়াও স্বামীকে বশ করিয়া লইতে পারিবে। তিনি

জানিতেন না যে সে সময় উমা সতীনাথের কাছে কি পাইয়াছে—একটা মুখের কথাও না। কিছু দিন হইতে উমা লক্ষ্য করিতেছিল, বিরাগীর চিত্তে যেন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চলিয়া যাইতে পথে দেখা হইলে যেন থমকিয়া দাঁড়ান, দেখা হইলে তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইবার চেষ্টা করেন না, কোন্ দিন জ্যেঠামহাশয়ের বা সুধীরের কোন প্রয়োজনীয় কাজে হয় ত দুইটা কথাও কহেন। কথার উত্তর না দিলে পাছে তিনি মনে করেন যে সে মান অভিমান জানাইতেছে, তাই লজ্জা এড়াইবার জন্য সঙ্কোচ কাটাইয়া বাধ্য হইয়া তাঁহার কথার উত্তরও সে দেয়। তাহাও এত সংক্ষিপ্ত যে বক্তা বা শ্রোতা কাহারও মনে অধিকক্ষণ তাহা স্থায়ী হয় না; আর সে ঘটনাও কদাচিৎ।

স্নেহাতুরা পিসীমার এই সকরুণ স্নেহের ছলনাটি আজ উমাকে তাই খুসী করিতে পারিল না। লজ্জায় বিরক্তিতে তাহার চম্পকবর্ণে গোলাপের আভা ফুটিয়া উঠিল। সে অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে রেশমের কৃত্রিম পুষ্পে বর্ণ মিলাইতে মনোযোগ দিল।

সতীনাথ উমার অনাবৃত সুগোল বাহুর আন্দোলনে মিশ্রিতবর্ণ রেশমসূত্রের উত্থান পতনলীলা দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল—'ইহাকে দূরে রাখা যত সহজ, কাছে দেখা বুঝি তেমনি কঠিন। কথা কহিতেও বাধে, উপেক্ষা দেখাইতেও লজ্জা করে।' অথচ এই শেষোক্ত নীচতাই নিতান্ত অসভ্যের মত সে দীর্ঘদিন ধরিয়া আচরণ করিয়া আসিতেছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা নিতান্তই অশোভন দেখাইতেছিল, অথচ তাহার মনের ভিতর যে অব্যক্ত প্রশ্নগুলা ছিল, তাহা সে ব্যক্ত করিতে পারিল না। কিছু বলা নিতান্তই উচিত মনে হইতেছিল, কিন্তু কোন্ কোথা দিয়া প্রথমে আরম্ভ করিবে, তাহার সূত্র খুঁজিয়া মিলে না। উমা যে নিজে হইতে কোন কথা কহিবে তাহার এতটুকুও সম্ভাবনা নাই, ইহা সে বিলক্ষণই বুঝিয়াছে।

যখন চুপ করিয়া বসিয়া নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সে কথার সূত্ররূপে তাড়াতাড়ি কহিল—"মনে কচ্চি, শীগ্‌গিরই একবার পশ্চিম বেড়াতে যাব।"

কথাটা বলিয়া তাহার মনে হইল, ইহার উত্তর পাইবার আশা কিছুই নাই। উমাকে এ কথা বলিবার যে কোন কারণ ছিল তাহাও নয়। পশ্চিমেই যাউক বা দক্ষিণেই যাউক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার সহিত উমার যে কোন যোগই নাই, সে কথা সেও জানে, উমাও বোঝে—কেবল কথা কহিবার অবলম্বনরূপেই সে এই সংবাদটা দিল—উত্তরের আশা রাখিয়া নয়।

উমা কহিল—"বর্ষায় ত কেউ পশ্চিমে যায় না"—নিজের মনোভাব গোপন

করিবাব অদ্ভুত দক্ষতা সে লাভ কবিয়াছিল। তবু তাহাব কালো চোখে একটুখানি যেন আশঙ্কাব ছায়া প্রকাশ পাইল। সংযত কণ্ঠস্বরের সহিত সেটুকু ঠিক থাপ খাওয়াইতে পারিল না, সে উত্তর চাহিল কি না, সেটুকু তাহাব কথাব সুরেও প্রকাশ পাইল না।

সতনাথ সুধীরের পবিত্যক্ত বামায়ণ তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত মনোযোগে তাহাবই একথানা অপূর্ব্ব চিত্রপটের সৌন্দর্য্যে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, মুখ না তুলিয়াই কহিল—'সবাই যা কবে, আমি কি তাই কবি? এ সময় কেউ যায় না বলেই আমি যাব।"

তাহাব কণ্ঠস্বরে উমা বিস্মিত হইল। কথাব এ সুর আজ যেন তাহাব নূতন মনে হইল। কিন্তু তথাপি কৌতূহল তাহাব ধৈর্য্যে বাধা দিল না। জোব কবিবার, মানা কবিবাব অধিকাব তাহাব কিসেব? কবিলেই বা উনি শুনিবেন কেন? পাছে নিজেব সীমা ছাড়াইয়া অনধিকার চর্চ্চা কবিয়া ফেলে, এই ভয়েই সে শঙ্কিত হইয়া থাকে। তিনি ইচ্ছা কবিয়া কথা কহিলে সে উত্তব দিতে বাধ্য হয়, তাহারও সীমা যে কতটুকু নির্দ্দিষ্ট, সে বিষয়েও তাহাব কিছু জানা নাই। সে মনোযোগেব সহিত সূচিব ছিদ্রে সূত্র প্রবেশেব চেষ্টায় অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্ত হইয়া রহিল দেখিয়া অসহিষ্ণু সতীনাথ ভাবিতেছিল, কতবাব সূচি উঠাইলে একটা ফুল হয় জিজ্ঞাসা করে। একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া সে কহিল—তুমি বোধ হয় আমাব উপব বাগ করেচ?"

উমা সূচি হইতে চোখ তুলিয়া কহিল—"কেন"—সতীনাথ কি ভাবে প্রশ্ন কবিয়াছিল, সে তাহার অর্থ না বুঝিয়া বিস্ময় বোধ করিল। স্বামীব উপব বাগ কবিবাব তাহাব যে কোন কাবণ বর্ত্তমান আছে, প্রশ্নের ধবণে সেটুকু বুঝিতেও পাবা গেল না।

সতীনাথ বিস্মিত হইল—মানুষ কি এমন বোকা হয়? তাহাব বলিবার কথা অনেক ছিল, কিন্তু বলিতে দ্বিধাব হাত এড়াইতে পাবিতেছিল না; এবং কি যে বলিবে তাহারও কোনও মীমাংসা স্থির কবা হয় নাই। তাই কহিল—"কোন কাবণ নেই কি?"

এইবার উমা বুঝিতে পাবিয়া লজ্জিত হইল। সে ভাবটা চাপা দিবাব জন্য সেলায়ের উপব চোখ বাখিয়া কহিল—"না—বাগ কব্‌ব কেন?"

সতীনাথেব ইচ্ছা করিতেছিল, চীৎকাব কবিয়া সে বলে—'কেন তা কব না? আমি কি এতই অধম যে বাগের কাবণ হইলেও বাগ কবা যায় না?' মুখে কিন্তু সে কথা না বলিয়া বলিল—"অন্য কেও হলে বোধ হয় খুবই রাগ করত। কবৃত না কি?"

এবার লজ্জা ও বিরক্তিতে উমার স্বাভাবিক ঔদাসীন্য পরাজিত হইল। তাহাব মুখখানা ক্ষণে ক্ষণে বিবর্ণ ও আরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া সতীনাথেবও নিজের কথায় অস্বস্তি বোধ হইল। অসমাপ্ত গোলাপ-কুঁড়িটি সমাপ্ত হইয়া যাওয়ায়, তাহার বাড়্তি সূতাটুকু কাঁচি দিয়া কাটিয়া, বিশৃঙ্খল রেশমগুলি বেতের ঝাঁপিটির মধ্যে ভরিয়া উমা উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে তাহাকে মুক্তি দিবার জন্যই যেন বাহিরের ঘড়িতে তিনটার ঘা বাজিয়া গেল। এ সময় রুদ্রকান্ত ঔষধ ও ডালিমের রস পান করেন। এ কার্য্যটির ভার উমার উপরেই ন্যস্ত। "জ্যেঠামহাশয়ের ওষুধ খাবার সময় হল"—বলিয়া নিজের হঠাৎ চলিয়া যাইবাব কৈফিয়ৎ দিয়া, সে তাহার স্বভাবের বিপরীত দ্রুতপদেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সতীনাথের প্রশ্নে উমা ব্যথা পাইল, বাগ কবিল্ অথবা অপমানিত জ্ঞান করিল—বুঝিতে না পারিয়া সেও দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কিছুদিন হইতে উমাকে বুঝিবার জন্য এমনি একটা নিরালা সুযোগ সেও চাহিতেছিল, আজ তাহার সুযোগও মিলিয়াছিল। তবু নিতান্ত আনাড়ীর মত সে তাহার হাতের খেলা কাঁচাইয়া বসিল! আরম্ভেই যাহাব এমন বিভ্রাট, তাহার উপসংহার অবধি পৌছিতে কি আর ধৈর্য্য থাকিবে?

অনেকক্ষণের পর রুদ্রকান্তকে ঔষধ সেবন করাইয়া উমা যখন দ্বিতলে নামিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতেছিল, তখন সবিস্ময়ে দেখিল—সতীনাথ তখনও সেইখানে তেমনি স্তব্ধ ভাবেই একা বসিয়া আছে। আজ আর সে সদা-সহাস্য মুখখানা তেমনি প্রফুল্ল নয়। সূর্য্যাস্তের ছায়াময় ম্লান আকাশের মতই ম্লানায়মান। থমকিয়া দাঁড়াইয়া, এক মুহূর্ত্ত সেই দিকে চাহিয়া, পরক্ষণে নিঃশব্দে সে নিজের কক্ষে চলিয়া গেল।

৯

নূতন সংবাদ

খাবার সময় কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে পিসীমা কহিলেন—"তুমি না কি মধুপুরে যাবে সতী, বিপ্নে বল্ছিল?"

সতীনাথ দক্ষিণ হস্তের কায্য বন্ধ রাখিয়া মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—"তাই ত মনে কচ্চি, শরীরটা বেশ ভাল থাক্চে না, একবার ঘুরে আসা যাক্।"

পিসীমা আতঙ্কিত ভাবে কহিলেন—"না বাবা, তোমার আর শরীর সারিয়ে কাজ নেই—সেবার যা শরীর সারিয়ে এসেছিলে! এইখানেই ওষুদ বিষুদ খাও, সেরে যাবে।"

সতীনাথ কহিল—"বারো মাসই কি ঘরে বসে থাক্‌তে ভাল লাগে, দুদিন একটু বদ্‌লে আসা যাবে।"

পিসীমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতের পাখাখানি জোরে জোরে চালাইয়া কহিলেন—"ফির্‌বে কবে?"

সতীনাথ কহিল—"তা এখন কেমন করে বল্‌ব? ভাল লাগে কিছুদিন থেকে আসাই যাবে।"

তাহার এই 'ভাল লাগা' কথাটি পিসীমার বুকে বাজিল। আহা, বাড়ীতে সুখ পায় না, তাই না বাছা বাহিরে থাকিতে চায়! বধূর উপর রাগও হইল। কেমনই বা মেয়ে সে, এদিকে এত বুদ্ধি বিবেচনা দয়া মায়া, কেবল স্বামীর উপরেই ভক্তির অভাব কেন? এত রূপ গুণ লইয়াও যদি স্বামীকে সুখী করিতে পারিল না, তবে সে রূপ গুণ থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি! হাতে পায়ে ধরিলে, কান্নাকাটী করিলে না কি স্বামী বশ হয় না! বিশেষতঃ অমন স্বামী! সতী কি তাহার তেমন ছেলে?

বধূর স্বামিবশীকরণে অক্ষমতাই যে সতীনাথের মনঃপীড়ার হেতু, এ সম্বন্ধে পিসীমার সন্দেহমাত্র ছিল না। তাই আজ কাল সুবিধা পাইলেই বধূকে তিনি হিতোপদেশ ও ছেলের কাছে পাকে প্রকারে বধূর স্বপক্ষে ওকালতীর ভার লইয়াছেন। অবশ্য পুত্রেরও পূর্ব্বের মত বিদ্রোহী ভাব দেখিলে হয় ত তিনিও সাহস করিতেন না। ছেলেকে 'ঘরবাসী' করিবার জন্য মানসিক করিয়া করিয়া দেবীদেরও যথেষ্ট প্রলোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। সতীনাথের বিষণ্ণ মুখ, সংসারের ছাড়া ছাড়া উদাসীন ভাব, সকল বিষয়ে নির্লিপ্ততা—দিবারাত্র যেন তাঁহার দেহমনে বিঁধিতে থাকে। কখনও নিজের অদৃষ্টের উপর, কখনও বধূর উপর রাগ করিয়াই তাই ঝাল মিটাইয়া লন। ছেলের দোষ কি? পুরুষ বেটাছেলে—ঘরে সুখ না পাইলে বাহিরে খুঁজিতে যাইবে, ইহা ত আর নূতন কথা নয়!

মাছের ঘণ্টটা তাহাকে নিঃশেষিত করিতে দেখিয়া পিসীমা তাড়াতাড়ি পাখা ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ঘণ্টটা আর একটু দিতে বলি—কই-কপিটা কেমন হয়েছে বল্ দেখি? দার্জ্জিলিংএর কপি, তবু দেখেচিস, ঠিক যেন কালের জিনিষ। দিনে দিনে কতই দেখ্‌ব!"

তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া সতীনাথ বাধা দিয়া কহিল—"কপিটা খাসা হয়েছে; ঠাকুর তোমার হাত পেয়েচে পিসীমা, তোমায় আর মাছ ছুঁতে হবে না।"

পিসীমা ঈষৎ লজ্জিত হাস্যে কহিলেন—"আমি কি মাছ ছুঁতে নারাজ রে?

তোমা খেয়ে তৃপ্তি পাবি—সেটা বড—না, আমার একবার কাপড কাচা বড় ? তবে আজ কাল নাকি তোদের কল্যাণে রোজ গঙ্গাস্নানটা করে আসি, তাই বলি আর বুড়ো বয়সে ওসব ছুঁই কেন ? দরকারও ত হয় না কিছু, এখন ত বৌমাই ও সব কলের উনুনে বেঁধে দেয়। হরিবোল হরি, ও বুঝি চক্রবর্ত্তীর রান্না ?"

সতীনাথ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল—"চক্রবর্ত্তী ত বেশ রাঁধে পিসীমা, অনর্থক কারো কষ্ট করা কেন ?"

পিসীমা সুপক্ক মর্ত্তমান কলার খোসা ছাড়াইয়া ঘনামৃত দুগ্ধে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"শোনো একবার ছেলেদের কথা ! নিজে হাতে দু-একখানা ভাল মন্দ রেঁধে খাওয়াবার সাধও কি ওর হয় না রে ? ও ত আর তেমন ঘরের মেয়ে নয় যে শুধু বই পশম আর দেহ নিয়েই থাক্‌বে ? বাছার আমার কাজ করে আর আশ মেটে না। আমায় ত ছুটিই দিয়েচে ; বলে—'তুমি চোখে দেখ্‌তে পাও না, কেন বারমাসই খাট্‌বে পিসীমা ? আমায় তবে কি কত্তে এনেচ ?'—তোর যে বিশ্বনিন্দুক জ্যেঠা, সেও আজ কাল তরকারীর বাটী চেটে খায়।"

পিসীমার বাক্যস্রোতে উৎসাহ না দিবার ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি সতীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। চটি জুতার ভিতর পা গলাইয়া দিয়া আচমনের জন্য বাহিরে আসিতেই দেখিতে পাইল, উমা অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে জানালায় কাছ হইতে সেইমাত্র দ্রুতপদে সরিয়া যাইতেছে।

সতীনাথ আজ নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে উঠিয়া পড়ায় উমা পলাইতে সময় পায় নাই। সতীনাথ বিস্মিত হইল—তবে কি রন্ধনকারিণী প্রত্যহই গোপনে থাকিয়া ভোজনকর্ত্তার তৃপ্তি অতৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ? সে ত এত তত্ত্ব জানিত না ! হয় ত সে অর্ব্বাচীন কত দিন তাহার সযত্ন-প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি আস্বাদন না করিয়াই ফেলিয়া রাখিয়াছে। এ সব বিষয়ে তাহার চিত্ত চিরদিনই কৌতূহল-হীন। তাই কখন যে পানে কেয়াগন্ধ, সরবতে গোলাপ এবং মিষ্টান্নের মিষ্টত্বের স্বাদ পরিবর্ত্তন ঘটিতে সুরু হইয়াছিল, সে তাহা জানিতেও পারে নাই। যখন পারিল, তখন বিস্ময়ের সহিত ঈষৎ কৃতজ্ঞতাও অনুভব করিল। কিন্তু কেন—কেন সে তাহার জন্য এত করে ? যেখানে এতটুকু মমতার কণিকারও আশা নাই, সেখানে গোপনে থাকিয়াও অহরহঃ তাহার এত দানের প্রয়োজন কি ? ইহাতে তাহার কিসেরই বা সার্থকতা ? এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে, সেব্য দ্রব্যের তৃপ্তির সহিত একটা অতৃপ্তির ব্যথাও সে যেন অনুভব করিতে লাগিল।

একটা নূতন চিন্তা কিছুদিন হইতেই ধীরে ধীরে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল—উমা হয় ত তাহাকে ভালবাসে। নিজের মনকে তাড়া দিয়া সে

সলজ্জে বলিতে চাহিল—কোন মানুষই এমন ব্যবহার পেয়ে কারুকে কখনও ভালবাস্‌তে পারে না। যত্ন করা তাহার স্বভাব, বাড়ীর কুকুর বিড়ালটাকেও ত সে যত্ন করিতে কৃপণতা করে না। বরং সে অনুপাতে সে সমধিক বঞ্চিত। জ্যেঠামহাশয়ের অত রাগও সে কত সহজে সহ্য করিয়া তাঁহার সেবা করে! এই চিন্তাটায় বিশেষ করিয়া তাহার বিস্ময় জাগাইল। শুধু ভয়ে কি মানুষ ভক্তি করিতে পারে? সেই সঙ্গে মনে পড়িল, দীর্ঘকাল অক্লান্ত সেবার মূল্য-স্বরূপ তাহারা তাহাকে কি দিয়াছে? লাঞ্ছনা—অনাদার—অবহেলা! সতীনাথের এতদিনের আত্মব্যবহারের কৈফিয়ৎ যেন আর তাহার বিবেককে প্রবোধ দিতে পারিতেছিল না। উমাকে সে বিবাহ-মূল্যে ক্রয় করিয়া কৃতার্থ করিয়াছে কি না, সেই পুরাতন প্রশ্নটা যখন তাহার মনে দ্বিধা জাগাইল, তখন হইতেই উমার ব্যবহার তাহার কাছে জটিল প্রহেলিকায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। নিজের স্বার্থপূর্ণ যুক্তিটার অযৌক্তিকতা তাহাকে লজ্জার সহিত ধিক্কার দিয়া যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছিল, বাস্তবিক বড় কে? যে অপরাধী সে—না, যে দোষীকে ক্ষমা করিতে পারে?

সতীনাথের মনে পড়িল—উমা বড়লোকের বধূ হইয়া তাহাদের দেওয়া সাজসজ্জা কিছুই গ্রহণ করে নাই, অত্যন্ত সাধারণ অনাড়ম্বর বেশেই সে থাকে। কয়গাছি কাঁচের চুড়ি মাত্র তাহার অঙ্গের আভরণ, তবু সে একজন ধনকুবেরের বাটীর বধূ। খুব বেশী না হউক তবু অমর ও মুরারির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বিবাহের সময় কতকগুলি মূল্যবান্ অলঙ্কার সে উচিত বোধেও উমাকে ক্রয় করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার একখানাও ত কৈ কোন দিন তাহাকে পরিতে দেখে না! কেন সে পরে না? সতীনাথ দিয়াছে বলিয়াই কি? সে যদি উপযুক্ত স্বামীর সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিত, তবে তাহার মত রমণীর জীবন কত সুখেরই না হইত! সতীনাথের মনে হইল, দেবতার পূজার ফুল সে তুলিয়া আনিয়া কত অবহেলায় কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে, এ কি তাহার অপরাধ নয়! সেদিন মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লেখার পুরস্কার স্বরূপ জ্যেঠামহাশয়ের নিকট সে যাহা পাইয়াছিল, তাহা তাহার অজ্ঞাত নাই। প্রবন্ধ লেখায় রুদ্রকান্তের ন্যায় সতীনাথের মনে অপমানবোধ না থাকায়, সে বিস্ময়ের সহিত শ্রদ্ধাও অনুভব করিয়াছিল। তার পর কোন এক সময় সুধীরকে দিয়া 'কিশলয়' মাসিক পত্রখানি আনাইয়া সে রচনাটি অনেকবার পাঠ করিয়াও লইয়াছে এবং পাঠকালে বালিকা লেখিকার উদার মত, সংযত ভাব, স্বাধীন ভাষা, নির্ম্মল রুচি তাহাকে মুগ্ধও করিয়াছে।

মনের এই দুর্ব্বলতাটাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত জ্ঞানে সতীনাথ নিজেকে কড়া শাসনে থামাইয়া রাখিতে চাহিল। কে কি করে, কে কি ভাবে, সে সব খবরের তাহার দরকার কি? বিরক্ত হইয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া থাকার অনেক জ্বালা, কর্ম্মহীন দীর্ঘ অবসর কাটাইবার সুযোগ না পাইয়া এই সব অনাবশ্যক জঞ্জালে মন ভরিয়া উঠে। মনে করিল, দিনকতক বায়ু সেবনে, কিছুদিন বা জমিদারী পরিদর্শনে, এমনি করিয়াই সে তাহার জীবনের দীর্ঘদিন কয়টা কাটাইয়া দিবে, কর্ম্মহীন অলস দিনগুলা এখন কেবল অবাস্তব চিন্তায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে চায়; কিন্তু ইহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইতেছে না।

১০

সতীনাথের আশঙ্কা

আহারান্তে সতীনাথ নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিল। পাশের ঘরে গিয়া সেলফ হইতে বাঁধান বইগুলির কাছে দাঁড়াইয়া, নাম দেখিয়া দেখিয়া অবশেষে একখানি টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। পুনরায় শয়নকক্ষে শয্যা গ্রহণ করিয়া সে খানির পাতা উল্টাইয়া এখান সেখান করিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল। কি পড়িতেছিল তাহার এক বর্ণও যখন বোধগম্য হইল না, তখন সে বিরক্ত ভাবে সেখানা ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। যে চিন্তাটাকে সে মনের ভিতর স্থান দিবে না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছে, সেইটাই জোর করিয়া আজ তাহার সমস্ত মনটিকে দখল করিয়া লইতে চাহিতেছিল। উমার কথা যতই সে ভাবিবে না বলিয়া মনে করিতেছে, মন বিদ্রোহী হইয়া ততই যেন তাহার কথাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিতেছে। সে উমাকে যে ভাবেই দেখুক, যেমন ব্যবহারই করুক, উমা ত তেমন কোন বিভ্রাট বিদ্রোহের কারণ ঘটায় নাই। সে কেন এত সহজে, এমন অবহেলায় তাহার দাবী ছাড়িয়া দিল? তিন বৎসর এক বাড়ীতে বাস করিয়াও সে ত একদিনের জন্যও স্ত্রীর অধিকারে স্বামীর বিরূপ চিত্তকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল না। এতটুকু অনুরাগ দেখাইল না, রাগ অভিমান কিছুই ত না। অপর স্থলে এমন ব্যবস্থা না ঘটুক, এমন নিরুপদ্রব সংসার যাত্রা ঘটাও ত সম্ভব হইত না। সে তাহার বন্ধুবান্ধবদের ভিতর অথবা গল্প উপন্যাসে এমন উদাসিনী স্ত্রীর সংবাদ এ পর্য্যন্ত কোথাও ত শুনিতে বা জানিতে পারে নাই। অনেক স্থলে স্ত্রী অনেকের মনোনীত হয়ও না, তবু সে সব স্ত্রীই কি এমন সহজে স্বামীকে যথেচ্ছ চলিতে ছাড়িয়া দেয়? কাঁদাকাটা

কত হাঙ্গামাও ত করিয়া থাকে বলিয়া শোনা যায় ;—এ ক্ষেত্রে সে সব কোন গোলযোগই নাই! সতীনাথের নির্লজ্জ আচরণের লজ্জাও সে তাহার অসঙ্কোচ উদার আত্মীয়তায় চাপা দিয়া ফেলিয়াছে। যেখানে তাহাদের সুখ শান্তি স্বচ্ছন্দতার জন্য যতটুকু আবশ্যক, কেবল ততটুকুই তাহাদের পাইতে দিয়া সে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, ধরা ছোঁয়া দেয় নাই। উমার এই অকুণ্ঠিত আত্মীয় ব্যবহারেই সে মনে মনে তাহাকে কিছুদিন হইতে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছিল। ভয়ের কারণ নাই ভাবিয়াই তাহার সঙ্গ গ্রহণে সাহসী হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাহার মনের বাতাস যেদিক দিয়া বহিতেছিল, তাহাতে সে আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে।

সতীনাথ এখন বুঝিয়াছে, কল্যাণীর উপর তাহার সব অধিকার চিরদিনের জন্যই ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন তাহার চিন্তা স্মরণ মনন তাহার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা অনুচিত। কল্যাণী এখনও যদি অপর কাহারও না হইয়াও থাকে, যদি কখন তাহা নাও হয়, তবু সে তাহার নয়, তাহার হইতে পারে না, সে বিবাহিত —শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী। এই ভাবের প্রেরণাতেই সে কল্যাণীর চিন্তা হইতেও নিজের মনকে ছিন্ন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টার ফল কিছু একদিনেই হয় নাই। পরিশ্রমে তাহার অন্তর দীর্ণ রক্তাক্ত হইয়া গেলেও, মন অবসাদে জড়ত্ব পাইলেও, সে মনকে কল্যাণী-চিন্তার স্বাধীনতা গ্রহণে ক্ষান্ত রাখিল। কল্যাণীকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে না পারিলেও, তাহার অপ্রাপ্তির ক্ষোভের ব্যথা অনুপায়ে নিবারিত হইয়াছিল। দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদ—চিরদিনের বিচ্ছেদকেই সে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের কোন খবর পর্য্যন্ত লইবার চেষ্টা মাত্র করে নাই। এ প্রাণান্ত চেষ্টার অন্তর্বিপ্লব—কালে ক্রুদ্ধ সাগরোর্ম্মিবক্ষে ক্ষুদ্র তৃণগাছির মত তৃণাদপি-তৃণ উমার চিন্তা কোথায় ভাসিয়া গেল, কে তাহার সংবাদ রাখিবে? আত্মসংযমের সেই কঠোর সাধনার সময় জীবনের অভিশাপরূপা উমাকেই বা তাহার কিসের প্রয়োজন? সে সময় উমার দিনগুলি কি ভাবে কোথা দিয়া কাটিতেছে—সে খবর লইবার আবশ্যকতা আছে বলিয়াও তাহার মনে হয় নাই। তার পর একদিন অকস্মাৎ যখন তাহার রুদ্ধদৃষ্টি খুলিয়া তাহার উপর দৃষ্টি পড়িল, তখন সেই বন্যলতা কেমন করিয়া এমন সুগন্ধি পুষ্পসম্ভারপূর্ণ উদ্যানলতায় রূপান্তরিত হইল ভাবিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। সেই সঙ্গে মনে নিপীড়িতার প্রতি একটুখানি সকরুণ শ্রদ্ধারও উদয় হইল। মনে হইল, যাহাকে কঠিন ঘৃণায় অবজ্ঞায় দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, হয় ত সে তত অবজ্ঞেয় নয়।

তাই সে মনে করিয়াছিল, এবার হইতে স্ত্রী মনে না করিলেও উমার সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে সে চেষ্টা করিবে।

চেষ্টার প্রথম উদ্যমেই সে বুঝিল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। উমা তাহার বন্ধুত্ব চাহে না, বরং নিজেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত রাখিয়া সে কেবল রাজরাজেশ্বরী রূপে বিলাইতেই ব্যস্ত, গ্রহণের প্রয়োজন তাহার কিছুই নাই।

যাহা অস্পষ্ট অরূপ আয়াসলভ্য, তাহাতেই মন আকৃষ্ট হয়। ভিতরের রহস্য-যবনিকার অভ্যন্তরে থাকিয়া যতই তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে দূরে সরাইয়া রাখিতে চায়, মন ততই তীব্র কৌতূহলে ভাবে—না জানি ইহার ভিতর কি অপরূপ রহস্যই লুকান আছে। তাই তাহার সঙ্গ গ্রহণে আগ্রহ জাগায়। বুঝিতে না পারায় বুঝিবার ব্যাকুলতার অন্ত থাকে না। সমুদ্রগর্ভে রত্ন আছে আমরা জানি, তাই ডুবারী নামাইয়া রত্ন আহরণের চেষ্টা করিয়া থাকি। যে অনধিকারী রত্নলাভের সাহস রাখে না, সেও রত্নাকরের সীমাহীন অতল নীল জলের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভাবে—'অতলের তলে না জানি কত অমূল্য মণিই লুকাইয়া আছে।' সে লুব্ধ না হইলেও বিস্ময় সম্ভ্রমে তাহার মনেও মুগ্ধতা আনে। উমার উপর সতীনাথ যেন তেমনি একটা বিস্ময়পূর্ণ মুগ্ধ ভাব অনুভব করিতেছিল। তাহার চরিত্র যতই অবোধ্য হইয়া উঠিতেছিল, মনও যেন সেই পরিমাণে কৌতূহলী হইয়া পড়িতেছিল। মানুষের দৃষ্টি যেখানে অন্ধ, চিত্ত সেখানে সজাগ। এ কৌতূহল তাহার বলিয়া নয়, ইহা মানব মাত্রেরই মনের ধর্ম্ম।

এই যে সুন্দরী তরুণী নারী সংসারের সকল বিরোধ দ্বিধা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া এমন অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে আপনার পথ গড়িয়া অবলীলায় চলিতে পারে, কে জানে তাহার ভিতরে কত বড় শক্তি জাগিয়া আছে, তাহার প্রসন্ন হাস্যে, ভাষাহীন মৌন অধরে, অচঞ্চল শান্ত দৃষ্টিপাতে, অকুণ্ঠিত সেবা-নিপুণতায়—নারীত্বের মহিমা গরিমা যে পরিমাণে ক্ষরিয়া ঝরিয়া পড়ে, মনোভাবের এতটুকু উচ্ছ্বাস তাহাতে সে যোগ করে না। সে যে কেবল তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য বিধি-নিয়োজিত যন্ত্রী, অভ্যাসবশে এ সংস্কার মনে উঠিলেও, তাহার ভিত্তিমূল যে আর ঝঞ্ঝাবাত্যা ধারণের উপযোগী দৃঢ়মূল নাই, এটুকু আজ তাহার মনের কাছেও অস্বীকৃত ছিল না। মনের এই দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটিকে আমল দিতেও সাহস হয় না। তাই দূরে উমার সান্নিধ্য ছাড়াইয়া কোথাও সরিয়া গিয়া সে নিজের এই দুর্ব্বলতাটাকে দূর করিয়া জীবনের নিরাপদ পথ পরিষ্কৃত করিয়া লইতে চাহিতে-ছিল। যে অধিকার দীর্ঘকালেও গ্রহণ করে নাই, যাহাকে অগ্রাহ্য দেখাইয়া অবহেলায় ত্যাগ করিয়াছে, আজ ভিক্ষুকের মত তাহারই দয়ার জন্য হাত পাতিবে

কেমন করিয়া? সে কি বলিবে—'এতদিন তোমায় চাহিয়া দেখি নাই, তাই বুঝিতে পারি নাই। আজ বুঝিয়াছি তাই আসিয়াছি? ছি!' সতীনাথের প্রবল আত্মাভিমান মাথা নাড়া দিয়া কহিল, উমা হয় ত তাহাকে অপদার্থ কাপুরুষ মনে করিয়া ঘৃণায় ধিক্কার দিবে, হয় ত বলিবে—'এতদিন যখন চাহিয়া দেখ নাই, তখন দেখিয়াও আর কাজ নাই। তোমার খেয়ালের জন্য পণ্যদ্রব্যের মত নিজেকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না। কখন দয়া করিয়া মনে পড়িবে, তবে চাহিয়া দেখিবে, পছন্দ হয় ক্রয় করিবে, না হয় অবহেলায় মুখ ফিরাইবে, এত তাচ্ছীল্যে তোমায় আমার প্রয়োজন নাই। এ কথা যদি সে মুখে নাও বলে, মনেও ত করিতে পারে। সতীনাথের মনে হইল, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিবার উপায় নাই। যে ভুল ঘটিয়াছে আর তাহা সংশোধন করা যায় না। জীবনের বাকী দিনগুলিও এমনি করিয়া ভুলের মধ্যে কোন মতে কাটাইয়া চলাই ভাল।'

খোলা জানালার বাহিরে মুক্ত আকাশের দিকে সতীনাথ চোখ ফিরাইল! সূর্য্য ডুবিয়া গেলেও অন্ধকার হইতে তখনও বিলম্ব আছে। অস্তগত সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা সাদা মেঘের ভিতরে যে ছায়া ফেলিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় কোথাও গোলাপী এবং কোথাও স্বর্ণরঞ্জিত অভিনব মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছে। ফিকা নীল রংএর চাদরখানা আজ যেন বিশ্বকর্ম্মা পূজা উপলক্ষে তাহারই নীচে রঙ্গীন চন্দ্রাতপের মত খাটাইয়া দিয়াছে। খণ্ড চন্দ্র ইহারই মধ্যে বক্র রেখায় দৃশ্যমান। দিনের আলোকে নিশানাথের জ্যোতিঃ রোগশীর্ণ মুখের মতই পাণ্ডুর ম্লান দেখাইতেছে।

১১

কোন মীমাংসাই হইল না

আকাশে চাঁদ নাই। জলে নক্ষত্রের ছায়া জোনাকীর মত ঝিক্ ঝিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পরপারে গরিফার কলেজ সজ্জিত দীপাবলীর মত অসংখ্য আলোক-বিন্দুর অনেকগুলিই নিভিয়া গিয়াছে। যা দুই চারিটি নিভিতে এখনও বাকী রহিয়াছে, জলে তাহাদেরই সঞ্চরমান ছায়া আলোকস্তম্ভের মত কাঁপিতেছিল।

নক্ষত্রালোকে জলের পানে চাহিয়া কল্যাণী চুপ করিয়া একা ছাদে দাঁড়াইয়াছিল। রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কতদিন সে এমনি দাঁড়াইয়া জলের পানে চাহিয়া থাকে—জলের তরঙ্গের আঘাতধ্বনি তাহার বুকে 'ছলাৎ ছলাৎ' করিয়া যেন সাড়া দিয়া চলিয়া যায়।

অনেক সময় কল্যাণীর মনে হয়—তাহায় বুকটা যেন খালি হইয়া গিয়াছে, সেখানে সুখ দুঃখ আশা কল্পনা কিছুরই আর যেন স্থান নাই। তাহার উদাস নেত্র তখন ধারণা হারাইয়া শূন্যেই চাহিয়া থাকে। আবার কত সময় সে অতীতকে জাগাইয়া মনের শূন্যতাকে ভরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। মনে পড়ে সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি, তাহার কৃত্রিম ক্ষুদ্র উদ্যানটুকু। সে বাগানে জমি যত কমই থাক, গাছপালা বড় কম ছিল না। টবে ভরা গোলাপ গাছগুলিতে সবে মাত্র কুঁড়ি ধরিতে সুরু করিয়াছিল। যূঁই বেল চন্দ্রমল্লিকা রজনীগন্ধা ফুটিয়া গন্ধে সন্ধ্যার বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিত। সেইখানেই প্রথম দিন সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। সে বাগানখানির প্রত্যেক ফুলে তাঁহার স্মৃতি জড়িত আছে। ভজার সহিত প্রথমে যেদিন তিনি মা'র চিকিৎসার ভার লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, কি বিশ্বাসে কি নির্ভরে সে তাঁহার কাছে গিয়া মিনতির সুরে—"মা ভাল হবেন কি না" জিজ্ঞাসা করিয়াছিল! তিনি তাহাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহাই সে বেদবাক্যের মত মানিয়া লইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহারই পাশে বসিয়া মা'র মাথায় বাতাস দিয়াছিল। সংসারের লোকের রীতিনীতি ভাল করিয়া বুঝিবার জানিবার সুযোগ তাহার না ঘটায়, যেখানে সঙ্কোচে সরিয়া আসা তাহার পক্ষে উচিত ছিল, সেখানে শ্রদ্ধা দিয়া সে তাঁহাকে পূজা করিতে চাহিয়াছিল।

তার পর ধীরে ধীরে কেমন করিয়া তিনি তেমন আপন হইয়াছিলেন, যেন মনেই পড়ে না। মনে হইত, তিনি যেন চিরদিনের কোন আত্মীয় জন। যে দিন পাশের ঘরে তাঁহার জন্য পান সাজিতে বসিয়া সে তাঁহাকে নিজের মুখে বিবাহের কথা বলিতে শুনিয়াছিল, সে দিন কি দারুণ লজ্জায় একা ঘরেও সে লাল হইয়া উঠিয়াছিল! তাঁহাকে কত নির্লজ্জই না মনে করিয়াছিল। তাঁর পর, কেন কে জানে, আজও সে ভাবিয়া পায় না, তার দুই চোখ দিয়া কেমন করিয়া জলের ঝরণা ঝরিয়াছিল—আর সেই মুহূর্ত্তেই মনে মনে তাঁহাকে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল! সে দিন হইতে সে আর তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতে পারিত না। তিনি যে তাহাকে দেখিবার জন্য পথের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, দরজার কাছে আসিয়া ফিরিয়া যাইতেন, কোন দিন মা'র কাছে আসিয়া খবরও লইতেন, গোপনে থাকিয়া সমস্তই লক্ষ্য করিলেও, সে আর তাঁহার কাছে বাহির হইতে পারিত না। অনেক সময় রাগও হইত—কেন তিনি এমন বিভ্রাট ঘটাইলেন, তাই ত সে আর তাঁহাকে দেখিতে পায় না! মা'র কাছে যে দিন তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনি আমার মা—আমি মনের কথা কখন লুকাতে শিখিনি, বিশ্বাস করুন, যত বাধাই থাক্, আমায় তা

বাধ্য কর্‌তে পার্‌বে না—আমি সব দুঃখ ওর জন্যে সইতে পার্‌ব”—সে কথাটা যদি জীবনের অন্য সকল ভুলের মত ভুলিয়া যাওয়া যাইত!

মানুষ কেমন করিয়া এমন বদল হইয়া যায়? যেদিন চিরদিনের জন্যই তিনি তাহাদের কাছে বিদায় লইয়াছিলেন, সে দিন যদি সে জানিত যে, ইহাই তাঁহার চিরবিদায়, তবে ভবিষ্যতের স্মরণের জন্য একবার তাঁহাকে সে গোপনে লুকাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইত। সে অভাগিনী, লজ্জার অনুরোধে একেবারে রন্ধন-গৃহে আশ্রয় লইয়া নিজেকে তখন লুকাইতেই ব্যস্ত ছিল। সে ত জানিত না যে আর সে লুকোচুরির প্রয়োজন নাই।

তিনি এখনও হয় ত সেই বাড়ীখানার দিকে চাহিয়া দেখেন। সেখানে এখন কাহারা আসিয়া বাস করিতেছে কে জানে! তাহাদের তত আদরের ফুল-গাছগুলির যত্ন লইতেছে কি না কে জানে! সে বাড়ীখানার দিকে কখনও চোখ পড়িলে তাঁর কোন কথা মনে পড়ে কি? কল্যাণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—না পড়াই ভাল। তাঁর স্ত্রী আছে, তিনি সুখী হইয়াছেন। অন্নপূর্ণার মুখে উমার কথা সে এত শুনিয়াছে যে উমা তাহার অদৃষ্টা হইলেও আর অপরিচিতা নাই। আহা—উমা খুব সুখী হোক্! সকলেই বলে উমাকে তিনি নিজে দেখিয়া পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছেন—আবার নাকি ভালও বাসেন না। আচ্ছা, এমন কেন হয়? যদি নিজে দেখিয়া পছন্দই করিলেন, তবে ভালবাসিলেন না কেন? বাসেন বই কি! ও সব দিদির ভুল। তাঁহার কজের অর্থ ত সকল সময় বুঝা যায় না, এও বোধ হয় তেমনি লোকের চোখে ধাঁধা দেওয়া। ভালবাসেন —তাঁর মনটাই যে ভালবাসা-ভরা—নহিলে তাকে এত ভালবাসিয়াছিলেন, কি করিয়া?

অন্ধকারের মধ্যে কল্যাণীর চোখের জল তাহার অজ্ঞাতে গণ্ড বাহিয়া পড়িল। সে মনে মনে বলিল—“লোকে তোমায় যাই বলুক, আমি জানি তুমি আমায় ঠকাও নি। তোমার স্নেহ, তোমার দয়া, তোমার বন্ধুত্ব এখনও যে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কচ্চি। সে কখনই ছলনা নয়। হয় ত সমাজের শাসনে, অথবা রুদ্রকান্ত বাবুর জেদে অথবা কি জন্যে জানিনে, তুমি ঐ পথেই চল্‌তে বাধ্য হয়েছ; নিশ্চয়ই সে তোমার নিজের ইচ্ছেয় নয়।”

কল্যাণীর মনে পড়িল, এক দিন বাগানে গল্প করিতে করিতে কত রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, তাহারা জানিতেও পারে নাই। ফুলেরা হয় ত তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল —আকাশে একটি ছোট তারা তাহাদের মাথার উপর জ্বলিতেছিল। মা রাত্রের রান্না জপ আহ্নিক সারিয়া যখন তাহাকে খুঁজিতে আসিলেন, তখন কি বিস্ময়ে

তাহারা দুইজনে চমকিয়া উঠিয়াছিল—এত রাত হয়ে গেছে! তিনি সে দিন কি অপ্রতিভ ভাবেই মা'র কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। মা কিন্তু সেই রাত্রেই তাহাকে কাছে টানিয়া বলিয়াছিলেন—"কল্যাণি—তুমি আর ছোটটি নেই, সতীনাথের সঙ্গে অত বেশী মিশো না, লোকে নিন্দা করবে। আর, এটা উচিতও নয়।" মা'র কথায় সেই দিনই সে প্রথম জানিতে পারে, সে আর বালিকা নাই। তিনি তাহাদের কেহই নহেন, তাঁহার সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করা তাহার উচিতও নয়—তাহাতে লোকে নিন্দা করে। এতদিন মা তাহাকে এ ভাবে শিক্ষা দেন নাই বলিয়াই তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইয়াছিল, নহিলে আরও অনেক আগেই তাহার বুঝা উচিত ছিল। সে রাত্রে মা ঘুমাইয়া পড়িলেও সে ঘুমাইতে পারে নাই। মনে পড়িল, ভগবানের উপর অভিমানে কেবলি যেন তাহার কান্না আসিতেছিল। কেন তিনি তাহাদের আপনার কেহ হইলেন না! তাহা হইলে ত আর বয়োবৃদ্ধির জন্য তাঁহার বন্ধুত্ব অপরাধের হইত না। পরদিনই তিনি বিবাহের কথা তুলিলেন, কেন তা করিলেন? তাঁহার মনেও কি সে দিন এমন ক্ষোভের ব্যথা জাগিয়াছিল? তিনি পুরুষ—জ্ঞানী, বিবেচক, তাই কি উপায়ে আপন হইতে পারা যায়, তাহা বুঝিয়াই উচিত বোধে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মা কিন্তু এখন আর সে কথা বিশ্বাস করেন না। মা বলেন, তাঁহাকে বিরক্ত বুঝিয়া তিনি উপস্থিত রক্ষার জন্য বুদ্ধিমানের মত ঐ কথায় তাঁহাকে শান্ত রাখিয়া, আসা যাওয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। মুরারিবাবুও মা'কে সেই কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সত্যই কি তাই? সে কি তবে তাঁর মনের কথা নয়? কেন তিনি মিথ্যা কথা বলিবেন? আসা যাওয়া নাই চলিত, তাহাতে তাঁহারই বা কি এমন ক্ষতি হইয়া যাইত? এই যে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, তিনি ত কাহারও মুখে তাহাদের একটা সংবাদও লইলেন না। সে যে কোথায় আছে, তাহাও ত নিজের চোখে দেখিয়া গিয়াছেন, তবুও ত কোন খবর লয়েন নাই। এত কাছে থাকিয়াও সে আজ তাঁহার এমন পর হইয়া গিয়াছে। সেই তিনি এমন নিষ্ঠুর কেমন করিয়া হইলেন?

কল্যাণীর মনে কোন মীমাংসাই হইল না—কেন তিনি তাহাদের না জানাইয়া দূরদেশে চলিয়া গেলেন, কেনই বা কোন সংবাদ দিলেন না, লইলেনও না!

মুরারিবাবু তাঁহার বাঙ্গাল দেশে বিবাহের যে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহা ত মিথ্যা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। তিনি ত তখন বিবাহ করিতে যান নাই, সে ত অনেক পরে। কল্যাণীরা যেদিন এখানে আসিয়া পৌঁছায়, সেই দিনই ত শুভক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তবে ততদিন তিনি কোথায় ছিলেন? কেন ছিলেন? উমাকেই

বা জানিলেন কিরূপে? এসব অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সবটাই যেন জটিল রহস্যের জালে জড়ান। ততখানি ভালবাসা এক রাত্রের মধ্যে এতখানি বিচ্ছেদ কেমন করিয়া আনিল? তিনি কি উমার কথা আগে জানিতেন? পাছে কল্যাণী মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তাই তাহার কাছে সে কথা প্রকাশ করেন নাই? না—না, তিনি ত সকল কথাই তাহার কাছে বলিতেন। বিবাহের বা ভালবাসার কথা কোন দিন নাই হউক, তবু কল্যাণীর বিশ্বাস—তাঁহার অন্তঃকরণের সবটুকুই সে দর্পণের মত দেখিয়াছিল। তেমন উজ্জ্বল স্বচ্ছ দর্পণখানার ভিতরে এত লুকাচুরি কোথায় লুকাইয়াছিল, সে যে তাহা ভাবিয়া পায় না।

কল্যাণীর মনে পড়িল, সেই বিবাহের পরদিনের যানারূঢ় বরের মুখ—সে কি গভীর বিষণ্ণ, কি হতাশামণ্ডিত। সে কি বিয়ের 'বরের' মুখ? তেমন বিবর্ণ মলিন মুখ সে যে তাঁহার আর কখনও দেখে নাই। মনে পড়িল, তিনিও তাহাকে দেখিয়াছিলেন, হাসিয়াও ছিলেন বোধ হয়, কিন্তু সে হাসি কি কান্না, এখনও সে ভাল বুঝিতে পারে না।

অন্ধকার আকাশের নীচে ততোধিক অন্ধকার মন লইয়া কল্যাণী ভাবিতেছিল —তিনি যদি চলিয়া গেলেন, তাঁহার স্মৃতি কেন গেল না! ভগবানের উপর অভিমানে চোখে জল ভরিয়া আসে—কেন তিনি তাহার জীবনটাকে এমন বিড়ম্বনার জালে জড়াইয়া দিলেন! তাহার লজ্জা রাখিবার যে ঠাঁই নাই!

তবু সতীনাথ যে তাহার কেহই নয়, এ কথা সে একবারও মনে করিতে পারে না। সে যে তাঁহাকে স্বামী বলিয়া একদিনের জন্যও মনে করিয়াছিল। সে মনে মনে স্বয়ম্বরা হইয়া তাঁহারই গলে বরমাল্য পরাইয়া দিয়াছিল। সে সম্বন্ধ ত আর সংসারের কোন সামাজিক বাধায় বাধা দিতে পারে না। একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—'মা কেন এ কথা বুঝেন না, কেন আমার চিন্তায় দুঃখ পান? দাদামহাশয় যদি মাকে কেবল এইটুকু বুঝাইতে পারিতেন—আমি বেশ আছি, সুখেই আছি! এই অবস্থায় থাকিবার অধিকার ওঁরা যদি চিরদিনই আমায় পাইতে দেন, আমি আর কিছুই চাই না। মা মনে করেন, তাঁহাকে ভুলিতে পারিলেই আমি সুখী হইব! তা কি কখনও পারা যায়? তাঁকেই যদি ভুলিব, তবে বাঁচিব কেমন করিয়া? শূন্য মনটাকে ভরাইব কি দিয়া?'

কল্যাণী ভাবিতেছিল, ফুলের রূপ শুকায়, গন্ধ চলিয়া যায়, দল ঝরিয়া পড়ে—তবু চিত্তের অনুভূতি ফুরায় না কেন? এই চিত্তটাকে ভিজা মাটির ঢেলার মত, মাখা ময়দার তালের মত থাসিয়া লইয়া আবার নূতন ছাঁচে গড়িতে পারিলে কেমন হইত কে জানে! একটুখানি মৃদু হাসি তাহার সূক্ষ্ম অধরপুটে ফুটিয়া উঠিল।

কল্যাণী ভাবিতেছিল—'আমরা নিজের কর্ম্মফলে দুঃখ পাই, আর ফলদাতা ভগবানের উপর অপরাধের আরোপ করিতে চাহি। দুরাশা না থাকিলে জগতে কত দুঃখ, কত অভাব, কত বেদনার হাহাকার কমিয়া যাইত। মঙ্গলময় বিধাতা পরোক্ষে মানবের মঙ্গল সাধন ত করিয়াই থাকেন। মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহার পূর্ণ উপলব্ধি হয় না বলিয়া, হাতে হাতে ফল পায় না বলিয়া, তাঁহাকে নিষ্ঠুর অবিবেচক মনে করে। এই আমিই ত এত দিন তাই মনে করিয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি—আমার ঈপ্সিতকে পাইলে দাদামহাশয়কে ত পাইতাম না। তাই ভগবান আমায় ব্যথা দিয়াও মস্ত জিনিষ দিয়াছেন। দাদামহাশয় বলেন—সুখদুঃখে অবিচলিত চিত্ত হইবার চেষ্টাতেই মানুষ মনে শান্তি পায়। আমি কি তা পাইব? আমি ত তাঁহার সম্বন্ধে কোন দুরাশাই রাখি না। আমার নিভৃত পূজাতেই বা সংসারের শান্তি কেন টলিবে, পূজা করিবার অধিকার কেন লইব না? মনের কাছে তাঁকেই যে আমি স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। তাঁকে ছাড়া অপর কাহাকেও কখনও মনে ঠাঁই দিব না—এ প্রতিজ্ঞা ত আমার অন্তরবাসী ভগবানের অগোচর নাই। জগতে আমার চোখে তিনিই যে একমাত্র পুরুষ। সুখ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বাস্তবিক তাহা নয়, দুঃখেরই সে একটা অংশ। দাদামহাশয় বলেন—সুখ আত্মতৃপ্তিতে নয়, আত্মবিসর্জ্জনে। যেখানে মিলনের পাশে বিরহ, হাসির সঙ্গেই অশ্রু, জীবনের পশ্চাতে মৃত্যু, সেখানে সুখ থাকিলে তার স্থিতিকালও যে তেমনি অস্থায়ী, অনিশ্চিত। আমার সে সব জ্বালা যন্ত্রণা ত কিছুই নাই।'

কল্যাণী যুক্তকরে মনে মনে বলিল—"ঠাকুর, আমার অন্তর বাহির তোমার রূপেই ভরিয়া দাও। উমার স্বামীর মূর্ত্তিতে তোমার পূজা আর লইও না। আমায় তোমার বিশ্বনাথ-রূপ দেখাও, যে রূপে বিশ্বের সকল রূপ লয় পাইয়া যায়, সেই রূপেই যেন আমি তোমায় দেখিতে পারি। আমায় তুমি নূতন চিন্তা, নূতন বন্ধন, নূতন স্বার্থের হাত হইতে রক্ষা কর। তোমার স্নেহে যেন বিশ্বাসহারা না হই—শুধু এইটুকুই আমার রাখিও ঠাকুর! পার্থিব স্বামীর কাছে মানুষ যেমন অপরিমিত সুখ পায়, তেমনি অপরিমিত দুঃখও যে তাহার কর্ম্মফলের সঙ্গে জড়াইয়া যায়। হাওয়ার গতি যেমনই থাকুক, আমি জানি আমার তরী একদিন না একদিন তোমার পায়েই ভিড়িবে। আমি কেবল সেই সু দিনের প্রতীক্ষা করিয়াই থাকিব।"

'জ্যোৎস্নার আলোক ম্লান করিয়া দিয়া পূর্ব্বাকাশের বক্ষে সুখতারাটি উষার সূচনা জানাইয়া দিল। পরপারে কলের বাঁশী তাহার কর্ম্মক্লান্ত ভৃত্যগুলিকে সুখসুপ্তি হইতে জাগাইবার আশু প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া ডাকিয়া ডাকিয়া এইবার

শ্রান্ত হইয়া চুপ করিয়াছে। নৈহাটীর ভোরের ট্রেণ ধরিবার জন্য যে বাবুটি খেয়া নৌকার মাঝিকে ডবল বখ্‌শিস স্বীকার করিয়া, নদীর জলে ক্ষেপণীর 'ছলাৎ ছলাৎ' শব্দের সহিত আপনার কণ্ঠের মিষ্ট স্বরটুকু মিশাইয়া নিদ্রালসা রজনীর শেষ যাম স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন, তাঁহারই গানের একটি চরণ কল্যাণীর কানের ভিতর দিয়া মনের ভিতরে বাজিতেছিল—

আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করে।

হায়, কবে সে সেই অরূপের রূপসাগরে ডুব দিয়া সকল রূপেব কথা ভুলিতে পারিবে—ওগো—সে কবে?

১২

উমা কথা কহিল

একটা অতৃপ্ত ক্ষুধিত চিন্তা ক্রমাগতই উমার মনে ব্যথা জাগাইতেছিল—অনাথ দাদার বিবাহ। বাড়ীতে বধূ আসিবে, কত আত্মীয় কুটুম্ব কুটুম্বিনী সমাগম হইবে, সে-ই কেবল দেখিতে পাইবে না। প্রথম প্রথম তাহার আত্মীয়-বিরহ-ব্যাকুল চিত্ত গাছের পাতাটি নড়িলেও চমকিয়া উঠিত—বুঝি তাহারই কারামুক্তিব সংবাদ সে বহিয়া আনিয়াছে। দীর্ঘকালের অভ্যাসে এখন আর সে আশা মনে সে উঠিতেও দেয় না। অনাথের বিবাহের সংবাদে কিন্তু আবার তাহার উদাসীন চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। বধূরূপিণী গৃহলক্ষ্মী বা বরবেশী ভ্রাতৃমূর্ত্তি দর্শনের লুব্ধ আশা তাহার ফুরাইলেও, আব একটি ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে মন হইতে সে সরাইতে পারিতেছিল না। নববধূকে কিছু যৌতুক দিয়া তাহার ভালবাসা জানাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। হাতে তুলিয়া দানেব সুখ এ বাড়ীতে আসিয়া পর্য্যন্ত তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কেহ মানা না করুক, অনধিকার বোধে সে এখানকার কোন দ্রব্যই গ্রহণ করে না—পবের দ্রব্যে কেনই বা সে দাতা হইতে যাইবে? বিবাহের পরদিন অন্নপূর্ণা তাহাকে একজোড়া মুক্তাবসান কানের ফুল উপহার দিয়াছিল। দিদির স্নেহের দান বলিয়া উমার কাছে তাহা অমূল্যই ছিল। কন্যাদানকালে বিশ্বনাথ ইহা দান করেন নাই। তাই উমার বিশ্বাস ছিল, সে এবং তাহার অন্য সমস্তই উৎসর্গীকৃত হইলেও—ইহা তাহার নিজস্ব—দিদির এই স্নেহের দানটুকু শুধু তাহারই।

কয়দিনের দ্বিধা কাটাইয়া একদিন সে ফুলজোড়াটি পিসীমার হাতে দিয়া কহিল—"অনাথ দাদার বৌকে এটা পাঠিয়ে দেব পিসীমা?"

পিসীমা তাহার প্রস্তাবে খুসী হইলেও ফুলজোড়া দেখিয়া কহিলেন—"এই ছোট রত্তি—এত বড় ঘর থেকে এমন খেলো জিনিষ গেলে যে লোকে নিন্দে করবে বাছা! তার চেয়ে বরং সতীকে বলি, একজোড়া বালা টালা কিছু গড়িয়ে দিক্।"

উমা বিপন্ন ভাবে তাড়াতাড়ি বাধা দিল—"না পিসীমা, না। এ খুব ভাল হবে; সে পাড়া গাঁ, আর তাঁরা ত বড়মানুষ নন—তাঁরা খুব ভাল বল্‌বেন।"

পিসীমা এ যুক্তির সত্যতা অস্বীকার করিলেন না; কহিলেন—"তা, সত্যি, পাড়াগাঁয়ে মানুষের অত শত নেই! আমাদের নন্দীপুরে সোনার জিনিষ দেবারই বা কার কত ক্ষ্যামতা বল? রূপোর পেজ্জাপতি, হোল গে মাথার দুটো রূপোর কাঁটা,—যে বড় পাল্লে সে আংটিটা টাংটিটা দিলে; তাতেই মানুষ কত খুসী হয়, কত পাড়ায় পাড়ার সুখ্যেত বেরোয়। এ সহরের লোক কিছুতেই খুসী নেই। সেদিন অমরের বিয়ে হল, সতী তার বৌকে দেবার জন্যে সোনার 'বেস্‌লেশ' না কি বলে বাবু, তাই আনালে। কত চুনী পান্না, চাঁদ সূর্য্যিকে ঝক্ মার্‌চে। তাও ছেলের মনে ধল্ল না; বলে—'সরকারটার যদি এতটুকু পছন্দ থাকে! এ জিনিষ কি দেওয়া যায় পিসীমা?' আমিই বা ছেড়ে কথা কইব কেন? আমিও বল্লুম যে—'বাবা, ঐ ঢের হয়েছে। ঘরের বৌকে ত এমনও কখনও দিলে না! বাপের বাড়ীর বালা দুগাছা ক্ষয়ে ভেঙ্গে গ্যাছে, তা বাছা আমার রাজরাণী হয়ে কাঁচের চুড়ী হাতে দিয়ে বেড়ায়। আমায় বল্‌তে মানা করে, দিব্যি দেয়, তাই কথাটি কই নে; দুটি ঠোঁট এক করে কেবল চুপ করে চেয়ে দেখি। বলি যে দেখি, ওদের আক্কেল হয় কি না!'—ছেলে সে কথার জবাবটি না দিয়ে মুখ লাল করে উঠে চলে গ্যাল। জবাব দেবে কোত্থেকে বল? উচিত কথার ত আর জবাব নেই! আমার কাছে বাছা স্পষ্ট কথা—অত 'ঢাকঢাক গুড়গুড়' বুঝিনে। হক্ কথা বল্‌ব, তাতে বন্ধু বেগ্‌ড়ান—বেগ্‌ড়াবেন, নাচার।"

উমা পিসীমার এই সাংঘাতিক সত্যপ্রিয়তায় লজ্জিত হইল, ক্ষুণ্ণও হইল। কেনই যে পিসীমা তাহার কথা লইয়া উঁহাদের বিরক্ত করেন!

পিসীমার নির্ভীক সত্যপ্রচারের বীরত্ব প্রদর্শনে উমা যে খুসী হয় নাই, তাহার মুখ দেখিয়া পিসীমাও তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু কি করিবেন, তাহার লজ্জা গোপন করিতে তিনি ত আর সদাসর্ব্বদা ন্যায়ের বিরুদ্ধে চলিতে পারেন না! উপস্থিত তাহাকে খুসী করিবার জন্য কহিলেন—"আচ্ছা, ফুলদুটো থুয়ে যাও, নিধেকে দিয়ে ডাকে পাটিয়ে দেব'খন।" উমা পিসীমার কথায় খুসী হইয়া ফুলজোড়াটি তাঁহার কাছে রাখিয়া প্রসন্ন চিত্তে উঠিয়া গেল।

হাজার বুদ্ধিমতী হইলেও উমা বালিকা। সংসারের সকল সূক্ষ্ম রহস্যের

তাৎপর্য্য গ্রহণের এখনও তাহার শক্তি জন্মে নাই। সে চলিয়া গেলে পিসীমা সরকারের সন্ধান করিয়া, তাহার অনুপস্থিতি জানিয়া কর্ত্তাবাবুর খাস খানসামা বেহারীর শরণ লইলেন। বেহারী ত বাবুর কাজে ফাঁকি দিয়া এই সুযোগে একবার রাজারবাজারে আত্মীয় দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সাগ্রহে তাঁহার অনুরোধ রাখিতে সম্মত হইল। সারাদিন বন্ধু সন্দর্শনে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় সে যখন বাড়ী ঢুকিল, তখনই রামদীন তাহাকে কর্ত্তাবাবুর জোর তলব জানাইয়া দিল।

বেহারীর আজ ভয় পাইবার কারণ ছিল না। সে মাতাঠাকুরাণীর ফরমাসী কার্য্যে নিযুক্ত থাকা, অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ দিল। শুনিয়া রুদ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

পরদিন অশ্বারোহণে বেড়াইয়া ফিরিয়া সতীনাথ প্রতিদিনের নিয়মেই রুদ্রকান্তকে দেখিতে গেল। এই সময়ে প্রত্যহই সে জ্যেঠামহাশয়ের কাছে যায়, তাঁহার শারীরিক সংবাদ জানিয়া লয়। তাঁহার সহিত সংবাদ-পত্র ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করে। কর্ম্মচারীরাও এই সময় তাহাদের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব জানিতে আসে। আজ সেখানে মুরারি ছাড়া অপর কেহই ছিল না, তাহারা পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। সতীনাথ সেদিন অনেক দূরে যাওয়ায়, ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

কবিরাজের উপদেশে কিছুদিন হইতে রুদ্রকান্তের শরীরে স্নানের পূর্ব্বে ঘণ্টা দুই করিয়া মহামাষ তৈল মর্দ্দন করা হইয়া থাকে। ব্যাতব্যাধির প্রকোপ বর্দ্ধিত হওয়ায় ডাক্তারী চিকিৎসা ছাড়িয়া এখন কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ হইযাছে। তৈলের দুঃসহ গন্ধ সুসহ করিয়া লইবার জন্য রুদ্রকান্ত নাকের কাছে একটা এসেন্সের ছিপি খুলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। টেবিলের উপর ফুলদানীতে তাজা ফুলের তোড়া ও একখানা চিত্রকরা পাথরের রেকাবীর উপর কতকগুলি সদ্যোচয়িত চম্পক—সৌরভে কৃত্রিম গন্ধকে উপহাস করিতেছিল।

বর্ষার মেঘমুক্ত আকাশে অনেক দিনের পর অম্লান সূর্য্যজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইযাছে। ঘরের সূক্ষ্ম কারুশিল্পের পর্দ্দা দুলাইয়া বাতাস ফুলের গন্ধ লুণ্ঠন করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। একখানি খাটো ধুতি পরিয়া রুদ্রকান্ত মাদুরের উপর উপুড় হইয়া শুইয়াছিলেন। পশ্চিমা চাকর রামদীন কুস্তিগীর পালোয়ানের মত নানা প্রকার বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তৈল মর্দ্দন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছিল। মাদুরের অনতিদূরে বসিয়া মুরারি হেঁট হইয়া একটা কিসের খসড়া টুকিয়া লইতে ব্যস্ত।

সতীনাথ বাহিরে জুতা রাখিয়া রুদ্রকান্তের কাছে গিয়া বসিল। পকেটের

ভিতর হইতে কয়েকটি সদ্যঃ চয়িত ফুল বাহির করিয়া মাদুরের উপর রাখিয়া দিয়া, হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছেন আজ জ্যেঠামশাই? তেলটায় বাত কম্‌চে কিছু?"

নিজের জন্য পুত্রের মনে উদ্বেগ দিতে রুদ্রকান্ত অনিচ্ছুক, তাই উপকারিতা বোধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলেও কহিলেন—"হ্যাঁ—তা হচ্চে বই কি কিছু।"

সতীনাথ হাসিয়া কহিল—"সে তেলের গুণে না আপনার ঐ পালোয়ানের কুস্তির চোটে?"

রমদীন ঘাড় ফিরাইয়া হাসি হাসি মুখে ছোট বাবুর পানে একবার কৃতজ্ঞ চোখে চাহিয়া লইয়া, নিজের কসরৎ দেখাইতে দ্বিগুণ মনোযোগী হইল। রুদ্রকান্ত কহিলেন—"তা যাই বল, বাতের ব্যথায় এ একটা মস্ত আরাম।" কর্ত্তার মনোরঞ্জনের এতবড় সুযোগটা উপেক্ষা না করিয়া সাক্ষীরূপে মুরারিও কি একটা উপমা দিতে গিয়া সহসা থামিয়া পড়িল।

উমা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঢুকিয়া খলে মাড়া মধু সংযুক্ত মকরধ্বজটুকু রুদ্রকান্তের কাছে রাখিতেই, তিনি সুযোগ বুঝিয়া মনে মনে হাসিয়া, মুখে গাম্ভীর্য্য আনিয়া কহিলেন—"কি গো, বড়মানুষের মেয়ের ঘুম ভাঙ্গ্‌ল? এই উঠ্‌চ না কি?"

উমার নিদ্রাভঙ্গের কালনির্ণয়ে সতীনাথের অজ্ঞতা যেমনই থাক, মুরারির তাহা অজ্ঞাত ছিল না। কারণ, সর্ব্বদা অন্দরে যাওয়া আসায় সে উমার গতিবিধি বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায়। সে উমার প্রতি বিস্মিত দৃষ্টি ফিরাইতেই, সতীনাথ ভূপতিত রুদ্রকান্তের পরিত্যক্ত সংবাদপত্র খানি লইয়া সংবাদ স্তম্ভে দৃষ্টিপাত করিল। উমা যে এতক্ষণ ঘুমাইতে ছিল না, তাহার পরিচয় তাহার প্রস্তুত জলখাবারেই রুদ্রকান্ত ইতঃপূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে নিজে না আসিয়া জলখাবার অপরের দ্বারা পাঠাইয়া যে কর্ত্তব্যে ক্রটী করিয়াছিল, এ টুকু তাহারই খোঁটা। রুদ্রকান্তের বাক্যস্রোত কোথায় গিয়া থামিবে, উমার তাহা এক রকম জানাই ছিল। কিন্তু স্বামী এবং মুরারির লক্ষ্যস্থল হইয়া সেটা পরিপাক করিতে তাহার কেমন লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইল। মনে করিল, জবাব দিলে যদি গোল মিটিয়া অল্পের উপর দিয়া যায়, সেই ভাল। সে কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট মৃদুতা রাখিয়া কহিল—"আজ লক্ষ্মীপুজো, তাই ঠাকুর ঘরে—"

বাধা দিয়া রুদ্রকান্ত শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিলেন—"যে লক্ষ্মীমন্ত ঘরের মেয়ে এসেছ বাছা! লক্ষ্মীকে একেবারে আঁচলে বেঁধে ফেল্‌বে দেখ্‌চি। যদি লক্ষ্মীর উপরেই এত ভক্তি, তবে আজ লক্ষ্মীপূজোর দিনে ঘরের লক্ষ্মীকে বার করে দিলে কেন বল দেখি—হ্যাগো লক্ষ্মি?"

প্রয়োজন স্থলে কথার বদলে বাধে না। কল্যকার ঘটনাটি সামঞ্জস্যের জন্য 'অন্য' বলিতেও রুদ্রকান্তের বাধিল না। তাঁহার কথার ইঙ্গিতের অর্থবোধ না হওয়ায় উমা নতনেত্র উন্নীত করিতেই দেখিল—রুদ্রকান্তের উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় ঘৃণা ও প্রতিশোধের আনন্দে জ্বলিতেছে। সে চোখ নামাইয়া লইল। রুদ্রকান্ত পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"মিট্‌মিটে ডান ছেলে খাবার রাক্ষস! আমি বলি চুপ্ চাপ্ থাকে, কিছু বুঝি জানে না। ও বাবা, পেটে পেটে এত বুদ্ধি! বাপের বাড়ী লুকিয়ে লুকিয়ে গহনা পাঠান হয়! এতই যদি তাদের অভাব, মান খুইয়ে বল্লেই ত পারে—না হয় কিছু কিছু মাসহারা সতী বন্দোবস্ত করে দেয়। পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, জামায়ের কাছে হাত পাত্তে অপমান হয়, মেয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে গহনা নিতে লজ্জা করে না? ছিঃ ছিঃ—গলায় দড়ি!"

উমার পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত এই অপমানে শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে বুঝিল—আর তাহার নীরব থাকা উচিত নয়। সে অনেক সহিয়াছে, কিন্তু এ অপমান সহিলে তাহার দেবতুল্য পিতামহের নিকট সে অপরাধী হইবে। তাহাকে মারুন কাটুন যা ইচ্ছা তাই করুন, তাই বলিয়া চুপ করিয়া সহিয়া সহিয়া সে তাহার পিতৃপিতামহের নিকট অপরাধী হইবে কেন? স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া সে অসহিষ্ণুভাবে নিজের প্রকৃতির বহির্ভূত কার্য্য করিয়া বসিল। রুদ্রকান্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তলে আপনার উন্নত দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ধীরভাবে কহিল—"ফুল জোড়াটা দিদি আমায় এখানে আস্‌বার সময় দিয়েছিলেন। অনাথ দাদার বৌকে আমি বিয়ের যৌতুক বলে পিসীমাকে পাঠাতে দিয়েছিলুম। তা ছাড়া এখানকার একটা পয়সাও আমি তাঁদের কখনো পাঠাই নি—পাঠালেও তাঁরা তা নিতেন না।"

উমার বক্তব্য শেষ হইয়া গেল। যেন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মুখ দিয়া মুখস্থ বুলি বাহির হইল। পা দুইখানা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। নিজের অজ্ঞাতে সে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

রুদ্রকান্ত উমার মুখে এ পর্য্যন্ত কখনও কোন ভর্ৎসনার এতটুকুও প্রতিবাদ শোনেন নাই। আঘাত দিয়া দিয়া তাহার সহ্যের সীমাকে কোথায় আনিয়া দাঁড় করান হইয়াছে, তাহাও কোন দিন ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। কতখানি মর্দ্দনে লেবুর রস তিক্ত হইয়া পড়ে, সে বিবেচনার প্রয়োজনও হয় নাই। তাই উমার মুখ হইতে এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রতিবাদের যুক্তিপূর্ণ জবাব পাইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার মধ্যে কতটুকু বিস্ময় ও কতটুকু ক্রোধ ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু হারিয়া পরাজয়

স্বীকার করা রুদ্রকান্তের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রতিবাদে দমিবার পাত্রও তিনি নহেন। রাগিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন—"কি? যত বড় মুখ তত বড় কথা! ছোট লোকের মেয়ে, নাই পেয়ে মাথায় চড়ে বসেচ বটে? মুখের উপর জবাব! ধরা পড়েচিস্—দোষ স্বীকার কর, মাপ চা—তা না, তার উপর তেজ দেখান! আইনের তর্ক বার করা! তোর চোখ রাঙানীতে যে ভয় পায় সে পাবে, রুদ্রকান্ত শর্মা এমন বাপের বেটা নয়।"

সতীনাথ কাগজ ফেলিয়া স্থানত্যাগের ইচ্ছায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা মুরারির পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। মুরারির চোখ দুইটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া ক্রোধে যেন জ্বলিতেছিল! মুখ চোখের ভাব দেখিলে মনে হয়, সে যেন ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত এখনি রুদ্রকান্তের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

পরমুহূর্ত্তে উমার মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সতীনাথ তখন ব্যস্ত হইয়া, রামদীনকে জোরে জোরে পাখার বাতাস করিতে বলিল। কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া উমার চোখে মুখে মাথায় জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল। তাহার মাথাটাকে টানিয়া মাটিতে সোজা করিয়া শোয়াইয়া দিল। মুরারির পানে না চাহিয়াই কহিল—"ঝিয়েদের কাকেও পাঠিয়ে দাও মুরারি—একে নিয়ে যাক্।"

ব্যাপার দেখিয়া রুদ্রকান্ত "থ" হইয়া গিয়াছিলেন। কোন কথা কহিলেন না, কোন বাধাও দিলেন না। ঠাকুরদাসী ঘরে আসিতেই সতীনাথ নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সিঁড়ির নীচে মুরারির সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কোন কথা না কহিয়া নীরবেই চলিয়া গেল।

চিকিৎসক রোগীর সম্বন্ধে কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞানই তাহাকে এ বিষয়ে উচিত পথেই চালিত করে। সন্ধ্যার পর সতীনাথ, সুধীর ও রামদীনের দ্বারা ঠাকুরদাসীর নিকট হইতে উমার সংবাদ আনাইয়া জানিল—উমা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

১৩
অনধিকার-চর্চ্চা

রুদ্রকান্তের উপর আক্রমণোদ্যত মুরারির সেই ক্রুদ্ধ দৃষ্টি সতীনাথ কিছুতেই মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না। মনে হইল, সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—"তোমার নিরাপদের জন্য বিশ্বের সহিত সংগ্রাম করিতেও আমি পশ্চাৎপদ নই।" সে নিজের মনকে বুঝাইতে চাহিল, নিপীড়িতের প্রতি করুণা মানবের স্বাভাবিক

ধর্ম্ম, ইহাতে তাহার আশ্চর্য্য হইবার বা সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই। দুই চারিদিনের নৈকটে বা সামান্য কৌতূহলের পর্য্যবেক্ষণে সে যদি উমার প্রতি এতখানি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, তবে দীর্ঘকালের আত্মীয়তায় মুরারিই বা তাহার প্রতি মমতাসম্পন্ন না হইবে কেন ?

উমার সুখ দুঃখে মুরারি যে উদাসীন নয়, বরং তাহার চেয়ে অধিক সমদুঃখী—এই কথাটা মনে উঠিতেই তাহার ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সতীনাথ ভালবাসিয়াছিল, ভালবাসার রূপ তাহার চক্ষে অজ্ঞাত নয়। যে ভালবাসে—প্রিয়ের জন্য আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। প্রবল আকর্ষণের মোহে হিতাহিত ঔচিত্যজ্ঞান সকল সময় সীমাবদ্ধ রাখা তাহার দ্বারা হয় ত সম্ভব হয় না। মুবারি হেন ক্ষুদ্র পতঙ্গ রুদ্রকান্তের ক্রোধ বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে যে ভয় পায় না, তার কারণ কোথায় ? সতীনাথের অন্তর্দৃষ্টি বলিল—"মুরারি উমাকে ভালবাসে।"

চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত করিবাব জন্য সে নিজের মনকে বুঝাইতে চাহিল—হয় ত তাহাব অনুমান ভ্রান্ত। মুরারি তাহাকে ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে, নিপীড়িতের প্রতি সহৃদয ব্যক্তির সে করুণা। তবু যেন করুণা ছাড়া সে দৃষ্টিতে আরও কিছু ছিল।

যদি তাই হয়, তাহার অনুমান যদি সত্যই হয়, তবে সে জন্য অপরাধী কে—মুরারি না সে ? স্বামী যদি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন না করিয়া বিবাহিতা পত্নীকে অপরের নির্য্যাতন লাঞ্ছনার পাত্রী করিয়া রাখিয়া দেন, তবে যে হৃদয়বান্ পরদুঃখে সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বক্ষা করিতে যায়, তাহাকে দোষী বলিবার তাহার কি যুক্তি আছে ?

যুক্তি যাই থাক, তবু তাহার মনে হইতেছিল, মুরারির মনোভাব উমাকে জ্ঞাত কবিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া তাহার একান্ত কর্ত্তব্য। প্রবল ঝোঁকের উপর কেবল মনে পড়িল না যে, উমার সম্বন্ধে সকল কর্ত্তব্যই সে এ যাবৎ যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছে কি না ; মনে পড়িল না যে উমা যদি বলে—তাহার অন্যান্য কর্ত্তব্য পালনের মত এ সতর্ক করিবার কর্ত্তব্যপালনটা বাদ দিলেও তাহার কোন ক্ষতি হইবে না, তখন সে কি বলিবে ? মনের সেই অভিভূত অবস্থায় ভাবের উত্তেজনায় সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটাইয়া, এক সময় সে উপরে আসিয়া উমাকে দেখিতে না পাইয়া একেবারে তাহার শয়ন কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফুলশয্যার পর এ গৃহ এবং গৃহমধ্যস্থ সমস্ত দ্রব্যই সে নিঃস্বত্ব হইয়া চিরদিনের জন্য তাহার বালিকা পত্নীকে ছাড়িয়া দিয়া সেই যে বাহিরে আশ্রয় লইয়াছিল,

কোন বিশেষ প্রয়োজনেও তার পর আর এ ঘরে প্রবেশ করেন নাই—আর কখনও প্রবেশ করিবে বলিয়া তাহার সংকল্পও ছিল না।

উমাব সান্নিধ্য ইদানীং সে যতটুকু উপভোগ করিত, সেটুকু হয় জ্যেঠামহাশয়ের পার্শ্বে. নয় পিসীমার মহলে বা দ্বিতলেরই অপর কোন অংশে কার্য্য-ব্যপদেশে। তাহাকে নিভৃত নিরালায় সে কোন দিন দেখিতে সাহস করে নাই, ইচ্ছা হইলেও অনভ্যাসের লজ্জায় বাধিত। আজও সে ঘরে ছিল না। উমা কাপড় কাচিতে গিয়াছে। সুধীর মাষ্টারের কাছে আবদ্ধ। রুদ্রকান্ত মোটরে বায়ু সেবনে গিয়াছেন।

সতীনাথ দেখিল—ঘরের যে জিনিসটি যেখানে যেভাবে সে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, আজিও সেটি সেইখানে ঠিক তেমনি ভাবেই রহিয়াছে। কোনটির এতটুকু স্থানচ্যুতিও ঘটে নাই। তবু সমস্ত ঘরখানি, প্রত্যেক জিনিসটি যে কোন স্নেহহস্তের সুখস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া অম্লান হাসি হাসিতেছিল, তাহা প্রথম দর্শনেই দর্শকের চোখে ধরা পড়িয়া যায়। মাঝখানে জোড়া-পালঙ্কে তুলার পুরু গদীব উপর বিছানা পাতা। খোলা জানালা দিয়া বর্ষার বাতাস আসিয়া নেটের মশাবি ও লেশের পর্দা দুলাইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। এই জানালায় দাঁড়াইয়া কতদিন সে রাস্তার পরপারে ঐ দিতল বাড়ীখানার পানে চাহিয়া দীর্ঘ সময় কাটাইয়া দিয়াছে। মনে পড়িল, দুই তিন বছরের ভিতর সে আব ওদিকে তেমন কবিয়া চাহিয়া দেখে নাই।

বাড়ীখানা তাহার পুরাতন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া হরিদ্রা বর্ণের বসনে আপাদমস্তক ঢাকিয়া ভোল ফিরাইয়া দিয়াছে। রাস্তার ধারের খোলা দরজাব সাম্‌নে—যেখানে খোলো হুঁকা হাতে ভজহরির পরিচিত শীর্ণ মূর্ত্তি প্রথমেই লোকের চোখে পড়িত, এখন সেখানে কয়েকটি হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি বালক মার্ব্বেল লইয়া খেলা করিতেছিল। একটি বালিকা পিঠে লম্বিত বেণী দুলাইয়া সুর করিয়া পাঠ্য পুস্তকের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে পথের দৃশ্য দেখিতেছিল। পুরাতনের স্থানে নূতনের জন্য এই যে প্রকৃতির চিরন্তন অধিকার স্থাপনা, ইহাব উপর হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, কখন কাহারও ছিল না। নিঃশ্বাস ফেলিয়া সতীনাথ চোখ ফিরাইয়া লইল। টেবিলের উপর তাহারই পরিত্যক্ত কয়েকখানি ইংরাজি নভেল, একখানি পঞ্জিকা—সেও পেনসন্ প্রাপ্ত বছর তিনেকের পুরাতন। নূতন ও অপরিচিতের মধ্যে কেবল একখানি উমা দেবীর নাম লেখা দেবনাগরী অক্ষরে "কুমারসম্ভবম্।"

সতীনাথ বইখানি তুলিয়া অন্যমনে পাতা খুলিতেই দেখিল—প্রথম পাতার

উপরে পরিষ্কার বাঙ্গালা অক্ষরে হাতে লেখা—"শ্রীমতী উমা দেবীকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ স্নেহ-উপহার"—স্বাক্ষরকারী "শুভার্থী অনাথ দাদা"। এই অনাথ দাদাটির সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাহার অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, সম্প্রতি সে তাঁহাকে জানিয়াছে—জানিবার উপলক্ষটা এখনও তাহাব মন হইতে সরিয়া যায় নাই। সংজ্ঞাহীনা উমার সেদিনকার সেই বিবর্ণ মুখখানি এখনও তাহার মনের ভিতর তেমনি ভাবেই ফুটিয়া রহিয়াছে। সে যে তাহার দীর্ঘদিনের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া এমন সময় এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে ঘটনাও ঐ উপহারদাতার সহিত অসংযুক্ত নয়। বইখানিব ভিতর একখানি কলটানা কাগজ—তাহার খানিকটায় কুমাবসম্ভবের পঞ্চম সর্গেব বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। একখানি অর্দ্ধসমাপ্ত চিঠিও সেই সঙ্গে ছিল।

সতীনাথ প্রথমে কবিতাংশে মনোযোগ দিল। আশ্রমাগত সংস্কৃত সন্ন্যাসীর পুনঃপুনঃ—

"নিবেদিতং নিঃশ্বসিতেন সোষ্মনা মনস্তু মে সংশয়মেব গাহতে।
ন দৃশ্যতে প্রার্থয়িতব্য এব তে ভবিষ্যতি প্রার্থিতদুর্ল্লভঃ কথম্।"

প্রভৃতি কৌতূহলী প্রশ্নে মনোগত বাক্যকথনে অসমর্থা উমা অঞ্জনহীন চক্ষু সখীমুখে ন্যস্ত করিলে, প্রার্থিত দুর্ল্লভে অনুরাগিণী গিরিরাজ-কন্যা উমার তপস্যার কঠোবতা ও মনোভাবেব উন্মাদনার করুণ চিত্র বর্ণনাচ্ছলে কবি যে কঠোরে করুণে মিশ্রিত মধুব সৌন্দর্য্যেব সৃষ্টি করিয়া সখীমুখে স্তুতি কবিয়াছেন, সে পুরাতন কাব্যকলার নব রসমাধুর্য্য আজ প্রত্যক্ষ হইযা সতীনাথকে অভিভূত করিয়া দিল। সে যেন আজ নূতন রসের নব সঙ্গীত শ্রবণ কবিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে যে শুধু অনুবাদ, পাখীব বাধাকৃষ্ণ বুলিব মত সে যে কেবল শেখাবুলিব ঝঙ্কার, সে কথা কোন মতেই সে যেন আজ আর মনে কবিতে পাবিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল—ভাষার কলঝঙ্কারে কবিব মনোভাবের সাহচর্য্যে সে যেন আজ উপেক্ষিতা বধূরই গোপন অন্তরের বেদনাটুকু প্রকাশ করিতেছে। বসন্তের বাতাসের মত উমার অন্তরেব উতলা বাতাসের চঞ্চল কোমল স্পর্শটুকু আজ তাহার দোলায়মান চিত্তকে কোন অজ্ঞাত ভাবের মধুব রসে ভরাইয়া একটি নূতন সংবাদ প্রচার করিয়া দিল। তাহার অন্তরের শীত-শীর্ণ মাধবীকুঞ্জের উপর যেন সহসা মুকুলোদ্গমের উপক্রম হইল।

বহির ভিতর একখানি অসমাপ্ত চিঠিও ছিল। উমা সেখানি লিখিতে বসিয়া হয় ত কোন বিশেষ প্রয়োজনে উঠিয়া গিয়াছে, তাই এখনও শেষ হয় নাই। অনুচিত বোধে সতীনাথ কিছুক্ষণ চিঠিখানি দেখিবে কি না স্থির করিতে না

পারিয়া দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া রহিল। তার পর মনে হইল—সে যাহা জানিতে চায় হয়ত এখানি তাহারই সাহায্য করিতে পারে। একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া সে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। সেখানি উমা অন্নপূর্ণাকে লিখিতেছিল। উপরে—'পূজনীয়া শ্রীচরণেষু দিদি'—পাঠ দিয়া লেখা আরম্ভ করা হইয়াছে। উমা লিখিয়াছে—

"দিদি, আজ অনেক দিনের পর তোমার চিঠি পাইয়াছি। 'অনেক দিনের পর'—কেন লিখিলাম বলিব? আজিকার এ চিঠিখানি শুধু হাতের লেখায় নয়—মনের কথাতেও তোমার। চিঠির ভিতর দিয়া যেন তোমার সেই স্নেহের স্পর্শ আজ বহুকাল পরে আবার নূতন করিয়া অনুভব করিলাম। তোমার হাতের অক্ষর চুরি করিয়া যে সব চিঠি আমার কাছে এ পর্য্যন্ত আসিয়াছে, মনে হইয়াছে, সে যেন আর কাহারও চিঠি, কে কাহাকে লিখিতেছে, সে বুঝি তোমার নয়। অনেক সময় কান্না আসিত—'দিদি, কেমন করিয়া আমায় এমন পর করিয়া ফেলিলে?' আজ তোমায় ফিরিয়া পাইয়া মনে করিয়াছিলাম রাগ করিব, খুব রাগ করিব, কিন্তু আজ আর আমার মনে রাগ নাই, কোন ক্ষোভ দৈন্য কিছুই নাই। আমার দিদির অন্তরভরা ভালবাসা আমারই। যে তোমার স্নেহে আমার অধিকার খর্ব্ব করিয়া অংশ গ্রহণ করিতে বসিয়াছে, তাহার উপরেও আর আমার রাগ নাই। আমার ন্যায্য প্রাপ্য তুমি অপরকে বিলাইয়া দিতেছ বলিয়া এক এক সময় তোমার উপর রাগ করিতে ইচ্ছা করিত, তবু রাগ আসিত না ত! অনেক সময় ইচ্ছা করে অব্যবহৃত মনোবৃত্তিটাকে একবার মাজিয়া ঘসিয়া উজ্জ্বল করিয়া লই, তখনই অপ্রয়োজনীয় বোধে হাসি পায়। আচ্ছা দিদি, মানুষের ছেলেবেলাটা এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায় কেন? মনে হয়, এখনও যদি তেমনি ছোটটিই থাকিতে পারিতাম!

"তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যই আমায় তুমি বিপদে ফেলিয়াছ। জীবনে তোমার কাছে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, আজিও বলিব না। সে প্রশ্নের উত্তর জটিল নয়, তোমার প্রশ্নই আমার উত্তরের পথ সহজ করিয়া দিয়াছে। সত্যই আমি তাঁহাকে সুখী করিতে পারি নাই। তুমি রাগ করিবে, মা শুনিলে দুঃখিত হইবেন; আমার অনুরোধ, মার কাছে এ কথা বলিও না। তিনি যে অসুখী, তাহা তাঁহার ব্যবহারেই বুঝা যায়। তাঁহার মত লোকের বৃথা খেয়ালে দিন কাটান দেখিলে স্বতঃই মনে হয়, সে যেন সময়ক্ষেপের জন্যই সময়ের অপব্যবহার করা। দায়িত্বহীন জীবন নিরাপদের কি না জানি না, আমার ত মনে হয় সুখের নয়। আমি নিজেকে তাঁহার সমালোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করি না, বরং এ

অধিকার লওয়া ধৃষ্টতাই মনে করি। তবু তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সব কথাই আজ খুলিয়া বলিলাম। আশা করি, বারান্তরে আর আমরা এসব অপ্রিয় অনধিকার-আলোচনা করিব না। দিদি, কেন তুমি বৃথা আশঙ্কিত হইতেছ? তাঁহার মত রূপবান্ গুণবান্ বিদ্বান্ স্বামী কয়জন স্ত্রীর ভাগ্যে ঘটে? যাহার ঘটে সে কি সুখী হয় না? তোমার মনের অন্ধ স্নেহ তোমায় হয় ত ভুল খবর দিতেছে। মনের কথা বিশ্বাস করিও না—"

চিঠিখানি এই পর্য্যন্ত লেখা হইয়াই বন্ধ হইয়াছে। উমার বক্তব্য অব্যক্তই রহিয়া গিয়াছে, তবু যতখানি সে লিখিয়াছে তাহাই যে যথেষ্ট। সে তবে সতীনাথের কথা ভাবে। তাহাকে যতখানি উদাসীন বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক সে তবে তাহা নয়। সে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছে, দেখিয়া যাহা স্থির করিয়াছে তাহাও অভ্রান্ত সত্য। উমা লিখিয়াছে—"তাঁহার মত রূপবান্ গুণবান্ স্বামী কয়জন স্ত্রীর ভাগ্যে ঘটে? যাহার ঘটে সে কি সুখী হয় না?"—অর্থাৎ তাহার সুখী হওয়া উচিত!

সতীনাথের মুখখানা লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। উমার বর্ণিত আদর্শ স্বামীর চিত্র এই বটে! তবু সে লজ্জা ও ধিক্কারের মধ্যেও তাহার দেহ যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। চিঠিখানি সে দুইবার তিনবার পড়িয়া দেখিল, তার পর সেখানি যথাস্থানে রাখিয়া বই মুড়িয়া, যে প্রয়োজনে আসিয়াছিল তাহা অসমাপ্ত রাখিয়াই ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

সিঁড়ির নীচে নামিয়া সতীনাথ একবার প্রত্যাশাপূর্ণ নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দালানের অপর প্রান্তে কম্বলের উপর অজিনাসন বিছাইয়া পিসীমা সবেমাত্র সন্ধ্যার আয়োজন করিতেছেন! নন্দর মা প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে দীপ দেখাইয়া দুয়ারে ধূনা গঙ্গাজল দিয়া গৃহস্থবাড়ীর নিয়মরক্ষা করিতেছিল। বিদ্যুতালোক এ নিয়মে বাধা জন্মাইতে পারে নাই। গৃহস্থের ঘরের বধূটির মত ক্ষুদ্র তৈলদীপটি যেন সজ্জিতা বিলাসিনীর পাশ কাটাইয়া উঁকি দিয়াই সভয়ে সরিয়া যাইতেছিল।

সতীনাথ পিসীমার চোখ এড়াইয়া আপনার আগমন সংবাদ অজ্ঞাত রাখিতে চাহিলেও, সেই জপনিবিষ্টার সতর্ক চক্ষুর তাহা অগোচর রহিল না। তিনি মনে মনে প্রীত হইলেন। তাঁহার মনে হইল—হইবে না কেন? এখনও ত আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্ত এবং নদীতে জোয়ার ভাঁটা বন্ধ হয় নাই। কাল কলি হইলে কি হয়, দেবতা ত আর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত নহেন। তাঁহার ঐকান্তিক মানসিকের ফল এইবার ফলিতে সুরু করিয়াছে। সফলতারও আর বড় বেশী বিলম্ব নাই, ছেলের মতি গতি যেন ভালর দিকেই ফিরিতেছে।

পিসীমা অসন্তুষ্ট চিত্তে মনে মনে বলিলেন—"বৌটো যে সেয়ানা নয়—আগে নিজের করে নে, তবে না রাগ ঝাল কর্‌বি! মেয়ের সব তাতে বাড়াবাড়ি! যে পল্‌কা স্থতো, বেশী টান্‌তে গেলে ছিঁড়ে যায় বা—যেখানে জোর কল্লে সাজে সেখানে না জোর! ওরে হাবি, আগে দিন কিনে নে—তবে না। যে মানোয়ারী গোরা মেজাজের সোয়ামী, এখুনি হয় ত বলে বস্‌বে—'বটে, এত গুমোর। থাক তোমার মান নিয়ে!' ওকে চিন্‌তে ত আমার বাকী নেই। ছোট থেকে যে জিনিস একবার চেয়ে পায়নি, আর কখনও দুবার চায়নি—সেই ছেলেই ত ও।"

উমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কোন্ কোন্ কথাগুলি কোন বিশেষণে তাহাকে কেমন করিয়া সম্‌ঝাইয়া দিবেন, মনে মনে তাহারাই একটা খসড়া করিতে করিতে পিসীমার সে রাত্রে জপ আহ্নিক বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। বার বার পুনরাবৃত্তি করিতে সময়েরও হিসাব রহিল না—তবুও সাফল্যের উৎসাহে তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইল না।

রাত্রে অন্ধকার কক্ষে শয্যা গ্রহণ করিয়াও সতীনাথ আজ আর উমার চিন্তাকে মন হইতে সরাইতে পারিল না—চাহিলও না। জীবনের কোন্ অজ্ঞাত আনন্দ-স্পন্দনের অনুভূতিতে সে যেন মূর্চ্ছাতুরের মত কিছুক্ষণ সুখে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। উমার চিঠিখানির কথা কেবলই তাঁহার মনে পড়িতেছিল। অক্ষর-গুলি জীবন্ত হইয়া অন্ধকারেও তাহার চোখের উপর যেন জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল! উমা অবশ্য কার্য্য কারণের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য পরিহাসছলে অন্নপূর্ণার কাছে ন্যায়ের ফাঁকি চালাইয়াছে। দিদির সহিত এই যে সকরুণ ছলনায় উমার আত্মগোপনের চেষ্টা, তাঁহার লজ্জা, অন্ধকার কক্ষেও সতীনাথের মনে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। "গুণবান্" স্বামীর গুণের পরিচয় সে যথেষ্টই পাইয়াছে। "রূপবান্ কথাটা সে কেন উল্লেখ করিল? লোকে বলে তাই বোধ হয়। শোনা কথার প্রতিধ্বনি? সে ত কখনও তাহাকে চাহিয়া দেখে নাই। অথবা হয় ত গোপনে দেখিয়াও থাকে! উমা তবে কখনও তাহার কথা ভাবিয়া দেখিয়াছে; হয় ত সে মানুষের মত মানুষ দেখিবার জন্য আশাও রাখিয়াছিল, নিরাশ হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। কেনই বা আশা রাখিবে? কোন্ বিবাহিতা নারী শুধু এমন করিয়া স্বামীর সংসারে শান্তি বজায় রাখিয়া গৃহকর্ত্তাদের মন যোগাইয়া লাঞ্ছিত দাসীত্বে জীবন অতিবাহিত করে? কোন হৃদয়বান্ স্বামী স্ত্রীর হৃদয় লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়া থাকে? ছি ছি, উমার বর্ণিত সৌভাগ্যবতীর প্রার্থিত গুণবান্ স্বামীর এই আদর্শ?

সতীনাথ ভাবিয়া পাইল না যে, এত অল্প পরিচয়ে উমা তাহাকে এমন নিখুঁত-রূপে কেমন করিয়া আঁকিতে পারিল। সে যে আসলে খেয়ালী নয়, সুধু সময়ক্ষেপের জন্যই সময়ের অপব্যবহার করে, কেমন করিয়া এমন ভাবে সে তাহা অনুভব করিল? সে যে সুখী নয়, উমার চোখে তাহাও ধরা পড়িয়া গিয়াছে! অথচ দেশশুদ্ধ লোকে, বিশেষতঃ মুরারি, দিবারাত্রি তাহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিতেছে, তাহাতে তাহাকে অসুখী মনে করিবার কারণও ত কিছু ঘটে নাই। হয় ত মুরারিই সে কথা তাহার কাছে গল্প করিয়াছে। কিন্তু চিঠিখানার সরল ভাষায় ত তেমন ভাব প্রকাশ পায় না। তবু এ আলোচনা তাহার স্বেচ্ছাকৃত নয়, তাহার দিদি জোর করিয়াই তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইয়াছে। এত দিন কেমন করিয়া এত অবহেলাতেও সে তাহার অনাদৃত অবস্থা তাহাদের কাছে অপ্রকাশিত রাখিয়াছে—এইটুকুই যেন তাহার সবচেয়ে আশ্চর্য্য মনে হইতেছিল। হয় ত তাহার ব্যবহার উমার মনে ব্যথা দিতে পারে নাই; পারিলেই সে কি এমন নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে স্বামীর উপর সব দাবী দাওয়া ছাড়িয়া নিজেকে এমন করিয়া দূরে রাখিতে চাহিত? কোন্ স্ত্রী এমন ভাবে স্বামীর যথেচ্ছাচারে প্রশ্রয় দেয়? যে অমন করিয়া কবির ভাষায় প্রাণের কথা প্রকাশ করিতে পারে, তুলিকার আঁচড়ে মনের ভাব আঁকিতে পারে, সে কেবল তাহার ব্যথাই বুঝে না কেন? রাগ না, দুঃখ না, অভিমান ত নহেই—সতীনাথ যেন কোথাকার কে? কিছুতেই যেন তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—এমনি উদাসীন! হয় ত সে তাহাকে বুঝিতে চাহে না। যে ভালবাসে, সে প্রিয়জনের দোষ ত্রুটী ধরিয়া মান অভিমান করে। উমা কেন তা করিবে?

আত্মাভিমানে আহত সতীনাথ মনকে বুঝাইতে চাহিল—"সে যখন আমার কথা ভাবে না—নিজেকে তফাৎ করিয়া সম্বন্ধ পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে—তখন আমিই বা তাহার কথা ভাবিয়া মরি কেন?"

সে মুখে বলিল—উমার কথা আর মনে করিবে না; মন কিন্তু তাহাতে সায় দিল না। এতদিন সতীনাথ গর্ব্ব করিয়াই বলিয়া আসিয়াছে—সে স্ত্রীর ভালবাসা চাহে না, সে তাহাকে কখনও ভালবাসিবে না। তবে আজ উমার তাচ্ছীল্য মনে করিয়া তাহার অন্তরের অন্তর হইতে বেদনার রুদ্ধ নিঃশ্বাস ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহে কেন? যাহাকে দূরে ঠেলিয়া মুক্তির আনন্দে এতদিন আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া আসিতেছে—আজ দীর্ঘকালের পর সেই অনাদৃতা উপেক্ষিতার পানে ব্যাকুল মন ভিখারীর মত এ কি প্রার্থনা জানাইতে চাহিতেছে?

১৪

মুরারির বস্তুতন্ত্রতা

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া ভোরের আলোয় নিজ মানসিক দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া সতীনাথ মনে মনে হাসিল। একটুখানি লজ্জাও সেই সঙ্গে অনুভব করিল। মনে হইল—উমা যে কাল ঘরে ছিল না, সে ভালই হইয়াছে। মুরারির বিরুদ্ধে অকস্মাৎ তাহাকে সতর্কতার পরামর্শ দিবার চেষ্টা লইতে দেখিয়া সে কি মনে করিত কে জানে! হয় ত সে মনে করিত, পাছে নিজের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে সে তাহার চিরদিনের ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া, সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত হইতে চাহিতেছে! উমার অনাগ্রহ ঔদাসীন্য যেন ক্রমশঃ তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। এত দিন সতীনাথ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অজ্ঞাত ভাবেই উমার সেবা-যত্ন অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। সেই সেবা-নিপুণা শ্রমশীলা প্রসন্ন-চিত্তা নারীর পরিচয় বাহিরে যতটুকু প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার অন্তরের পরিচয়ের জন্য মন যেন সেই পরিমাণেই ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছিল। এই অজ্ঞাত ভাবের আক্রমণে কাল সারা রাত্রি সে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই।

সতীনাথের মনে হইল, এ ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া আজ উচিত হইতেছে না। ভগ্ন গৃহকে 'দাগরাজী' না করিলে, বর্ষার জলে তাহাকে রক্ষা করাই ভার হইবে। এ খেলার পরিণাম তাহার কাছে আর খেলার মত তুচ্ছ নহে। উমার সান্নিধ্য হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করাই তাহার যেন প্রধান প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া মনে হইতেছিল। উমা যে তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখিতেও অসম্মত, কয়দিনের ছোট খাট অভিজ্ঞতায় সে তাহা বেশ ভালই বুঝিয়াছে। অথচ এমন করিয়া তাহার স্নেহ মমতা সেবায় অহরহ নিজের অপরিসীম অপরাধের ভার বাড়াইয়া সেই বা কেন আর তাহার দয়ার দানে জীবনধারণ করে? উমা যখন তাহাকে চাহে না, তখন তাহারই বা প্রতিদিন নিজের কথা স্মরণ রাখাইবার জন্য সাক্ষী রূপে বর্ত্তমান থাকিবার প্রয়োজন কি? দুই চক্ষু যেদিকে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহে, সেই দিকেই সে চলিয়া যাইবে। কিসের জন্য সংসারে থাকা? কিসেরই বা তাহার সংসার?—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, জটিল কর্ত্তব্য চিন্তার হাত এড়াইবার জন্য আল্‌না হইতে শাট পাড়িয়া কাঁধে ফেলিয়া, চটি জুতার মধ্যে পা দুইটাকে গলাইয়া দিয়া বাগানের পথে সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া খানিক বাগানে বেড়ান সতীনাথের বহুদিনের অভ্যাস। সকাল বেলা তরুপত্রের শ্যামলতায় সে তাহার ছাত্র-জীবনের অধ্যয়নক্লান্ত চক্ষুকে

শীতল করিয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পূর্ণানন্দে ভরাইয়া লইত। তাহার যৌবন-নিকুঞ্জে প্রথম যখন মলয় বাতাস বহিয়াছিল, ধরণীর বর্ণ সোনার রঙ্গে রাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তখনও সতীনাথ এই বাগানে আসিয়া মানসের মোহিনী প্রতিমাকে ফুলের সাজে সাজাইয়া, আশার আলোকে ভবিষ্যৎ সুখের ছবি আঁকিয়া সময় যাপন করিত। তার পর যখন স্বপ্ন টুটিয়া বাস্তবের কঠোর রূপ প্রত্যক্ষ হইল, তখনও এই খানেই দাঁড়াইয়া সে তাহার বক্ষঃরক্ত দিয়া সেই সাধের ছবি মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত। তাই আজও সে তাহার চিন্তাক্লিষ্ট ভারগ্রস্ত মন লইয়া শান্তি কামনায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

তখনও প্রভাতের আলো ভাল করিয়া ধরণীর বক্ষে প্রকাশ পায় নাই। ঘুম ভাঙ্গিয়া পাখীরা সবেমাত্র কাকলী তুলিয়াছে, এখনও পাখা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করে নাই। পাণ্ডু চন্দ্র আকাশের অত্যন্ত নীচে নামিয়া আসিয়াছে; নক্ষত্র একটাও জাগিয়া নাই। রামচরিত তেওয়ারী ভোরে গঙ্গাস্নান সারিয়া গামছা জড়ান ভিজা কাপড়খানি বগলে চাপিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া—"বৃন্দাবন্‌মে কুসুম কানন্‌মে ভ্রমরা হরিগুণ গাওয়ে জী"—গাহিয়া চলিয়াছে। দেউড়ীতে ঢুবে চৌবে দরোওয়ানের দল কেহ ঘুম ভাঙ্গিয়া সবেমাত্র গা মোড়া দিয়া উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে, কেহ তখনও দড়ির খাটিয়ার উপর আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া অনিষ্পীত অবস্থার অনুকরণে নিদ্রাসুখে মগ্ন। সতীনাথকে বাগানের পথে যাইতে দেখিয়া জাগ্রতের দল তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ নত হইয়া প্রণাম জানাইল।

আষাঢ়ের শেষাংশ। কয়েকদিনের পর বর্ষণক্ষান্ত প্রকৃতি একটু বিশ্রাম লইবার সুযোগ পাইয়াছে। গোলাপ ফুলের রঙ্গীন শোভায় বাগানে আলোকিত। যূথিকার সবুজ পাতার সহিত শাদা ফুলের বাহার বড়ই খুলিয়াছে। মাধবীলতার পাপড়িঝরা গাছের তলায় প্রকৃতির নৈশশয্যা এখনও বিছানো রহিয়াছে—গুটাইয়া লওয়া হয় নাই।

সতীনাথ ভাবিতেছিল—এই যে সুমিষ্ট সুরভি অম্লান ফুলগুলি রজনীর স্নেহের বাতাসে জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহাদের জীবনের পরিমাপ কতটুকু? দিনের আলোয় রোদের তেজ ভালো করিয়া না ফুটিতেই ম্লান হইয়া যাইবে। সন্ধ্যার অন্ধকার না আসিতেই শুষ্ক দলগুলি মাটিতে ঝরিয়া পড়িবে—কাল আর ইহাদের চিহ্নটুকুও খুঁজিয়া মিলিবে না। মানবজীবনও কি তাই নয়? এই যে আশা তৃষ্ণা স্নেহ প্রেম ভরা আবেগময় মানবের অন্তঃকরণ—মৃত্যুই ইহার পরিণাম! তার পর?—তার পর এ জগতে তাহার চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। সত্যই যদি এই বিশ্বজগতের

কোন শক্তিশালী সৃজনকর্ত্তা থাকেন, তাঁহার রক্ষণশক্তির এত অভাব ঘটিল কেন? এই দুদিনের খেলাঘরে এত আশা অতৃপ্তি বেদনার হাহাকার সৃজন করার কি এমন প্রয়োজন ঘটিয়াছিল? কে তাঁহাকে করুণাময় আখ্যা দিয়াছিল? বালকের পুতুল খেলার মত নিজের সৃষ্টি নিজের হাতে ধ্বংস করাই যাঁহার কাজ, তিনি আবার কেমন করিয়া দয়াল হইলেন? এ কোন তোষামোদকারীর স্তোকবাক্য? যদি সৃষ্টিরক্ষায় সৃষ্টি ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তাই আবশ্যক, তবে মাটির পুতুলগুলার মত মানুষের মনগুলিও এমনি জড় হইল না কেন? মনোবৃত্তির এ উচ্চ স্ফুরণের তবে কি এমন প্রয়োজন ছিল—এ কি শক্তিশালীর অসীম শক্তির অপব্যবহার নয়?

সহসা তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল। আপাদমস্তক ফুলভাবে ভাবাক্রান্ত একটা গন্ধরাজ গাছের তলায় অন্মেগোপনোদ্যত সুধীর তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

শেষরাত্রে জ্যোৎস্না থাকায় সময় বুঝিতে না পারিয়া সুধীর বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। দাসী চাকরের বিনা সাহায্যেই তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া লইয়া দাদার ও দুবেজী চৌবেজীর দলের চোখ এড়াইয়া সে কোন মতে বাগানে আসিয়া পৌছিয়াছে। আগের দিন কথায় কথায় উমা তাহার ছোট বেলার গল্প করিবার সময় বলিয়াছিল—বৈশাখ মাসে সেখানে মেয়েদের শিবপূজার ভারি ধুম—মাটির শিব গড়িয়া মেয়েরা সব "পুণ্যি পুকুর', "হরির চরণ, "শিল শিলাটন" প্রভৃতি ব্রত করে, কুমারীকালে সেও এসব করিয়াছে। দাদামহাশয় বলিতেন—'শিবপূজা বারমাস করিতে হয়।' ফুল দিয়া সেও প্রতিদিন শিবপূজা করিত। বিবাহের পর আর কখনও শিবপূজার সুযোগ না ঘটায়, করাও হয় নাই। কাল কি একটা যোগ উপলক্ষে পিসীমা অনুদয়ে স্নানের জন্য সহিস কোচম্যান্‌কে প্রস্তুত থাকিবার কথা রামদীনকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নতুবা তাহারা কাজের সময় অনুপস্থিত থাকিয়া সূর্য্যোদয় দেখাইয়া ছাড়িবে। পিসিমার ইচ্ছা ছিল, উমাকেও পুণ্যের অংশ দেন। কিন্তু রুদ্রকান্তের অনুমতি চাহিয়া মিলে নাই। রুদ্রকান্ত বলিয়াছিলেন,—"অত আর ভট্‌চায্যিগিরি ফলাবার দরকার নেই, গঙ্গাস্নান ত নয়, মেম সাহেবের হাওয়া খেতে যাবার মতলব।" পিসীমা আর কথা বাড়াইতে সাহস করেন নাই।

তখন হইতেই সুধীরের মাথায় একটা মতলব আসিয়াছিল। গঙ্গাস্নান নাই হউক, ফুল দিয়া শিবপূজা করিতে পাইলে বৌদিদি নিশ্চয়ই খুসী হইবেন। মাটি দিয়া শিবগড়া—সে এমন কিছু বিচিত্র কথা নয়, বাগান হইতে একডেলা মাটি তুলিয়া আনিলেই চলিবে, আর সে নিজে হাতে ভোর বেলা ফুল তুলিয়া আনিয়া

দিবে! তাই বৌদিদিকেও না জানাইয়া সুধীর বাগানে আসিয়াছে। যূঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা ও গন্ধরাজে তাহার হাতের ডালাখানি ভরিয়া উঠিয়াছে, এইবার সাবধানে ফিরিয়া যাইতে পারিলেই বালক তাহার সফলতার পুরস্কার পায়। এমন সময় সতীনাথের অতর্কিত আগমনে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। সতীনাথ কাছে আসিতেই ফুলগুলি বাঁহাতে কাপড়ের ভিতর ঢাকা দিয়া সে তাড়াতাড়ি কহিল—"ভোর বেলা বেড়ান বুঝি মন্দ? স্বাস্থ্যতত্ত্বে ত আছে।"

সতীনাথ হাসিয়া বলিল—"আমি কি বলেছি যে মন্দ?"—বলিয়া হঠাৎ খপ্ করিয়া সে তাহার বস্ত্রাচ্ছাদিত গোপন হাতখানাই ধরিয়া ফেলিল। সুধীর চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"যাঃ, সব গেল। বাসি কাপড়ে ছুঁয়ে দিলে।"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া সতীনাথ ভাইটিকে কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল—"নারাণ ঠাকুরের এইবার অন্ন মারা গেল দেখ্‌চি—তাই ত, ভট্‌চায্যি মশাই, বাসি কাপড়ে ছোঁয়ার প্রায়শ্চিত্তের বিধান কি বল ত?"

সুধীর রাগিয়াছিল। দাদার আকর্ষণে কাছে গেল না, আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। তার পর নিষ্ফল ক্রোধে ফুলগুলি মাটিতে ছড়াইয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"জুতো পবে বাসি কাপড়ে ফুল ছুঁলে বুঝি পূজো হয়? কক্ষনো হয় না—জিজ্ঞেস্ করো সবাইকে!"

সতীনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল,—পূজোর জন্যে ফুল তুলেছিলি? কে পূজো কর্‌বে রে? পিসীমার হুকুম বুঝি?"

সুধীর অভিমান-স্ফুরিতাধারে কহিল—"তিনি ফুল দিয়ে পূজো করেন কি না! তাঁর ত ভারি ক্ষতি! গঙ্গা নাইবেন, শিবতলায় যাবেন—বৌদিরই কিছু হল না।"

সতীনাথ হাসিয়া কহিল—"কেন তাঁকেই বা মানা কর্‌চে কে? গেলেই ত পাবেন সেখানে।"

সুধীর রাগ করিয়া কহিল—"ভারি ত জান! জ্যেঠামহাশয় যেতে দেন কি না! কাল পিসীমা"—কথা শেষ না করিয়াই, চোখের জলে পাছে মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া দাদার কাছে ধরা পড়িয়া যায়, তাই মুখ ফিরাইয়া ছুটিয়া সে বাড়ীর দিকে পলাইয়া গেল। সতীনাথের পুনঃপুনঃ আহ্বানেও আর ফিরিল না।

সুধীর চলিয়া গেলে, তাহার নিষ্ফলতার বেদনাটুকু সতীনাথের বুকে বাজিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্তব্ধভাবে সেই ভক্তহস্তে আহরিত দেবতার অনিবেদিত সুরভিস্নিগ্ধ ভূপতিত অম্লান ফুলগুলির পানে বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখের পাতা জলে ভিজিয়া ভারি হইয়া আসিল। স্বপ্নাভি-ভূতের মত সে যেন শুনিল—তাহার হৃদয়বীণার তারে ঘা দিয়া কোন অদৃশ্য যন্ত্রী

বাজাইতেছে—"দেবতা আছেন—বিশ্বাসীর বিশ্বাসে, ভক্তের ভক্তিতে, প্রেমিকের প্রেমে তাঁহার সিংহাসন পাতা রহিয়াছে—দেবতা আছেন। চির পুরাতন বাণী আজ যেন নূতন রূপ ধরিয়া সতীনাথের মনে জাগিয়া উঠিল। মনে হইল দেবতা আছেন, তাঁহার নিজের আসনে অটল হইয়াই তিনি বসিয়া আছেন, সে-ই কেবল ভুলিয়া গিয়াছিল। ভক্তের এই অর্ঘ্য—যাহা নিষ্ঠুর আঘাতে সে আজ নষ্ট করিয়া দিল, তাহা প্রত্যর্পণের সাধ্য তাহার কোথায়? যাহার দানের শক্তি নাই, সে তস্করের মত কাড়িয়া লইতে চায় কিসের স্পর্দ্ধায়? সত্যই সে রিক্ত—দাতার দানে, ভক্তের পূজায় হাত দিবার কোন অধিকাব তাহার নাই।

অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সতীনাথকে বাড়ীর ভিতর আসিতে দেখিয়া পিসীমা তাঁহার গঙ্গাস্নানের শুচিতা ভুলিয়া অধৌত দালান মাড়াইয়াই কাছে আসিয়া বলিলেন—"কিরে সতী, অঘরা চায়ের জল নিয়ে যায়নি বুঝি?"

সতীনাথ হাসিয়া কহিল—"বিনা দরকারে বুঝি আস্‌তে নেই পিসীমা?"

পিসীমা একটা ছোটরকম নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"আসিস্‌নে ত কখনও, মুরারিকে এখনি সেই কথাই বলছিনু—'সতী একেবারে পরের চেয়েও পর হয়ে গেছে, পিসীমা বলেও আর কাছে আসে না মুরারি'!"

সতীনাথের দৃষ্টি মুরারির উপর পতিত হইল। ভাঁড়ার ঘরের সাম্‌নে কার্পেটের আসন বিছাইয়া থালা ভরা ফলমূল, গৃহজাত মিষ্টান্ন, ছানা চিনি, শাদা পাথবেব বাটিতে নেওয়াতি ডাবের শাঁস ও জল, অপর একটায় গোলাপ দেওয়া মিছরির সরবৎ লইয়া মহা আড়ম্বরে মুরারি জলযোগে বসিয়া গিয়াছে। সতীনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল—"ব্যাপার কি মুরারি, ভোর হতে না হতেই যে ফলার লাগিয়ে দিয়েছ।"

উমার সাক্ষাতে সতীনাথকে খোঁচা দিবার সুযোগ লইতে মুরারি কোনই দ্বিধা করিত না। সে মুখ গম্ভীর করিয়া শর্করাযুক্ত ছানার পিণ্ড গালে ফেলিয়া দিয়া কহিল—"তোমাদের কি দাদা! সারারাত গাওনা বাজনা করে দশটায় ভোর হবে না কেন? তোমরা সূর্য্যি উঠ্‌তে দেখ্‌লে, পরীর বাচ্ছা বলে' মূচ্ছো যাবে। আমরা ঔদরিক ব্রাহ্মণ, আমাদের ছটাতেই বারটা বাজে, না খেয়ে পেটের নাড়ী চুঁই চুঁই করে, চোখে সর্ষের ফুল দেখ্‌তে হয়। চাঁদের আলো, ফুলের বাতাস, থিয়েটারের পরীতে ত আর আমাদের পেট ভরে না! তার উপরে আজ আবার খোদ বৌদির নিমন্ত্রণ—এ সুযোগ ত্যাগ করা অর্ব্বাচীনের কাজ।"

মুরারির বক্তৃতার ভাষায় সতীনাথের মুখ লাল হইয়া কর্ণমূল পর্যন্ত ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। সে যেন গান বাজনা থিয়েটারের পরী দেখিয়াই নিত্য রাত

কাটাইয়া থাকে—তাহার বক্তব্যের ভাষায় এই ভাবটুকুই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বিরক্তভাবে সে একটা কি বলিতে গিয়া তখনই আত্মসম্বরণ করিয়া লইল। কেন সে প্রতিবাদ করিবে? এ মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে কেহ ত কোন প্রতিবাদ শুনিতে চাহে নাই? কেহ ত জিজ্ঞাসাও করে নাই যে সত্যই সে মুরারি-বর্ণিত উপহাস্য জীববিশেষ কি না? তবে গায়ে পড়িয়া কিসের এ কৈফিয়ৎ দিতে যাওয়া! উমা হয় ত তাহাকে এমনি ঘৃণ্য চরিত্রই দেখিতে চায়; সেও ইহাতে দুঃখিত নয়।

মুরারির তীব্র আক্রমণ অবহেলায় অম্লান মুখে সহিয়া লইয়া, সতীনাথ মুরারিকেও বিস্মিত করিয়া দিয়া হাসিয়া কহিল—"আমরা বুঝি ব্রতের ব্রাহ্মণ হবারও অযোগ্য পিসীমা? খেতে বুঝি কেবল ঐ মুরারিই জানে?"

পিসীমা কুণ্ঠিত হাস্যে কহিলেন—"তুমি তেমনি ছেলে কিনা বাছা! সকাল বেলা এই সব খেতে কি না! বলিনি তাই বাহাদুরী হচ্চে!"

সতীনাথ হাসিমুখে কি একটা উত্তর দিতে গিয়া দেখিল—উমা একটি রূপার ডিবায় গুটি কয়েক সাজা পান মুরারির অনতিদূরে রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে। তাহার সদ্যঃস্নাত চুলে গ্রন্থি বাঁধা, রাঙ্গা কস্তাপেড়ে শাড়ীর অঞ্চলের বেষ্টনীতেও কেশপ্রান্ত ঢাকা পড়ে নাই। ললাটতলে সিন্দূরবিন্দু সেদিনকার প্রভাত-সূর্য্যের আরক্ত গোলক বিন্দুর মতই উজ্জ্বল। উমার এমন রূপ সে যেন আব কোনদিন দেখে নাই বলিয়া মনে হইল। হাতে তিনগাছি করিয়া রাঙ্গা কাচের চুড়ি মাত্র—দেখিয়া ঈষৎ বিরক্তিও অনুভব করিল। সেই না হয় উমার বিষয়ে উদাসীন, আরও অনেক সজাগ চক্ষুও ত তাহার পানে চাহিয়া থাকে, তবে তাহাকে এমন কাচের চুড়ি সার করাইয়া রাখিয়াছে কেন? নিতান্ত মোটা মোটা মিলের কাপড় ছাড়া তাহাকে কোন দিন একখানা ভাল শাড়ী পারিতেও ত দেখা যায় না!

নয়নান্তরালবর্ত্তিনী উমার দিক হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়াই সে দেখিল—মুরারি ঈর্ষাপূর্ণ তীব্র কটাক্ষে তাহারই পানে চাহিয়া আছে। সতীনাথের সহিত চোখে চোখে মিলিতেই সে দ্বিগুণ উৎসাহে আহারে মনোযোগ দিল। দেখিয়া মৃদু হাসিয়া—"মুরারি ভাই, হজমশক্তি বুঝে খেও" বলিয়া, অযাচিত উপদেশের উত্তর শুনিবার প্রত্যাশা না রাখিয়াই সে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। পথেই সরকার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

ছেঁড়া শার্টের কাঁধটুকু সিল্কের চাদরে ঢাকা পড়িয়াছে কি না, বাহিরে যাইবার সময় নিধিরাম সরকার অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

বাবুকে দেখিয়া সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল। সতীনাথ কহিল—"বাড়ীর ভেতর যে সব কাপড় টাপড় পাঠান হয়, এমন খেলো কেনা হয় কেন? পয়সায় কুলোয না বলে?"

বাবুর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে এবং অশ্রুতপূর্ব্ব 'বাড়ীর ভিতবের' অর্থবোধে প্রপমটা বিপন্ন নিধিরাম মাথা চুলকাইয়া, 'আজ্ঞে আজ্ঞে' কবিয়া যখন প্রকৃত অর্থ আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইল, তখন একটুখানি বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া কহিল—"সে যেমন মা ঠাক্‌রুণের হুকুম। শান্তিপুরের, ফরাসডাঙ্গার, ঢাকাই—কত নামজাদা ভাল ভাল শাড়ী, রেশম সিল্কের লেশদার সেমিজ, বডিস, সৌখীন গন্ধ, সাবান এনে দিলাম, সে সব ফেবৎ এল। হুকুম হল, মোটা দেশী মিলের শাড়ী আব সেই রকম সেমিজ চাই। নিজে গিয়ে জোড়হাত করে বল্লাম—যে এবাবকার মত না হয় এগুলো নেন্, পরে মাঠাক্‌রুণেব ফরমাস মত এনে দেব। তা বল্লেন—'ওসব যাঁবা ব্যবহাব কবেন তাঁদের দেওয়া হোক, কেন মিছে পড়ে পচ্‌বে'। তিনি কোন সৌখীন জিনিস ব্যবহার কবেন না, করবেনও না। মাব আমাব সেই পুবাকালেব মোটা চাল।"

সতীনাথ দ্বিতীয় প্রশ্ন না কবিয়া নিঃশব্দে নিজেব কক্ষে ফিবিয়া গেল।

১৫

মধুপুর যাত্রার আয়োজন

কিছুদিন হইতে সতীনাথের ব্যবহাব বাড়ীব লোকেব ও পাড়াব লোকের আলোচ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ষাব জল যেমন হিসাব না রাখিয়া কূল কিনারা ডুবাইযা যথেচ্ছ বাড়িয়া যায়, আবার শীতাগমে ক্রমে কমিতে সুরু কবিয়া গ্রীষ্মে একেবাবে জরাজীর্ণা নারীর মত শীর্ণা নদীব দীনমূর্ত্তি লোক-চক্ষে বিপুল বিস্ময় জাগাইয়া বলে—'এই কি সেই?' সে প্রবল আবর্ত্ত উচ্ছল জলস্রোতে যৌবনের চাপল্য-লীলা কোথায় গেল?' সতীনাথের গান বাজনার অনুরাগও তেমনি বন্যাব জলেব মত সহসা কোন্ অদৃশ্য সাগরে লয় পাইল তাহার খবরটুকুও জানা গেল না। সন্ধ্যার সময় বন্ধুরা মজলিস্ করিতে আসিয়া হয় শবীর খারাপ, নয় মন খাবাপ, অথবা অনুপস্থিত, এমনি অনিয়মিত অপ্রত্যাশিত উত্তরে ফিরিয়া যায়। যাহাবা বড় বেশী ধৈর্য্যশালী বা উৎসাহী, তাহারা যতক্ষণ পারে নিজে নিজেই হারমোনিয়ম্ বা বেহালায় সুর সাধিয়া, তার পর বিরক্ত হইয়া এক সময় উঠিয়া পড়ে। সত্যই ত আর অন্নাভাবে কেহ আসে না! পান তামাক সিগারেটের সহিত চর্ব্ব্যচোষ্য

জলযোগের ব্যবস্থাও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। গৃহস্বামীর অনিচ্ছা বুঝিয়া অনেকেই আসা বন্ধ করিল।

যাঁহারা বন্ধুত্বের নেশায় না আসিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহারাও আসিয়াই ঘড়ি খুলিয়া বসেন, বসিতে না বসিতে 'যাই যাই' করেন। কেহ বলেন— ছেলের অসুখ, শীঘ্র ফিরিতে হইবে। কেহ স্ত্রীকে "কমলাকান্তের দপ্তরের" টিকা ভাষ্য বুঝাইতে প্রতিশ্রুত। কেহ বা অপর কোন কিছু। এ সব প্রয়োজন তাঁহাদের পূর্ব্বেও ছিল, উঠিতেও তাঁহারা চাহিতেন, কেবল সতীনাথেরই কোন প্রয়োজন না থাকায় সে-ই কেবল জোর করিয়া ধরিয়া রাখিত বই ত নয়! অভিমান করিয়া বলিত—"এখুনি? বেশ—যাও'। কিন্তু হুকুম পাইবার পর ছাড় পত্র প্রাপ্তের ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য আর থাকিত না। সে নীরব অভিমান উপেক্ষা করা ত সম্ভবই নয়, বরং দণ্ডস্বরূপ আবশ্যকেরও অতিরিক্ত সময় জরিমানা দিয়া তবে যাইতে পারিতেন। আজও তাহাদের ঘর ও ঘরের প্রয়োজন যেমনই থাক, লুব্ধ মন আগে—পূর্ব্বের মত তেমনি স্নেহের দাবী করিয়া বসে। মূঢ় সতীনাথ ইহার বিন্দুবিসর্গও ধরিতে পারে না। অম্লানমুখে বলে—"বাড়ীতে যখন দরকার তখন ত আর জোর করে ধরে রাখতে পারি না, তবে যাও।" অনভিজ্ঞ বুঝে না যে, সেই জোর করিতে পারা টুকু-ই যে চাই। "এখনই ছেড়ে দিলাম ত—কোথায় রাত? সারারাত এখনও পড়ে আছে। বোস, বোস, এখনই যেতে পাচ্ছ কি না?"—সে সব ভালবাসার অনুরোধ ফুরাইয়া গিয়াছে। বন্ধওষ্ঠের বাহিরে তাহার এতটুকু ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও আর শুনিতে পাওয়া যায় না। একবার একটা ক্ষুদ্র "না" বলিলে যেখানে পত্নী পুত্রের নীরস ভাবনা ভুলিয়া এখনি তাঁহারা জাঁকাইয়া বসিয়া সরস আলোচনায়, মধুর কণ্ঠের স্বর লহরীতে, শিক্ষিত অঙ্গুলি তাড়নে মূক বাদ্যযন্ত্রের অন্তরের সবটুকু রসধারা নিঙড়াইয়া বাহিরে ছড়াইয়া দিয়া সুপ্ত সন্ধ্যাকে সজাগ আনন্দে পুলক-চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারেন—সেখানে সেই অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ 'দন্ত্য ন'য়ে আকারটা কোন মতেই আর ঈপ্সিত স্থানের বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে না। কাজেই ক্ষুণ্ণ চিত্তে অসময়ে যে যাহার ঘরে ফিরিতে বাধ্য হন। আহ্বানের প্রতীক্ষায় কেহ বা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে পথ চাহিয়া গৃহে বসিয়া থাকিলেও, নিজে হইতে সাধিয়া আসিতে পারেন না। হায়! কোথায় বা সে আহ্বান! কোথায় সে মানভঞ্জনের পালা!

একদিন যাহাদের অনুপস্থিতিতে লোকের উপর লোক আসিয়া খবর লইত, আজ তাহারা একমাস অনুপস্থিত থাকিলেও কেহ খবর লইতেও আসে না। এই জন্যই বুঝি অসমান বন্ধুত্বে নীতিকার নিষেধ আজ্ঞা জানাইয়াছেন। নদীর বেগ

যেমন বালির বাঁধ দিয়া রোধ করা যায় না, অসমান আত্মীয়তাও তেমনি স্থায়ী হইতে পারে না। ঢাকা চাপা ঠাণ্ডা ভাত-ব্যঞ্জনের সহিত নিদ্রালসা গৃহিণীর কাটা-কাটা-মন্তব্য, পীড়িত পুত্রকন্যাদের ঔষধ পথ্যের নীরস চিন্তা, বায়না, আবদারের সমাধান করিতে অনিদ্রায় রাত্রি যাপনের সুযোগ না ঘটায়, সান্ধ্য নিদ্রার দীর্ঘ বিশ্রামে, তাঁহাদের পাক-যন্ত্রের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। কেহ কেহ গুল্ম-রোগের আকস্মিক আবির্ভাব আশঙ্কায় চিন্তাকুলও হইয়াছিলেন। এক দিন একজন স্পষ্টবক্তা বন্ধু সাহস করিয়া সতীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হঠাৎ এতটা গভীর বৈরাগ্য যে? বন্ধুসঙ্গ গৃহকর্ত্রীর নিষেধ না কি?" সতীনাথ বাক্যে তাহার উত্তর না দিয়া, হারমোনিয়মে মৃদু মৃদু বেলো করিতে করিতে সুর করিয়া—"এমন দিন কি হবে তারা" গান ধরিতেই বন্ধু রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

পড়িবার টেবিলে সুধীরকে একখানা কাগজের উপর অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে ঝুঁকিয়া থাকিতে দেখিয়া সতীনাথ নীরবে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুধীর পিছনে ফিরিয়া চাহিতেই সে মৃদু হাসিয়া কহিল—"এত মন দিয়ে কি পড়া হচ্ছিল—তাই দেখ্‌তে এলুম, স্কুলের বই নিশ্চয়ই না!" বলিয়া সে নত হইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেই, সুধীর দৃষ্ট পদার্থটিকে—"না দাদা, লক্ষ্মী দাদা,—দেখো না দেখো না" বলিয়া তুলিয়া উল্টাইয়া ধরিল। সতীনাথ দেখিল—সেখানা বই নয়—একখানা কাগজ। তাহার বাহির পৃষ্ঠা সাদা। সতীনাথ হাসিয়া কহিল—"কবিতা বুঝি—এই তোর পড়া হচ্চে?" বলিয়া অসতর্ক সু[illegible]ত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইল। পাছে ছিঁড়িয়া যায় সেই ভয়ে সেও জোর করিল না। অথবা জোর করিবার তাহার হয় ত ইচ্ছাও ছিল না। ধর্ম্ম-বুদ্ধি কাগজখানি দাদাকে দেখাইতে মানা করিলেও, দেখাইবার লোভ সংবরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টকরই হইয়াছিল। দাদা যখন সেখানি জোর করিয়া দখল করিলেন, তখন কর্ত্তব্যচ্যুতির অপরাধ এড়াইয়া সেখানি দাদার দ্রষ্টব্য করিবার সুযোগ গ্রহণে তাহার ক্ষোভের অপেক্ষা আনন্দই অধিক হইয়াছিল। সতীনাথ কাগজখানির পানে চাহিয়াই বিস্মিত হইল—সে একখানা হাতে আঁকা ছবি।

আকাশে ঘনমেঘ। বর্ষা আসন্ন হইয়া নামিতে উদ্যত, সম্মুখে নদী, নদীর পরপারে বনরাজিনীলা তটভূমি। আকাশের গায়ে সন্ধ্যার ছায়া—অস্পষ্ট রেখায় অদৃষ্টপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। নদীতীরে যুক্তকরে উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া এক বিধবা নারী—ছবির প্লট ইহাই। সেই আসন্ন বর্ষাসন্ধ্যায় অসহায়া নারীর একাকিত্ব যেন চিত্রকরের তুলির রেখায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে যে অসহায়া অথবা অনাথা

এ ভাবটুকু পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া তাহার নির্ভরের ভাবটি চিত্রকর যেন উপরের পানে পৌঁছাইয়া দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিল। পিসীমার শয়নকক্ষে নির্ব্বাসিতা সীতার একখানি চিত্র আছে—নারীমূর্ত্তি অনেকখানি তাহারই অনুকৃতি। তবু কি সুন্দর সে অনুকরণ! সুধীর কহিল—"কেমন হয়েচে বল না দাদা?" সতীনাথ ছবিখানি হাতে করিয়াই দেখিয়াছিল, তলায় নাম লেখা—'উমা'। সে বিস্মিত হইয়া কহিল—"তোর আঁকা ত?" সুধীর বলিল—"না, বৌদির।"—"দূর, মিছে কথা" বলিয়া সতীনাথ পুনরায় ছবির উপর মন দিল সুধীর কহিল—"মিছে বই কি? সত্যিই ত বৌদির আঁকা, আমি বুঝি মানুষের ছবি অমন আঁকতে পারি?" সতীনাথ অদম্য কৌতূহলটাকে দমন করিতে না পারিয়া হাসিয়া কহিল—"মাষ্টারটি কে শুনি?" সুধীর সোৎসাহে কহিল—"কে আবার? অনাথ-দাদা! ছবি দেখে বৌদিদি আপ্‌নি আঁকতে পারে। পিসীমার ঘরে সেই যে নির্ব্বাসিতা সীতার ছবিখানা আছে না—তারই গয়না টয়না বাদ দিয়ে এঁকেছে। বনের ধারে কেবল জল করে দিয়েচে। কেমন হয়েচে বল না দাদা?" সতীনাথ বিদ্রূপের স্বরে কহিল—"চমৎকার! এমন আঁকা কালীঘাটের পোটোরাও আঁক্‌তে পারে না। রামঃ—এ কি ছবি হয়েছে, রাবিস্" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। সে হাসির সুর বালক সুধীরের কানে বেসুরা ঠেকিল না, তাই সে রাগিয়া কহিল—"বেশ, তোমার আর দেখ্‌তে হবে না—দাও। ঐ জন্যেই ত বৌদি তোমাদের কিছু দেখাতে চায় না। দাও, আমার ছবি ফিরে দাও।" সতীনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল—"এমন ছবি নষ্ট হলে পৃথিবীর একটা মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। রোস্ বাঁধিয়ে দেব—তোর নিজের ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখিস্।" সুধীর হাসিল না, মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল—"বৌদি তাহলে আর কখ্‌খনো আঁক্‌বে কি না? তুমি দেখেচ শুন্‌লেই আড়ি দেবে, রাগ কর্‌বে—নৈলে টাঙ্গিয়েই ত রাখতুম" বলিয়া অপ্রসন্ন-চিত্তে বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল দেখিয়া সতীনাথ ছবিখানা হাতে করিয়াই—"আচ্ছা ভাল করে দেখি, কোন লুকান সৌন্দর্য্য বের্ করা যায় কি না" বলিয়া মৃদু হাসিয়া নিজকক্ষে ফিরিয়া আসিল।

ছবিখানি একটা টিপয়ের উপর অনাগ্রহভাবে ফেলিয়া রাখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিতভাবে সে খানিক ঘরের মধ্যে পাইচারী করিয়া বেড়াইল। তার পর সম্পূর্ণ অনিচ্ছাতেও সেই আঁকা ছবিখানি উঠাইয়া লইয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল—এই যে কর্ত্তব্যে অবিচলিত ধৈর্য্যশালিনী, শিল্পকলায় শক্তিশালিনী মেধাবিনী নারী—যাহার তুলির টান জীবনের জ্যোতিঃ ফুটাইয়া তুলে—সে কি সত্যই প্রাণহীনা! ছবিখানির পানে চাহিয়া যে প্রশংসার বাণী-

তাহার মনে উঠিতেছিল, তাহা এত উচ্চে যে, মনের কাছেও তাহা স্বীকার করিতে সে লজ্জানুভব করিল।

সতীনাথ চিত্রকর নয়। চিত্রের কোথায় কি ছোট-খাট দোষ-ত্রুটি আছে, সে তাহার ভ্রম সংশোধনে অসমর্থ। তাই মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া এক সময় তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণের পর আশ্বস্ত হইয়া মৃদু হাসিয়া তাড়াতাড়ি ছবিখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

মধুপুর যাইবার জন্য সতীনাথ রুদ্রকান্তের অনুমতি চাহিলে তিনি বিশেষ আপত্তি তুলিলেন না। তাহার নিত্য শরীর-খারাপের সংবাদে তাহাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। পশ্চিমের জলবায়ুর গুণে উপকার হওয়াই সম্ভব, বিশেষতঃ মধুপুর কিছু এমন বেশী দূরও নয়। তাই একটুখানি নিশ্চিন্তও হইলেন।—তা'ছাড়া ভট্টাচার্য-দুহিতা তাহার রূপ গুণ এমন কি বিদ্যার পরিচয়েও যে স্বামীকে মেষত্ব দিতে সক্ষম হইল না—পুত্রের এই বিজয়-গর্ব্বে মনে মনে তিনি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভবও করিলেন। সতীনাথ যে অন্য ছেলের মত স্ত্রীর বশীভূত হইল না, এ তাহার প্রকাণ্ড মনুষ্যত্ব। কোন্ ছেলে স্বেচ্ছায় এমন করিয়া নিত্য নির্জ্জনবাস গ্রহণ করিতে চায়? তাহার কষ্ট হইবে সত্য, তা সে কষ্ট তিনি সহ্য করিতে অক্ষম নহেন। উমার সেদিনকার সেই দুর্ব্বলতা ও মোহপ্রাপ্তি অকস্মাৎ তাহার অটল মনকেও যেন টলাইয়াছিল। সেদিন হইতে তিনি তাহাকে বাক্যবাণে আর বিঁধিতে ইচ্ছা করেন নাই। হয় ত মনের কোন নিভৃত কোণে এতটুকু মমতাও জন্মিয়াছিল। যদি সে অনুমান সত্য হয়, তবে বৈচিত্র্যময়ী ধরণীতে অসম্ভব বুঝি কিছুই নাই।

সতীনাথ সুধীরকে সঙ্গে লইতে চাহিলে রুদ্রকান্ত আপত্তি করিলেন। সুধীরের স্বাস্থ্যের অপেক্ষা বিদ্যার উপর রুদ্রকান্তের প্রখর দৃষ্টি, কহিলেন—"তা হ'লে পড়া শোনা কিছুই হবে না। ওর না হাফ্ ইয়ার্‌লি আসচে?" সতীনাথ কহিল—"মাষ্টারও সঙ্গে যাবে, আমিও নিজে দেখ্‌ব। পরীক্ষার পূর্ব্বে সে ফিরে আসবে।" রুদ্রকান্ত কহিলেন—"তবে যাক্"—মনে করিলেন রাত দিন বাড়ীর ভিতর থাকিয়া 'কুনো' হইয়া যাইতেছে, একটু ঘুরিয়া আসে আসুক্।

দাদার সহিত মধুপুরে যাইবার সংবাদ পাইয়া সুধীর মহানন্দে লাফালাফি সোরগোল করিয়া সাড়ম্বরে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিল। ফরমাইস খাটিতে খাটিতে চাকর বাকর লোকজনের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল। চাকরদের সজ্জিত ট্রাঙ্কের জিনিসপত্র অপছন্দ হওয়ায় সব মাটিতে ঢালিয়া ফেলিয়া সে উমার

কাছে সাহায্য চাহিল—"কি ছাই গুচিয়ে দিয়েছে। লাট্টু, লাটাই কিছু ধর্‌বে না। বৌদি তুমি ঠিক করে দাও ত।"

উমা কাজে মন দিয়া চোখ নীচে রাখিয়া কহিল—"ঠাকুরপো সেখানে গিয়ে ভুলে যাবে না ত ভাই? চিঠি পত্র দেবে ত?"

সুধীর নবক্রীত 'এয়ার-গনের' কল কব্জার রহস্য উদ্‌ঘাটনে ক্ষান্ত দিয়া চমকিয়া কহিল—"কি রকম—তুমি যাবে না?"

উমা একটুখানি হাসিয়া কহিল—"না।"

"তবে?"—সে যেন সহসা আকাশ হইতে পড়িল। বৌদিদি যাইবেন না—এ প্রশ্নটা এতই অসম্ভব যে তাহার মনে সন্দেহ মাত্র জাগায় নাই। যদি তিনিই না যাইবেন তবে তাহার যাওয়া কেমন করিয়া হইতে পারে? সে না থাকিলে এতবড় বাড়ীখানায় কেবল জ্যেঠামহাশয়ের বকুনি খাইয়া বৌদি কেমন করিয়া বাস করিবেন? না—না—সে কি কখনও হয়!

রুদ্রকান্ত যখন বিনা প্রতিবাদে সতীনাথের দরখাস্ত পাশ করিলেন, তখন তাহারও মনে হইল—'এত শীঘ্র'? সে যেন মঞ্জরীর আশা না রাখিয়াই দরখাস্ত পেশ করিয়াছিল। কিন্তু যখন করিয়াছে, এবং মঞ্জরীও সহি হইয়া গিয়াছে, তখন সে কথা ভাবিয়া আর ফল কি?

সুধীরকে বিষণ্ণ-মুখে কাছে আসিতে দেখিয়া সতীনাথ কহিল—"তোমার গোছান-গাছান সব শেষ হল সুধীর? আর ত চার দিন আছে মাঝে।"

সুধীরের গুছাইবার উৎসাহ মিটিয়া গিয়াছিল, ভ্রমণের কৌতূহল তথৈবচ। সে মুখখানা ভার করিয়া কহিল—"আমি ত যাচ্ছি না, গুছিয়ে আর কি হবে?"

সতীনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল—"রাগ হল নাকি? যাবে না কেন শুনি?"

সুধীর একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—"বড্ড কি হবে গিয়ে, বেড়ানও যাবে না, কিছুই হবে না। কে কে যাবে?"

সতীনাথ বুঝিলেন, বালকের ব্যথা কোথায়। এই সুকুমারচিত্ত বন্ধুটিই যে উমার এখানে জুড়াইবার একমাত্র আশ্রয়স্থল। এটুকু হইতে সে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নিষ্ঠুরতার চরমসীমা দেখাইতে বসিয়াছে মনে করিয়া, মনের কাছে একটুখানি লজ্জানুভবও যেন করিল। সুধীরের প্রশ্নের উত্তরে কহিল—"কে আবার—তুমি আমি পাঁড়ে মাষ্টার বিপিন, আর তোমার টেবি রাশিও যদি যেতে চায় ত যেতে পারে।"

দাদার উদারতায় আজ আর সুধীরকে খুসী করিতে পারিল না। পাঁড়ে

বিপিন সবাই যাবে, কেবল বৌদি নয়? বক্তব্যটা সে স্পষ্ট করিয়াই বলিল—“আর বৌদি?—বৌদি বুঝি যাবেন না?”

সতীনাথ অধীত পুস্তকে মনোযোগ দিবার ভান করিয়া কহিল—“পাগল! বাড়ীশুদ্ধ গেলে কি চলে? জ্যেঠামশায়ের জন্যে—”

সুধীর উত্তেজিতভাবে বাধা দিয়া বলিল—“বৌদি গেলেই বাড়ীশুদ্ধ হল বুঝি? পিসীমা মুরারিদা' আরও কত লোক ত রয়েছে। জ্যেঠামশাই বৌদিকে যা ভালবাসেন—তিনি গেলেই বা তাঁর কি ক্ষতি?”

বালকের যুক্তিপূর্ণ কথায় সতীনাথ ঈষৎ বিপন্ন বোধ করিলেও, স্বরে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য রাখিয়া কহিল—“সে বাংলো, সেখানে মেয়েমানুষদের থাক্‌বার সুবিধে হবে না ত।”

সুধীর তাহার নূতন কেনা মাঞ্জা দেওয়া লাটাইযের সূতার দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য বাহিরে দালানে আলোর কাছে সরিয়া গিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিল—“তুমি এক্‌লাই যেও দাদা—আমার স্কুল কামাই হবে, আমি ত যেতে পার্‌ব না। স্যর বল্‌ছিলেন—এতদিন কামাই হলে আমার এক্‌জামিনের ক্ষতি হবে।”

স্যরের আপত্তির জন্য এতদিন যে তাহার উৎসাহে বাধে নাই এবং মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অনিচ্ছা দেখা যায় নাই, সতীনাথ সে বিষয়ে কোন তর্ক না তুলিযা “আচ্ছা” বলিয়া পুস্তকে মন দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাদার রায় বদল হইবার আশাটুকুও যখন মন হইতে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া গেল, বালক তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদু গতিতে বাহির হইয়াই মহা উৎসাহে স-কলরবে বৌদিদির কাছে গিয়া জানাইল—‘স্কুল কামাই করিয়া এখন বেড়াইতে যাওয়া তাহার সম্ভব হইল না, পরীক্ষা আসন্ন’ ইত্যাদি। সে দাদাকেও সেই কথা জানাইয়া পশ্চিমে যাওয়ার দায় এড়াইয়াছে। এই বর্ষায় কাদা, জল, ব্যাং—আরও যে কত ভীষণ অন্তরায় পশ্চিম ভ্রমণের আনন্দের পথে বর্ত্তমান, তাহাও সে বিশিষ্টরূপে সেখানে ব্যাখ্যা করিতে ভুলিল না।

উমা তখন তাহারই কতকগুলি নূতন শার্টে সূতা দিয়া নাম লিখিতেছিল। মনের আনন্দটুকু গোপন করিতে না পারিয়া প্রসন্নহাস্যে মুখ তুলিয়া কহিল—“ভালই হল ঠাকুরপো, তুমি চলে গেলে কেমন করেই যে থাক্‌তুম। পাছে তুমি যেতে না চাও বলে তোমার কাছে বলিনি। সত্যি বল্‌চি, ক'দিন থেকে কিছু যেন আর ভাল লাগ্‌ছিল না।”

সুধীরও যে তাঁহার জন্য ভাবিয়া থাকে, সেও যে কাহারও চেয়ে তাঁহাকে কম ভালবাসে না, এইমাত্র যে কাঙ্ক্ষিত প্রলোভন সে স্বেচ্ছায় তাঁহারই জন্য ত্যাগ করিয়া আসিল, লজ্জায় সে কথা বলিতে পারিল না। বৌদিদির সেই প্রসন্ন

হাসিটুকুতেই সে তাঁহার স্নেহের যে নিদর্শন পাইল, তাহাই স্বীয় ত্যাগের পুরস্কার বলিয়া প্রীতচিত্তে গ্রহণ করিল। সতীনাথ যাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভুলিতে চায় সুধীর তাহাকেই অবলম্বনের জন্য সানন্দে ক্ষতি সহিতেও সম্মত! মানুষে মানুষে প্রকৃতির এতই বিভিন্নতা! তবু তাহারা দুজনেই তাহাকে ভালবাসে। মনুষ্য-প্রকৃতিব এই পার্থক্যের গোপন রহস্য বুঝা বড় কঠিন।

পিসীমা নারায়ণ ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখাইয়া যাত্রাব জন্য দিন স্থির করিয়া লইলেন। "শনিবাব সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী। বেলা ৩টা ১৭ মিনিটের পরে মাহেন্দ্রযোগ—যাত্রার জন্য অতি প্রশস্ত কাল।"

বিদাযকালে নারায়ণ ঠাকুর পিসীমার নিকট প্রাপ্ত প্রণামীব টাকাটি তুলিযা লইয়া চলিয়া গেলে পিসীমার মনে পডিল—তাই ত শনিবারেব বারবেলা, কি ছাঁইএব দিন যে দেখালাম! আর একটা দিন দেখালে ভাল হত। ও মোক্ষদা, ওবে ও নন্দব মা, বিপনে হরে—ওরে তোবা ছুটে যা, ভট্চায্যি ঠাকুবেব দেখা পাস্ ত ফিবিয়ে আন্, বল গিযে, ও দিন হবে না। যা যা যা।"

মোক্ষদা হবি বিপিন ছুটিযা গিযাও কোথাও কোন গলির মধ্যেই নারায়ণ ঠাকুবেব অদৃশ্য মূর্ত্তি আবিষ্কাব করিতে সক্ষম হইল না। পিসীমাব মনেব খুঁৎখুঁতানিও গেল না।

নফব আসিযা বলিল—"বাবুব সঙ্গে কি কি জিনিষ যাবে সরকার মশাই ফর্দ্দ চাইচে।" বেহারী কহিল "কর্ত্তাবাবু বলে দিলেন, জিনিষ পত্র সব যেন গুছিয়ে দেওয়া হয। সঙ্গে যাবার জন্যে তোরঙ্গ কটা আসবে, একটা না দুটো?"

১৬

নিমন্ত্রণ-রক্ষা

সারাদিনেব অসহ্য গুমোট্ কাটাইয়া বিকালের দিকে বাতাস উঠিয়াছে। সূর্য্য তখনও অস্তাচল গমনোন্মুখ নহেন, কেবল উত্তাপ নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে মাত্র। নীচেই বাঁধা ঘাটে, বর্ষার গঙ্গার গেরুয়া রঙের জল তীর ডুবাইয়া কয়েকটা সিঁড়িও ডুবাইয়া দিয়াছে। তীবে তীরে যেখানে পাথরেব নুড়ি ও শিয়ালকাঁটা গাছের ঝোপ ছিল, সেখানে এখন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। পাড়ার কয়েকটি মেয়ে কাপড় কাচিবার জন্য জলে নামিয়াছিল। দুইটি অল্পবয়স্কা 'ঝিউড়ী' মেয়ে গামছা ছাঁকা দিয়া জলে মাঝ ধরিবার চেষ্টায় কখন বা কতকগুলা ভাসমান জঞ্জাল, কখন বা দুই একটা ছোট চিংড়ী ধরিয়া কলহাস্যে নদীতীর মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল।

পাড়ার জলবাহী ভারী বাবুরাম, বাঁকের দুইদিকে দুইটা কর্ত্তিত-মুখ কেরোসিনের টিন বসাইয়া অনবরত জল বহিয়া বহিয়া এইবার শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার গমনের মন্থরতাতেই তাহা প্রমাণ করিতেছিল। লখীয়ার মা উপরের পৈঠার উপর একখানা ভাঙ্গা ইটে বসিয়া একখানা নিকষ-কৃষ্ণ কটাহ বালী ও শালপাতা সহযোগে প্রবল বিক্রমে ঘর্ষণ করিতে করিতে রন্ধনকারী ঠাকুরজীর চক্ষুষ্মত্তায় যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিল। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যে এমন করিয়া 'দোস্‌রা আদ্‌মির' শরীরের উপর 'দবদহীন' হইয়া কটাহ দগ্ধ করিতে পারে তাহা কিছু আর সম্ভব নয়। লখীয়ার মা বহুকাল বাঙ্গালা মল্লুকে আসিয়া বাস করিয়াছে। সে যখন এ দেশে আসে তখন হুগলীতে 'পোল' হয় নাই এবং পরপারে অতগুলা কলের মধ্যে একটাও হইয়াছে কি না সন্দেহ। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী সে যে বঙ্গভাষায় অদ্ভুত বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, এ সম্বন্ধে তাহার ও তাহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু তবু তাহার বাঙ্গালা কথা শুনিয়া সম্ভবতঃ বয়স দোষে মৎস্যসংগ্রহকারিণী মেয়ে দুটির হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইয়া উঠিতেছিল।

পালতোলা নৌকাগুলি উজান বাহিয়া চলিয়াছে। নৌকার ছইয়ের ভিতর কাছারী-প্রত্যাগত উকীল ও মুহুরী বাবুর সংখ্যাই অধিক। মাঝিরা নিরুদ্বেগে হালের কাছে বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছিল। নিস্তরঙ্গ নদীর বক্ষে পালতোলা নৌকাগুলি যেন নীল আকাশের বুকে ছোট পাখীগুলির মত অবাধে ভাসিয়া চলিয়াছে। কোন কোন ইট বোঝাই মহাজনী নৌকাকে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতে হইতেছে। যেখানে তীরে, পায়ে হাঁটার পথ নাই, সেখানে বশাবশী গুটাইয়া মাঝি মল্লারা নৌকার উপর উঠিয়া বসিতে বাধ্য হইতেছে। জগতে যাহারা নিজের শক্তিতে চলিতে পারে না, তাহাদেরও বুঝি এমনি করিয়া টানিয়া চালাইয়া লইতে হয়।

একখানি ইট-বোঝাই মন্থরগামী নৌকার পানে চাহিয়া চাহিয়া কল্যাণীর মনে এই প্রশ্নটিই উঠিতেছিল—"আমার এ ইটের বোঝা টেনে নিয়ে যাবে কে? যদি দাদামহাশয়কে না পেতুম, তবে এ পোড়া মাটির-বোঝা এমন করে টেনে নিয়ে একদিনও চল্‌তে পার্ত্তুম কি? তুমি আমায় অনেক দিয়েছ দাদামশাই, আমার এ বৃথা-জীবনকে তুমি সার্থক করে তুলেচ। আমার সুখ দুঃখই যে সব নয়, আমি যে কিছুই নই, ত্যাগ যে কত মধুর, দুঃখ যে কত আনন্দময়, ত্যাগের সুখ না পেলে কি কেউ বুঝতে পারে?—পেলেও বুঝি পারে না। তোমায় না পেলে এ কথা কি আমিও কখন ভাবতে পার্ত্তুম! যেদিন বরের সাজে তাঁকে

দেখেছিলুম, মনে হয়েছিল সেই দিনই আমার মৃত্যু হয়ে গেল, আমার সব বুঝি শেষ হয়ে গেছে। আত্ম-অভিমানে আঘাত লাগায় ক্ষোভে হাজার বার মৃত্যু কামনা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কত শীঘ্র, কত সহজে তুমি আমায় নতন জীবন দিয়ে ধন্য করে দিলে দাদামশাই।"

সে অতীত দিনের পুরাতন স্মৃতিটা স্মরণপথে আনিয়া কল্যাণী একবার নিজের মনের কাছে তুলিয়া ধরিয়া যাচাই করিয়া যেন দেখিতেছিল—চিত্র যেমনই থাক্, চিত্রের আদর্শ যে আর তাহার কাম্য নাই তাহা সে ভালই বুঝিয়াছে। তবু অজ্ঞাতে তাহার চোখের পাতায় অল্প যেন জলের রেখা দৃষ্টিপথে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে বিষয়ান্তরে মন ফিরাইবার জন্য নদীর দিকে চাহিতেই দেখিল—একখানা সবুজ রঙের পান্‌সী ঘাটের কিনারায় আসিয়া ভিড়িয়াছে এবং তাহার একমাত্র আরোহী বাবুটি নামিয়া মাঝির সহিত ভাড়া লইয়া বচসা লাগাইয়া দিয়াছেন। বাবুটির বেশবেশের একটু বিশেষ ভাবের পারিপাট্য থাকায় পল্লীবাসিনী রমণীদের মনে একটুখানি সম্ভ্রমপূর্ণ শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিয়াছে। কেহ বা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া, কেহ বা কেবল মাথার উপর আঁচল দিয়া আড়ে আড়ে তাহার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল।

এমন সময় উপরের জানালা হইতে কল্যাণীর এবং সোপান আরোহণোদ্যত উদ্ধনেত্র বাবুটির চক্ষুও এক সময়েই পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়ায় দুজনেই বিস্মিত হইয়াছিল। নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিয়া লইবার জন্য পুনরায় জানালার পানে চাহিতে গিয়া বাবুটি আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

বাবুটি—মুরারি। ঘাট হইতে উঠিয়া, লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সে তারাসুন্দরীর বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর দাসী মোক্ষদাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যা গা বাছা, এ বাড়ীতে কারা থাকেন বলতে পার ?"

এই অপরিচিত বাবুটির প্রশ্নে একটু থতমত খাইয়া মোক্ষদা কহিল—"এই—আমরাই থাকি।" বাড়ীর অধিকারীর সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কখনও তাহাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই—তাই ইহার উত্তরও তাহার ঠিক জানা ছিল না।

ভদ্রলোকটি অসহিষ্ণুভাবে কহিল—"বাবুর নাম কি ? বাড়ীর কর্ত্তা কোথায় ? বাড়ী আছেন কি ?"

মোক্ষদা তাহার সোনার মোটা চেন ছড়া হইতে সার্টের স্বর্ণময় বোতামগুলি পর্য্যন্ত একবার ভাল করিয়া দেখিয়া একটুখানি সম্ভ্রমের সহিত কহিল—কর্ত্তার কথা শুচ্ছেন—তা' ঐ পণ্ডিত মশাই-ই আমাদের এক রকম কর্ত্তা কি না—এখানে

থাকেন মাঠাকৃরুণ আর তাঁর মেয়ে।”—মনে মনে কহিল—“দিদিমণিকে দেখ্‌তে এয়েচে বুঝি—বিয়ের নেগে?” প্রকাশ্যে কহিল—“তা আপনার কথা তাঁদের গে কি বল্‌ব?”

এমন সময় ভজহরি এক হাতে তেলের ভাঁড় ও অন্য হাতে চুপড়ীতে কয়েকটা পাকা বিলাতী আমড়া, পেয়ারা ইত্যাদি লইয়া বাজার হইতে ফিরিতেছিল। উভয় উভয়কে চিনিতে পারিল। কুশলপ্রশ্নাদি সমাপ্তি হইবামাত্র মুরারি জিজ্ঞাসা করিল—তাহার দিদিমণির স্বামী কোথায়? ভজহরি বাড়ীর ভিতর গমনোদ্যত হইয়া কহিল—“তাঁর আবার বিয়ে কবে হল ঠাকুর, যে তাঁর স্বোযামীর কথা শুদুচ্ছেন? চলুন বাড়ীর ভেতর—মাঠাকৃরুণ চেনা নোক দেখলে খুসী হবেন এখন”—বলিয়া মুরারির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই ভিতরের উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—“মা, কে এসেছেন দেখেন গো!”

ভজহরির অতর্কিত আহ্বানে, ডান হাতে দুধের হাতা ও বাঁ হাতে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিতে দিতেই তারাসুন্দরী রান্নাঘবেব বাহিরে আসিয়া মুরাবিকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। অনেক দিনের পর দেখা, তবু চিনিবার পক্ষে বাধিল না। তারপর কি ভাবিয়া, হাতা রাখিয়া ঘটির জলে হাত মুখ ধুইয়া মাথার কাপড় ভাল করিয়া টানিয়া, বাহিরে রকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুরারি অগ্রসর হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল। হাসি হাসি মুখে কহিল—“আমি বলি মা বুঝি চিন্‌তেই পার্‌বেন না! সন্তানকে মনে আছে ত মা?”

তারাসুন্দরী একটুখানি বিপন্নভাবে হাসিয়া উত্তরে কহিলেন—“খবর ভাল? —ভাল আছ সব?”—বাড়ীর অপরাপর সংবাদ ইহার অধিক বিস্তারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

মুবারি একটু অভিমানের সুরে কহিল—“ভাল আর কই মা, মা ত সন্তানদের ভুলেই গেছেন। কুপুত্র হলেও কুমাতা হয় না জানি, আমার ভাগে—মা সবই উল্টো!”

মুরারির এই অসময়োচিত বিনয় প্রকাশে তারাসুন্দরীর মুখে বিশেষ ভাবান্তর দেখা গেল না। ভজহরিকে আদেশ করিলেন—“ভজা, বাবুকে আসনখানা পেতে দে। মুকী কোথায় গেল, একটা আলো দিতে বল।”

তার পর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন। তারাসুন্দরীর বলিবার কথা, জানিবার কথা অনেক ছিল। কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না। যে সম্বন্ধ জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে তাহার কোথায় কি গলদ

বহিয়া গিয়াছে, না জানিলেই বা ক্ষতি কি ? মুরারির কিছু কিছু বুঝিবার ছিল, কিন্তু কি ভাবে কোন্ কথার উপলক্ষে আসল কথাটা উত্থাপিত করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেই বিদ্যানাথ বাচস্পতির বাড়ীতে সান্ধ্য-আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তারাসুন্দরী ও ভজহরি উদ্দেশ্যে দেবচরণে প্রণত হইলে—দেখাদেখি মুরারিও প্রণাম করিল। এমন সময় মোক্ষদা একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিয়া কহিল—"পণ্ডিত মশাই বলে দিলেন দিদিমণিকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় ওখানে যেতে। বড় দিদিমণি বল্লেন—খাওয়া দাওয়াও রাতে সেখানেই হবে"—

"উপর থেকে দুটো পান এনে দে"—বলিয়া তারাসুন্দরী ভাঁড়ার ঘরে গিয়া একখানি ছোট কাঁসার রেকাবীতে কিছু ছানা চিনি দুইটি সন্দেশ ও এক গেলাস জল আনিয়া মুরারিকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ তৎক্ষণাৎ পালিত হইল। পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া মুরারি অজ্ঞতার ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দিদির বিয়ে কোথায় দিলেন মা ? তিনি এখানে রয়েচেন বুঝি ?

তারাসুন্দরী উদ্বেলিত নিঃশ্বাসটা জোর করিয়া চাপা দিয়া সংক্ষেপে কহিলেন—"তাঁর অসুখ, এখানেই আছে বৈ কি।"

বিবাহ বিষয়ে ইচ্ছা করিয়াই কোন কথা কহিলেন না বুঝিয়া মুরারি কথার সুর ফিরাইয়া লইয়া কহিল—"সতীনাথের শ্বশুরবাড়ী এইখানেই কি না, বিদ্যানাথ বাচস্পতির বাড়ী যাব। তাঁর ছাত্রের বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে এসেচি। তা সাধু দর্শনের আগেই ফল পেলাম। না এলে ত আর মার শ্রীচরণ দেখ্‌তে পেতাম না। বাড়ীটা ঠিক আমার মনে নেই, খুঁজে নিতে হবে আবার—তা হলে উঠি মা।

তারাসুন্দরী ভজহরির উদ্দেশে কহিলেন—"ভজা, বাবুকে আলো দেখিয়ে গুরুদেবের ওখানে পৌঁছে দিয়ে আয়, জামাই বাবুর ভাই উনি"—বলিয়া মুরারিকে দ্বিতীয় কথার অবকাশ না দিয়া, ফুটন্ত দুধের কথা স্মরণ হওয়াতেই বোধ হয় দ্রুতপদে রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

প্রথম বারের রোগী যে দ্বিতীয় বারের বৈদ্য, এ শিক্ষা মুরারির পূর্ব্বে না থাকায় সে ভুল বুঝিয়াছিল। মনে করিয়াছিল—তারাসুন্দরীর নিকট হইতে এমন কতক গুলি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে লইয়া যাইতে পারিবে, যাহাতে সহজেই সতীনাথকে দোটানায় ফেলিয়া আরও ভগ্নমনা করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু তারাসুন্দরীকে

সে কিছুই বুঝিত না। যেখানে দাবী নাই, সেখানে তাঁহার কৌতূহল মৃত, অকারণচর্চ্চা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তাই মুরারির কোন কথা বলাও হইল না—জানাও হইল না।

ক্ষুণ্ণ হইলেও ভজহরি-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে তাহাকে বাধ্য হইতে হইল। পথে ভজহরির নিকট হইতে সে যথাসাধ্য আপনার কৌতূহল পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল হইল না। কল্যাণী যে অবিবাহিতা, এইটুকুই ভজহরির জানা আছে। বিবাহ কবে হইবে, কোথায় হইবে, আদৌ হইবে কি না—এ সকল সংবাদ সে কিছুই জ্ঞাত নয়, জানিবার জন্য কোন কৌতূহলও তাহার মনে কখনও উঠে নাই। সে জানে, মাঠাক্রুণের গুরু আছেন, তাই গুরুর কাছে তারা এসে রয়েছেন, একটা অভিভাবক চাই ত! পণ্ডিত মশাই যে খুব ভাল লোক, সেই কথাটিই সে অনেকবার করিয়াই বলিল। মুরারিও আন্তরিকতার সহিত সে কথায় সায় দিয়া গেল। সতীবাবু যে ঠাকুর মশায়ের নাতজামাই, এ খবর ভজহরি জানিত না; জানিয়া তাহার অনেকখানি ক্ষোভ মিটিয়া গেল। তা, এ বাড়ীর জামাই না হয়ে ও বাড়ীর হয়েচেন, তাতে আর কি! ও একই কথা। ভজহরি কেবল একটা কথা বুঝিতে পারিল না। এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত সে অচেনা 'ছোট-দিদিঠানের' শ্বশুরবাড়ীর বিরুদ্ধে নানা কথাই শুনিয়া আসিয়াছে। কল্পনায় সে কুটুম্বদের চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াও রাখিয়াছে, আজ কেবল সেই স্থানটিতে সংশয় জাগিতেছিল। তেমন গুণের ছোটবাবু—তিনি যে কেমন করিয়া 'ঠাকুরমশায়' হেন মহাশয়ব্যক্তির মনঃক্ষোভের হেতু হইতে পারেন, এইটুকুই তাহার সবচেয়ে বিচিত্র মনে হইল।

একটা ছোট গলি পার হইয়া একটুখানি ঘেটু কাল্‌কাসুন্দা ও ধুতুরা ফুলের আগাছাপূর্ণ সবুজ জমির পরেই বিদ্যানাথের বাড়ী। শুভকর্ম্ম উপলক্ষে বাড়ীর বাহিরে দরজার দুইধারে দুইটি কদলীবৃক্ষ রোপণে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। দরজার মাথায় দেবদারু পাতার মালা গাঁথিয়া, দালান এবং বাহিরের দরজায় একটি কেরোসিন তৈলের আলো দিয়া বিবাহ বাড়ীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হইয়াছিল। পথের ধারে স্তূপীকৃত ভাঁড় খুরি ও উচ্ছিষ্ট পত্ররাশির মধ্যে লোলুপ কুকুরগুলা খেও-খেয়ি লাগাইয়া দিয়াছে। সারাদিনের পর কর্ম্মবাড়ী অবসাদক্লান্ত, তবু এখনও এ বেলার নিমন্ত্রিত দুই একজন মধ্যে মধ্যে আসিয়া খাইয়া যাইতেছেন। "বৌভাতের যগ্যি" ও বেলাই সারা হয়েছে, এবেলা ফুলশয্যার আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত। কুটুম্বগৃহাগত দাসী চাকরদের আহারস্থানে স্বয়ং গৃহকর্ত্তা দাঁড়াইয়া তদারক করিতেছিলেন—গৃহাগত অতিথির না অতৃপ্তি হয়। সারাদিনের যজ্ঞের ব্যাপার

শেষ করিয়া অন্নপূর্ণা সবেমাত্র ঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়াছে, রাজলক্ষ্মী তখনও রন্ধনগৃহে কার্য্য ব্যাপৃতা।

অপ্রত্যাশিত মুরারিকে দেখিয়া বিদ্যানাথ যে শুধু খুসীই হইলেন এমন নয়, বিস্মিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু সে কৌতূহলের আভাস মাত্র প্রকাশ বা কোন প্রশ্ন না করিয়াই অভ্যাগত কুটুম্বকে যথোপযুক্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। বাটীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পরিচর্য্যার ভার অনাথের উপর প্রদান করিলেন। এই অনাড়ম্বর দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে শান্তিময় গৃহস্থালী, বিদ্যানাথের উদার বাৎসল্য ভাব, রাজলক্ষ্মীর স্নেহকোমল মাতৃত্বের আস্বাদন—যেন সেই অল্প সময়ের মধ্যেই মুরারির চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়া তুলিয়াছিল। সে যে কোন বিশেষ স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া কুটুম্বগৃহে আথিত্য লইতে আসিয়াছে—ক্ষণেকের জন্য মনের কাছেও সে যেন তাহা অস্বীকার করিল। স্থানমাহাত্ম্যে সে নিজের স্বার্থচিন্তা ভুলিয়া গিয়া অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিতই শ্রদ্ধেয় লোক কয়টির তৃপ্তি খুঁজিতে চাহিতেছিল। নিজে কাছে বসিয়া বিদ্যানাথ তাহার আহার দেখিলেন, এবং রাত্রে শয়নের বন্দোবস্ত করিতে চাহিলে মুরারি জানাইল—রাত্রেই তাহাকে ফিরিতে হইবে। বিদ্যানাথ আর কোন অনুরোধ করিলেন না।

আহারাদির পর রাজলক্ষ্মী তাহাকে কাছে ডাকাইয়া উমার শারীরিক সংবাদ জানিতে চাহিলে মুরারি হাসিয়া কহিল—"বৌঠান খুব ভালই আছেন। এখন তাকে দেখলে আপনাদের সেই ছোট প্যানপেনে মেয়েটি বলে আর চিনতেও পারবেন না,—একেবারে চমকে যাবেন।"

অনিচ্ছাতে ও নিজের অজ্ঞাতে রাজলক্ষ্মীর চোখের জল গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। এ অশ্রু বিষাদের নয়—আনন্দের। সে তবে ভাল আছে, সুখে আছে? মনের শান্তি না পাইলে শুধু শরীরের ভোগে সৌন্দর্য্য আসিবে কোথা হইতে? রাজলক্ষ্মী জানিতেন না যে প্রকৃতি কোন অবস্থাতেই তাহার কার্য্য স্থগিত রাখেন না। যথেষ্ট জল বাতাসের অভাবেও কত চারা গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, আবার কত যত্নপালিত উদ্যানতরু পর্য্যাপ্ত স্নেহ পাইয়াও জীর্ণ শীর্ণ ভাবে মৃত্যু-প্রতীক্ষায় কালহরণ করিতে থাকে।

সতীনাথের সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মী বিশেষ কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করিতে সাহস করিলেন না। ভয় হইল—কি জানি মহীলতাবোধে মৃত্তিকা খননে সুপ্ত বিষধরকে পাছে জাগাইয়া তুলেন। "জামাই শারীরিক ভাল আছেন ত?"—সংক্ষেপে এইটুকু জানিতে চাহিলে মুরারি তাচ্ছীল্যভাবে কহিল—"তার ভাল থাকার কথা ছেড়ে দিন। কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, কেবল গান বাজনা থিয়েটার দেখায় দিন

কাটালে কত দিন আর মানুষের শরীর বয় বলুন। নিত্যি অসুখ, নিত্য অসুখ—কোথায় পশ্চিম টশ্চিম বেড়াতে যাবে শুন্‌চি।"

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বলিতে গেলেন—"এই সময়ে ভাল করে চিকিৎসা করাও" কিন্তু মুখের কথাটা তখনই সামলাইয়া লইলেন। এ উপদেশ দিবার অধিকার তাঁহার আছে কি না জানা ত নাই, তাই সাবধানে কহিলেন—"একবার ত পশ্চিম গিয়ে খুবই দেহ খারাপ হয়েছিল শুন্‌তে পাই। তুমি বাবা মনে করে যদি মধ্যে মধ্যে খবর দাও? কি করেই যে দিন কাটে!"

মুরারিকে পাইয়া রাজলক্ষ্মীর মনে হইয়াছিল যেন সে তাঁহাদের কতদিনের পরমাত্মীয়। পরকে আপন করিয়া লইবার যে অমোঘ শক্তি তাহা সকলের থাকে না, মুরারির ঐ গুণটিই ছিল। আর সেই জন্যই বুদ্ধিমতী হইয়া তারাসুন্দরী তাহার চাতুরীতে অত সহজে ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু উমার মাতার নিকট মুরারি নিজের ছদ্মবেশ ধারণ করে নাই। সে তাঁহার অনুরোধ রাখিতে অকৃত্রিম ইচ্ছায় সম্মত হইল।

দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া অন্নপূর্ণা তাঁহাদেব কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। একখানি খামে মোড়া চিঠি মায়ের হাতে দিয়া কহিল—"মুরাবি বাবু যদি দয়া করে উমার হাতে চিঠিখানা নিজে দেন ত বড় ভাল হয়।"—ডাকে চিঠি দিলে সে চিঠি যে সব উমার হাতে পৌঁছায় না অন্নপূর্ণা তাহাব প্রমাণ যথেষ্ট পাইয়াছে, তাই নিষ্প্রয়োজন বোধে সেও আজকাল চিঠি লেখা সংক্ষেপ করিয়াছে এবং লিখিলেও লিখিবার বিষয় কিছুই রাখিত না।

উমাকে খুসী করিবার এত বড় একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ মুবারি খুসী হইয়াই তুলিয়া লইল। তারপর একটু স্বব নামাইয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—"জ্যেঠামশাই লেখাপড়ায় বড চটা কি না, বলেন—'ঐ করেই মেয়েগুলো বিবি হয়ে যাচ্ছে'; তাই বোধ করি বৌ-ঠাকরুণ চিঠিপত্র দিতে টিতে পারেন না! তবে আমি এখন আসি মা, আবার নৌকায় পার হযে ট্রেণ ধর্‌তে হবে কি না?"

নৌকায় এই রাত্রে গঙ্গাপার—সর্ব্বনাশ। রাজলক্ষ্মী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা রাত্রিটা কাটাইযা ভোরের গাড়ীতে মুরাবিকে ফিরিয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে লইল। বিশ্বনাথ শুনিয়া খুসী হইয়া কহিলেন—"সেই ভাল।"

এমন সময় খিড়কীর পথে ভজহরির সহিত তারাসুন্দরীদের আসিতে দেখিয়া মুরারি অজ্ঞতার ভান করিয়া যেন স্বগতঃ ভাবে কহিল—নবীনবাবুর স্ত্রী আর মেয়ে না?"

বিশ্বনাথ কহিলেন—"হাঁ।"

কথাটার এই ভাবে উপসংহার হইয়া যায় মুরারির ইচ্ছা নয়। সে স্বর নামাইয়া, অন্তভাবে কহিল—"মেয়েটির বিয়ে কোথায় হল? খাসা মেয়ে। সতী ত ওঁকে বিয়ে করবার জন্যে পাগলই হয়েছিল একরকম! মেয়ের বাপ 'বেহ্ম' শুনে কর্ত্তাবাবুর মত হল না। তারপর খবরের কাগজে হঠাৎ ভুল খবর বেরুল, কোথাকার কোন ম্যাজেষ্টারের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়ে গেছে। সতী ত সেই খবর শুনে, রাগ করে কারু মত না নিয়ে এখানে বিয়ে করে বস্‌ল। তা—আমাদের কুলীনের ঘরে এমন পাঁচগণ্ডা হলেও ত দোষ নেই। বাবুর বাপেরই ত ছিল ষাটটা বিয়ে, বাবুই কেবল একটাও কল্লেন না। এখন ওসব রেওয়াজও আর নেই, কি বলেন দাদামশাই? আপনার কি মত? অনেক বিয়ে করা কি আর ভাল?"

চতুর মুরারি বিশ্বানাথের মুখের পানে চাহিয়াই বুঝিল—তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বিশ্বানাথ অন্যমনস্কভাবে কহিলেন—"না, ভাল নয়। তবে স্থান কাল হিসাবে কোথাও কোথাও ভাল ফলও হতে দেখা যায় বই কি। একেবারেই যে মন্দ এ কথাও বলা যাও না।"

মনে মনে কহিলেন—"ওঃ হরি, তাই এত গলদ! কল্যাণীকে যে ভাল-বাসিয়াছে, অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত হওয়া তাহার পক্ষে কষ্টকর বই কি! কিন্তু ভালবাসিয়াছিলই বা কেমন করিয়া বলি? যে ভালবাসে সে কি এমন কাণ্ডজ্ঞান-হীন—রাগের বশে হঠাৎ কিছু করিয়া ফেলে?"

শান্তচিত্ত সংযতমনা বিশ্বানাথের নিকট ভালবাসার এমন উগ্ররূপ প্রত্যাখাত প্রেমের প্রতিহিংসা লইবার প্রচণ্ড বিদ্বেষ একেবারেই অজ্ঞাত। তাই ভাবগ্রহণে অক্ষম হইয়া কেবল মাথা চুলকাইয়া নস্য লইয়া বার কত "তারা-তারা" বলিয়া মনকে সে চিন্তা হইতে সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। তারাসুন্দরী ও কল্যাণীর সলজ্জ অপরাধীভাবেরও আজ অর্থবোধ হইয়া গেল। আহা, কেন উহারা দুঃখ পায়? সতীনাথ যদি তাঁহার বাধ্য হইত, তিনি এখনি মুরারির উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য খুসী হইয়াই তাহাকে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু সে সাহস ত হয় না—তা ছাড়া, কল্যাণীর শারীরিক অবস্থা যে ভবিষ্যতের জন্য সকল আশারই মূলোচ্ছেদ করিয়া রাখিয়াছে।

১৭

মুরারির ক্রোধ

সেদিন হুগলী হইতে ফিরিয়া মুরারি প্রথমেই উমার সন্ধানে গেল। আজ আর সে ভিক্ষুকের দীনতা লইয়া আসে নাই। অন্নপূর্ণার চিঠিখানিকেই সে তাহার

যুদ্ধজয়ের নিশানের মত উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া, প্রসন্নমুখে উপরে উঠিতেই দেখিল, দালানে বঁটি পাতিয়া বসিয়া উমা জ্যেঠামহাশয়ের জন্য ফল কাটিয়া রেকাবী সাজাইতেছে। মুরারিকে হাসিমুখে "বৌঠান" বলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সে একটুখানি বিস্মিত, কিছু বিপন্নভাবে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া আবার নতমুখে কাজে মন দিল। মুরারি হাসি হাসি মুখে কহিল—"কাল হুগলী গেছ্‌লাম—অনাথ দাদার বৌভাতের নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে, খুব লুচি সন্দেশ খেয়ে এলাম।"

এ কথার পর উমার আর অনাগ্রহ ঔদাসীন্য টেঁকিল না। সে উৎসুক আনন্দে ব্যাকুলতা-ভরা দুই চোখ মুহূর্ত্তমাত্র মুরারির পানে তুলিতেই যখন দেখিল সেও হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাহারই পানে চাহিয়া আছে, তখন আপনা হইতেই উমার চোখের পাতা নামিয়া পড়িল। মনের ব্যাকুল প্রশ্নগুলি কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেলাঠেলি লাগাইয়া দিলেও মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। কিন্তু সেই কালো চোখের বিদ্যুদ্বর্ষী আলোকে মুরারি তাহার প্রশ্ন বুঝিল। অভিমানের সুরে কহিল—"জিজ্ঞাসা না কল্লে আমিও কিছু বল্‌ব না ত! কেন বল্‌ব? যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। আমি তোমার বাপের বাড়ী গেলাম, তুমি আমার সঙ্গে কথা-ই কবে না, বেশ।"

উমা নতমুখে একটুখানি সলজ্জ প্রসন্ন হাসি হাসিল; মুরারির দৃষ্টিভয়ে এবার আর সে চোখ তুলিয়া চাহিল না। মুরারি বুঝিল এখানে অভিমান বৃথা, উমা নিজ হইতে কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না। অগত্যা সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াই কহিল—"বৌটি দিব্বি হয়েচে—ছোট্ট মেয়েটি! দাদামশাই, মাঠাক্‌রুণ, দিদি ঠাক্‌রুণ সকলেই যত্ন টত্ন কল্লেন। নিমন্ত্রণে দক্ষিণাও কিছু আদায় করিয়া আনা গেল"—বলিয়া সে কোটের বুক পকেটে খামে মোড়া যে চিঠিখানি অর্দ্ধাঙ্গ বাহির করিয়া দর্শককে সগর্ব্বে আহ্বান করিতেছিল, সেইখানি বাহির করিয়া উমার চোখের উপর ধরিল।

খামের উপরে দিদির হাতের চিরপরিচিত সুছাঁদের অক্ষরাবলীতে "সাবিত্রী সমতুল্যাসু" উমার নাম লেখা। উমা স্মিতমুখে ভিজা হাতখানি কাপড়ে মুছিয়া হাত পাতিতেই মুরারি চিঠিখানি তাহার হাতে দিয়া কহিল—"সেদিন দাদামশাই যেরকম শুক্‌ন মুখ করে ফিরে গেলেন, তা দেখে অতি বড় পাষাণ যে সেও জল হয়ে যায়। মানুষ যে হয়, সে কখনও অগ্রাহ্য কর্‌তে পারে না। জ্যেঠামহাশয়ের কথা ধরি না, তাঁর সোত্তর পেরিয়ে বাহাত্তুরে ধরেচে। সতীদার ব্যাভারে আমার ওঁদের কাছে মুখ দেখাতে যেন লজ্জায় মাথাকাটা যাচ্ছিল। বুড় বামুন এই টুকুতেই

এত খুসী—এ টুকুও কি আব দেওয়া যায় না ? ভাগ্যে ভগবান্ আমায় বড়মানুষ কবেন নি ! তা হলে হয় ত অম্‌নি মেজাজ হয়ে যেত। গবীব আত্মীয়কে আত্মীয় বলে স্বীকাব কর্ত্তে অপমান হত। ঘবেব ভেতব যাই থাক্, যেমন ব্যাভাবই করুক, বাইবে তা বলে কেলেঙ্কাবী কবা—ছিঃ।”

স্বামীব বিরুদ্ধ-আলোচনায় ও তাহাব নিজেবই দুর্ভাগ্যেব স্পষ্ট ইঙ্গিতে উমা লজ্জিত ও বিবক্ত হইল। যে ভিখাবী তাহাকে যদি দিনবাত স্মবণ কবাইয়া দিতে থাক—“ওগো তুমি ভিখাবী, তুমি ভিখাবী” তবে সেও বিবক্ত হইয়া বলিয়া বসিবে—“বেশ, আমি আছি—আমিই আছি, তোমাব সে জন্য এত মাথা ব্যথা কেন ?” দেববসম্পর্কীয় হইলেও মুবাবি তাহাব চেয়ে অনেক বড। বিশেষতঃ জ্যেঠামহাশয়েব অনভিপ্রেত বুঝিয়া সে তাহাব সহিত কথাবার্ত্তাও কহে না বহিলে সে আজ নিশ্চয় কলহ কবিত। বলিত—“ওগো তোমাদের ভয় নাই, আমাব অবস্থাব কথা আমাব বেশ স্মবণ আছে, নিত্য নিত্য আব স্মবণ কবাইবাব প্রয়োজন নাই।”—চিঠিখানি সে এক পাশে বাখিয়া দিয়া পুনবায় আবদ্ধ কার্য্য শেষ কবিতে মন দিল দেখিয়া মুবাবি বিস্মিত হইল, কৌতূহলও কি উহাকে জাগাইতে পাবে না। সে দাঁড়াইয়া তাহাবই অনুদ্বিগ্ন শান্ত মুখেব পানে চাহিয়া অসহিষ্ণুচিত্তে ভাবিতেছিল—এই যে কার্য্যকুশলা নাবী, ইহাব মনেব ভিতবটাও কি এমনি ভাষাহীন মৌন নির্ব্বাক। সত্যই কি এ নদীতে জোযাব ভাঁটা নাই, উচ্ছ্বাসতবঙ্গহীন স্থিব জল। কেবল তাহাবই মনে ঝড উঠিয়াছে বলিয়া নদীব জলে কম্পন অনুভব কবিয়া সেই বৃথা ভীত হইয়াছে। নতুবা সতীনাথেব বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া কিছুই বলিল না বা কবিল না,—বাগও কি হয় না,—আশ্চর্য্য ! সতীনাথ যে উমাব মনে আসন পাতিতে পাবে নাই, এই তথ্যটুকু জ্ঞাত হইতে পাবিলেই সে সুখী হইয়া এখনি চলিয়া যায়, কিন্তু সে কথা ত আব মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা কবা যায় না।

মুবাবি শেষে বলিয়া ফেলিল—“বৌদি, যদি দোষ না ভেবে আমায় বন্ধু বলে মনে কব, এটা ঠিক জেন, তোমাব পায়ে আমি কাঁটাটিও ফুটতে দেব না।”

সহসা উমাব চিন্তাকুল মুখেব প্রতি দৃষ্টি পডিতেই মুবাবি স্তম্ভিত হইয়া গেল। কতটুকু কি বলিয়াছে ভাল স্মবণ না হওয়ায়, রুদ্রকান্ত ও সতীনাথেব বিরুদ্ধে আত্মপক্ষসমর্থনেব জন্য অসংলগ্ন অস্পষ্টভাবে যাহা বলিল—তাহাব কোন অর্থই বোঝা গেল না।

উমার কাজ শেষ হইযাছিল, সে একধাবে বঁটিখানি কাৎ কবিয়া রাখিয়া ফলেব বেকাবী উঠাইয়া লইয়া নীববে চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল—‘ঠাকুরপো এমন

লোক, তবু জ্যেঠামশায় ওঁকে দোষ দেন। পরের কষ্ট দেখ্‌তে পারেন না বলেই না ওঁর জ্বালা !'

মুরারির সমবেদনা-ব্যঞ্জক মুখের পানে চাহিয়া মনে হইল—সেদিনকার সেই মোহাবস্থা স্মরণ করিয়া ঠাকুরপো বুঝি সান্ত্বনা দিতে চাহিতেছেন—ছিঃ ছিঃ ! ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতিতে নিজেকে সে সকলের কাছে কতখানি দয়ার্হ করিয়াই তুলিয়াছে। তিনিও বুঝি তাই আজ কাল যখন তখন বাড়ীর ভিতর আসেন, দয়া করিয়া কথাও কহেন। দয়ালু তিনি কিন্তু সেও ত ভিক্ষা চাহে নাই।

বৈকালে সতীনাথ বেড়াইতে যাইবার জন্য মনে মনে সবেমাত্র উঠি উঠি করিতেছে, এমন সময় ব্যস্তভাবে মুরারিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার পানে স্থির করিল। কাছে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া মুরারি কহিল— "কাল হুগলী গেছ্‌লাম।"

কথার ভাবে মনে হইল বক্তব্য শুধু এইটুকুই নয়, বলিবার বিষয় আরও অনেক আছে ; কিন্তু সে আর কিছুই বলিল না দেখিয়া কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া সতীনাথ কহিল—"যাবার উদ্দেশ্য, প্রকৃতিব সৌন্দয্যদর্শন, না পল্লীগ্রামের বায়ুভক্ষণ, অথবা"—

মুরারি হাসিমুখে বাধা দিয়া বলিল—"অথবা ও সবের কিছুই নয়। কি কবি বল, তোমাদের মত চোখের চামড়াটা ত একেবাবে ত্যাগ কর্‌তে পারিনি। বুড়ো মানুষ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন, তাই ভাব্‌লাম আমিই না হয তাঁদের খুসী করে আসি। আমার ত আব মান নেই যে খোয়া যাবে, ধনও তথৈবচ ; তবে আর গরীববাড়ী পাত পাড়্‌তে লজ্জা কিসের ? তা. খুব যত্ন খাতির পাওয়া গেল।"

সতীনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল—"জ্যেঠামহাশয়েব অনুমতি নিয়ে গেছ্‌লে না কি ?"

তাহার উপহাসের প্রচ্ছন্ন অর্থটুকু গায়ে না মাখিয়া সপ্রতিভভাবে মুরারি কহিল—"সব কাজই ত আর তাঁর হুকুম নিয়ে করে থাকি না, মনে কল্লাম এটাও না হয় তেমনি বিনা হুকুমে করে ফেলি। তা খাওয়া দাওয়া মন্দ হয় নি। ওঁদেরও যে দেখ্‌লাম সেখানে"—বলিয়া সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সতীনাথের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইল।

মুখ দেখিয়া মানুষের মন বুঝিবার শক্তি সম্বন্ধে নিজের প্রতি মুরারির যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল, আজ তাহার ভিত্তি টলিয়া গেল। সতীনাথের উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ-বর্জ্জিত মুখে এতটুকু ভাবান্তরও লক্ষিত হইল না। মুরারি একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বিষয়টা স্পষ্ট করিয়াই প্রকাশ করিল—"বৌদির দাদামশাই তাঁর গুরু কি না—

মেয়ে না কি বিয়ে কর্‌তে রাজি নয়, তাই বিয়ে দিতে পারেন নি। এইগুলো দেখ্‌লে ভগবানের উপর মন চটে যায়। এতই যদি তাঁর দয়া, তবে মানুষকে দিয়ে ভুল চুক গুলো করান কেন? ঐ জন্যেই ত ঠাকুর ফাকুব, নেহাৎ দায়ে না পড়্‌লে মানি না, মান্‌তে ইচ্ছেও আর করে না। আহা, মেয়েটির কি দুববস্থাই না হল বল দেখি?"

মুবারির উদ্দেশ্য অনেকখানি যে সিদ্ধ না হইয়াছিল এমনও নয়। সতীনাথের অনুতপ্ত চিত্তে একটা আঘাত লাগিল—কল্যাণী অবিবাহিতা? এই জীবনই তবে সে বহন করিবে? তাহার জীবনটাকে এমন করিয়া পায়ে মাড়াইয়া যে ভাঙ্গিয়া দিল, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি নাই? তবু আজ সে বেদনার স্বর বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল, অনুতপ্তের লজ্জা ও নিপীড়িতার প্রতি করুণারই সে স্বর। দুর্ল্লভ-প্রার্থিতের আকাঙ্ক্ষা তাহাতে ছিল না। হায় কল্যাণি! যে তোমার চিন্তাকেও আজ মনে স্থান দিতে নিজেকে অপরাধী মনে কবিতে চায, তাহারই ধ্যানে তুমি জীবন উৎসর্গ করিতে বসিয়াছ!

সতীনাথের মনেব ভিতব দিযা যে চিন্তার স্রোত বহিয়া গেল, বাহিরে মুখে চোখে তাহার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তাহাব অনুদ্বিগ্ন মুখের পানে চাহিয়া মুবাবিব মনে সন্দেহ হইল—কথাটার অর্থবোধ হয নাই না কি? সে সন্দেহকে নিশ্চয করিবাব জন্য কহিল—"বুঝ্‌তে পাল্লে না, নবীনবাবুর মেয়ের কথা বল্‌ছিলাম।"

সতীনাথ ইতঃপূর্ব্বেই বেড়াইতে যাইবাব জন্য কোটের বোতাম আঁটিয়া ঘড়ি খুলিযা দেখিতেছিল। মৃদু হাসিযা মুবারির পানে কটাক্ষে চাহিয়া কহিল—"এতটা ভীমরতি ঘট্‌বার কারণ ত কিছু হয় নি, বুঝ্‌তে পাচ্চি বই কি।"

তাহার হাসি চাহনিতে মুরারি রাগিযাছিল; বিবক্ত কণ্ঠে কহিল—"ও রকম হাসি চাহনিতে ঐ বেচারীরাই সব মরে—এ সব পাথরে ওতে আঁচড়ও লাগে না—বৃথা অপব্যয়! তাই ভাবি, ভগবান্ একচোখোমী করে চেহারা দিলে কি হবে, মনটা যে দিয়েচেন নেহাত—ধ্যাৎ!"

সতীনাথ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল—"সেই বিয়ের পরদিন তাঁহাকে সেখানে দেখেছিলুম, কিন্তু তখন তাঁকে দেখ্‌বার অধিকারও আমার হাত ছাড়া হয়ে গেছ্‌ল মুরারি! চেহারার এক চোখোমীর জন্যে যাঁকে নিন্দে কচ্চ, তাঁকে ধন্যবাদ দাও যে এমন ভাগ্য তিনি আর কারুকে দেন্‌নি"—বলিয়া মুরারির উত্তবের অপেক্ষা না রাখিয়াই, শিস দিতে দিতে ছড়ি ঘুরাইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মুরারি সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল—'কাপুরুষ! অর্থলোভে, জ্যেঠামহাশয়ের বিরক্তির ভয়ে—একটা জীবনের জন্মের মত ক্ষতি করিয়া দিলি! মনে যাহাকে স্ত্রী বলিয়া লইয়াছিস্ সেও সেই সম্বন্ধ এখন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া পথ চাহিয়া বসিয়া আছে—বাহিরে তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবার সৎসাহস নাই। অর্থই পরমার্থ হইল? প্রেমের মূল্য নাই? তবু এই হৃদয়হীন—নারীরও অধম—পুরুষ আখ্যাধারী জীবই জগতের প্রার্থিততম রত্নদেরও প্রার্থিত। হায় সংসার, তুমি শুধু বাহিরের শাদা খোলস খানাই বুঝিয়াছ? অন্তরের পরিচয় চাও না? তোমার কাছে মাখাল শিমুলেরই মান্য!'

সতীনাথ যে উমার প্রতি আর উদাসীন নয়, এ চিন্তাটা কিছুদিন হইতেই মুরারিকে গোপনে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছিল। সতী যে আবার কখনও তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতি মনোযোগী হইবে, দীর্ঘ দিনের অনভ্যাসে সে যেন এ কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। সতীর অতীত ব্যবহার যে অনুচিত অকর্ত্তব্য এবং অস্বাভাবিক, এ কথা এখন আর তাহার মনেই পড়ে না। স্ত্রীকে স্নেহ মমতা করা যে সতীনাথের অবশ্যকর্ত্তব্য, এ কথা মনে না হইয়া নিষ্ঠুর বেদনার মত তাহার অন্যায় দাবী মুরারির বুকে যেন ব্যথা দিতেছিল। সত্যই সতীনাথ তাহার স্ত্রীকে ভালবাসিয়াছে কি না, তাহাকে চাহিতেছে কি না—এ সকল কথা সে ভাবিল না, ভাবিতে চাহিলও না।

ক্রোধে দুঃখে অভিমানে তাহার যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। উমাকে সে এতদিন যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, আজও তাহার সে অধিকার যে কেহ খর্ব্ব করে নাই বা করিতে পারে না—অভিমানে সে কথা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল। সে ত উমাকে ভালবাসিয়াই তৃপ্ত ছিল, প্রতিদানে কিছুই ত পায় নাই, পাইবার আশাও রাখে নাই। তবে আজ সতী তাহার স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, সে তাহাকে গ্রহণ করিতে চায়, মনে করিয়া সে কেন ব্যথা পায়? সতীনাথকে এতদিন সে নিজ সৌভাগ্যের শনিগ্রহ বলিয়া বিদ্বেষ করিয়া আসিয়াছে; আজ মনে হইল, সে তাহার সর্ব্বস্ব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিয়া, তাহার জীবনের সকল সুখ কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে আঘাতকারীকে সে যেন আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইল। 'জুয়াচোর—প্রতারক' বলিয়া মনে হাজারবার ঘৃণায় গালি দিল। 'ভণ্ড—যদি শেষ রাখিতে না পারিবি, তবে এতদিন ধরিয়া এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি ছিল!'

সতীনাথের মতি-পরিবর্ত্তনের সহিত মুরারির লাভ ক্ষতি যে জড়িত নয়, এ

কথা সে আজ আর মনের কাছেও অস্বীকার করিতে চাহিল না। বরং মনে করিয়া আত্মপ্রসাদই অনুভব করিল। উমা যে কখনও তাহার হইবে, এমন দুরাশা তাহার মনে স্থান না পাইলেও, সে যে সতীনাথেরও নয়, এইটুকুই সে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুভব করিয়াছে; দেবীর আসন দিয়া মনে মনে পূজা করিয়াছে। তবু সে জানিত—মানবের সুখ দুঃখের সহিত অসম্বন্ধ থাকাই, পাষাণ প্রতিমার কর্ম্ম। আজ বুঝিল—পাষাণদেবতা প্রাণময়ী হইয়াছেন—কিন্তু সে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সাধকের সাধনায় সিদ্ধি নয়! বিগ্রহক্রয়কারী মানবের আদেশপালন-মন্ত্রে দেবতা আজ পূজার আসন ছাড়িয়া মর্ত্ত্য-মানবের সঙ্গিনী হইতে মাটীতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর সে মানব—সে দেবতার পূজক সেবক ভক্ত ত নহেই, বরং দেবদ্বেষী! দেবতার এই শোচনীয় পরিণাম কল্পনা করিয়া মুরারি যেন ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

১

নবাগতা

সকালবেলা একখানা ভাড়াটীয়া থার্ড ক্লাস গাড়ীর মাথায় একটা রংচটা টিনের ট্রাঙ্ক, ময়লা কাপড়ে বাঁধা প্রকাণ্ড গাঁট্‌রী এবং গৃহকর্ত্রীর মনোরঞ্জনের উপঢৌকন দড়িবাঁধা কতকগুলি চুপড়ি, ধামা, ধুচুনী ও তাহার মধ্যে বড় বড় কয়েকটা গৃহজাত লাউ কুমড়া ডেঙ্গো ডাঁটা চাপাইয়া ক্ষীরোদমোহিনী তাঁহার ছোট ছেলে শ্রীহরির হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া, বিস্মিত দর্শক হরেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"জিনিষগুলো নামিয়ে ভিতরে নিয়ে আয় বাছা।"

ক্ষীরোদমোহিনী এ বাড়ীতে খুব পরিচিতা না হইলেও, একেবারে অপরিচিতাও নহেন। সতীনাথের বিবাহের পূর্ব্বে প্রায়ই তিনি এখানে আসা যাওয়া করতেন, পরেও দুই একবার আসিয়াছেন। ধনী আত্মীয়—দরিদ্রের ঘন ঘন যাতায়াত-রূপ আত্মীয়তা-রক্ষায় অসন্তুষ্ট হন বুঝিয়া ইদানীং আর আসিতেন না। পুত্র মুরারি মাঝে মাঝে মাকে দেখিতে যাইত,—আজকাল তাহারও সময়াভাব। সে বছরখানেক বাড়ী যাইবার অবকাশ না পাওয়ায়, বিধবার পুত্রমুখ দর্শনের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। অনেকদিন ছেলের অদর্শন—সেটা গৌণ কারণ হইলেও, "রথে বামন দর্শনে পুনর্জ্জন্ম" এড়াইবার আকাঙ্ক্ষাটাই এখন মুখ্য কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই এই দ্বিবিধ আকর্ষণে পড়িয়া বহুকাল পরে তিনি আজ খবর না দিয়াই হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন।

সতীনাথ ক্ষীরোদমোহিনীর আগমন সংবাদ পাইয়া বাড়ীর ভিতর আসিল। প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলে জ্যেঠাইমা অঙ্গুলির অগ্রভাগে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া, সেই অঙ্গুলিগুলি চুম্বন করিলেন এবং ওষ্ঠ ও তালু সংস্পর্শে শব্দ করিয়া কহিলেন—"বেঁচে থাক বাবা, লক্ষেশ্বর হও। আমার মাথার যত চুল তত বছর তোমার পেরমাই হোক।"

সতীনাথ হাসিয়া কহিল—"মাপ করুন, জ্যেঠাইমা, ঐটি ছাড়া। দাঁত পড়ে কোমর ভেঙ্গে বুড় থুড়্‌থুড়ো হয়ে বেঁচে থাক্‌তে চাই না। তার চেয়ে বলুন, এমনি যোয়ান থাকতে থাক্‌তে যেন যেতে পারি।"

ক্ষীরোদমোহিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অভিমানের স্বরে কহিলেন—“তা বল্‌বে বৈ কি বাবা! জেঠী খুড়ীতে না হলে এমন আশীর্ব্বাদ কর্‌বে কে?”

উত্তর না ভাবিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিল, তাই আলোচ্য প্রসঙ্গটা থামাইবার ইচ্ছায় বিষয়ান্তরের অবতারণা করিল। হাসি মুখে কহিল—“কি ভাগ্যি যে জ্যেঠাইমার বড় মনে পড়্‌ল?”

জ্যেঠাইমা সে অনুযোগটাও ফিরাইয়া দিলেন—“মনে ত রাতদিনই তোমরা গাঁথা রয়েছ। জ্যেঠাইমা বলে কখনও ত মনে কর না বাবা,—উদ্দেশও নাও না—বুড়ী রইল কি মোল! বুড়ী অনেক দিন বেঁচে আছে তাই মুরারিও আর খবর নেবার সময় পায় না।”

সতীনাথ হাসিয়া কহিল—“স্নেহ যে নিম্নগামী জ্যেঠাইমা! কুপুত্র হলেই কি কুমাতা হতে হবে? তার পর—আসল কথাটা বলুন দেখি, শুধু যে আমাদের দেখ্‌বার জন্যেই এতদূর ছুটে এসেছেন, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পারি নে? নিশ্চয় কোন মতলব আছে! আচ্ছা সত্যি বলুন, মতলব নেই? এই—কোথাও যাবার টাবার?”

জ্যেঠাইমা অঞ্চলে অভিমানাশ্রু মুছিয়া হাসিয়া কহিলেন,—তোমার কাছে কি আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ কথায় পার্‌বো বাবা? দেখ্‌তেই তোমাদের এসেচি—সেই সঙ্গে ইচ্ছেটাও আছে, যদি বাবা টানেন, তবে একবার রথে বামনরূপ দর্শন করে জন্ম সার্থক করে আস্‌ব।”

“তাই বলুন, বাবার টানে এসেছেন—আমাদের টানে নয়—” বলিয়া সতীনাথ সশব্দে হাসিতে লাগিল। এমনই করিয়া উভয় পক্ষের অভিযোগ আপোষে মিটিয়া গেল।

ক্ষীরোদমোহিনী পুরীধাম যাইবেন শুনিয়া পিসীমাও জেদ ধরিয়া বসিলেন, তিনিও যাইবেন। রুদ্রকান্ত সংক্ষেপে কহিলেন—“বেশ ত।” পূর্ব্বের মত সংসারে অনাস্থা থাকিলে সতীনাথ সংবাদও লইত না। আজ কাল বৈরাগ্যের ভাবটা না কি তাহার কিছু শিথিল হইয়াছে, সে একটুখানি ভীত হইয়া কহিল—“আমি পশ্চিম চল্লুম, তুমি দক্ষিণ চল্লে, বাড়ীর দশা হবে কি? মুরারিও শুন্‌ছি সঙ্গে যাবে”—যেন সে বাড়ী থাকিয়া সকল সাহায্যই করিতেছিল!

পিসীমা সেদিক দিয়া না গিয়া সহজভাবে কহিলেন—“আমি ত আর চিরকালের জন্য যাচ্চি নে, আমি ফির্‌লে তুই তখন যাস্। পশ্চিম গিয়ে যে ছিরিছাঁদ হয়ে আস্‌বে তা ত জানি—না হয় দুদিন পরেই গেলি।”

ইহার পর সতীনাথ বাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলা, জিনিষপত্র কেনা প্রভৃতি

কতকগুলো এমনি অসংলগ্ন কথা গোলমাল করিয়া বলিল, যাহাব একবিন্দুও পিসীমার বোধগম্য হইল না—ইহার প্রয়োজনও কিছু ছিল না। পিসীমাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, যেন বাধ্য হইয়া সতীনাথকে পিসীমার কথায় স্বীকৃত হইতে হইল। কহিল—"বেশ, ঐ কথা রইল। দশ দিনের কড়াবে ফিরে আস ভাল—না আস, এগার দিনেব দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি বেরিয়ে যাব—বলে রাখ্‌লুম। তখন যার ভাগ্যে যা আছে, তাব তাই হবে।"

পিসীমা মুখভার করিয়া ভাইজের উদ্দেশে কহিলেন—"শোন একবার ছেলেব কথা! এই ছেলেমানুষ বৌয়েব ঘাড়ে সংসার—বুড় মানুষের সেবা, ছেলেব ভাব, ছিষ্টির ভাব চাপিযে উনি বেড়াতে যাবেন! জানি আমি, আমার কি কোথাও যাওযাব যো আছে? এসব ভাগ্যে সে সব ঘটে না"—পিসীমার অনুযোগেব ভিতবেও একটুখানি আত্ম-প্রসাদের স্থর গোপনে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল। এ সংসাবে তাঁহাকে এতখানিই প্রযোজন—যে, দুই দিন বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবাবও উপায় নাই।

পিসীমাব মনোভাবটুকু সতীনাথেব চোখ না এড়াইলেও ক্ষীরোদমোহিনীব মুখে বিবক্তিব ছায়া ফটাইয়া তুলিল। পিসীমার এতটা আধিপত্য কেনই বা তাহাব ভাল লাগিবে? বক্ত-সম্বন্ধে কে যে আপন কে যে পব, সে কথা অবজ্ঞাত হইলেও আত্মীয জনে ত ভুলিয়া যাইতে পাবে না! একটু কাষ্ঠহাসি হাসিযা কহিলেন—"কেন, বৌকে ত বেশ চালাক চটপটেই দেখ্‌লুম। এই একটুখানিব মধ্যেই ত খুট্‌খুট্‌ কবে কত কাজ কবে গেল। ঘাড়ে পড়্‌লেই পার্‌বে। পিসী কি চিবদিন থাক্‌বে বাবা? এখন থেকে সংসাব কর্‌তে শিখে নাও। উপব থেকে বুড়ীব ডাক এলে ত আব ফেবাতে পার্‌বে না—কি বল ঠাকুরঝি?" —বলিয়া ননন্দাব মন রাখিবার জন্য একবার সৌজন্যেব সহিত তাঁহার অভিমত চাহিলেন। উপরের ডাকের প্রত্যাশায় পিসীমার কোন ব্যাকুলতা না থাকায় অনাগ্রহভাবে কহিলেন—"তাই বল্‌ ত ভাই, অবুঝ ছেলে দুটো—ঐটুকুই বোঝে না, বৌটি আবাব আবো সেবা—বলে—'আমাব তা হলে কি হবে'!"

জ্যেঠাইমা কি বলিতে যাইতেছিলেন, সতীনাথ কথা বাড়িতে দেওয়ায় নিজের বিপদ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি ও বিষয়েব উপসংহার কবিবার জন্য পিসীমার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত থাকিবার সম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিল—"মনে থাকে যেন, ঐ কথা—দেরী করা হবে না।" পিসীমা হাসিয়া "নারে না" বলিয়া ভাণ্ডাব-ঘরে চলিয়া গেলেন।

উমার সহিত নিজের লজ্জাকর ব্যবহারটা সাধারণের চোখের উপর তুলিয়া

ধরার বিপদ এড়াইবার ইচ্ছাতেও বটে, এবং উপস্থিত ভ্রমণের দায় এড়াইবার জন্যও কতকটা, সতীনাথ এই ঘটনাটিকে খুসী হইয়াই গ্রহণ করিল। মনকে অনেক বারই বুঝাইতেছিল—উমাকে তাহার কোন প্রয়োজন নাই, উমার সান্নিধ্য সে চাহিতেছেও না, চাহিবেও না—তবু বিষয়টা যে মনের ভিতর হইতে সরিতে চায় না। তাড়াইয়া দিলেও আবার ফিরিয়া ফিরিয়া আসে, এইটুকুই না জ্বালা!

মুরারির সৌভাগ্যের শনিগ্রহরূপী এই সতীনাথ সেদিন রুদ্রকান্তের সংসার ও হৃদয়গগনে উদিত হইয়াছিল, সেদিন ক্ষীরোদমোহিনী তাহার আবির্ভাবকে অবশ্যই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। কালে যখন ক্ষতির ব্যথা সহিয়া অভ্যাসে দাঁড়াইল এবং মুরারির সহিত তুলনায় সতীনাথ নিজের শক্তিমত্তা দেখাইয়া মানব-চিত্তজয়ী যশঃ ও বিদ্যার প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান অধিকার করিল, তখন তাহার গুণগ্রাহী চিত্ত অনিচ্ছাতেও তাহাকে প্রশংসা করিতে বিরত হয় নাই। সৌন্দর্য্যের, হাসিমুখের এবং সদালাপীর যে স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহার বলেও তাহাকে একটুখানি প্রীতির চোখে না দেখিয়া পারিলেন না।

একদিনের একটা ঘটনায় ক্ষীরোদমোহিনীর চিত্তে সতীনাথের স্নেহের আসন দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল।

কন্যা বিদ্যুতের বিবাহের জন্য ঘটক ঘটকী লাগাইয়া এক পাঁচহাজারী হাকিম-পাত্র আবিষ্কার করিয়া রুদ্রকান্তের নিকট দায় জানাইলে, রুদ্রকান্ত যে উত্তর দিলেন, তাহা এমনি অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত যে ক্ষীরোদমোহিনীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাঙ্গালের অশ্বরোগ ত্যাগের উপদেশ দিয়া তিনি জানাইয়া দিলেন, হাজার টাকার উপর একটি পয়সাও অধিক দিবার সাধ্য তাহার নাই। তখন প্রলুব্ধ চিত্ত অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, শিষ্ট ঘোড়ার মত রাশ মানিয়া ঘরে ফিরিতে চাহিল না। 'পাশকরা' ছেলের মর্ম্ম তখন পল্লীগ্রামেও অজ্ঞাত নাই, বরং সহরের চেয়েও বেশী 'মানে' ও 'দামে' বিকাইতেছিল। ভীটা বেচিয়া 'পাশকরা জামাই' করিয়া ছেলেদের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতেও লোকে কুণ্ঠিত নয়। পাশকরা ছেলের ভবিষ্যৎ তখন লোকের চক্ষে এমনি আশাপ্রদ ছিল। ধনীর আত্মীয়া ক্ষীরোদমোহিনী পাড়া প্রতিবাসী ঘটক ঘটকীর সম্মুখে জাঁক করিয়া বিনা দ্বিধায় 'পাশকরা' ছেলে খুঁজিয়া দিবার হুকুম দিয়াছেন। ঘটকী 'কিন্তু' করিলে অবহেলায় কহিয়াছেন—"তা হয়ে যাবে ঘটক ঠাকরুণ, ও জন্য আটক থাবে না।" আজ কেমন করিয়া সেই বড়মুখ ছোট করিয়া জানাইবেন—"ভিক্ষা মিলিল না?" বরকর্ত্তার সহিত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া

গিয়াছে, এবং হাল্‌ফ্যাসানে 'পাত্র' নিজে আসিয়া 'পাত্রী' দেখিয়া পছন্দ করিয়াও গিয়াছে—সমস্তই ঠিক। এইবার উদ্যোগ আয়োজনে লাগিয়া যাওয়া মাত্র বাকি—এমন সময় এ কি নির্ঘাত উত্তর?

ক্ষীরোদমোহিনী নিজে গিয়া রুদ্রকান্তের নিকট কাঁদিয়া পড়িলেন! পিসীমাকে দিয়া জানাইলেন—"তিনি না রাখিলে উপায় নাই।" রুদ্রকান্ত 'কথার মানুষ'—তাঁহার কথা কখনও 'নড চড' হয় না। যাহা 'সম্ভব' এবং যাহাতে তিনি 'সক্ষম' তাহা বলিয়াছেন—মেয়ের দায়ে চুরি ডাকাতি করিতে যাইতে পারেন না ত? 'কল্প বৃক্ষ'ও তিনি নহেন যে নাড়া দিলেই অর্থ মিলিবে? আলাদিনের 'আশ্চর্য্য প্রদীপ'ও তিনি কুড়াইয়া পান নাই—এত টাকা পাইবেন তবে কোথায়? মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, যা' দু'ই চারি পয়সা সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছেন, তাহাতে 'পাঁচ হাজারী' জামাই কেনা তাঁহার মত 'সামান্য' জনের সাধ্যের বাহিরে। অসাধ্য সাধনের মত শক্তি তাঁহার বুড়া হাড়ে আর নাই—থাকিলে না হয় একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেন। মুটেগিরি করিয়াও ভ্রাতৃজায়ার সাধ মিটাইবার চেষ্টা করিতেন। সে দিন ও কাল এখন অতীতের গর্ভে!

অগত্যা দুরাশা বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষীরোদমোহিনী দেশে ফিরিবার উপক্রম করিলেন। মুরারি, জননীর এই অকারণ হীনতা স্বীকারে অপমানিত বোধে তাহাকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

এমন সময় পিসীমার মুখে ক্ষীরোদমোহিনীর আগমনের ইতিহাস শুনিয়া রঙ্গভূমে সতীনাথ আসিয়া দর্শন দিল। জ্যেঠাইমার প্রস্তাব সে ন্যায়ানুমোদিত জ্ঞান করিল। উপযাচক হইয়া নিজের বহুমূল্য ঘড়ি চেন আংটী ও হাতে নগদ অর্থাদি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দান করিয়া বসিল। কহিল—"পয়সার জন্যে সব ঠিক করেও মেয়েটার ভাল বিয়ে হবে না—তাও কি কখনও হয়? জ্যেঠামশাই হাজারই দিন, বাকী চার হাজার আমি দোব।" এই চারি হাজার সংগ্রহ করিতে তাহাকেও অবশ্য অল্প হীনতা স্বীকার করিতে হইল না। এত টাকা তাহার হাতে না থাকায়—অগত্যা বন্ধু বান্ধবের কাছে কিছু ঋণও করিতে হইল। ঋণদাতারা মুখ টিপিয়া বক্র হাসি হাসিয়া মনে করিলেন—"ধন-কুবেরের এইবার ধার আরম্ভ হোল—কাপ্তেন হয়ে উঠ্‌ল না কি?"

রুদ্রকান্ত যে সতীনাথকেও অপর্য্যাপ্ত খরচের অধিকার দেন নাই, তাহা ক্ষীরোদমোহিনী শুনিয়াছেন। ঘড়ি চেন আংটী দেওয়ায় অর্থাভাব স্পষ্টই ত প্রমাণ করিতেছিল। একটুখানি কুণ্ঠিত লজ্জার সহিত কহিলেন—"থাক্ না বাবা, তোমার জিনিষ আমি কি পরকে দিতে পারি? তুমি যে দিতে চাইলে—

এই তোমার দেওয়া হয়েচে।" সতীনাথ আশা ক্ষুণ্ণ-মনে কহিল—'আমি কি ছেলে নই জ্যেঠাইমা—তাই আমার কাছে নিতে কুণ্ঠিত হচ্চেন ? বোনের বিয়ের সাহায্য করা—এ ত আমারই কাজ। মা হলে কি নিতেন না ?—পরকে কেন দেব—ভগ্নীপতিকে নিজের জিনিষ দিতে বুঝি হিংসা হয় ?" ইহার পর জ্যেঠাইমা আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না—'পাঁচহাজারী' পাত্রটি হয়ত এখনি হস্তান্তর হইয়া যাইবে।

নির্ব্বাক্ আশীর্ব্বাদের সে ভাষা অশ্রু-কুয়াশাচ্ছন্ন নেত্রের দৃষ্টিতেই পাঠ করিয়া সতীনাথ দানের সার্থকতায় নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিল। মনে করিল—বিলাসিতা সখের খরচ বন্ধ রাখিলেই এ দেনা শোধ হইয়া যাইবে। রূপার ঘড়ি যখন সোনার ঘড়ি অপেক্ষা সময়ের মূল্য বোধে মূল্যহীন নয়, তখন নাই বা রহিল সোনা !

সতীনাথের ব্যবহারে মুরারি—'বাহাদুরী লওয়া', 'নাম বড়াই', 'দেবে না কেন—বুকে বল থাকলে সবাই দাতা হতে পারে—পুরনো গিয়ে নতুন হবে' প্রভৃতি ঈর্ষ্যাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কহিল—"জানে আমারই ত সব, সমুদ্রের জল একঘটি তুলি, না তুলি সমান কথা। মাঝ থেকে নাম কেনা হয়ে যায়—যাক্ না ? হ্যাঁ, স্বীকার করি চালাকীতে সবার সেরা বটে, আমরা ওঁর পায়ের তলায় দাঁড়াতেও পারি না।"

মুরারির মনে ও মুখে যতখানি বিদ্বেষের বিষ উচ্ছ্বসিতই হউক, ক্ষীরোদ-মোহিনীর মনে হইয়াছিল—"এমন মন না হইলে ধন হইবেই বা কেন, ধনেরও ত সার্থকতা থাকা চাই।" পরের ছেলের তুলনায় নিজের ছেলেকে—শুধু বিদ্যা নয়, সকল রকমেই 'খাটো' বলিয়া মনের কাছেও অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়াছিলেন। উচিত জ্ঞান যাঁহার থাকে, নিজের কাছে 'আপন' 'পরের' ভেদ থাকিলেও—ভাল মন্দ বুঝিতে তাঁহারও বাধে না। দুর্য্যোধন-জননী গান্ধারী দেবীও জয়কামী প্রণত পুত্রের প্রার্থনার উত্তরে এই উচিত জ্ঞানের প্রেরণাতেই বুঝি একদিন 'যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

২

একা ঘরে

পিসীমা চলিয়া গেলে সতীনাথের মনে হইল, সে যখন স্বেচ্ছায় সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তখন সেখানকার একটু খবর রাখাও তাহার উচিত। মুরারি নাই, থাকিলে তাহার সংবাদ লইবার প্রয়োজনও হইত না। মনে হইতেই, এক

সময় সে অন্দরে আসিয়া উপরে নীচে উমার সন্ধান করিয়া, অবশেষে তাহাকে রন্ধনগৃহে খুঁজিয়া পাইল। উনানের উপর ঘৃতপূর্ণ গরম কড়ায় সে তখন অত্যন্ত মনোনিবেশের সহিত পান্তুয়া ভাজিতেছিল। হরের মা বাহিরে দোরের কাছে পা মেলিয়া বসিয়া মনোযোগের সহিত তাহার কার্য্য দেখিতে দেখিতে, উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের অক্ষমতার সম্বন্ধে অনেক তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উমার সহানুভূতি উদ্রেকের বৃথা চেষ্টা করিতেছিল।

বাবুকে আসিতে দেখিয়াই ঝি দন্তে বসনা কর্ত্তিত করিয়া, মাথার কাপড় আধ হাত টানিয়া, উঠিয়া সরিয়া গেল। সতীনাথ দরজার কাছে দাঁড়াইলে উমার চোখ তাহার উপর পড়িল। সে, কাজে এতই নিবিষ্টচিত্ত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার আগমন প্রথমে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। স্বামীকে এমন সময় অপ্রত্যাশিত স্থানে আসিতে দেখিয়া তাহার বিস্ময়বোধ হইলেও, মুখে সে কোন প্রশ্ন করিল না। একটখানি মৃদু হাসি হাসিয়া, গরম ঘিয়ের উত্তাপ জুড়াইয়া লইবার জন্য সাবধানে 'নেতি' দিয়া কড়াখানি মাটিতে নামাইল।

সতীনাথ বসিবার জন্য ইতস্ততঃ চাহিয়া কোন উপযুক্ত আসন দেখিতে পাইল না। উমা তাহার মনোভাব বুঝিলেও, না বুঝিবার ভানে সে বিষয়ে সাহায্যও করিল না। অগত্যা তাহাকে দাঁড়াইয়াই থাকিতে হইল। স্বামী হয় ত কিছু প্রয়োজনে আসিয়াছেন মনে করিয়া, সে মুখ তুলিয়াই দেখিল, তিনি তাহার পানেই চাহিয়া আছেন। একটুখানি অস্বস্তি বোধ করিল।—দুইটি হাতই যোড়া, মাথার কাপড়খানি যেটুকু সরিয়া গিয়া ললাট সন্নিহিত সীঁথির প্রান্তটুকু বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সেটুকু ঢাকা দিবারও উপায় নাই জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে একবার তাঁহার পানে চাহিয়া অস্বচ্ছন্দ-চিত্তে পুনরায় সে কাজে মন দিল। তাহার উপস্থিতিতে উমা নিজেকে বিপন্ন অনুভব করিতেছে—এইটুকু বুঝিতে পারিয়া সতীনাথও একটুখানি অপ্রতিভ হইল। কহিল—"পিসীমা নেই—তোমাদের কিছু দরকার টর্কার আছে কি না, তাই জান্তে এলুম। যা দর্কার হবে বলে পাঠিও।"

উমা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিলে সতীনাথের প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল। রান্নাঘরের গরম ও পরিশ্রমের ক্লেশে উমার মুখখানি ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠায়, তাহার সুন্দর বর্ণে স্বাস্থ্যের লালিমা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। স্বেদজড়িত ললাটতলে চূর্ণকুন্তলগুচ্ছ জড়াইয়া আছে। তাহার নির্ম্মল চোখ দুটি শান্ত, অধর-প্রান্তে অনভ্যস্ত-সঙ্গের লজ্জাজনিত অপ্রতিভ ক্ষীণ হাসির রেখাটি পর্য্যন্ত সতীনাথের চোখে আজ যেন বড় মনোহর বলিয়া বোধ হইল। একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া অনেকখানি ব্যস্ততার সহিত কর্ত্তিত রাশিকৃত আনাজ-তরকারির পানে চাহিয়া সে

কহিল—"এই গরমে এখানে কেন এ সব কচ্চ? ষ্টোভটা জ্বেলে কিছু করলেও ত হত। সেটা বুঝি খারাপ হয়ে গ্যাছে?"

উমা কাজে চোখ রাখিয়া সংক্ষেপে কহিল—"না।"

"তবে?"

স্বামী প্রশ্নপূর্ণ-নেত্রে নিশ্চয়ই তাহার পানে চাহিয়া আছেন মনে করিয়া, সে তাঁহার দৃষ্টি হইতে মুক্তি পাইবার আশায় কহিল—"ঠাকুরের জ্বর হয়েচে, রামরূপ মিশিরও আজ কালীঘাটে গেছে—তাই এইখানেই সব হবে।"

সতীনাথ বিস্মিতভাবে কহিল—"সব? মানে—এই যজ্ঞের ব্যাপার?"

উমা একটুখানি অপ্রতিভভাবে মৃদু হাসিল। বাস্তবিকই সে যে একেবারে ভয় পায় নাই, এমন নয়। কাজ জানা থাকিলেও এবং ছোট-খাট কাজ নিত্যই স্বহস্তে কিছু কিছু করিলেও, এই বৃহৎ যজ্ঞশালার ভার বহন করা তাহারও অভ্যাস নাই। তবু সেই যখন আজ বাড়ীর গৃহিণী, এবং রন্ধনকারীরা অনুপস্থিত, তখন এতগুলি লোককে অনাহারে রাখাও কিছু সঙ্গত নয়। তাই সাহস করিয়া কিছু অধিক বেলা থাকিতেই সে আসরে নামিয়াছিল। একেবারে না হউক, চার পাঁচ বারেও রাঁধিয়া কোন মতে কাজ শেষ করিতে হইবে বৈ কি। পারিবে না—এও কি একটা কথা?

নন্দর মা, হরের মা'র দল প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু কোন সহজ উপায় তাহাদের বুদ্ধিতে না আসায় শেষে উমার মতেই মত দিয়াছে। এতগুলা লোক না খাইয়া থাকিবে, ইহাও ত সম্ভব নয়! তাহারা মনে করিল, মা-ঠাক্রুণ গরীবের মেয়ে, রান্না-বান্না অভ্যাস আছে, একরকমে চালিয় নিতে পারবেন এখন। উমার সাহস দেখিয়াও সতীনাথের কিন্তু সাহস হইল না। এখানে প্রতিবাদ করিতে গেলে ফল যে সুবিধার হইবে এমনও মনে হইল না। সে নিঃশব্দে চলিয়া গেলে উমা তাহার অতর্কিত প্রস্থানের মর্ম্ম না বুঝিয়া একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার কাজে মন দিল।

জলখাবার তৈয়ারী হইয়া গেলে, একখানা প্রকাণ্ড কটাহে তেলের উপর 'ছ্যাক্ ব্যাক্' শব্দে কতকগুলি আলু পটল ছাড়িয়া দিয়া সবেমাত্র উমা খুন্তী তুলিয়া সেগুলি নাড়িতে সুরু করিয়াছে—এমন সময় বাহিরের দিক হইতে একটা সোরগোল শুনিতে পাইল। হরের মা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিল—"মা-ঠাক্রুণ, কড়া নামিয়ে চলে য্যাসেন গো, সরকার মশাই নতুন বামুনঠাকুর নিয়ে এসেচে।"

উমা কাজের উৎসাহে তখন মাতিয়া গিয়াছিল। অপ্রসন্নভাবে কহিল—"আচ্ছা, এইটে রেঁধে যাচ্ছি।"

হরের মা বাহিরের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া ত্বরা দিয়া কহিল—"না গো না, ও থাক্। এখুনি বাবু এসে দেখ্তে পেলে আমাদের 'মুখ' কর্‌বে 'খন। বামুন খুঁজে 'আনেনি বলে সরকার মুণ্ডুইকে যার কত ফৈজত কল্লে, তাই তিনি তামুকের হুঁকো ফেলে বামুন খুঁজ্‌তে বেরিয়েছেল। এ কল্‌কাতা সহর, এখানে কড়ি ফেল্লে কি না মেলে ? বামুনের আবার ভাবনা! যত গণ্ডা চাও তত গণ্ডা হাজির হবে।"

উমা চুল্লীর উপরিস্থিত কটাহ নামাইয়া, জলের ঘটি কাৎ করিয়া হাত ধুইয়া ফেলিল। নূতন বামুনঠাকুরের জন্য অধিকার ছাড়িয়া দিয়া সে নীরবে চলিয়া গেল!

দুই দিন পরে স্কুলে যাইবার সময় সুধীর সতীনাথকে জানাইয়া গেল—"বৌদির বোধ হয় জ্বর হয়েছে, একটু খবর নিও।" কতকগুলি বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তৎক্ষণাৎ খবর লইবার সতীনাথের অবকাশ হইল না।

স্নানের পর আহারে বসিয়াই সে বুঝিল, আজ সেখানে যথেষ্টই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্যঞ্জনগুলির স্বাদ গ্রহণ করা একেবারেই তাহার অসম্ভব মনে হইল। দুধে চিনিব অংশ এত বেশী যে, মিষ্টান্নের মধুর রসও বিরক্তি উৎপাদন করে। আবও অনেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কারণ অদৃশ্য পূজারিণীর পূজার অভাবের কথা জানাইয়া দিতেছিল। কেবল পানগুলি নন্দর মার 'হাত দিয়া' আসিলেও পরিচিত স্বাদে প্রস্তুতকারিণীকে স্মরণ করাইয়া দিল।

জ্যেঠামহাশয়েরও আজ মেজাজ ভাল নাই। আহারে অতৃপ্তি ও উমার অনুপস্থিতিই প্রধান কারণ। দুই একটা মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত আংশিক কারণও ছিল। সেদিনকার উমার সেই আকস্মিক মূর্চ্ছা ঘটিবার পর হইতে, রুদ্রকান্ত চেষ্টা করিয়াই অনেক সময় উমার বড় বড় দোষ ত্রুটিগুলিও উপেক্ষা করিয়া চলিতে সুরু করিয়াছেন। আর সেই উপেক্ষা করার দরুণই যে তাহাব সংসারের উপর এতখানি তাচ্ছিল্য বাড়িয়া উঠিয়াছে, এটুকুও তিনি বেশ ভালই বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু 'চোর' যখন ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবেই না, তখন অবুঝকে বুঝাইবার পণ্ডশ্রমে কেনই বা তিনি বকিয়া মরিবেন! তাই সে কাজের বিড়ম্বনার দায় এড়াইবার সংকল্পে যে পরিমাণে মুখে গাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন—সংসারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছিলেন—ভিতরে ভিতরে ততখানিই অস্বচ্ছলতা অনুভব করিতেছিলেন।

আহারান্তে সতীনাথ উমার উদ্দেশে তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। হয় ত সে ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া, পায়ের শব্দ সংযত করিয়া নিঃশব্দেই সে ঘরে

ঢুকিল। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া উমা একা খাটের উপর চুপ করিয়া শুইয়াছিল। খোলা জানালা দিয়া শীতের রৌদ্র ঘরে ঢুকিবার পথে কোন বাধা পায় নাই। সবুজ রং করা পত্রপুষ্পখচিত দেওয়ালে খানিকটা রোদ আসিয়া পড়িয়াছিল।

সতীনাথ সন্তর্পণে নিজ আগমন গোপন করিয়া ঘরে ঢুকিলেও উমার তাহা অজ্ঞাত রহিল না। সে ব্যস্ত ভাবে খাটের উপর উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই, সতীনাথ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল—"থাক্ থাক্ আমি—"

উমার মনে হইল বিবাহের তিন চারি বৎসর পরে স্বামী আজ এই প্রথম তাহার কক্ষে আসিয়াছেন। তিনি যে আরও একদিন—সেও অল্প কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে—একবার এ ঘরে আসিয়াছিলেন, উমার তাহা অজ্ঞাত। কথাটা এই ভাবে মনে পড়িতেই, তাহার মুখ চোখে লজ্জা বিস্ময় ও সঙ্কোচমিশ্রিত এক অভিনব ভাব ফুটিয়া উঠিল।

উমার প্রশ্নজিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে সতীনাথ কহিল—"তোমার না কি জ্বর হয়েচে?"—বলিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া, ঘরের অপর অংশ হইতে একখানি চেয়ার টানিয়া উমার অদূরে উপবেশন করিল। খাটের উপর যথেষ্ট স্থান থাকিলেও সেখানে বসিল না।

উমা ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তবে সুধীরের কাছে অসুখের খবর শুনিয়াই ডাক্তারী করিতে আসিয়াছেন। রক্ষা! মনে মনে সুধীরের উপর রাগও হইল,—শুধু শুধু কেন মানুষকে এমন করিয়া ব্যস্ত করা? ঠাকুরপোর যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে! মুখে অপ্রতিভের মৃদু হাসির সহিত কহিল—"ঠাকুরপো বলেচে বুঝি? ও কিছু নয়—জ্বর হয়নি বোধ হয়, মাথাটা কেবল একটুখানি ধরেচে। আপনিই সেরে যাবে।"

উমার আরক্ত বিশুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া, সে কথার সত্যতা সম্বন্ধে সতীনাথের যথেষ্ট সন্দেহ জন্মিতেছিল। বড় অল্পে সে যে শয্যা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে, ইহা কখনও সম্ভব নয়। হাসিয়া আলাপটাকে সহজ করিয়া লইবার জন্য কহিল— "তা না সেরেই বা কি করবে—রোগের উপর যে যত্ন! রোগ আপনিই পালাতে পথ পায় না।"

উমা কোন উত্তর দিল না।

"দেখি—জ্বর বলেই ত মনে হচ্ছে, মুখখানা ভাল দেখাচ্ছে না ত?"—বলিয়া সতীনাথ তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেই, উমা সঙ্কুচিত-ভাবে নিজের হাতখানি তাড়াতাড়ি সরাইয়া লইয়া কহিল—"না জ্বর নয়, এমন ত মাঝে মাঝে হয়েই থাকে। আপনিই সেরে যায়।"

বর্ষাকালের ঘনঘোর মেঘের ছায়ার মত পুঞ্জীভূত বিরক্তিতে সতীনাথের ললাট ও ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। উত্তেজনায় সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াও দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই নিজের সে অপমানিত ভাবটা সচেষ্টায় দমন করিয়া, পুনরায় আসন গ্রহণ করিল। ধীরভাবে মৃদুস্বরে কহিল—"তোমার বোধ হয় স্মরণ নেই—মেডিকেল কলেজে আমায় ডাক্তার বলে স্বীকাব করে ছাড়পত্র দিয়েছে ?"

স্বামীর কথার বিদ্রূপের হুলটুকু মনে বিঁধিলেও, মুখে সে খুব বেশী বিপন্নভাব প্রকাশ করিল না। মুখ না তুলিয়াই কহিল—"ডাক্তারী ওষুধ আমি কখনও খাইনি।"

"কেন ?"

উমা স্বামীর মুখ দেখিতে পাইল না, পাইলে দেখিত, কিছু পূর্ব্বের বিরক্তির মেঘ কাটিয়া কৌতুকের সরস হাসিতে তাহাব মুখখানি শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশেব মতই দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সতীনাথ বিদ্রূপপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিল—"কবরেজী খাও বুঝি ?"

সতীনাথের ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বেদনানুভব কবিয়া উমা কহিল—"সেখানে দাদামশাই আমায় ওষুধ দিতেন।"

সতীনাথ কহিল—"কিন্তু এখানে ত দাদামশায়ের ওষুধ পাবার উপায় নেই,—আমি যাই হই—ওষুধ দিয়ে শত্রুতা করব না, এটুকু বিশ্বাস আমার উপরেও রাখ্‌তে পার।"

সতীনাথ কথাটা হাসি দিয়া আরম্ভ করিলেও ভাষার প্রচ্ছন্ন অর্থে ভাব আপনিই গম্ভীব হইয়া উঠিল এবং তাহা উমার আহত বক্ষে বাজিয়া তাহার চক্ষে জল ভবাইয়া দিল। কিন্তু ব্যথা সহাই যাহার অভ্যাস, সে ব্যথাবোধ করিলে চলিবে কেন ? উমা মৌন মুখে নত দৃষ্টিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; না আপত্তি খণ্ডন করিল, না স্বীকার-উক্তি জানাইল। কিছুক্ষণ তাহার মৌন মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সতীনাথ অসহিষ্ণুভাবে কহিল—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্য বল্‌বে কি ?"

উমা তেমনি শান্ত অচপল স্বরে কহিল—"বলুন।"

স্ত্রীর ঔদাসীন্যে ক্রমেই সতীনাথ যেন ধৈর্য্য হারাইতেছিল। ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে ভিতরের বিপ্লবসংবাদ বাহিরেও প্রকাশ করিয়া বলিল—"আমি তোমার যে ক্ষতি কবেচি, তার জন্যে—"

উমা এবার যথার্থই বিস্মিত হইল। আর সে ভাবটুকু গোপন করিবার

চেষ্টা না করিয়া, বাধা দিয়া কহিল—"আপনি? আপনি ত আমার কোন ক্ষতি করেন নি।"

সতীনাথ উমার বর্ম্মাচ্ছাদিত মনে আঘাত দিতেও পারিল না, এই নিষ্ফলতা তাহাকে আঘাত করিল। কেন সে উমার ক্ষতি করিতে পারে না, তাহার কি এমন কোন গুণই নাই যাহাতে এই উদাসীন নারীচিত্তকে এতটুকুও আকৃষ্ট করিতে পারে? সে কি এতই তুচ্ছ, এমনি অপদার্থ? হউক তুচ্ছ, অপদার্থ—তবু স্বামী ত বটে!

সতীনাথ কহিল—"করিনি?—তোমায় বিয়ে করে?"—মানসিক উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল।

একটুখানি ম্লান সলজ্জ হাসি উমার সূক্ষ্ম ওষ্ঠপুটে ফুটিতে গিয়াই মিলাইয়া গেল। সে কহিল—"আপনি দয়ালু, তাই দাদামহাশয়ের উপকার করেছেন, না হলে—"

বাকী কথাটুকু সে লজ্জায় শেষ করিতে পারিল না। না পারিলেও সতীনাথের বুঝিবার পক্ষে বাধিল না। উমা যে উপকার-ঋণে আবদ্ধ, কেন যে রাগ করা তাহার দ্বারা সম্ভব নয়, ঐ অল্প কয়টি কথাতেই সে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। কিন্তু উমার ক্রোধের পাত্র না হইবার পক্ষে যে প্রকাণ্ড সার্টিফিকেট এইমাত্র সে পাইল, তাহারই লজ্জায় তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। উমার কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য তাহার মনে যে তীব্র যুক্তিপরম্পরা ভিড় করিয়া আসিতেছিল, তাহাই সংক্ষিপ্ত করিয়া, অনেকখানি শান্তভাবে সে কহিল—"বিয়ে কি কেবল পরের দায় উদ্ধারের জন্যেই লোকে করে থাকে? নিজের কোন স্বার্থ নাও যদি থাকে, স্ত্রীর উপর কোন কর্ত্তব্য থাকে না কি?"

লজ্জা ও বিরক্তিতে উমার মনটা ভরিয়া উঠিয়া মুখখানাও ঈষৎ অপমানের ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া গেল। কর্ম্মকর্ত্তা যখন নিজে অভিজ্ঞ, তখন কার্য্যের ভাল মন্দ তাঁহার জানাই ত আছে—নিপীড়িতাকে স্মরণ করাইয়া লজ্জা দিয়া পুরুষার্থ দেখাইবারই বা প্রয়োজন কি? কথার বিরুদ্ধে কথা বলা বা যুক্তি দিয়া খণ্ডন করিবার চেষ্টা তাহার স্বভাব নয়; সে নিরুপায় নতদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল।

সতীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইচ্ছা করিতেছিল, দুই হাতে তাহার নত মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া, ঐ ঘনপক্ষবেষ্টিত কালো চোখের ভিতর কি অপূর্ব্ব বারতা লুকান আছে, একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বের অপমান ও লজ্জার ব্যথাটা স্মরণ হওয়ায়, সে উমাকে স্পর্শ করিতে সাহস করিল না; পুনরায় আসন গ্রহণ করিল। জোর করিয়া নিজের অধিকার স্থাপন করা

তাহার স্বভাবও নয়। ভালবাসা দিয়া সে জয়ী হইতে জানে, কিন্তু সে ভালবাসাও আবাব প্রবাল অভিমানেব সহিত জড়িত।

উমার অটল গাম্ভীর্য্যের বর্ম্মে ঠেকিয়া তাহাব প্রেমেব অর্ঘ্য যখন ফিবিয়া আসিল সে আব সেই ভূলুণ্ঠিত অর্ঘ্যটাকে মাটী হইতে পুনবায় তুলিয়া দেবতাব পদে নিবেদন করিতে চাহিল না—উৎসৃষ্ট নির্ম্মাল্যেব মতই একপাশে অবহেলায় ফেলিয়া দিল। যে অভিমানী বিশ্বদেবতাব নিকটেও নিজ অন্তরের নিবেদন জানাইতে অনিচ্ছুক, প্রেমেব দেবতাব কাছে সে কি আজ ভিখারীর মত হাত পাতিযা দাঁড়াইবে?

একটুখানি ইতস্ততঃ কবিয়া সতীনাথ কহিল—"তোমায় যদি হুগলী পাঠিয়ে দিই, খুসী হও কি?"

স্বামী কি ভাবে কথাটা বলিতেছেন, উদ্দেশ্য না বুঝিয়া উমা নত নেত্র উন্নত কবিযা প্রথমে তাঁহাব মুখ দেখিয়া লইল, তাঁহার উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহারই মুখেব উত্তব শুনিতে চাহিতেছে দেখিয়া তখনই সে চোখ নামাইয়া লইতে বাধ্য হইল। নিজেব অবস্থা অপেক্ষাকৃত বিপন্ন হইযা পড়িতেছে বুঝিয়া এবং অনুপায় বোধে কহিল—"যদি তাই ইচ্ছা কবেন।"

"না না, আমাব ইচ্ছের কথা এখানে হচ্ছে না। তুমি খুসী হও কি না, সেই কথাই আমি কেবল জান্‌তে চাইচি।"

মেঘমণ্ডিত আকাশে তবল মেঘাববণ অপসৃত হইলে যেমন সূর্য্যালোক পতিত হইয়া মধুব উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকটিত কবে, মুহূর্ত্তমাত্র তেমনি একটা আনন্দের দীপ্তি উমাব মুখে ফুটিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তেই আবাব চিন্তাব মেঘে তাহা ঢাকা পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, রুদ্রকান্ত বলিয়াছেন—'এ বাড়ী হইতে একবার যে বাহিব হইবে, সে আর কখনও প্রবেশ কবিবে না!' তবে হুগলী গেলে ত চিবদিনেব জন্যই এখানে তাহাব প্রবেশ-পথ বন্ধ হইয়া যাইবে? তা যাউক, তাহাতে কি আর এমন ক্ষতি। কিন্তু সে না ঢুকিলেও এ বাড়ীর গৃহিণীব পদ ত শূন্য বহিবে না। আব—সে সংবাদ যখন মায়ের কাছে গিয়া পঁহুছিবে, তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবাব যে কিছুই থাকিবে না। দিদির মুখ চাহিয়াই তাঁহার চোঁখের জল শুকাইতে অবকাশ পায় না, ইহার পর স্বামিপরিত্যক্তা-রূপে সেও কি আবার দুঃখিনী মায়ের বুকে কণ্টকলতার মত বেড়িয়া থাকিবে? দাদামণির চিরপ্রসন্ন মুখ মলিন করিয়া, দিদির ললাঠে বিষাদের ছায়া আঁকিয়া তুলিবে? এখান হইতে যাওয়া হইলে সুধীরেব সহিতও যে চিরবিচ্ছেদ ঘটিবে, সেও ত বড় কম দুঃখ নয়। স্বামীর কথা মনে হইল, কিন্তু এ বিষয়ে মনকে সে

বেশী প্রশ্রয় দিল না। এখানে যে তাঁহাকে দেখিতে পায়, আজকাল তাঁহার কথা শুনিবার অধিকারেও সে বঞ্চিতা নয়, এটুকুও বড় কম পাওয়া নয়; তবু সে কথা উমা মনের কাছে অস্বীকার করিল—মনকে বুঝাইতে চাহিল, ইহাতে তাহার খুব বেশী আসিয়া যাইবে না, এজন্য সে কাতরও নয়।

উমার মনেব ভিতর দিয়া পরস্পর-বিরোধী যে ভাবের তরঙ্গ বহিয়া গেল, বাহিরে মুখে চোখে তাহার একটুখানি উচ্ছ্বাসও দেখা দিল। কিন্তু প্রকাশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে সে উত্তর করিল—"না।"

অপ্রত্যাশিত উত্তরে সতীনাথ কিছু বিস্মিত, কিছু পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"না—খুসী হও না?"

উমা অপ্রতিভভাবে অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছাটা লইয়া অকারণ নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। এ অবস্থায় মুক্তির সংবাদ যে খুসী হইয়াই তাহার গ্রহণ করা উচিত ছিল, স্বামীর বিস্ময়জড়িত কণ্ঠস্বরেই সে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। কিন্তু সাধারণের সহিত তাহার জীবনের যতখানি প্রভেদ, তাহাতে সাধারণের কার্য্যের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলাও যে তাহার পক্ষে সম্ভব নয়!

সতীনাথ কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া পুনরায় কহিল—"কেন খুসী হও না বল্‌বে কি? মেয়েরা ত বাপের বাড়ী যেতে পেলেই সব চেয়ে খুসী হয়?"—বলিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পত্নীর নত মুখের উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিল।

এই অনভিপ্রেত প্রসঙ্গটা এড়াইয়া চলিতে পারিলেই উমা এখন বর্ত্তিয়া যায়, কিন্তু স্বামীর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায়, তিনি যে উত্তর না লইয়া ছাড়িবেন—এমন সম্ভাবনাও বুঝাইল না। মিথ্যা কথা বলিতে তাহার বাধিয়া যায়—কেনই বা সে মিথ্যা বলিবে? নিজের লজ্জা ও মানসিক উচ্ছ্বাস গোপনের জন্য, চোখ নীচু রাখিয়াই সে স্থির স্বরে কহিল—"জ্যেঠামহাশয় বলেছেন এ বাড়ী থেকে গেলে—আর—কখনও আসা হবে না—তাই।"—উমার দৃষ্টি তাহার অঞ্চলস্থ চাবি ও অঙ্গুলির ক্রীড়ায় অত্যন্ত নিবিষ্ট থাকায়, সতীনাথের মুখে যে একটা গভীর উচ্ছ্বাস উঠিয়া পড়িয়াছিল, সে তাহা দেখিতে পাইল না।

"সে ত আরও ভাল হবে—কখনও আস্‌তে হবে না। সে বাড়ীর চেয়ে এ বাড়ী বোধ হয় এমন কিছু পছন্দ কর্‌বার মত নয়—অর্থাৎ বাড়ীর লোকগুলিকে"—বলিতে বলিতে সতীনাথ তাহার কৌতুকপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি উমার নত মুখের উপর স্থাপন করিল।

উমা মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে শান্ত সহিষ্ণু দৃষ্টিতে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—"মা দুঃখ পাবেন তা হলে।"

"ওঃ"—বলিয়া সতীনাথ চেয়ার ছাড়িয়া, তাহার ভৎর্সনার দৃষ্টি এড়াইবার জন্যই যেন, বারকতক ঘরখানার এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

উমা তাহার আসনে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মাথার যন্ত্রণার উপর মনের যন্ত্রণাও তাহাকে ব্যথিত করিতেছিল। এমন করিয়া অপমান করিবার প্রয়োজন ছিল কি? সে কি ইঁহাদের এমনি গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছে যে, বাড়ীতে স্থান দিতেও আর ইচ্ছা করেন না? শুধু নিজের জন্য হইলে, মনের কোন লাভক্ষতির হিসাব না লইয়া এখনি সে ইঁহাকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিয়া চলিয়া যাইতে চাহিত। কিন্তু মার কথা সে যে ভুলিতে পারিতেছিল না। এ আঘাত তাঁহার ব্যথাজীর্ণ অন্তরে সহিবে কি না কে জানে! একবার ইচ্ছা হইল ডাকিয়া বলে—"তাই দাও, আমাকে চিরবিদায় দিয়াই তুমি তোমার সুখের পথ মুক্ত করিয়া লও। এ অসহনীয় জীবন আমারও আর সহ্য হয় না। দৈন্য যদি গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা চরমরূপেই দেখাইয়া দাও; এমন করে ভুলের ছায়ায় আমায় আর ঢাকিয়া রাখিও না।" অনির্দ্দেশের পথে ভাসিয়া চলার চেয়ে, মুক্তির আশায় সত্যের কঠোর রূপকে বরণ করিয়া লইবার জন্যই উমার মনের ভিতর যেন বিপ্লবের ঝড় বহিতেছিল। মুখে কিন্তু সে ভাবের কোন কথাই প্রকাশ হইল না। পিতৃগৃহে তাঁহারা যে জানেন, বড়লোকের ঘরে বড় সুখে—বড় আদরেই তাঁহাদের আদরিণী উমার দিন কাটিতেছে। এ ভুল কেমন করিয়া নিজের হাতে সে ভাঙ্গিয়া দিবে! তাহা সে পারিবে না, ইহাতে তাহার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক্।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। রোদের তেজ কমিয়া বাহিরের বাতাস ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। জানালার নীচে বারান্দায় টবের গাছে দুই একটা কুঁড়ি ফুটিয়া মৃদু সুগন্ধ ছড়াইয়া দিতেছিল। দিগন্তের ললাটে অস্তগামী সূর্য্য উজ্জ্বল মণিখণ্ডের মত আলোর আভায় জ্বলিতেছিল। নীল আকাশে স্থানে স্থানে বরফের পাহাড়ের মত শুভ্র মেঘপুঞ্জ, অস্ত-সূর্য্যের সোনার আলো মাখিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বাহিরের বাতাস স্পর্শে স্বেদসঞ্চিত উত্তপ্ত ললাট অনেকখানি শীতল হইয়া আসিলে, সতীনাথ ফিরিয়া উমার খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"তোমার কপালে ও কিসের দাগ?"

উমা বিস্মিত হইয়া কপালে হাত দিয়া পরীক্ষা করিবে কি না ভাবিতেই, সহসা কি একটা কথা তাহার স্মরণ হইল। মৃদু হাসিয়া মুখ নামাইয়া কহিল—"না, আমি কোন কথাই বেশী ভাবি না। আমার কপালেও কোন দাগ নেই"—বলিয়া সে হাসি অথবা অশ্রু গোপনের জন্য মুখ ফিরাইয়া রহিল।

তাহার সূক্ষ্ম অনুমানের শক্তি দেখিয়া সতীনাথ বিস্মিত হইল, ব্যথিতও হইল। যে সব বোঝে—সে কি কেবল এইটুকুই বোঝে না? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিল—'আমায় ঘৃণা করে, তাই বোঝে না।'

অবশেষে সতীনাথ বলিল—"আমি ওষুধ পাঠিয়ে দেব, ওজোর না করে খেও।"

উমা স্বামীর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় বোধ করিল। ভাষাটা আদেশের, কিন্তু স্বরটুকু অনুনয়ের। সে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে, অত্যন্ত সম্ভ্রমপূর্ণ নেত্রে পত্নীর নত মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া সতীনাথ নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উমা সে দৃষ্টি দেখিতে পাইল না, পাইলে ব্যথিত অথবা লজ্জিত—কি যে হইত বলা যায় না। সতীনাথ চলিয়া গেলে, সে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিল। কি একটা অজ্ঞাত ব্যথায় বুকটা ফুলিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। চোখের জল যেন আর বন্ধ রাখা যায় না।

খানিক পরে নন্দর মা এক শিশি মিকশ্চার একটা মেজার গ্লাস এবং একখানা রেকাবিতে কিছু বেদানা ও আকের টিক্‌লি লইয়া ঘরে ঢুকিল। ঔষধ ও গ্লাস হাতে দিলে, উমা ঔষধ ঢালিয়া অন্যমনস্কভাবে খাইয়া ফেলিল! সে এমনই বিমনা হইয়া গিয়াছিল যে, ঔষধটা তিক্ত কটু বা মিষ্ট তাহা উপলব্ধিও করিতে পারিল না। নন্দর মা ফলের রেকাবিখানা তাহার হাতে দিতে গেলে সে মৃদু হাসিয়া ফেরৎ দিল, কহিল—"কোন দরকার নেই।"—বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে অসহ্য মাথার ও মনের যন্ত্রণাটাকে সহ্য করিবার জন্য পুনরায় শয়ন করিল।

হাঁচি কাশিতে নিত্য ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাহাদের দেহযন্ত্র ঔষধের উপকারিতা গ্রহণের অবস্থাও হারাইয়া বসে, অবহেলিত অশ্রদ্ধেয় উমার তাহাদের ন্যায় দুরবস্থা না ঘটায়, কর্ষিত ক্ষেত্রে প্রথম বৃষ্টিপাতের মত সহজেই আশ্চর্য্য ফল দেখা গেল। একদাগ ঔষধ খাইয়াই সে ঘুমাইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন ঘুম ভাঙ্গিল—তখন সম্পূর্ণরূপেই মাথার যন্ত্রণা সরিয়া দেহ ভারমুক্ত হইয়া গিয়াছে। তীব্র যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া, মনে মনে সে স্বামীর অযাচিত করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করিল।

৩

প্রবাস যাত্রা

পুরী-প্রত্যাগত পিসীমার সহিত সতীনাথের মেয়াদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম যাওয়া স্থগিত রাখিবার আর কোন বিশিষ্ট কারণ উপস্থিত না হওয়ায়, একদিন নারায়ণ ঠাকুর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট একটা বিশেষ নক্ষত্রযুক্ত দিনে, মাহেন্দ্রযোগে,

ললাটে দধির তিলক ও পকেটে সিদ্ধির সহিত জগন্নাথদেবের প্রসাদী ফুল বিল্বপত্রে বর্ম্মাবৃত হইয়া সতীনাথ স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিল। প্রবাস গমনে মনের উৎসাহ ও আগ্রহ না থাকায় মন যে পরিমাণে নিশ্চেষ্ট হইতেছিল, মুখে তাহার তিনগুণ উৎসাহ দেখাইয়া সে নিজের কাছে নিজেকে প্রতারিত করিতে চাহিতেছিল। কেনই বা যাইতে ভাল লাগিবে না? খুব ভাল লাগিতেছে!

যাত্রাকালে পিসীমা ও জ্যেঠামহাশয়কে প্রণাম করিয়া সতীনাথ বিদায় গ্রহণ করিল। মুরারি তাহার মাকে পঁহুছাইয়া দিতে দেশে গিয়াছে। সুধীর ষ্টেশনে সঙ্গে যাইবে। উমার কাছে বিদায় লইবার কোন প্রযোজন ছিল না, তবু মন ও পা একসময় তাহাকে টানিয়া অজ্ঞাতে সোপানের মধ্যপথে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। উপরে উঠিবে কি না বার কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া সতীনাথ নামিয়া আসিল—মনকে সে আর প্রশ্রয় দিবে না।

গাড়ী সশব্দে বাগানের পথ ছাড়াইয়া রাস্তায় পড়িলে, অজ্ঞাতে তাহার উৎসুক দৃষ্টি উপরের সেই প্রার্থিত ঘরখানির বাহিরের জানালায় পতিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। খোলা জানালাগুলির দুই পাশে নেটের পর্দ্দা বাতাসে দুলিতেছে—দেওয়ালের গায়ে ছবিগুলির দৃশ্যও অদৃশ্য নয়। খাটের ডাণ্ডা ও মশারির ঝালর দেখা যাইতেছে। সতীনাথের ক্ষুণ্ণ-দৃষ্টি ফিরিতে গিয়া, একটা রুদ্ধ জানালার কাছে আবদ্ধ হইল। বন্ধ জানালাটার খোলা 'পাখী'র ভিতর দিয়া দুইটি উজ্জ্বল কালো আঁখিতারা তাহার বিদায়-দৃশ্য দেখিতেছিল কি? একটুখানি বেদনা সেই দুইটি কালো চোখের আলোর ভিতরেও ফুটিযাছে কি? না—কখনই না; কেন তা থাকিবে? রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত এ তাহার মনের ভ্রম। আজকাল তাহার এ হইল কি? মনকে সে ফিরাইয়া লইল। উমার সময় এত মূল্যহীন নয়—এতক্ষণ নিশ্চয়ই সে পিসীমার ভাণ্ডারের কাজের সাহায্যে অথবা জ্যেঠামহাশয়ের কোন সেবার কাজে লাগিযা গিয়াছে।

উমা যে তাহার সান্নিধ্যে খুসী না হইয়া নিজেকে বিপন্ন বলিয়া মনে করে, এই ভাবটুকু সতীনাথের মনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রবাসগমনে উমা যে খুসী নয়, সেদিনকার সেই—"এমন সময় ত কেউ যায় না" কথাটিতে প্রকাশ হইয়াছিল। তাই প্রবাস যাত্রায় সতীনাথের উৎসাহ ছিল না। কিন্তু উমার পিত্রালয় গমনের অনিচ্ছার প্রকৃত কারণ শুনিয়া অবধি যেন নিজের মনের কাছে সে আর কোন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। নিজের অবহেলিত নারীত্বের ব্যথা গোপন করিয়াও বালিকা তাহার প্রিয়জনকে ভ্রান্তির সুখে ভুলাইয়া রাখিতে চায়। জ্যেঠামহাশয় বলিয়াছেন, যে বাড়ীর বাহিরে পা দিবে সে আর

প্রবেশ করিবে না। সতীনাথ অনাত্মীয়ভাবে তাহাকে সেই বাহিরেই পাঠাইতে চাহিয়াছিল। কেন সে তাহার উদ্দেশ্য স্বার্থমূলক মনে না করিবে? স্বামীর কাছে এমন কি পাইয়াছে, যাহাতে তাঁহাকে এতটাই নীচ মনে না করিতে পারে? সে ত একথা স্পষ্ট করিয়া মুখের উপরই স্বীকার করিয়াছে। স্বামী ও স্বামি-গৃহ হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্যুতা কন্যা মাতার বা আত্মীয়দের ব্যথার কারণ হইয়াই থাকে, শান্তিদায়িনী হয় না, নিজের মুক্তি-মূল্যেও সে তাহার প্রিয়জনদের মনে ব্যথা দিতে অনিচ্ছুক, নতুবা এখান হইতে বন্ধন কাটাইবার—চিরদিনের জন্য পৃথক হইবার—উমার পক্ষে ত কোন বাধাই ছিল না।

অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা বলিয়া যাহাকে সে অবহেলায় রাখিয়াছে, তাহার বুদ্ধি বিবেচনার কাছে নিজেকে আজ তাহার অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হইল। এতবড় ঐশ্বর্য্য যাহার, তাহারই দ্বারে সে আজ ভিক্ষা করিতে গিয়াও শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিযাছে মনে করিয়া তাহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। উমার আত্মবিসর্জনে মঙ্গল-মন্ত্রের আভাস পাইয়া সতীনাথ মনে মনে তাহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত হইলেও, অনেকখানি ব্যথিতও হইয়াছিল। সে সকলকার জন্যই ভাবে, কেবল তাহার সম্বন্ধে নির্ম্মম বিচারক! এখানে স্নেহের ভাণ্ডারে কুলুপ দিয়া, নিক্তির তৌলে বিচার করিতে চায়!

মন আজ এ যুক্তিতেও ঠিক সায় দিল না। তাই বা কেমন করিয়া বলিবে? সে ত সেবার মূল্যে সকলকার কাছেই আত্মদান করিয়া রাখিয়াছে। মনের দ্বারে নাড়া না দিলেও, বাহিরের সেবাযত্নের কোন ত্রুটি ত তাহার সম্বন্ধেও রাখে নাই। অন্ততঃ তাহার অধিকারে যতটুকু সম্ভব, তদপেক্ষা অনেক বেশীই ত দিয়াছে। তবে সে এমন করিয়া অবুঝের মত তাহাকে না বুঝিতেই চায় কেন? নারী-হৃদয়ের গোপন রহস্যে অনভিজ্ঞ সতীনাথ বুঝিল না যে, অভিমান কেবল এক তরফেই থাকা সম্ভব নয়! প্রেমহীন বন্ধন, বন্ধনের মতই যেন তাহাকে পীড়ন করিয়া তুলিতেছিল। সে দারুণ অভিমানে মনে করিল—"বেশ, তুমি যদি বুঝতে না চাও, আমিও জোর করিয়া তোমায় বুঝাইতে চাহিব না। তোমার শান্তিসুখে আঘাত দিয়া—তোমায় মুখ দেখাইয়া বিরক্ত করিব না। ভালবাসিয়া ভাল না বাস, জোর করিয়া ভালবাসিতে বাধ্য করিব না। তোমা হইতে দূরে থাকা যদিও আমার পক্ষে খুবই কঠিন, তবু সেই দণ্ডই আমি গ্রহণ করিলাম—ইহাতেও কি আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না?"

৪

রোগশয্যায়

"জানালাটা ভাল করে খুলে দাও ত সুধীর, বাইরের তাজা বাতাসে নিঃশ্বেসটা একবার হাল্কা করে নিই। ডাক্তারবাবু, তোমার সায়েন্স এখানে কি বলে বলতে পার? আর ক'দিন বা ক'ঘণ্টা আমার মেয়াদ?"

শীতের গোধূলি—রুদ্রকান্ত রোগশয্যায় শয়ান। সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিরেখা আকাশের প্রান্তে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় মিলাইয়া যাইতেছে। ধরণীর বক্ষে ছায়া ফেলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার সবেমাত্র নামিবার উদ্যোগ করিতেছে। পশ্চিম দিক্-চক্রবালে রোগীর মুখের বিষণ্ণ হাসিটুকুর মতই তখনও খানিকটা ফিকা পাংশু রঙের আলো মেঘের বুকে লুকাইয়া রহিয়াছে, অন্ধকারেও মিলাইয়া যায় নাই।

ডাক্তার কৃষ্ণকিশোরবাবু থার্ম্মোমিটার কেসে ভরিয়া পকেটে রাখিলেন। ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিয়া, তার পর চেয়ারখানি রোগীর খাটের আর একটুখানি কাছে টানিয়া শান্তস্বরে কহিলেন—"তা হলে বড় কষ্ট পাচ্চেন আপনি?"

রোগী এতক্ষণ ডাক্তারের উদ্বেগ-রেখাহীন অবিচলিত মুখের পানে চাহিয়া ছিলেন—বোধ হয় কোন পরিবর্ত্তন আশা করিতেছিলেন। হতাশ হইয়া চোখ নামাইয়া কহিলেন—"কষ্ট? কষ্ট খুবই পাচ্চি বই কি; ডাক্তার হলেও তোমরা বোধ হয় তা অস্বীকার করতে পার না। সুধীর কাঁদচ. বোকা ছেলে? জ্যেঠা কি কারও চিরকাল বেঁচে থাকে? যাও গোপাল, বাইরে খেলা করগে যাও।"

আদেশপ্রাপ্ত বালক সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় মৃদুগতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, রুদ্রকান্ত নিমেষহীন নিষ্প্রভ ম্লাননেত্রে গভীর স্নেহ ভরিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। জীবন-সায়াহ্নে যখন রৌদ্রালোক নিস্তেজ হইয়া অপরাহ্নের ম্লানালোকে অন্ধকারের সূচনা করে, তখন অজ্ঞাত অন্ধকার-পথে চলিতে পা বাড়াইয়া, অপ্রয়োজনীয় তৃণগাছটির শোভাতেও মুগ্ধদৃষ্টি ফিরিয়া ফিরিয়া চায়—এমন সতেজ শ্যামলতা কি আর চোখে পড়িবে? কে জানে বন্ধুর পথে বা পথের শেষে কি আছে।

বালক দৃষ্টি-পথের বাহিরে চলিয়া গেল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারের পানে চাহিয়া রুদ্রকান্ত বলিলেন—"তা হলে পার না? মানুষের জীবন মরণের সময় নির্দ্দেশে তোমাদের শাস্ত্র কোন সাহায্য করে না?"

ডাক্তার কৃষ্ণকিশোর বাবু নাড়ী পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন—"বুকটা একবার পরীক্ষা করা দরকার, কাৎ হতে পারবেন কি? পারবেন না? বাঁ

লাঙ্‌সটা দেখ্‌তে হবে—এই যে, আমার সাহায্য নিন্‌, ঠিক হয়েচে। আচ্ছা গুণে যান, এক-দুই-তিন—বেশ্‌ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবেন, মুখ বন্ধ কর্‌বেন না।”

রোগী ডাক্তারের আদেশ মত জোরে নিঃশ্বাস লইবার বারকয়েক চেষ্টা করিয়া হাপাইয়া উঠিলেন। কুঞ্চিৎ ললাটে পুঞ্জীভূত বিরক্তি আঁকিয়া তাচ্ছীল্যভরে কহিলেন—“থাক্‌ থাক্‌ হয়েচে, ও সবেব আর দরকার নেই। আমার কথার জবাব থাকে দাও, না থাকে—ব্যস্‌।”

ডাক্তার রোগীর বিরক্তি বুঝিয়া যথাকর্ত্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়াই চেয়ারে ঘুরিয়া বসিলেন। গম্ভীর মুখে হাসির রেখা আঁকিয়া কহিলেন—“ক'দিন বাঁচবেন? অ-নে-ক দিন। আপনার মৃত্যুব কোন লক্ষণ-ই ত দেখা যায় না; বেশ আছেন।”

“বেশ আছেন” কথাটা ডাক্তারের না হইয়া অপরের মুখ দিয়া বাহির হইলে, মনে হইত তামাসা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা মনে হইল না।

“বল কি কৃষ্ণবাবু, এমনি করে বেঁচে থাকা—এরে বলে বেশ থাকা? আমায় তোমরা ছুটি দিয়ে যাও—আর আমি পাচ্চি নে”—গভীর হতাশায় রুদ্রকান্তের স্বর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

ডাক্তার এ বাড়ীতে আজ নূতন নহেন, রুদ্রকান্তের উদ্ধত প্রকৃতি তাঁহাব চিরদিনের পবিচিত; কেবল—এতবড় শক্তিশালী তেজস্বী বৃদ্ধের মুখে এমন করুণ অন্তরের ক্রন্দনধ্বনি—এইটুকুই তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কতবড় কাতরতায় যে তেমন স্বর এমন লোকের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, মানবচিত্তের সুখদুঃখে অবিচলিত, কর্ত্তব্যের-যন্ত্র ডাক্তারের অটল অন্তঃকরণেও বুঝি তাহার অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল! যেন অনিচ্ছাতেই তাঁহাকে বলিতে হইল—“উপায় নেই রুদ্রকান্তবাবু, এ রোগে মরণ এত শীঘ্র আসে না। যখন আস্‌বে. হয় ত তার আক্রমণ আকস্মিকই হবে; কিন্তু আপনি যতই তার কামনা করুন,—এখন হার্টের কাজ বেশ ভালই চল্‌চে, ভয়ের কোন কিছু নেই। এ কথা আমি কেন, সকল ডাক্তারকেই স্বীকার কর্‌তে হবে।”

রুদ্রকান্ত দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠের ভিতর দিয়া বাহির হইল—“মরণকে ভয়? কামানের মুখে দাঁড়িয়েও রুদ্রকান্ত মরণকে ভয় করে নি। ডাক্তার—তোমার কাজ হয়ে গেছে, এখন যেতে পার।”

মরণের অচির-আগমনের সংবাদ দানে অক্ষম অপরাধী ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাঁহার হস্তাচ্ছাদিত মুখের পানে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর টেবিলের উপর হইতে টুপী উঠাইয়া লইয়া, বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া গম্ভীর মুখে

ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মৃত্যুও যে, সময় বিশেষে এমন কাম্য হইয়া আসে, এ অভিজ্ঞতা ডাক্তারী-জীবনে তাঁহার হইয়াছে। ইহাতে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। তবু এই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের জীবন-সায়াহ্নের শেষ অঙ্কটার এমন হৃদয়ভেদী পরিণাম দেখিয়া, শুষ্কহৃদয় ডাক্তারের চিত্তও যেন একটুখানি করুণায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যেদিন পীড়ার প্রথম আক্রমণ আসে, সে কি ভয়ানকই হইয়াছিল! সন্ধ্যার পর ঈজি-চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে তাঁহার বুকে ও মাথায় একটা তীব্র যন্ত্রণাবোধের সহিত আকস্মিক চৈতন্যলোপ হইয়া যায়। তিন দিন একই ভাবে কাটিয়া গেল। ডাক্তার বৈদ্যে বাড়ী ভরিয়া গেল; খবর পাইয়া সতীনাথ ফিরিয়া আসিল। দারুণ উদ্বেগে সে কয়টা দিন-রাত্রি যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়াছিল, বাড়ীর লোকদের যেন জ্ঞানই ছিল না। চিকিৎসকদের সমবেত চেষ্টা এবং বিজ্ঞানের নূতন নূতন প্রক্রিয়ার তিন দিনের পর নির্জীব দেহে ধীরে ধীরে জীবনচিহ্ন ফিরিয়া আসিল। তখন অঙ্গসঞ্চালন শক্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেন কোন বিপরীত শক্তির কঠোর আকর্ষণে সহসা সচল রথচক্রের গতি অচল হইয়া গিয়াছে। চিকিৎসকেরা একবাক্যে জানাইলেন—সর্ব্বাঙ্গব্যাপী পক্ষাঘাত। রুদ্রকান্তের মনে হইল—মৃত্যু তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া, শুধু নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় দেখাইয়া, উপহাসে তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া গেল।

৫

সেবাপরায়ণা

ভাষাতীত মানসিক যন্ত্রণায় ব্যাকুলচিত্ত রুদ্রকান্ত যখন অন্তরের অন্তরে বিস্মৃতপ্রায় অন্তর্য্যামীর নিকট মরণ প্রার্থনা কবিতেছিলেন, তখন তাঁহার বিস্মিত দৃষ্টি সহসা দুইটি সমবেদনাতুর কালোচোখের করুণার সলিলে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যা উমার দুই চোখ বহিয়া যে করুণার ধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল, রুদ্রকান্তের দারুণ অন্তর্জ্জ্বালা সেই শীতল সলিলে অবগাহন করিয়া যেন অনেকখানি শান্ত হইয়া গেল। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়াও দেখেন, সেই দুইটি কালো তারা নির্নিমেষ নক্ষত্রের মত তাঁহারই মুখের ভাব পর্য্যবেক্ষণে নিয়ত ব্যাকুলতার সহিত চাহিয়া আছে। দুইখানি সেবানিপুণ শীতল করতল তাঁহারই উষ্ণ মস্তকে দেহে মৃদু স্নেহ-হস্তের মর্দ্দনে যন্ত্রণা নিবারণে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহার সুখের পথে যে হাত লৌহকীলক আঁটিয়া পাথরের দেওয়ালে তুলিয়া দিতেও পরাঙ্মুখ হয়

নাই, আজ সেই হাতখানাকেই মজ্জমান দেখিয়া সে অবলম্বন দিতে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছে।

উমা যখন শান্ত করুণ চোখ দুটি রুদ্রকান্তের মুখের উপব ধরিয়া স্নেহমধুরস্বরে ডাকিল—"জ্যেঠামশাই"—তখন সবিস্ময়ে সে দেখিল, রুদ্রকান্তের শুষ্কনেত্রে জলের ধাবা বহিয়া, স্বচ্ছ মুক্তাবিন্দুর মত মাথার বালিশে ঝরিয়া পড়িতেছে। বালিকা উমা সে অশ্রুজলের অর্থ বুঝিল না, মনে করিল বুঝি যন্ত্রণার সে অশ্রু। পুরুষেব চোখে, বিশেষতঃ 'রুদ্রকান্তহেন' পুরুষের চোখে, জল বড় সহজে বাহির হয় নাই; সকরুণ সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে তাঁহার পানে চাহিতেই রুদ্রকান্ত কহিলেন—

"মা আমার, এ অপরাধী সন্তানকে মাপ কর্‌তে পার্‌বি কি মা? বড অভাগা আমি, চোখ থাক্‌তে তাই চিন্‌তে পাবি নি।"

উমা মাটিতে মাথা ঠেকাইযা প্রণাম কবিযা মিনতিপূর্ণ স্ববে কহিল—"ও কথা বল্‌বেন না জ্যেঠামশাই, আমার পাপ হবে তা'হলে।"

রুদ্রকান্তের শুষ্ক অধরে মৃদু হাসি—তৈলহীন দীপেব মত অনুজ্জ্বল ভাবে জ্বলিযা উঠিল। কহিলেন—"আমি যে তোমাব সৌভাগ্যের শনি—সুখের রাহু—কখনও ত তোমায় সুখী কল্লুম না মা আমার, কেবল দুঃখ দিতেই তোমায ঘরে এনেছিলুম।"

উমা ঈষৎ নত হইযা তাঁহার ললাটে হাত বুলাইযা দিতে দিতে কহিল—"দোষ দেখ্‌লে বক্‌বেন না? আপনি আমায় কাছেই ত রেখেছেন জ্যেঠামশাই!"

উমা কথাটা স্পষ্ট করিযা না বলিলেও তাহার কথার ভিতর যে করুণ-অভিযোগের মৃদু আভাসটুকু বাহিরে প্রকাশ পাইল, তাহার অর্থ রুদ্রকান্ত বুঝিলেন। সতী তাহাকে সাধ্যপক্ষে এ অধিকারটুকুও যে দেয় না, সে তাহাব নিত্য ভ্রমণেই প্রকাশ। এই লাঞ্ছনার বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও উমা তাহার অধিকারের সম্মানলাভে সন্তুষ্টা। কিন্তু রুদ্রকান্ত এ সান্ত্বনায় শান্তি পাইতে পারেন না। সতী যাই করুক, তবু ত সে নির্দ্দয় নয়; উমার সেদিনকার সেই হৃতচেতন মরণাহতবৎ বিবর্ণ মুখ যে ঘুমাইয়াও তিনি স্বপ্নে দেখিযাছেন! রুদ্রকান্তের মনে হইল, এই যে উৎকট ব্যাধি—জীবন্মৃতাবস্থা—এ তাঁহার সেই মহাপাপেরই প্রায়শ্চিত্ত। এত বড় দুর্ভাগ্য দিয়া যে জ্ঞানদাতা তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিলেন, মনে মনে রুদ্রকান্ত তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিপদ দুর্দ্দিন না আসিলে, ভগবানের কথা মনে পড়ে না; রুদ্রকান্তেরও অসহায় অবস্থা আসিয়া তবে সেই অসহায়ের সহায়কে স্মরণ হইল।

শীতের অপরাহ্ণ—রুদ্রকান্ত চুপ করিয়া রোগ শয্যায় পড়িয়া আছেন। উমা তাহার মাথার কাছে বসিয়া চুলের ভিতর স্নেহের অঙ্গুলিগুলি চালনা করিতে করিতে কহিল—"এইবার একটু গরম দুধ নিয়ে আসি? জ্যেঠামশাই, অনেকক্ষণ খাননি ত।"

উমা সেবা করিয়া তৃপ্তি পায়—রুদ্রকান্ত তাহার মুখের প্রসন্নতায় তাহা বুঝিতে পারেন, তাই তাহার ইচ্ছায় বাধা দিতে চাহেন না। নিতান্ত আজ্ঞা-প্রতিপালক সুবোধ শিশুর মত কহিলেন—"দে মা! কত খাব বল্ দেখি, রাতদিনই ত খাচ্চি!"

উমা কথার উত্তর মুখে না দিয়া মৃদু হাসিয়া বাহিরে আসিয়াই দেখিল, সতীনাথ অদূরে দালানের প্রান্তে রেলিঙে ভর দিয়া চুপ করিয়া একা দাঁড়াইয়া আছে। জ্যেঠামহাশয়ের এই কঠিন পীড়ার মৃত্যুযন্ত্রণা সর্ব্বদা চোখে দেখিয়া দেখিয়া সতীনাথের হাসিমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, সময়ে স্নানাহার না থাকায় শরীরও অনেকখানি যেন কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলা অধিকাংশ সময়ই সে রুদ্রকান্তের কাছে আসিয়া বসিয়া থাকে। কখনও তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, কখনও বা পাখা লইয়া বাতাস করে, বেশীর ভাগই বিষণ্ণ মুখে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়েও রোগীর মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখা যে প্রয়োজন, সে কথা মনেই পড়ে না। সে চিরদিন পরের কাছে সেবা পাইয়াছে, কাহাকেও কখন কিছু দিতে হয় নাই—তবু সে ডাক্তার, ঘরের লোকের কাজে না লাগিলেও বাহিরে তাহার কার্য্য-ক্ষেত্রে রোগীর সেবার যথেষ্ট অংশই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এ বিদ্যায় সে অপটুও নয়, বরং বাড়ীর অন্য সকলের অপেক্ষাই অভিজ্ঞ। তবু আত্মীয় এবং একমাত্র সুহৃদের এই জীবন্মৃত অবস্থা ও পলে পলে মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিয়া দেখিয়া দুঃসহ ক্লান্তিতে তাহার দেহ মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এ রোগ হইতে, বিশেষতঃ এই বয়সে, আরোগ্য হইবার যে কোন উপায় নাই, তাহাও সে জানে। এই জ্যেঠামহাশয়ের স্নেহেই সে শৈশবে বাপ মার স্নেহের অভাব ভুলিয়াছিল। আজ সমাজে সে যে মান্য গণ্য, অনেকের সম্মান শ্রদ্ধার পাত্র—সেও ইঁহারও করুণায়। কত রকমে কতবার তাঁহার মনে কত বেদনাই না দিয়াছে—অবাধ্য হইয়াছে, তবু এক দিনের জন্যও তিনি একটা কড়া কথা কখনও বলেন নাই, এতটুকু স্নেহের হ্রাস করেন নাই। সেই চিরস্নেহময় চিরকরুণাময় জ্যেঠামহাশয় আজ মৃত্যুশয্যায় শুইয়া মরণাধিক যন্ত্রণাকাতর—এ কি চোখে দেখা যায়?

এ কয়দিন সর্ব্বদা জ্যেঠামহাশয়ের কাছে কাছে থাকায় সতীনাথ উমার সঙ্গ-

গ্রহণেও বাধ্য হইয়াছিল। উমার ঐকান্তিক সেবাযত্ন দেখিয়া সে বিস্মিত শ্রদ্ধান্বিত হইল, চিন্তিতও হইল। কঠোর পরিশ্রমে রাত্রি জাগরণ-ক্লেশে তাহার ভাসা চোখের তলায় কালীর রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, পুরন্ত গলায় হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে—চোখে মুখে ম্লানিমা। তবু তাহাকে কোন দিন সেবার কাজে ক্লান্ত দেখা যাইত না।

রুদ্রকান্তের রোগের প্রথমাবস্থা কাটিয়া একটা স্থিবতার ভাব আসিলে এক দিন সতীনাথ উমাকে কহিল—"রাত্রে তোমার আব এখানে থাক্‌বার দরকার নেই, আমি আর মুবারি পালা করে থাকৃব। তোমাব শরীর বোধ হয় খুবই খাবাপ হয়েচে?"

উমা মৃদু হাসিয়া আপত্তি তুলিল—"না না, আমি ত বেশ ভালই আছি—আপনাব রাত জাগা অভ্যাস নেই, কেন কষ্ট পাবেন?"

সতীনাথ অভ্যস্ত পরিহাসের সুবে হাসিযা কহিল—"তোমাব বুঝি নিত্য বাত জাগা অভ্যাস আছে, তাই কষ্ট হয় না?"

উমা কথাটার প্রচ্ছন্ন অর্থ বুঝিল কি না—না বুঝিতে দিলেও, সতীনাথেব রহস্যপূর্ণ হাসিতে লজ্জিত হইয়া কথাটা বাড়িতে না দিয়া কহিল—"আচ্ছা আমি ভোরেই আস্‌ব, আপনারাই এ রাতটা থাক্‌বেন তা হলে।"

জ্যেঠামহাশয়ের প্রতি অত্যধিক প্রীতিতে মুরারি আজকাল বাত্রেব সেবাব ভাব একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। অন্য অনেক নেশা এই নূতন নেশাব মাযায ছাড়িতে হওয়াতেও সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে কবে নাই—তবু ত উমার সান্নিধ্য ও সঙ্গ পায়। রোগীর শিয়রে বসিয়া বিনিদ্র উমা অধিকাংশ কালই এই একনিষ্ঠ ভক্তটিব সাহায্য গ্রহণ করে। অনেক সময় বাধ্য হইয়াই এখন তাহাকে মুবাবির সহিত কথা কহিতে হয়। কত বিনিদ্র রজনী সমান উৎকণ্ঠার ভিতব দিয়াই তাহাদেব কাটিয়া যায়। উমার চোখে তন্দ্রা জড়াইয়া আসিলে সে হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া মৃদু অনুযোগের সহিত ঘুমাইতে যাইতে বলে—উমা মৃদু হাসিয়া আবাব তন্দ্রা ছাড়াইয়া লয়, অনুরোধ রাখে না। তবু প্রায় অন্ধকার কক্ষে গভীর রাত্রে মরণাপন্ন রোগী লইয়া একাকিনী মুরারির সান্নিধ্য তাহার মনে অনেক সময় অস্বচ্ছন্দতা জাগাইয়া তুলে। একেই ত সে স্বামিপরিত্যক্তা, আবার কি কোন নিন্দাও কিনিয়া বসিবে? রুদ্রকান্ত সুস্থাবস্থায় মুরারির সহিত উমার ঘনিষ্ঠতা কবা পছন্দ করিতেন না, আজ তাঁহাকে অক্ষম দেখিয়া তাঁহারই সম্মুখে তাঁহারই অনভিপ্রেত কার্য্য করা উমার কাছে অপরাধ বলিয়াই গণ্য হয়। তাই সতীনাথ যখন জেদ করিয়া রাত্রি জাগরণের ভার লইয়া তাহাকে ছুটি দিতে চাহিল, সে খুব

বেশী আপত্তি করিল না। দিনের বেলা অনেকেই কাছে থাকে, বাহিরের লোকেও দেখিতে আসে, উমা সে সময় পাশের ঘরে পর্দ্দার পাশে বসিয়া থাকে।

আজকাল কাজে কর্ম্মেও সে মন দিতে পারে না; রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে সে উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল চিত্তে বাহির হইয়া আসে, রুদ্রকান্তের কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতরের অবস্থা নিঃশঙ্ক বুঝিতে পারিলে আবার নীরবে ফিরিয়া যায়। রাত্রের মধ্যে এমন কতবার সে উঠিয়া আসে তাহার হিসাব নাই।

রুদ্রকান্ত যে একান্ত ভাবে তাহাকেই চাহিতে থাকেন, সেও তাহা বুঝিতে পারে; বুঝিয়া তাহার অন্তরের ক্রন্দন বাহিরেও যেন ঠেলিয়া আসিতে চায়। এতদিনের ভৎর্সনা লাঞ্ছনার কথা সে তাঁহার পীড়ার আরম্ভেই সব ভুলিয়া গিয়াছে। এখন কেবলই মনে হয়, যদি উনি ভাল না হন, যদি না বাঁচেন, তাহার দশা কি হইবে? স্পষ্ট না হউক, অস্পষ্ট ভাবে নিজের এই স্বার্থ চিন্তাটাকেও সে একেবারে মন হইতে লোপ করিয়া দিতে পারে না। নিজেকে তাহার একান্ত ভাবে নিরাশ্রয় বলিয়াই মনে হইতেছিল। রুদ্রকান্তের কোপন-স্বভাব, অকারণ তিরস্কার আজ তাহার কাছে পিতার আশীর্ব্বাদের মত, শিক্ষকের স্নেহোপদেশের মতই মিষ্ট মনে হইতেছিল! সে কেন চিরজীবন তাঁহার ক্রোধের পাত্রী হইয়া থাকিতে পাইল না? প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের সহিত তাহার মনে আশা জাগিত, আজ হয়ত একটু উপকার দেখা যাইবে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামিলে ব্যর্থতার নিঃশ্বাস আপনিই বাহির হইয়া পড়িত।

উমা বাহিরে আসিতেই সতীনাথ রুদ্রকান্তের ঘরে যাইবার জন্য ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইল। দুই-চারি পা না যাইতেই পিছন হইতে শুনিতে পাইল—"শুমুন।"

চলিতে চলিতে বিস্মিত হইয়া সতীনাথ দাঁড়াইয়া পড়িল, কিন্তু পিছন ফিরিয়া চাহিল না। যাহা অসম্ভব তাহা হইবে কেমন করিয়া? উমা নিশ্চয়ই তাহাকে কিছু বলে নাই, তাহারই শুনিবার ভুল; অথবা অপর কেহ তাহার লক্ষ্য। সে আবার গমনোদ্যত হইলে পুনরায় শুনিল—"জ্যেঠামশায়ের কথা বল্‌ছিলুম।"

সতীনাথ এবার দ্বিধা ঘুচাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"আমায় বল্‌চ? আমি মনে করেছিলুম আর কাকে।"

বলিবার ধরণে ও কথার সুরে উমার লজ্জিত হইবার হেতু থাকিলেও সে ভাব সে প্রকাশ করিল না। কোন ভূমিকা না করিয়া পুনরায় কহিল—"জ্যেঠামশায়ের কথা বল্‌ছিলুম।"

সতীনাথ অন্যদিকে চাহিয়া কহিল—"বল?"

স্বামীর মুখের ভাব বুঝিতে তাঁহার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি স্থির করিয়াই উমা

চোখ নামাইয়া লইল। কহিল—"সারাদিন ঘরে থেকে ওঁর ভারি কষ্ট হচ্ছে। চেয়ারে করে ধরে মাঝে মাঝে ওঁকে বাইরে বাগানে নিয়ে যাওয়া যায় না? তাতে বোধ হয় ওঁর মন একটুখানি ভাল থাকৃতেও পারে।"

উত্তরের প্রতীক্ষায় চোখ তুলিয়াই সে লজ্জিত হইল। সতীনাথ গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ চোখে তাহারই পানে চাহিয়া আছে। এমন হৃদয় যাহার, তাহাকেই সে হৃদয়হীন বলিয়া সন্দেহ করিতে চায়! লজ্জিতও হইল—এ কথা তাহারই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। সে না ডাক্তার? স্নেহের দাবিতেও সে যে সবার উপরে।

উমার কথার উত্তরে—"আমি এখনি চেষ্টা করে দেখ্‌চি। কেন তা হবে না? খুব হবে"—বলিয়া সতীনাথ ঘরে ঢুকিয়াই ডাকিল—"জ্যেঠামশাই"—

রুদ্রকান্ত কাতরস্বরে বলিলেন—"সতী, আয়, আমার কাছে এসে বোস্। আমি যে তোকে ছুঁতে পারি নে বাপ আমার"—

সতীনাথ রুদ্রকান্তের পাশে আসিয়া বসিল।

৬

রুদ্রকান্তের নূতন ভাব

ভৃত্যদের দ্বারা বাহিত হইয়া সেদিন বাগানে আসিয়া রুদ্রকান্ত অত্যন্ত খুসী হইলেন। দুইমাসের পর আজ প্রথম তাঁহার মুখে হাসি দেখা গেল। বাহিরের খোলা বাতাসে প্রকৃতির নীলচন্দ্রাতপের তলে শয়ন করিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনিও তবে এই পৃথিবীর মানুষ, এখানকার আলো বাতাস গন্ধ স্পর্শ গ্রহণের অধিকারী, মৃত্যুর পরোয়ানা আসিলেও এখনও তবে তিনি মৃতের সামিল নহেন। অবশদেহ সুখদুঃখের অনুভূতিতে সংজ্ঞাহীন—তাই মন যে পূরা মাত্রায় তাহার ত্রুটি সারিয়া লইতে চায়। ঘরের ভিতর একভাবে শুইয়া শুইয়া মনে হইত, জীবন্তেই বুঝি তাঁহার সমাধি হইয়া গিয়াছে—মরণে ইহার অপেক্ষা যন্ত্রণা আর কত অধিকই বাড়িবে! বাড়েও যদি, তাহারও ত শেষ আছে!

ফুলের গন্ধ চুরি করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস তাঁহার তপ্ত মাথায় উমার কোমল করতলের মতই স্নেহ স্পর্শ জাগাইয়া দিয়া গেল। নীল আকাশের গায় অনেকগুলি নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই উদিত হইয়াছিল, সন্ধ্যা নামিতেই তাহার জ্যোৎস্নাটুকু গাছেপাতায় ঝরণার জলে শষ্পাবৃত কৃত্রিম শৈলে ছড়াইয়া পড়িয়া রজতবন্যা বহাইয়া দিল।

কুসুমপল্লবহীন হিমশীর্ণ লতাগাছটিও আজ রুদ্রকান্তের চোখে অপরূপ রূপে

ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছের ডালে কোন অজানা পাখী ডাকিয়া গেল, তাহার স্বরটুকু কি মিষ্ট। মাথার উপরে দূর আকাশে ঐ যে ঝাঁক বাঁধিয়া পাখীর দল নীল সাগরে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে, উহাদের ছোট ডানাগুলির কি সুন্দর কম্পন—কি সুখের জগতের স্বাধীন প্রাণী ওরা! এত বড় হইয়া—এত উঁচুতে উঠিয়া, এমন করিয়া আবার নামিতে হয় না।

রুদ্রকান্তের বক্ষঃ ভেদ করিয়া একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস বাতাসে মিশাইয়া গেল। মমতাময়ী পৃথিবী, এ প্রস্তরেও তোমার এত করুণা? রুদ্রকান্ত ভাবিতেছিলেন, এখনও চোখ আছে তাই চাহিয়া আছি। কবে কাহার কোন অলঙ্ঘ্য আদেশে ইহার উপর হয়ত কালো পর্দা পড়িয়া যাইবে; তখন জগতের এত রূপ সব নিমেষে ফুরাইবে।

দুইটা সুরবাঁধা বেহালা পাশাপাশি রাখিয়া একটাকে বাজাইলে আর একটারও তার যেমন আপনিই বাজিয়া উঠে, রুদ্রকান্তের মর্ম্মব্যথা আত্মহৃদয়ে অনুভব করিয়াই যেন বেদনাবহ নিঃশ্বাসটা চাপিয়া সতীনাথ ডাকিল—"জ্যেঠামশাই।"

"কি রে সতী—কিছু বল্‌বি রে? আজ মনটা আমার বাতাসের মত হাল্‌কা হয়েই উড়ে বেড়াচ্চে, মুক্তির আনন্দ এতেই এত, যখন সত্যিকার মুক্তির খবর আসবে, সেদিন কি সুখই পাওয়া যাবে—আজ কেবল তাই ভাবচি।"

সতীনাথ তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। চোখে জল ভরিয়া আসায় সে মুখ ফিরাইয়া জামার হাতে গোপনে চোখ মুছিতেছে দেখিয়া রুদ্রকান্ত মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ভাবিতে লাগিলেন—"ভগবান্, এমন বয়সে এমন শাস্তি দিয়াও মায়া কমাইলে না কেন? এ সব বাঁধন ছিঁড়িবার ভয়ে এ দুর্ব্বহ জীবনটাকেও যে বহিতে ইচ্ছা করে। বিশ্বের সহিত সন্ধি করিয়া আবার অবহেলার পাষাণ-ভার বহিতে সাধ যায়। এমন ভালবাসার বাঁধনগুলি কাটাই কি করিয়া! দয়াময়, তোমার অনেক দয়া। এত দয়া করিয়াছিলে বলিয়াই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। এও তোমার অসীম দয়া প্রভু, এমন রূপে দেখা না দিলে মৃত্যুকেও হয়ত তুচ্ছ করিয়া চলিতে চাহিতাম। তোমার কথা, তোমার দানের কথা মনেই পড়িত না। যদি এমন করিয়া আঘাত দিয়াই জানাইয়া দিলে, তবে এ আঘাত স্থায়ী করিয়াই রাখিয়া দিও; যেন তোমার কথা আর ভুলিয়া না যাই"—রুদ্রকান্তের মনের ভিতর চিন্তার স্রোত বহিতেছিল। কিন্তু সে চিন্তা দুঃখের নয়, তাহা পরম সান্ত্বনার।

আকাশে মেঘ জমিয়া জ্যোৎস্নার আলো মলিন করিয়া তুলিল। শিশিরভারে

অবনত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত চামেলির গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাস্তায় কে একজন মিঠা গলায় গাহিতেছিল—

"যেজন ভবের জলে অবহেলে করেন জীবে পার,
ওরে—আজ্‌কে তাঁরে নিচ্ছি পারে হয়ে কর্ণধার!
পারের কড়ি ধরে নেব চরণ দু—খানি—"

স্তব্ধ সন্ধ্যায় মহাভাবের স্তব্ধতা চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পথিকের মিষ্ট গানটি যেন তাহারই সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভাবের আবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। জগতের সমস্ত শব্দ যেন স্তব্ধ হইয়া সেই গানের সুরে মিশিয়া গিয়াছে। সে যেন ঊষর জগতে আজ প্রেমের বন্যা বহাইয়া ভক্তি রসে তাহাকে সরস করিয়া দিয়া গেল।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া রুদ্রকান্ত মনে করিলেন—"পারের কড়ি ত সঞ্চয় করিয়া রাখি নাই, তবে পার হইব কি দিয়া? দয়াময়, এ দীনহীনে যদি এত দয়াই করিয়াছিলে, তবে চরণ দুখানিতে বঞ্চিত করিবে কেন? আমার কোনও গুণে ত আমায় এত ভালবাসিনি প্রভু—তবে আমার দোষ দেখিয়াই বা ত্যাগ করিবে কেন? সোনার তরীর যাত্রীরূপে অহল্যার মত এ পাতকীর ভীষণ ভারও কি এক দিন মোচন করিয়া দিবে না?"

সন্ধ্যাবায়ু সেবনান্তে বাবুর দল গাড়ীর শব্দে চারিদিক সচকিত করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। সাইকেলের সাঙ্কেতিক মৃদু-মধুর ঘণ্টাধ্বনি ও মোটরের গর্ব্বিত সিংহনাদেরও অভাব নাই। পুষ্পিত-শাখা সাদাফুলের গাছগুলি মেঘ-ঢাকা জ্যোৎস্নালোকে মনে হইতেছিল যেন শুক্লবসনা নারীর মত অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাহিরে কোন বালক বা পথিক কর্ত্তৃক তাড়িত রাস্তার ধারে কুকুরটা একবার 'ঘেউ' করিয়া শব্দ করিয়া সরিয়া গেল। হিম লাগিবার ভয়ে সতীনাথ কহিল—"জ্যেঠামশাই, এবার আপনাকে ঘরে নিয়ে যাই।"

রুদ্রকান্ত প্রসন্ন মুখে কহিলেন—"চল্‌, তাই যাওয়া যাক্‌। মা আমার এতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ কচ্চেন—আমারও মনটা তার চেয়ে বড় কম কচ্চে না রে।"

সতীনাথকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রুদ্রকান্ত উদ্বেলিত নিঃশ্বাসটা চাপিয়া ফেলিলেন। মনে করিলেন—সেই দিন, সেই শেষ দিনে—অনুরোধ করিয়া, উমার হাতে সতীর হাত মিলাইয়া দিয়া বলিয়া যাইবেন, এইবার যেন সে উমার মূল্য বুঝিতে পারে। এই সম্ভাবনার চিন্তাটাতেই মন তাঁহার বাহির হইয়া পড়িবার জন্য যেন আরও অধিক ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তবু ডাক্তার—নিষ্ঠুর ডাক্তারের দল ষড়যন্ত্র করিয়া বলিতে চায়, মরণ তাঁহার এখনও সুদূরে। তাহারা

ত বোঝে না যে মরণে তাঁহার কত প্রয়োজন। শুধু অসহ্য রোগযন্ত্রণা নয়, এই যে লক্ষ্মী থাকিতেও লক্ষ্মীছাড়া সংসার তাহার রুক্ষমূর্ত্তি দিবারাত্র প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে, এখানেও যে গৃহলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠামন্ত্রের প্রয়োজন। সে পূজার উদ্‌যোগ ত আর সহজে হইবে না—প্রচণ্ড অপরাধের শাস্তিও যে তেমনি কঠোর। তাঁহার উৎসাহে প্রশ্রয় পাইয়া সতী যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া নিজে জ্বলিয়া অপরকে জ্বালাইতেছে, তাঁহাকেই সে বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া যাইতে হইবে। সেই মহাপ্রস্থানের সন্ধিক্ষণে স্বীকার করাইয়া লইতে হইবে, উমার মত স্ত্রীর যেন সে যোগ্য হইতে পারে।

উমা যে সতীনাথকে অবিবেচক হৃদয়হীন বলিয়া মনে করে, আজকাল এইটুকুই রুদ্রকান্তের কাছে যেন পীড়াদায়ক হইয়া উঠিযাছিল। উমা তাহার স্বামীকে কি মনে করে, অথবা কিছুই মনে করে কি না, এ সম্বন্ধে তাহার দিক হইতে অবশ্য কোন অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। তবু যাহা সম্ভব এবং স্বাভাবিক, তাহাই তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন—দেখিয়া মনে মনে ব্যথিতও হইযাছেন। সতীর দুর্ভাগ্য, তাই কোথাকার কোন 'ধিঙ্গি' মেয়ের শোক বুকে করিয়া, এমন স্ত্রীকে যত্ন করিতে শিখিল না।

রুদ্রকান্ত বুঝিযাছিলেন—সতীনাথ উমাকে ভালবাসে না, যত্ন করে না। তাহাদের সম্বন্ধটা যে কতখানি দূরত্বে দাঁড়াইযাছে, সে খবর তাঁহার কাছে পঁহুছায় নাই। তাই দুঃখিত হইযা ভাবেন—উমারও দুর্ভাগ্য যে এত গুণ লইয়াও এতদিনের ঘনিষ্ঠতাতেও সে তাহার স্বামীর অন্তরে এতটুকু স্থান করিয়া লইতে পারিল না। তা নাই পারুক, সেই দিনে তিনি এ সমস্যারও মীমাংসা করিয়া যাইবেন। তাঁহার আজীবন ভালবাসার মূল্যরূপে তিনি উমার প্রতি তাহাকে স্নেহসম্পন্ন হইবার প্রতিশ্রুতি করাইযা লইবেন। সতী যে কথা স্বীকার করিবে—তাহার অসাধ্য হইলেও যে সে সুসাধ্য করিতে পারিবে—ইহাতে কোন সংশয়ই তাঁহার ছিল না।

সতীনাথ মুরারি ও ভৃত্যবর্গ দ্বারা বাহিত হইযা রুদ্রকান্ত তাঁহার শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। ইলেক্‌ট্রিকের তীব্র আলোর পরিবর্ত্তে টেবিলের উপর বাতির আলোর জ্বালাইয়া রাখিয়া উমা তাঁহারই জন্য ব্যাকুলআগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। আসিবার দরুণ 'নাড়াচাড়ায়' যেটুকু শ্রম হইয়াছিল, তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই রুদ্রকান্ত মনের এতক্ষণের রুদ্ধ উচ্ছ্বাসটা মুক্ত করিয়া দিলেন—"আঃ, বাগানে গিয়ে যেন নূতন জন্ম পাওয়া গেল। পৃথিবীর রং পর্য্যন্ত ভুলে গেছলুম। কড়ি-কাঠের উপরে যে অতবড় নীল কাপড়খানা বিছানো আছে, সে কথা আর মনেই

পড়্‌ত না। রাতদিন তোমাদের 'ফ্যানের' আর তাল পাতার বাতাস খেয়ে খেয়ে, ভগবানের বাতাস যেন আর মনেই ছিল না। ভাগ্যে সতী ডাক্তার হয়েছিল, তাই কেমন চট্ করে বাইরে নে যাবার মতলবটা ওর মাথায় এল!"

জ্যেঠামহাশয়ের প্রশংসায় অত্যধিক লজ্জিত মুখে সতীনাথ ঘরের অপর অংশে উঠিয়া গিয়া পর্দ্দার স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে কি না তাহারই পর্য্যবেক্ষণে রত হইল।

উমা বেদানার রস লইয়া আসিয়া স্মরণ করাইয়া দিল—আহারের সময় উপস্থিত। রোগশয্যায় পড়িয়া পড়িয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি একমাত্র চক্ষুকর্ণকেই আশ্রয় করায়, ঐ দুইটা ইন্দ্রিয়ের শক্তিও যেন অসম্ভব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এখন ঘোলা চোখেও যেন বালকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছে। মনে হয়, এতটুকু ছায়াও তাহার অগোচরে লুকাইতে পারে না। তাই অনেক সময় সতীনাথ যে বিস্মিত হইয়া সেবাপরায়ণা উমার দিকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, সেটুকু রুদ্রকান্তের চোখ এড়াইয়া যায় না। উমার সান্নিধ্য সে ত্যাগ করিয়া চলে বটে, কিন্তু সেটা যে ঘৃণায় নয়, এটুকুও তিনি ভালই বুঝিতে পারেন। ছেলের উদাসীন ভাব, ম্লান মুখ, শরীরে অযত্ন যতই তাঁহার চোখে স্পষ্ট হইয়া ফুটিতে থাকে, ততই যেন বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়া যায়। কে যে কাহাকে এড়াইয়া চলিতেছে এ যেন সমস্যা বলিয়াই মনে হয়। তবে কি উমাই উহাকে চাহে না? জগতে অনেক অসম্ভবের মত এও কি তবে সম্ভব বলিয়া মানিতে হইবে? আশ্চর্য্য কি! চন্দ্রে কলঙ্ক, গোলাপে কণ্টক, সেও ত সেই বিধাতারই সৃষ্টি! তবু আজ উমার দোষ ধরিতে রুদ্রকান্তের মন যেন আর প্রস্তুত নহে।

৭

অন্নপূর্ণা শুনিল

শরৎ প্রভাত। তেজ থাকিলেও সকাল বেলার রৌদ্রটুকু বেশ আরামপ্রদ। পথের ধারে একতারা বাজাইয়া ভিখারী গাহিতেছিল—

"আদরে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন—তুমি দেখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে!"

পূজান্তে বিশ্বনাথ তাঁহার বাহিরের ঘরে তক্তাপোষের উপর চুপ করিয়া একা বসিয়া ছিলেন। বর্ষণক্লান্ত শরতের মেঘের মত তাঁহার মনের মেঘও যেন আজ হাল্‌কা বাতাসে ভাসিয়া চলিয়াছে। রাগরাগিণী সম্বন্ধে গায়কের দায়িত্বজ্ঞান

কিছুমাত্র না থাকিলেও, গানের বিষয়টুকুই তাঁহার ভাবপূর্ণ হৃদয়ে যেন ভক্তির লহরী তুলিতেছিল; কণ্ঠেও তাঁহার মৃদু মৃদু গুঞ্জনধ্বনি অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল—"মন—তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন—"এ অজ্ঞান তিমিরাবৃত নেত্রে জ্ঞানের আলো কবে ফুটিয়ে তুল্‌বি মা?—তুল্‌বি কি কখনও? এ হৃদয়ভরা প্রীতি-নৈবেদ্য কবে প্রীতিময়ী তোর চরণ তলে পঁহুছিবে মা? আদরিণী মা আমাব, কবে তোর চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি দেখাবি? এ আশাহীনের চিত্তে এ দুরাশা কখনও কি পূর্ণ হবে?"

বাড়ীব সামনে রাস্তার পরপারে মুদির দোকান। দোকানী দাঁড়ি পাল্লা ধবিয়া জিনিষ ওজন করিতেছিল, মুখে ক্রেতাদের সহিত দরদস্তুর ও পথচারী পথিকদেব সহিত—"দাদাঠাকুর প্রাতঃপেন্নাম হই গো—কিহে ঘোষালের পো, আর যে দেখ্‌তেই পাইনে, ভাল আছ? —কিগো সৈরুবী মাসী, তিরপুনী চ্ছানে গেছ্‌লে নাকি? জামাইটি পত্যি পেয়েচে?"—ইত্যাদি শিষ্টাচার রক্ষা করিতেছিল। বিদ্যানাথের মনে হইল, এতদিকে মন দিয়াও মুদি তাহার ক্রেতাদের মনস্তুষ্টি করিতেছে, বিক্রেয় দ্রব্যের ওজন ও মূল্যের হিসাবেও ভুল করিতেছে না। তবে সংসারের দাঁড়িপাল্লা ধরিতে তাঁহারই কেবল ভুল হইয়া যায় কেন? আসল লক্ষ্যে মনকে ধবিয়া বাখিতে পারেন না কেন?

মাছের পেতে মাথায় মেছুনীরা হাত দুলাইয়া হন্‌হন্ করিয়া পথ চলিতেছিল। পাছে কথা কহিয়া সময় বৃথা ব্যয়িত হইয়া যায়, তাই গুলপোরা মুখখানা টেপাই আছে। পশারীরা ঝাঁকাভরা লাউ বেগুন কচু কুমড়া প্রভৃতি মাথায় লইয়া ছুটিয়াছে। সেদিন ইমামবাড়ীব হাট, তাই সেই দিকেই তাহাদের দ্রুতগতি, খুচবা ক্রেতা ডাকিয়াও সাড়া পাইতেছে না। বুড়ী 'কুম্মির মা' পুষ্করিণীজাত কলমীদলে ও গৃহজাত কাঁচালঙ্কায় ঝুড়ি ভরিয়া, বাঁকা কোমর যথাসাধ্য সোজা করিয়া পথ চলিতেছে। "শাগ্ চাইগো—কাঁচালঙ্কা" হাঁকিয়া বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করিয়া দুই চারি পয়সা যাহা পাইবে তাহাই তাহার জীবিকা। লোভনীয় দ্রব্যের আকর্ষণে যত না হউক বিক্রেত্রীর প্রতি করুণায় অনেক বাড়ীর গৃহিণীরাই বিনা প্রয়োজনেও তাহার জিনিষ কিনিয়া থাকেন। টিকেউলি 'রোমজানের মা' এত সকালেই ঢেঁকিতে কয়লা কুটিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। নদীতটে কোলাহল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভিখারী ভিক্ষা কুড়াইয়া কুড়াইয়া এইবার বিদ্যানাথের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া গাহিতেছিল—

"গিরি-মনে আমার এই বাসনা
জামাতা সহিতে আনিব দুহিতে
গিরিপুরে কর্‌ব শিব স্থাপনা!
ঘর জামায়ে করে রাখ্‌ব কৃত্তিবাস,
গিরিপুরে কর্‌ব দ্বিতীয় কৈলাস;
আঁখিতারা উমায় কর্‌ব বারমাস
বৎসরান্তে তারে আন্‌তে হবে না।"

সাম্‌নের খোলা দরজা দিয়া ভিতরের নিকান পোছান উঠানটুকু দেখা যাইতেছে। একপাশে খুঁটীর গায়ে রজ্জুবদ্ধ মুঙ্‌লী গাই। ভৃত্য বৃন্দাবন বামজানু মুড়িয়া ও দক্ষিণ জানুর অবলম্বনে মাজ্জিত পিতলের বোকনায় দুধ দুহিতেছিল। পাড়ার কয়েকটি কৌতূহলী নিত্যদর্শক ছেলেমেয়ে বাগিভরা মুড়ির কতকগুলি গালে পুরিয়া, দুগ্ধ দোহনের অদ্ভুত ক্রিয়া বিস্ময়পূর্ণ চোখে চাহিয়া দেখিতেছিল। কুণ্ডলীকৃত-লাঙ্গুল বিড়ালটি "ভিজা" উপাধি না পাইলেও তদ্রূপ প্রশংসিত অবস্থায় মিটি মিটি চাহিয়া কার্য্যাভাবে হাই তুলেতেছিল, সকাল বেলার রোদটুকু উপভোগের প্রলোভনও হয় ত বা সেই সঙ্গেই থাকিবে। অন্দর ও বাহিরের মধ্যপথে দাঁড়াইয়া অন্নপূর্ণা একখানি পিতলের সরায় দুইটি আলু ও কিছু চাউল লইয়া ভিখারীর গান শুনিতেছিল। সেই শরৎ-প্রভাতের আগমনী গানে তাহারও মনের মাঝে যেন কোন পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল—তাহার স্বপ্নপূর্ণ চোখের জলের রেখাটুকুতে তাহা সুপরিস্ফুট! শ্রোত্রীকে মনোযোগিনী দেখিয়া গায়ক ভাবাবেশে তদ্গতচিত্তে গলা কাঁপাইয়া মাথা দুলাইয়া ঐ একই গান বারবার করিয়া গাহিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিতেই বিশ্বনাথ ভিতরে আসিলেন। তাঁহাকে কাছে আসিতে দেখিয়া অন্নপূর্ণা অপ্রতিভ ভাবে মৃদু হাসিয়া চোখের জল মুছিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ডাক্তার কি বল্লেন দাদামশাই?"

বিশ্বনাথ বার-দুই 'তারা-তারা' উচ্চারণ করিয়া কহিলেন—যে ভয় করা যাচ্ছিল, তাই। এতদিন অস্বীকার করে এলেও, আর ত স্বীকার না করে উপায় নেই।"

অন্নপূর্ণার বক্ষঃস্পন্দন এত দ্রুত হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাহিরেও তাহার শব্দ যেন স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্লেন?"

বিদ্যানাথ চিন্তিত মুখে কহিলেন—"নবীনমাধব এই রোগেই মারা গেছেন, যক্ষ্মাই বলা যায় একরকম।"

তবে কল্যাণীও তাহাদের ছাড়িয়া চলিল। আতঙ্কের প্রথম আক্রমণেই অন্নপূর্ণার মনে হইল, এত বড় দুঃখ কাকীমা সহিবেন কেমন করিয়া। সত্যই কি ভগবান এমনই নির্দ্দয় হইবেন? তিনি যে ধর্ম্মকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন, তবে তাঁহার কপালে এত দুঃখ কেন?

অন্নপূর্ণার চিন্তিত বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া, একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বিদ্যানাথ কহিলেন—"একটা কথা ক'দিন থেকেই ভাবচি, সতীকে একবার আসতে ব'লে হয় না? হয়ত তাতে কল্যাণীর মনটাও কিছু ভাল হতে পারে।"

অন্নপূর্ণা বিস্মিত হইল। মন ভাল রাখাইবার মত কোনও মোহিনীবিদ্যা যে সতীনাথের আছে, এই দীর্ঘকাল আত্মীয়তার অভিজ্ঞতায় তাহার কোন পরিচয় অন্নপূর্ণা এ পর্য্যন্ত পাবে নাই, বরং বিপরীত প্রমাণই ত পাইয়াছে। তা ছাড়া সে আসিবেই বা কেন? অন্নপূর্ণা ভাবিতে লাগিল—"কল্যাণীর মত অনাত্মীয়া কুমারী যুবতী-কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করার তাহার প্রয়োজনই বা কি? তবে কি—?' সন্দেহটাকে প্রশ্রয় দিতেও সে সাহস করিল না। কেবল বিস্ময়পূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিদ্যানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিদ্যানাথ তাহার মুখের পানে চাহিয়া, মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া, তাহার মাথার চুলের উপর হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"সেই যে গুর বিশ্বনাথ, দিদি। সতীর ত ক্ষমা চাওয়া দরকার। সংসার-পথের প্রথমেই যে ভুল ও করেচে, স শোধ্‌রাবার ত আর উপায় নেই। মাপ চাইবার সুযোগও আর কখনও পাবে কি না তা বিশ্বনাথই জানেন।"

অন্নপূর্ণা অন্তরে বাহিরে শিহরিয়া উঠিল। চোখের উপর যে অন্ধকার মলিন পর্দ্দাখানা ভিতরের গোপন দৃশ্যপটকে এতদিন আবৃত রাখিয়াছিল, হঠাৎ রঙ্গভূমির পট উত্তোলনের মতই সেখানা উঠিয়া গিয়া ভিতরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকুকে প্রকাশ করিয়া ধরিল। তাই বুঝি কল্যাণী এত ভালবাসিয়াও, অন্নপূর্ণাকে তাহার অন্তরের কথা খুলিয়া বলিতে পারে নাই। ভুলিয়াও কখন সতীনাথের আলোচনা ত করেই না, উমার সম্বন্ধেও কোন কথা কহিতে যেন কুণ্ঠা অনুভব করে।

কল্যাণীর যে আত্মগোপন এত দিন অজ্ঞাতে তাহার মনকে অভিমানের ব্যথায় পীড়িত করিত, আজ তাহার সত্য রূপ দেখিয়া, তদপেক্ষা গভীরতর ব্যথাই সে অনুভব করিল। তাহারাই তবে কল্যাণীর সুখের হন্তারক। তাহাদের নিদারুণ লোভের বশেই আজ কল্যাণী মরণ-পথের যাত্রী—তবু সেই যেন কত

অপরাধিনী! নিজের ব্যর্থতার বেদনা ভুলিয়া সে যে পরোক্ষে উমার সুখের হন্ত্রী হইয়াছে—এই অনুশোচনাতেই কুণ্ঠিত হইয়া থাকে! সতীনাথ উমাকে ভালবাসে না শুনিয়া কল্যাণী ত সুখী হয়ই না, বরং ব্যথাই পায়। অন্নপূর্ণা ভাবিয়া পাইল না, কল্যাণীকে যে এত ভালবাসিত, সে উহাকে বিবাহ করিল না কেন? বিষয়ের লোভে জ্যেঠামহাশয়ের আদেশ পালনের জন্য? কারণ যাহাই হউক, এ ছাড়া সতীনাথের অন্য উপায়ই বা কি ছিল? গুরুজনের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাদের অসম্মতিতে বিবাহ করা ত উচিত হইত না। তখনই আবার স্মরণ হইল, উমাকেও ত সে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুসারে গ্রহণ করে নাই। তবে সতীনাথ কি শুধু খেয়ালেই চলিয়া থাকে?

মনের ভাব মুখে প্রকাশ পাইল কি না, অন্নপূর্ণা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহার মনের অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেই যেন বিশ্বনাথ কহিলেন—"কল্যাণীব বিয়ের মিছে খবর পেয়ে, রাগ করে সতীনাথ উমাকে বিয়ে করেছিল। দোষ শুধু তাহারই ত নয়; সে ছেলে মানুষ, নিজের মন বুঝ্‌তে পারে নি। দোষ আমাবই বেশী। ঠিক এমনটা না হোক্, কিছু যে গলদ ভিতরে আছে, সে তাহার মুখ দেখে তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। কোনও খবব নিলাম না ত। সস্তায় মেয়ে পার·কর্‌তে চেয়েছিল, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে ফেল্লাম। সুতরাং আমাকেও তাব অপরাধের ভাগ সমান করেই নিতে হবে। মানুষ তুচ্ছ অবহেলায় নিজের কত বড দুঃখের পথ নিজের হাতেই যে গড়ে তোলে। তাবা-মা!" চিন্তিত বিষন্ন মুখে বিশ্বনাথ পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা ঠাকুর-ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সদ্যঃধৌত সাণের মেঝের উপব লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"ঠাকুর, কেন এমন হল?"—আজ সতীনাথের উপব তাহার কোন অভিমান বা রাগ ছিল না; সহানুভূতির ব্যথার সহিত তাহাব দুই চোখ দিয়া গভীর করুণাব ধারা ভিজা মাটী আরো ভিজাইয়া তুলিল। কল্যাণী ও সতীনাথের ভালবাসার অব্যক্ত গভীর বেদনা সে যেন আজ নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতেছিল। আত্মযুদ্ধে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত সতীনাথের চরিত্রের দৃঢ়তায় সে মনে মনে সেই সঙ্গে তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতাও হইল। এত ভালবাসিয়াও, এমন করিযা যে নিজেকে প্রলোভন হইতে বিমুক্ত রাখিতে পারে, সে ত দেবতা! হায় অভাগী কল্যাণী—এমন হৃদয়ে আসন বিছাইয়াও সংসারে ভিখারিণীই রহিয়া গেলে! অজেয় কর্ম্মফল—নির্ম্মম ভাগ্যলিপি! তবু কেহ কেহ এ সকল মানিতে চাহেন না! যদি কর্ম্মফল নাই,—নাই, তবে এমন অঘটনগুলা ঘটে কেন?

বনে দাবানল জ্বলিয়া উঠিলে তাহার সংবাদ জানিতে দূরান্তরের অধিবাসীদেরও

বিলম্ব হয় না। তারাসুন্দরীর শান্তির ঘরে যে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, সে সংবাদ প্রচারিত হইতেও তেমনি বিলম্ব হইল না। বিশ্বনাথের সতর্ক সাবধানতায়, অন্নপূর্ণার প্রাণান্ত চেষ্টাতেও, সে নিষ্ঠুর সংবাদ তারাসুন্দরীর কাছে গোপন রহিল না! ডাক্তার যখন বিশ্বনাথের মনের সংশয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন গৃহ-মার্জ্জন-রতা মোক্ষদা দাসীর কর্ণে সে সংবাদটুকু অশ্রুত রহিল না। 'যক্ষ্মা' নামটা তাহার জানা ছিল, তাহার দুই পুত্র এই কাল ব্যাধিতেই যে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! মোক্ষদার ইচ্ছা না থাকিলেও কেমন করিয়া যে তাহারই মুখ দিয়া ঐ কথাটা গোপনে একজন দুইজন করিয়া অনেক জনের কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহা সেও বলিতে পারে না।

তারাসুন্দরী গঙ্গাস্নানে গিয়া প্রতিবেশিনীদেব সতর্ক ইঙ্গিতে তাহা বুঝিযা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর জজের রায় শুনিতেই কেবল বাকী ছিল, নতুবা চক্ষু ত তাঁহার অন্ধ হইযা যায় নাই। প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তটিই যে এই আশঙ্কা বহন করিযা আসিতেছিল।

নদীর জল যেখানে গভীর, সেখানে উচ্ছ্বাস কম। তীরের নিকট অগভীব জলেই তরঙ্গের উদ্দাম চাপল্য দেখিতে পাওয়া যায়। তারাসুন্দরীর গভীব দুঃখ বাহিরে প্রকাশ পাইল না, তাহার সবটুকুই ভিতরে। ভিতরটা যে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছিল, অগ্নিতাপ-ঝলসিতের মত চোখে মুখে তাহারই গভীব চিহ্ন অতি দ্রুতগতিতে আঁকিয়া তুলিলেও, চোখে এক দিনও জল দেখা গেল না; মুখেও কোন আক্ষেপের ভাষা বাহির হইল না। দেখিয়া শুনিয়া রাজলক্ষ্মী এক দিন অন্নপূর্ণার কাছে গোপনে কহিলেন—"ঘা খেয়ে মনটা ওঁর কি শক্তই হয়ে গ্যাছে!"

বিশ্বনাথ সেই অনলস সেবাপবাযণা কন্যাগতপ্রাণা জননীব অসীম ধৈর্য্য দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

৮

কল্যাণী প্রস্তুত হইয়াছে

কল্যাণীর রোগ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জটিল পথেই অগ্রসব হইতেছিল। শীতের পূর্ব্বেই সে শয্যা গ্রহণ করিল, এখন আর তাহার উঠিয়া বসিবার সামর্থ্যটুকুও নাই। জ্বর নিয়মিত লাগিয়াই থাকে। কোন দিন একটু বেশী, কোন দিন কিছু কম—একেবারে বিচ্ছেদ হয় না। দুর্ব্বলতা ক্রমেই বাড়িতেছিল। আহারে রুচি নাই, বুকের বেদনার সঙ্গে কাশী দেখা দিল। হিমশীর্ণ লতাটির মত দেহের তরুণ লাবণ্যটুকু দেহেই মিলাইয়া যাইতেছিল। চোখের ঔজ্জ্বল্য ও মুখের প্রসন্ন হাসিটুকু

কেবল তেমনি অটুটভাবে আঁকা রহিল। তারাসুন্দরী ও বিদ্যানাথের সংসারে—দিন যে কি ভাবে কাটিতেছিল, তাহা তাঁহারাই জানেন। যে দিন জর একটু কম থাকে, অথবা জ্বরের উপর পুনরায় জর না আসে, মনে অমনি আশা জাগিতে চায়। কিন্তু এ আশার সুযোগও এখন এত বিরল হইয়া গিয়াছে যে, কদাচিৎ সে সুখটুকু মিলে।

বুদ্ধিমতী কল্যাণীও নিজের অবস্থা বুঝিতেছিল, কিন্তু এখনও সে ভাবের আভাসটুকুও সে প্রকাশ করিত না। সে এখনও তেমনি মার কাছে ছেলেমানুষী করে; অন্নপূর্ণাকে বায়না আব্‌দারে যতক্ষণ পারে নিজের কাছে আবদ্ধ করিয়া রাখে। বিদ্যানাথের সঙ্গে দেখা হইলে দুইটা ভাল কথা শুনিয়া লয়, ভাল ভাল গ্রন্থ হইতে যাহা বাছা বাছা অংশ চিহ্নিত করিয়া রাখে, তাহার অর্থ বুঝিতে চায়। বিদ্যানাথ অনেক সময় তাহার কাছে আসিয়া বসেন, যাহাতে তাহার মনে উৎসাহ আনন্দ জন্মায় এমন সব কথা কহিয়া তাহাকে খুসী রাখিতে চেষ্টা করেন। সদগ্রন্থ হইতে উপদেশ দেন। স্কুলের কাজ ছাড়িয়া দেওয়ায় তাঁহারও সময়ের আজকাল অভাব ছিল না। গুরুশিষ্য দুই জনেই এখন চতুষ্পাঠীর উন্নতির দিকে মনোযোগী হইয়াছেন। তা ছাড়া—সময় পাওয়ায় পূজার্চ্চনার কালও বাড়াইয়া লইতে পারিয়াছেন। পুস্তক প্রণয়নে ও পাঠে তাঁহার সময়ের সদ্ব্যবহার হইতে পাবে। বাকী সময় কল্যাণীর সঙ্গেই অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

দাদামহাশয়কে সর্ব্বদা কাছে পাইয়া কল্যাণীব রোগশয্যা সুখশয্যা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত মুখের পানে চাহিযা, নির্ম্মল স্নেহের স্পর্শানুভব করিয়া, মন তাহার গভীর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। জীবনের ব্যর্থতার দুঃখের অংশটা এখন আর তাহাকে পীড়িত করিতে পারে না। মনে হইত—"এমন ভাবে দুঃখের ব্যথায় অন্তর শোধনের মন্ত্র গ্রহণ না করিলে, এমন করিয়া কি দাদামহাশযকে বুঝিতে পারিতাম? না, এত অমূল্য রত্ন লাভ করিতাম? ভগবান মঙ্গলময, তাই অমঙ্গলের বাহ্যিকরূপে তিনি মঙ্গলেরই প্রতিষ্ঠা করেন! আমার দিন ত এত শীঘ্রই ফুরাইয়া আসিত; কেবল সংসারের বিলাসসুখের পঙ্কিল আবর্ত্তে পা দিয়াই চলিয়া যাইতাম, পরমানন্দ চিরসুন্দরের সত্যরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।"

নিকটাগত মুক্তির আভাস সে যেন অনেক দিন হইতেই অনুভব করিয়া আসিতেছে। অন্তর যাহার ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত, জগতে তাহার চোখে কিছুই যে অসুন্দর নাই। অনির্দ্দেশের পথে চলিতে মনে তাহার ভয়ের আভাসমাত্র জাগাইতে পারে না। মনে হয়, মৃত্যুর এত রূপ! তবে মরণে লোকে ভয় পায় কেন? সে এত দিন তাহার দ্বিধাগ্রস্ত জটিলতার আঁধার জীবনের অতল সলিলে

ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। দুঃখ ও দ্বন্দ্বের অতীত কোন্ লোকের শুভবার্তা বহিয়া, যে তাহার নিকটাগত হইয়াছে, তাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিতে কেনই বা সে দ্বিধা করিবে ?

৯

'নৌকাডুবি'

কিছুদিন হইতে কল্যাণীর জ্বর, কমের দিকে না থাকিয়া বাড়ের দিকেই চলিতেছিল। এমন সময় সময় হয়, আবার দুই পাঁচ দিন কমও থাকে। অন্নপূর্ণা আজকাল তাই সংক্ষেপে রান্নাবান্না তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া, দুপুর বেলাটা তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া থাকে, দুই একখানি গল্পের বা অন্য কোন বই লইয়া পড়িয়া শোনায়। সেদিন মঞ্জুভূষণের স্ত্রী কল্যাণীকে দেখিতে আসিয়া 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের সুখ্যাতি করিয়াছিল। অন্নপূর্ণা বইখানি তাহার নিকট হইতে চাহিয়া আনাইয়াছে। সেই বইখানিই অলস মধ্যাহ্ন-যাপনের জন্য তাহাদের আজকাল একমাত্র পাঠ্য ও আলোচ্য। কল্যাণীকে ঔষধ খাওয়াইয়া তারাসুন্দরী এইমাত্র স্নান সারিয়া, হবিষ্যান্নের জোগাড় করিতে গিয়াছেন। অন্নপূর্ণা কল্যাণীর ললাটে হস্তস্পর্শে তাহার জ্বরের তাপ পরীক্ষা করিয়া কাছে আসিয়া বসিতেই কল্যাণী মৃদু হাসিয়া কহিল—"দিদি, গল্পটা আজ শেষ কর্‌বে না? আহা কমলার ভারি দুঃখ—না দিদি? কিন্তু হেমের জন্যেও খুব মায়া করে—করে না ভাই?"

তাকের উপর হইতে বইখানি পাড়িয়া আনিয়া অন্নপূর্ণা তাহার কাছে ঘেষিয়া বসিলে, কল্যাণী সরিয়া তাহাকে স্থান করিয়া দিল। অন্নপূর্ণা বইয়ের পাতা না খুলিয়, স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—"কেন রে, হেমের ত আর বিয়ে হয়ে যায় নি, তার ত পথ খোলা রয়েচে। বেচারী কমলাই না জালে জড়িয়ে পড়্‌ল! কি করে এ জালের গেরো খুল্‌বে যে আমি ত কিছু ভেবেই পাচ্চিনে।"

গল্পের পরিণাম দু'জনেরই অজ্ঞাত—অথচ অতি দুরূহ স্থানে তাহারা আসিয়া পঁহুছিয়াছে—নিজে নিজে মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতেছে না।

কল্যাণী একটা ছোট রকম নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"যাকে স্বামী বলে ভালবাসত, যখন জান্‌লে সে তার স্বামী নয়, অথচ জেনে শুনে এত দিনেও সে কথা সে জানায়নি—তখন কি ভয়ানক দুঃখই না ওকে সইতে হয়েছিল! ওর অবস্থা ভয়ানক নয়?"

কল্যাণী গল্পাংশে তন্ময় হইয়া নিজের কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। অথবা

সতীনাথের প্রেমে তাহার মনে কোন সন্দেহ কখনও বুঝি তেমন করিয়া জাগে নাই। নিরুপায়ে রুদ্রকান্তের মতানুবর্ত্তী হওয়া ছাড়া যে তাঁহার পথ ছিল না। তা ছাড়া, তিনি ত সর্ব্বজ্ঞ নহেন—কল্যাণীর মনের কথা ত তিনি কিছুই জানিতেন না। বিবাহের কথা কত লোকের সহিত হয়, ভাঙ্গিয়াও যায়, তাই বলিয়া কে কাহাকে অপরাধী করিয়া থাকে? কল্যাণী যে এত বড লজ্জাহীনা—মনে মনে স্বয়ংবরা—তাহা তিনি কেমন করিয়াই বা জানিবেন? সতীনাথের 'পরে কল্যাণীর বিদ্বেষ ছিল না, ক্রোধও ছিল না। তাহার স্বার্থহীন প্রেমে পরছিদ্রানুসন্ধানের প্রবৃত্তি নাই। সে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল, এখনও বাসে, কিন্তু সে ভালবাসা ব্যর্থতা জানে না। সে ভালবাসা তাহার সার্থক হইয়াছে।

সেদিন দাদামহাশয়ের মুখে সে এই কথারই মীমাংসা শুনিয়াছে। ভগবানকে প্রত্যক্ষরূপে পাওয়ার প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"দেবতা ত শুধু ভক্তি চান্ না, ভক্তি প্রেম স্নেহ—যে যা দেবার অধিকারী, তিনি তার কাছ থেকে তাই নিয়ে থাকেন। তুমি যে তোমার অপরিমেয় প্রেমের বন্ধনে তাঁকে বন্দী করে আপন করে নিয়েচ, তোমার দেবতা মানবের মূর্ত্তিতেই তোমার পূজা গ্রহণ করেচেন। তোমার কামনাহীন অকলুষ প্রেম—সেই প্রেমময়ের পাদপদ্মেই অর্পিত হয়েছে। প্রেমের ঠাকুর, তিনি যে এমনি সিংহাসনই খুঁজে বেড়ান। আহা, শান্তিময় তোমায় শান্তি দেবেন।"

কল্যাণীর মনে পড়িল, সে দিন কি পূর্ণানন্দেই তাহার জীবন সার্থক মনে হইয়াছিল! কামনাপূর্ণ জাগতিক প্রেম কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র বলিয়াই সে দিন সে বুঝিতে পারিয়াছিল! ফুল কি শুধু মানবের ভোগের জন্যই সৃষ্ট? দেবপূজাতে উৎসৃষ্ট হওয়াই যে ফুলের জীবনের পরম সার্থকতা। তবে তাহার জীবনই বৃথা হইবে কেন? তাহার মানস-দেবতাকে পূজার দেবতায় মিশাইয়া কেনই বা সে ধন্য হইতে না পারিবে?

কল্যাণীর মনের খবর অন্নপূর্ণার জানা ছিল না; সে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া কল্যাণী যেন একটুখানি লজ্জা পাইল। সে জোর করিয়া সে ভাবটাকে কাটাইয়া ফেলিবার জন্য হাসিয়া কহিল—"আমি ত উপন্যাস বেশী পড়ি নি, তাই আমার বোধ হয় এত ভাল লাগচে, মনে হচ্চে যেন সত্যিকার মানুষ ওরা।"

অন্নপূর্ণা পুস্তকপৃষ্ঠার পঠিতাংশ চিহ্নিত স্থানটুকু বাহির করিয়া কহিল—"সে লেখকের গুণে। আচ্ছা, পড়ি তবে শোন্। কমলা রমেশের চিঠি পেয়েচে—সেখানটা হয়ে গেছল না?"

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া কহিল—"এইখানটায় রমেশের চরিত্রটাকে ভারি কাহিল করা হয়েছে কিন্তু। এত দিন এমন নির্লিপ্তভাবে কাটিয়ে, কেনই যে ওর এমন মতিভ্রম হল। ভালবাসার এত বড় অপমান—কমলা যখন জান্‌তে পার্ব্বে, তার মন তখন না জানি কি বল্‌বে?"

অন্নপূর্ণার মনের ভিতরটা বাতাসে আন্দোলিত বৃক্ষশাখার মত দুলিতেছিল। সতীনাথের কথা কি সে তবে সব খুলিয়া বলিবে? বলা কি উচিত নয়? ভালবাসার এত বড় অপমান যে তাহার জীবনে ঘটে নাই সে কি তাহা শুনিয়া যাইবে না? সতীনাথ কাণ্ডজ্ঞানহীন, অদূরদর্শী, মূর্খ—সবই হইতে পারে, কিন্তু প্রতারক নয়, এটুকুও কি সান্ত্বনা নয়? আহা, সেও যে অভাগা। উমা হেন রত্নের অধিকারী হইয়াও তাহাকে যত্ন করিতে পারিল না, সেও কি কম দুঃখে?

অন্নপূর্ণা স্থির করিতে পারিল না—কথাটা প্রকাশ করায় কল্যাণীর শারীরিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব কি না। দাদামহাশয় ধীরে ধীরে তাহার কাছে এই কথাটাই জানাইতে বলিয়াছেন। জীবনের অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাওয়াই ভাল। তা ছাড়া—লুকোচুরি কাটিয়া গেলে কল্যাণীর মনেও যে শান্তি আসিবে, ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। এ কথা প্রকাশে কল্যাণীর কিসের লজ্জা? সে ত ডাকার স্বামীকে কাড়িয়া লয় নাই। দুর্ভাগিনী উমাই যে তাহার স্বামীর—প্রেমে না হউক, অধিকারে ধনী হইয়াছে। এই গোপনীয়তার ব্যথা যে কল্যাণীর সরল মনে অহরহঃ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তিনি নিজের মন দিয়াই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। প্রকাশে লজ্জা সঙ্কোচ কমিয়া গেলে, সতীনাথকে, বন্ধুভাবে আহ্বান করা সম্ভব হইবে। জটিলতার উচ্ছেদ করিতে পারিলে কল্যাণীও হয় ত শান্তি পাইবে।

বিশ্বনাথের অনুমতি থাকিলেও, অন্নপূর্ণা যেন সঙ্কোচের হাত এড়াইতে পারিতেছিল না। পাছে অত্যধিক আনন্দ বা নৈরাশ্যের আঘাত—তাহার জীর্ণ দেহকে আহত করে, এই ভয়ে সে কতদিন বলি বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই,—আজিও পারিতেছিল না। সতীনাথ যে ভাবে কল্যাণীর সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে মনে মনে সে তাহাকে প্রশংসা করিলেও, কল্যাণীর তরফ হইতে আশা কিছুই পাইল না। দাদামহাশয় বলিয়াছেন—কল্যাণী যে এখানে আছে সে খবর সতীনাথ জানে। তবু ত একদিনও কৈ কোন ছুতায় দেখা করিল না। দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে একটা সংবাদও লইল না! ভুলিয়া যে গিয়াছে—বর্ত্তমান ব্যবহারে তাহাও ত ঠিক প্রমাণ করে না? তবে সে কি

আসিতে বলিলেই আসিবে? নির্ব্বাপিত-প্রায় বহ্নিকে আর ইন্ধন-যোগে জ্বালাইয়া তুলিয়া ফল কি? শুধু অমীমাংসিত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা, তাহারই কি কিছু প্রয়োজন আর আছে? হয় ত আছে। এ সুযোগ ছাড়িয়া দিলে হয় ত আর কখনও তাহা মিলিবে না। ইহার ব্যথা যতই থাক, সুখও বুঝি আছে। এই না কল্যাণী বলিতেছিল—'ভালবাসার এত বড় অপমান কমলা সহিবে কেমন করিয়া? কমলা যাহাকে স্বামী বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, এইমাত্র যাহার প্রণয়-পত্রিকা পাঠ করিল, যখন জানিবে সে তাহার স্বামী নয়, তখন দারুণ ঘৃণায় রমেশের চিরদিনের আত্মবিসর্জ্জনের মূল্যও তাহার চোখে অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যাইবে কি না?' স্বামিপ্রেম-অনভিজ্ঞা অন্নপূর্ণার মনে পড়িল, সেদিন কি একখানা কবিতা পুস্তকে পড়িয়াছিল—

"আমি আমার অপমান সহিতে পারি,
প্রেমের সহেনা ত অপমান,
অমরাবতী ত্যজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তোমারও চেয়ে সে যে মহীয়ান্।"

প্রেম বুঝি প্রণয়াস্পদেরও উপরে। তাই আমরা ক্ষতির ব্যথায় যত না হউক ভগবানের করুণায় যদি কখনও সন্দিহান হই, তাহাতে অধিক যন্ত্রণা পাইয়া থাকি। কল্যাণী ত মেল ট্রেণে চড়িয়া বসিয়াছে, এখন উহার ক্ষতি করিবে কে? হয় ত এই মৃত-সঞ্জীবনী সুধার স্পর্শে শুষ্ক তরু আবার মুঞ্জরিয়া উঠিতেও পারে। আহা, সতীনাথ কেন সকল কথা দাদামহাশয়ের কাছে খুলিয়া বলিল না? দুই স্ত্রী ত কুলীনের ঘরে নিন্দার কথা নয়। কল্যাণী—উমা—উভয়কে সহ্য করিবার শক্তি যে উভয়েরই ছিল। কল্যাণীর প্রতি গভীর সমবেদনায় আজ উমার সপত্নী চিন্তাও সরলা অন্নপূর্ণার মনে বিভীষিকা জাগাইতে পারিল না—অসম্ভব মনে হইল না। মমতাভরা-চিত্তে স্বার্থের স্থান কোথায়?

অন্নপূর্ণার মনের বিভিন্ন চিন্তা তাহার মুখেও হয় ত কিছু ছায়া ফেলিয়াছিল। সে অন্যমনে পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। পাঠ সুরু করিল না দেখিয়া, কল্যাণী মৃদু অনুযোগের স্বরে কহিল—"পড়্লে না দিদি, এক্ষুণি ত আবার তোমার বাড়ী ফির্বার সময় হবে। কি ভাবচো দিদি—নিশ্চয় কিছু ভাব্চ—ভাব্চ না?"

ভূমিকা করিয়া কথা আরম্ভ করিতে গেলে আরম্ভ করাই হয় ত কঠিন হইবে। তাই অন্নপূর্ণা বক্তব্যটা সহজ করিয়া লইবার জন্য একেবারেই কহিল—"সেদিন রুদ্রকান্তবাবুকে দেখ্তে গিয়ে দাদামহাশয়ের সঙ্গে সতীনাথের অনেক কথা হয়েছিল শুনলুম।"

কল্যাণী নীববে তাহাব বক্তব্যেব শেষাংশ শুনিবাব অপেক্ষা কবিয়া বহিল। কোন প্রশ্ন কবিল না, চোখে মুখে ব্যগ্রতাব আভাস মাত্রও দেখা গেল না। অন্নপূর্ণা কহিল—"তোরা যে এখানে আছিস্, তাও সে জানে বল্লে।"

কল্যাণী বিস্মিত হইল। তাহাব বক্তহীন মুখখানাতে একটা শ্রী-পূর্ণ ভাব প্রকাশ পাইল। এতদিনেব পব স্মৃতিব আবাব এ আন্দোলন কেন? তাহাদেব সংবাদ লইবাব জন্যই কি? কল্যাণী যে মৃত্যুশয্যায়, সে কথাও তবে তিনি শুনিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহাব মনে কি হইযাছিল কে জানে? তখনই সে মনকে বুঝাইল,—কি আবাব হইবে? কত লোকেব ত বোগ হয, কত লোক ত মবিয়া যায—সকলেব জন্যই কি তিনি ভাবেন?

"কল্যাণী, এতদিন এমন কবে আমাব কাছেও কেন নিজেকে লুকিযে বেখেছিলি ভাই,"—বলিযা অন্নপূর্ণা সস্নেহে তাহাব হাতখানা নিজেব কম্পিত হস্তেব ভিতবে চাপিযা ধবিল। কল্যাণী নীববে ভাবিতে লাগিল - দিদি তবে সব শুনিযাছেন। কল্যাণী এখন তাঁহাব অবসব-যাপনেব গল্পেব বিষযে দাঁড়াইয়াছে। তাহাব অসীম স্পর্দ্ধাব কথাও হয ত আব তাঁহাব অজ্ঞাত নাই। ছি ছি, আব দুইটা দিনও কি সহিতে পাবিলেন না। তিনি তবে দাদামহাশয়েব কাছে সকল কথা বলিযাছেন। যখন এত বলিযাছেন, তখন কি আব তাহাব কথাই জানিতে চাহেন নাই? না চাহিলে এ কথা তুলিবেনই বা কেন?– কল্যাণীব দুই চোখে জল ভবিযা আসিল,—দুঃখে নয—লজ্জায ও অপমানে।

অন্নপূর্ণা তাহাব শীর্ণ অঙ্গুলিগুলি ক্রীড়াচ্ছলে নাড়িতে নাড়িতে কহিল—"অনাথেব বিযেব সময় এসে সুবাবি বাবু তোমাদেব কথা দাদামহাশয়েব কাছে সব বলেছিলেন কি না? সতী অবশ্য কিছুই বলেনি। দাদামহাশয় তোমাদেব এখানে থাকাব কথা জানালে, সে কেবল বলেছিল, সে তা অনেক দিনই জানে।"

অন্নপূর্ণা চুপ কবিয়া কল্যাণীকে বিশ্রাম লইবাব অবসব দিল। এক সঙ্গে সব কথা শুনিবাব মত শক্তি তাহাব আছে কি না কে জানে? শুধু দুঃখে নয়, আনন্দেও যে ভগ্ন হৃদয়কে আহত কবিয়া থাকে।

"আঃ—তিনি তবে তাহাব কথা লইযা আলোচনা কবেন নাই।"—মনে মনেও যে মুহূর্ত্তেব জন্য তাঁহাকে সন্দেহ কবিয়াছিল, ইহাতে কল্যাণীব নিজেব মনেব উপব বাগ হইল। এত লঘুচিত্ত সে!

কল্যাণীকে নীরব দেখিয়া অন্নপূর্ণা কহিল—"মুবাবি বাবু বল্লেন, সতীনাথ বিদেশে কোথায় গেছলেন, সেখানে কোন খববের কাগজে—হৃদয় বাবুব নাম ভুল কবে নবীন বাবুব মেয়ে কল্যাণীর এক ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে—পড়ে,

রাগের মাথায় বন্ধুর পরামর্শে উমাকে ঝাঁ করে বিয়ে করে ফেলেছিলেন। সে সময় তোমরাও না কি কারুকে খবর না দিয়ে চলে এসেছিলে, কাজেই কথাটা সত্যি বলে' তাঁর মনেও বিশ্বাস হয়ে গেছল। তার পর অবশ্য নিজের ভুল বুঝ্‌তে পাল্লেন। কিন্তু তুই ত জানিস্ ভাই, এতে তিনিও সুখী হতে পারেন নি। সত্যি বল্‌চি, এখন তাঁর জন্যে মায়াই করে, রাগ হয় না। তিনি যে নিজের হাতেই তাঁর সাধ করে পোঁতা গাছের গোড়া কেটে ফেলেচেন। আহা—তিনিও বড় অভাগা, বড় দুঃখী।"

অন্নপূর্ণা তাহার মুষ্টিধৃত কল্যাণীর হাতখানির দ্রুত কম্পনেই তাহার মানসিক আবেগ অনুভব করিতেছিল। কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া কহিল—"তবু তোমরা আমায় এত ভালবাস দিদি? আমার জন্যে তোমাদের—"

"এ কি, তুই কাঁদচিস্ কল্যাণি! তুই কি উমা ছাড়া রে—তোর অধিকারই যে আগে। আমরা যে তোর সুখের ঘরে চোরের মত সিঁদ কেটেচি। প্রথম থেকেই দাদামহাশয়ের এ বিয়েতে একটুও ইচ্ছে ছিল না। এই জন্যেই হয় ত মন তাঁর তখন অমন করে কেঁদেছিল"—বলিতে বলিতে অন্নপূর্ণা গভীর স্নেহে কল্যাণীকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া মৃদু স্বরে কহিল,—অন্যায় কল্লুম কি রে? বড় কষ্ট দিলুম কি কল্যাণি?"

হাত দিয়া চোখ মুছিয়া অন্নপূর্ণার বদ্ধ বাহুর বেষ্টনে মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে কল্যাণী কহিল—"না দিদি, মুক্তি দিলে ভাই। এমন করে তোমাদের চোখে নিজেকে লুকিয়ে বেড়াতে আমি যে হাঁপিয়ে মরে যাচ্ছিলুম। আমার অপরাধের বোঝা ভারিই হয়ে যাচ্ছিল।"

"অপরাধ ত তোর নয় ভাই,—তাঁর মুখই যে বলে দিচ্ছিল। মন তাঁর নিজের বশে নেই। কেন লোভে পড়ে বুঝ্‌লুম না, দাদামহাশয়ের অনিচ্ছা বুঝেও নিজেদের জেদ দেখালুম।"

কল্যাণী এইবার মুখ তুলিয়া প্রবাহিত অশ্রুধারা হাত দিয়া মুছিতে মুছিতে মৃদু হাসিয়া কহিল—"তিনি যে উমার স্বামী, আমার ভগ্নীপতি, এতেই আমি খুব সুখী হয়েচি দিদি।"

অন্নপূর্ণা তাহার রুক্ষ চুলগুলি হাত দিয়া গুছাইতে গুছাইতে স্নেহভরা কণ্ঠে কহিল—"তা আমরা খুব জানি, তাই তোকে এত ভালবাসি রে। তুই যে শুধু পরের কথাই ভাব্‌লি, নিজের কথা কখনও ত ভাব্‌লিনে।" অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা, উমাকে—আর সতীনাথকে—দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না? তাদের আস্‌তে বল্‌ব?"

কল্যাণী চুপ করিয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। দেখিতে ইচ্ছা করে বৈ কি। একবার জন্মশোধ দেখি, পায়ের ধূলা লইয়া, সকল অপরাধের ক্ষমা চাহিয়া লওয়া বাকী রহিয়াছে যে। অপরাধী ত তিনি নহেন, সে যে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া, তাঁহার অজ্ঞাতে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। এ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। তাহার অসীম স্নেহ সে কি অনুভব করিতে পারে নাই? তবে সে কেন লোকের মিথ্যা কথায় ভুলিয়াছিল? দেখিতে ইচ্ছা করে না, এত বড় মিথ্যা কেমন করিয়াই বা বলিবে? ইচ্ছা খুবই করে, কেবল অনুচিত বোধে সে ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। তাহার ভুল যেমনই হউক, অভাগিনী কল্যাণীর ভুলের যে আর সংশোধন করা চলিল না। তাহার ইহজীবনের পূজা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এইবার পূজার নির্ম্মাল্যটুকু নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়াই শুধু বাকী। তবেই তাহার জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষার শেষ হইয়া যায়।

সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া, স্বর নামাইয়া কহিল—"এখন থাক না ভাই, যাবার সময় তাঁদের একবার আসতে বোল। উমাকে আমি রাতদিনই মনের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করি, তবু তাকে দেখি নি ত কখনও, দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে করে দিদি"—সতীনাথের কথা সে মুখ ফুটিয়া না বলিলেও, সে যে শেষ সময়ে তাহাকেও দেখিতে চায়—সেটুকু ভাবেই বুঝা গেল।

অন্নপূর্ণা মুখ ভার করিল, ব্যথিতস্বরে কহিল—"কেন ও কথা বলে কষ্ট দিস কল্যাণী? জানিস না কি—?"

"জানি দিদি, জানি বলেই সইয়ে রাখ্‌তে চাই। একেবারে সত্যিটা যখন আসবে, সইতে পার্‌বে কি না তাই ভয় হয়, স্রোতের মুখে ইট কাঠ ফেলে তার গতি ত বন্ধ কর্‌তে পার্‌বে না ভাই।"

অন্নপূর্ণা উঠিল। কল্যাণীর দিকে পিছন ফিরিয়া, জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এবার আর তাহার উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা বাধা মানিল না।

কল্যাণী মৃদুস্বরে ডাকিয়া কহিল—"দিদি, রাগ কল্লে ভাই?"

অন্নপূর্ণা মাথা নাড়িয়া জানাইল—না, সে রাগ করে নাই।

জীবনের দুর্ব্বহ লুকাচুরির হাত এড়াইয়া আজ যেন কল্যাণী লঘু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বুকের বোঝা হাল্কা করিতে পারিল। বৃথা সন্দেহে কেন এত দিন আত্ম-প্রতারণায় কাটাইয়াছিল? তাই এখন তাহার মনে অনুতাপ হইতেছিল। নিজের সঙ্কীর্ণ মন লইয়া ইঁহাদের মনের প্রসারতা বুঝিতে পারে নাই, তাই না লজ্জায়

আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছিল! মনের উপর তাহার রাগ ধরিতেছিল। সংশয়ের চেয়ে নিশ্চয়তা—তা সে যে মূর্ত্তিতেই আসুক—অনেক ভাল।

সতীনাথের মনের সংবাদে সে আজ তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছে। আর—সে উত্তরটুকু কত মিষ্ট! তিনি তাহাকে ভুলিয়া যান নাই। ঘৃণা করিয়া অথবা সংসারের কোন স্বার্থহানির লোভে তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। তাহার প্রেমে সন্দেহ করিয়া নৈরাশ্যে আত্মহত্যার মত অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। সে ভালবাসা কত তীব্র, কত গভীর, তাঁহার বর্ত্তমান জীবনই ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উমা-হেন সর্ব্বগুণবতী স্ত্রীও তাঁহার ক্ষোভের ব্যথা নিবারণ করিতে পারে নাই। তাঁহার ভালবাসা শুধু চোখের নেশা, দু'দিনের মোহ ত ছিল না। মানুষ ভ্রমের দাস, তিনিও ভুল করিয়াছিলেন—তবু সে ভুলের প্রশ্রয় দিয়া দ্বিতীয় বার ভুল করিতে চাহেন নাই—কল্যাণীর সকল ইতিহাস, অবস্থান, সব জানিয়াও তাহার চোখের কাছে আসিয়া দাঁড়ান নাই। তাহাকে প্রলোভিত করেন নাই—এ ভালই করিয়াছেন। তিনি এমন মহৎ বলিয়াই না সে তাঁহাকে এত ভালবাসিয়াছে! হা, এতই ভালবাসে—আজ আর সে তাহার মনের কাছেও অস্বীকার করিবে না। সত্যই সে তাহাকে ভালবাসে। সখারূপে, গুরুরূপে, প্রিয়রূপে, স্বামিরূপে, তাহার আরাধ্য দেবতার রূপেই সে তাহাকে ভালবাসে। তাহার বিশ্বেশ্বর স্বামীকে সে বিশ্বনাথের অংশরূপেই ভালবাসে। হউন তিনি উমার স্বামী, বিশ্বনাথও ত বিশ্বের স্বামী, তাই বলিয়া তাহার কোনও ভক্ত পূজকের পূজার ব্যাঘাত লাগে কি? তাহার এ নীরব পূজাতেই বা তবে বাধিবে কেন?

১০

'নিমেষের তরে সরমে বাধিল'—

রুদ্রকান্তের পীড়া যখন হ্রাস-বৃদ্ধির গতি হারাইয়া নিজের ঘরে স্থির হইয়া রহিল, তখন বাড়ীর লোকেরা যেন অনেকখানি নিশ্চিন্তভাবে আবার আপন আপন কার্য্যে মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইল। সতীনাথ ও মুরারি বিষয়কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিল। আম্‌লা কর্ম্মচারীরা তাহাদের খেরো-বাঁধা মোটা মোটা খাতা খুলিয়া হিসাব দেখিতে এবং উকীল মোক্তার এটর্ণিরা রুদ্রকান্তের পয়সায় পকেট ভরাইয়া মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীর বেতনভোগী চাকর দাসীরাও পুরাতন রোগীর সেবায় শৈথিল্য দিয়া ক্রমে নিজ নিজ আরাম খুঁজিতে সুরু করিল। কেবল শ্রান্ত হইল না উমা। তাহার ত আর অন্য

কোন বন্ধন নাই, প্রয়োজনও নাই—এবং জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গই তাহার অভ্যস্ত। দুঃখের দিনেও সে তাঁহার সঙ্গী, তাঁহাকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? মরণপথ-যাত্রী বৃদ্ধকে সে রুগ্ন শিশুর মতই মনে করে,—যতই সে তাঁহার অসহায় অবস্থার কথা ভাবে, ততই গভীর স্নেহে তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরিতে যায়। সত্যই যদি রুদ্রকান্ত চলিয়া যান, এত বড় বাড়ীখানাতে একা সে কেমন করিয়া আমৃত্যু তিষ্ঠিয়া থাকিবে? শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই—একনিষ্ঠ সাধকের মত অনলস উমাই কেবল ঐকান্তিক সেবায় রোগশয্যা আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল।

শীত আসিয়া পড়ায় সহর জুড়িয়া বিপুল আয়োজনে আনন্দের উৎসব চলিতেছিল। নূতন নূতন থিয়েটার বায়স্কোপ সার্কাসের বিজ্ঞাপনে দ্বিতল ত্রিতল বাড়ীগুলার বাহির অংশ খচিত হইয়া উঠিয়াছে। পার্শী অ্যালফ্রেড থিয়েটারে মহাভারতের অভিনয় দেখান হইতেছিল, সতীনাথ ও মুরারি একদিন দেখিয়া আসিল। দেখিয়া মুগ্ধ-মুরারি পিসীমার কাছে তাহার সালঙ্কার বর্ণনায় তাঁহার মনটিকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। উমা কোথাও যায় না বা যাইতে পায় না, তাই পিসীমার স্বাধীনতার কোন বাধা না থাকিলেও তিনিও চক্ষুলজ্জা রাখিয়া যাইতে পারেন না। ঠাকুর দেবতার অভিনয়—বিশেষ এমন অলৌকিক কাণ্ডের বর্ণনা—কাজেই পিসীমা মনের অভিমান চাপিয়া একদিন সতীনাথের কাছে জানাইলেন, উমাকে লইয়া তিনি মহাভারতের অভিনয় দেখিতে যাইবেন। শুনিয়া সতীনাথ তৎক্ষণাৎ খুসী হইয়া মত দিল এবং উৎসাহ দেখাইয়া নিজে সঙ্গী হইবার প্রস্তাব করিয়া বসিল।

রুদ্রকান্তের অনুমতি লইবার আবশ্যকতা ছিল না। তবু কি ভাবিয়া সতীনাথ সুধীরকে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি আনাইয়া লইল। রুদ্রকান্ত আপত্তি করিলেন না, উমাকে খুসী করিতে এখন তিনিও যেন সমুৎসুক। সতীনাথ সঙ্কোচবশে পিসীমার কথাই বলিয়াছিল, জ্যেঠামহাশয় নিজ হইতে বলিয়া দিয়াছেন উমাকেও যেন লইয়া যাওয়া হয়। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন—সে খেয়ালী ছেলে, মনে করাইয়া না দিলে হয় ত তাহার মনেও পড়িবে না, শুধু বুড়ীকেই দেখাইয়া আনিবে,—উহাকে বিশ্বাস ত কিছুই নাই। সরকার মহাশয় আগে গিয়া বক্স রিজার্ভ করিয়া আসিয়াছেন।

দুপুর বেলা সুধীর আসিয়া খবর দিল—সে ও পিসীমা থিয়েটার দেখিতে যাইবে, উমা যাইবে না। সতীনাথ নিজের ঘরে চুপ করিয়া একা খাটে শুইয়া ছিল, শুনিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"কেন, যাবে না কেন?"

সুধীর মুখ ভাব করিয়া কহিল—"বল্লেন—'ইচ্ছে নেই'। বৌদি ত কখনও থিয়েটার দেখেন নি, তাই বোধ হয় ইচ্ছেও হয় না।"

সতীনাথ পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিয়া কহিল—"না যান ত করা যাবে কি। তোমরাই তা হলে ঠিক হয়ে নাও।" বৌদির অকারণ বৈরাগ্যে সুধীরও আজ রাগিয়াছিল, তাই দাদার ঔদাসীন্যে ক্ষুণ্ণ হইলেও মনের উষ্মাটা মুখ দিয়া অনুরোধের কোন ভাষা বাহির হইতে দিল না। সে নীরবে চলিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার ঘরে ঘড়ির কাঁটিয়া পঁহুছিতেই সতীনাথ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং সন্ধান করিয়া দ্বিতলের ঘরে উমার সাক্ষাৎ পাইল।

উমা তখন ঘরের মেঝেয় কলাপাতা বিছাইয়া একরাশ পান সাজিয়া সবেমাত্র খিলি মুড়িতে সুরু করিয়াছে। স্বামীকে অপ্রত্যাশিতরূপে অসময়ে কাছে আসিতে দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত হইলেও, মুখে কিছুই বলিল না। একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া নিজের কাজে মন দিল। তাহার আগ্রহহীন উদ্বেগরেখা বর্জ্জিত মুখের পানে চাহিয়া সতীনাথের হিংসা হইতেছিল। একটুখানি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে কহিল—"তুমি না কি থিয়েটার দেখতে যাবে না?"

উমা কাজ বন্ধ না করিয়া মুখ না তুলিয়াই কহিল—"না।"

"কেন, শুনতে পাই না? সুধীর বলছিল, তুমি না কি কখনও থিয়েটার দেখ নি।"

উমা নম্রমুখে মৃদু হাসিল, প্রতিবাদ করিল না। সতীনাথ অসহিষ্ণুভাবে কহিল—"কেন যাবে না বল্‌তে দোষ আছে কিছু?"

উমা মুখ তুলিয়া স্বামীর সংশয়পূর্ণ চোখে নিজের দৃষ্টি মিলাইয়া মুহূর্ত্তে চোখ নামাইয়া ফেলিল। জ্যেঠামহাশয়ের এমন অসুখ, এখন কি আমোদ করিয়া থিয়েটার দেখিয়া বেড়াইবার সময়, এই সত্য কথাটি তাহার ঠোঁটের কাছে আসিলেও সে মুখের বাহির হইতে দিল না। মা'র চেয়ে অধিক দরদীর মত কথাটা যে একান্তই অশোভন শুনাইবে। উঁহারা যদি আমোদ করিতে পারেন, সে কি বেশী আপন জন যে আত্মীয়তার বাহাদুরী লইতে হইবে? তাই কারণটা উহ্য রাখিয়া সংক্ষেপে নিজের অনিচ্ছা মাত্র সে জানাইল। কহিল—"আমার ভাল লাগে না ও সব দেখ্‌তে।"

শুনিয়া সতীনাথের অধর প্রান্ত মৃদু হাসিতে কুঞ্চিত হইল। কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ভরিয়া সে কহিল—"না পড়েই পণ্ডিত, কি করে বুঝ্‌লে ভাল লাগ্‌বে কি না? দেখ নি ত?"

উমার খিলি মোড়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। এইবার পানে গোলাপ জলের

ছিটা দিয়া সেগুলি ডিবা ও ডাবরে ভরিতে ভরিতে সে নতমুখেই কহিল—"না দেখে ত কোন ক্ষতি হয়নি, আমি যাব না"—স্বর মৃদু হইলেও সঙ্কল্প যে অটল, স্বরের দৃঢ়তাতেই তাহা অনুমিত হইল।

সতীনাথ দুঃখিত হইলেও জেদ করিল না। ক্ষুন্নস্বরে—"জোর ত নেই, তবে থাক্"—বলিয়া গমনোদ্যত হইয়া আবার কি ভাবিয়া সহসা উমার অত্যন্ত কাছে আসিয়া কহিল—"পান বোধ হয় দু' একটা পেতে পারি ?"

উমা একটা পান-ভরা ডিবা হাতে তুলিতেই, কিছু না ভাবিয়া সতীনাথ তাড়াতাড়ি একটুখানি ঝুঁকিয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। উমা লজ্জায় ডিবাটা স্বামীর হাতে না দিয়া, মেঝেয় রাখিয়া বাকী পানগুলি গুছাইয়া তুলিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

সতীনাথ প্রসারিত হাতখানা গুটাইয়া লইল। তারপর একটুখানি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া, পানের ডিবা স্পর্শ না করিয়া মৃদু হাসি হাসিয়া সে আস্তে আস্তে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সকাল বেলা নিজে গিয়া প্যাটার্ণ পছন্দ করিয়া লাভচাদের দোকান হইতে যে সোনার চুড়ি ও গলার হার কিনিয়া আনিয়াছিল, ইহার পর সেগুলি আর পকেটের বাহির করা চলিল না।

জুতার শব্দ সিঁড়ির নীচে ক্রমে মিলাইয়া গেল। সাজা পানগুলি তেমনি-ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া, কিছুক্ষণ তাহার সেই অনাদৃত অবহেলিত তাম্বুলপূর্ণ ডিবাটির পানে চাহিয়া, তার পর উমা উঠিয়া একটা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

অল্পক্ষণ পরেই সে দেখিল, বাগানের ফটক পার হইয়া বন্ধদ্বার গাড়ীখানি সশব্দে বাড়ীর বাহির হইয়া বড় রাস্তায় পড়িল, এবং মুহূর্তে উমার দৃষ্টির তরল কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। কোচবাক্সে কোচম্যানের পার্শ্বে সরকার নিধিরামের শীর্ণ মূর্ত্তি এবং গাড়ীর ছাদে দরোয়ান বংশীবদনের জরী লাগান টুপীর কিনারাটিও অদৃশ্য হইয়া গেল।

উমা সেইখানে তেমনি ভাবেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীর সেই ম্লান হাসিটুকু আজ সে যেন কোন মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। কখনও বিদ্রূপপূর্ণ, কখনও সরল হাসি হাসিয়া কথা কহাই সতীনাথের চিরকালের স্বভাব। আজকাল উমাও এ হাসির সংবাদ মাঝে মাঝে পাইয়া থাকে—তবু আজিকার সে হাসি, সে বুঝি সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে হাসি—হাসি নয়, সে যেন করুণ বেদনাভরা অশ্রুঝরা অভিমানের ভর্ৎসনা। তিনি যে কিছুদিন হইতে তাঁহার চালচলন সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন, এ খবর উমার কাছেও আর অজ্ঞাত নাই। দাদামহাশয় সিগার সিগারেট খাওয়া অপছন্দ করেন শুনিয়া

তিনি না কি ও সব একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন—এমনি অবিশ্বাস্য সংবাদও সে সুধীরের কাছে পাইয়াছে এবং তাহার বিস্ময়েব মাত্রা পূর্ণ করিয়া সেদিন না কি পিসীমার কাছে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ কবিবাব সঙ্কল্পও তিনি জানাইয়াছেন। সুধীব বলে—তিনি নাকি এখন সন্ধ্যাহ্নিকও কবিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেব অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি এ বাড়ীতে এমনি অশ্রদ্ধেয় যে, এই সব ছোটখাট ঘটনাগুলিই উমার কাছে রাষ্ট্রবিপ্লবের মত বৃহৎ ব্যাপাব বলিয়া প্রতিভাত হইয়া উঠিযাছিল। মুবারি দেখিয়া শুনিয়া একদিন ব্যঙ্গ কবিযা কহিল—"দেখ্‌চ কি বৌঠান. এইবাব আলোচাল কাঁচকলার পালা সুরু হল, এর পব কোন দিন 'কম্বলবস্ত' হযে লোটা হাতে কবে বেরিয়ে না পডলে বাঁচি। বড যে টুলো পণ্ডিত বলে ঠাকুবদ্দা মশায়কে নিন্দে করা হত—এখন নিজেই যে ভটচায্যি হযে উঠলেন। কোন দিন তেড়ীব পেছনে টিকি দেখ্‌ব, এখন কেবল সেইদিনেব প্রতীক্ষা কবে আছি।"

মুবারি কথাটা পবিহাসেব ভাবে বলিলেও, মনটা তাহাব ঈর্ষ্যাব জ্বালায় জ্বলিতেছিল। এমন করিয়া স্ত্রীব মন ফিবাইতে হইবে?—গলায দডি। এমন বিমুখ মন নাই বা ফিবিল।

উমা কিন্তু সতীনাথেব এই অবিশ্বাস্য মতিপরিবর্ত্তনেব ইতিহাস শুনিযা মনে মনে বিপুল আনন্দই অনুভব কবিযাছিল। নিজেব অনুকূলে এতটুকু প্রশ্রয়—চিন্তাতেও সে গ্রহণ কবে নাই। মুবাবিব বিদ্রূপে তাই সে ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং খুসীই হইয়াছিল। তিনি যে আজকাল তাহাব কাছে একটু স্নেহমমতার প্রার্থী, এটুকুও সে যেন অনুভব কবিয়া আসিতেছে। তবুও সে খেয়াল কতটুকু, আর কতক্ষণেব, তাহা সে বুঝিতে পাবিতেছিল না। সে আদাব ব্যাপাবী, জাহাজেব সংবাদে তাহাব প্রযোজনই বা কি? সে ভাবিত— আগুন লইয়া খেলা ত আব নিবাপদ নয়—এ বেশ আছি। অকাবণ অভাব টানিয়া আনাব প্রয়োজন কি? এই ভাবেব বশবর্ত্তী হইয়া সে সতীনাথেব মনোভাব বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিত না। আজও নিজেকে চোখ বাঙ্গাইযা ভুল বুঝাইতে চাহিল—কিছু না, সে কিছু না,—তাহাবই ভ্রম।

১১

রহস্য ভেদ

অস্তগামী সূর্য্যেব বশ্মিরেখা চোখে পড়ায় উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, মনেব বাশ টানিয়া তাহাকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করিবাব ইচ্ছায় মুখ ফিবাইতেই, সহসা বিস্মিত হইয়া গেল। মুবারি কখন আসিয়া দবজার উপরে দাঁড়াইয়া আছে।

হয় ত সে নিঃশব্দে আসিয়াছিল, নয় ত নিজের গভীর চিন্তায় উমা তাহার পদশব্দ শুনিতে পায় নাই।

মুরারি দেখিল, উমার চোখে তখনও স্বপ্নাভিভূত দৃষ্টি, চোখের কোণে জলের রেখা— নিটোল গণ্ডে মুক্তাবিন্দুর মত দুই ফোঁটা জল তখনও টল টল করিতেছে, অথচ এমনিই আত্মবিস্মৃত সে, যে নিজে তাহা জানেও না। উমাকে ফিরিতে দেখিয়া মুরারি ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"বৌঠান, থিয়েটার দেখতে গেলে না যে?"

জ্যেঠামহাশয়ের পীড়া উপলক্ষে বাধ্য হইয়াই উমাকে সর্ব্বদাই মুরারির সঙ্গ সহ্য করিতে হইয়াছে—এখনও হয়। সতীনাথের কাছে সাহায্য চাওয়া অপেক্ষা মুরারির কাছে চাওয়া তাহার পক্ষে সহজ। প্রয়োজন স্থলে অনেক সময় তাহার সহিত কথাও কহিয়াছে। উমার সরল সংযত ব্যবহারে মুরারিও মনে মনে তাহার প্রতি সম্ভ্রম অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপে উমার প্রতি ধীরে ধীরে ভগিনীস্নেহ জাগাইয়া তুলিয়া তাহার বিশ্বের প্রতি বিতৃষ্ণ মনটাও ক্রমে শান্ত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় উমার চোখের জলে সতীনাথের প্রতি তাহার গোপন মনোভাবের প্রকৃত সংবাদটি অকস্মাৎ ব্যক্ত হইয়া পড়ায়, তখনই তাহার সহজ স্বচ্ছন্দতা দূর হইয়া, আবার সতীনাথের উপর পূর্ব্ব বিদ্বেষ ভাব ফিরিয়া আসিল।

অসময়ে অকস্মাৎ মুরারির আবির্ভাবে উমা একটু বিরক্ত হইল। পিসীমা ও সুধার বাড়ী নাই, দাসীরা নীচে। সকল খবর জানিয়াও মুরারি মূঢ়ের মত উমার সম্বন্ধে এমন ব্যবহার করে কেন? হয় ত একদিন তাহার এই অকপট বন্ধুত্ব অকারণে উমার পক্ষে একটা জঘন্য অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইবে। মনের বিরক্তি-ভাবটা মুখে ফুটিতে না দিয়া সে সাজা পাণগুলি অকারণ নাড়াচাড়া করিয়া কহিল—"ইচ্ছে হল না।"

মুরারি একটুখানি হাসিয়া, অনেকখানি কাশিয়া গলা সাফ ও বক্তব্যটাকে সহজ করিয়া লইয়া কহিল—"বৌঠান, রাগ কোর না, একটা কথা বলি—তুমি যে অভিমান করে থিয়েটার দেখ্‌তে গেলে না, এতে ক্ষতিটে হল কার শুনি? তিনি ত গ্রাহ্যও কল্লেন না, দিব্যি হাসিমুখে চলে গেলেন দেখ্‌লাম। যেখানে অভিমান করতে যাওয়ার মানে—অপমান হওয়া, সেখানে এ বিড়ম্বনা ভোগ কেন?"—কথা শেষ করিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় তীব্র দৃষ্টিতে সে উমার আরক্ত নত মুখের পানে চাহিল।

মুরারির আরোপিত অপবাদ যে মিথ্যা, সে কথা প্রমাণ করিবার কোন উপায় উমার হাতে নাই। নিজের অবস্থা মুরারির চেয়ে সে ভালই জানে, তবু এই অতর্কিত আঘাতে তাহার নারীমর্য্যাদা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। স্বামী—ভালবাসেন না

ইহা সহ্য হয়, কিন্তু সেই উপলক্ষে অন্যের মুখে সহানুভূতিবাক্য—সে যে একান্ত অসহ্য !

উমার মুখ কান লাল হইয়া উঠিল, ক্ষোভে চোখেও বুঝি তাহার জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে উত্তর না দিয়া, কাজ ফেলিয়া সাজা পাণগুলি এক পাশে সবাইয়া বাখিয়া সহসা ঘব ছাড়িয়া যাইবাব জন্য মুরাবিব উদ্দেশে কহিল—"দোব ছাড়ুন, জ্যেঠামহাশয়কে খাবাব দিতে যাব।"

মুবাবি তাহাব প্রশ্নের উত্তব না পাইয়াও ক্ষুন্ন হইল না—সে আজ কোন মতেই দমিবে না। যে কথা বলিবাব জন্য মন তাহাব বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, সে কথা সে আজ নিঃশেষেই বলিয়া লইবে। দয়ামায়াব দিন ফুবাইযা গিয়াছে। কিসেব মমতা ? তাহাব উপরে কেহ কখনও এমন দয়া কবিয়াছিল কি ? উমাব মুখ চাহিয়া এই দীর্ঘকাল সে যে মনের স'হত সংগ্রাম কবিযা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, আজ তাহাব হিসাব নিকাশেব দিন আসিয়াছে, সে আজ স্থিব সঙ্কল্প কবিয়াছে—মারিবে অথবা মরিবে। যে সতীনাথ তাহাব জীবনের সুখ নষ্ট কবিয়া দিল, জন্মেব সঙ্গে শত্রুতা সাধিযা আসিল, তাহাকেও সে সুখী হইতে দিবে না। সে দুষ্টগ্রহ—নিজে জ্বলিয়াও তাহাকে জ্বালাইবে, আজন্মের শত্রুতাব শোধ তুলিবে। সাধুপুরুষ কেমন কবিয়া ধার্ম্মিকেব ভাণে আজ স্ত্রীব মনে শ্রদ্ধাব সিংহাসন অটল বাখেন, দেখিয়া লইবে। সে যখন কল্যাণীতেই আসক্ত, সে আসক্তি যখন তিন বৎসবেব ব্যবধানেও কাটিল না, জ্যেঠামহাশয়েব মৃত্যুপথ চাহিয়াই যখন মিলনেব দিন গণিযা কাটাইতেছে, কে জানে হয ত উভযেব মধ্যে পত্রচালাচালিও হইয়া থাকে—হয় ত তাহাকে ধৈর্য্য ধবিবাব পবামর্শ দিয়াই বহিয়াছে। মাঝে হইতে বিবাহেব মন্ত্র পড়িযা উমাকে তবে সে দখল কবিয়া বাখিল কেন ? রুদ্রকান্তেব বৈমাত্রেয ভ্রাতুষ্পুত্র যদি উমাব স্বামী হইতে পাবে, মাতুলপৌত্র কেনই বা সে অধিকাব বাখিতে না পাবিত ? যে মুবাবি আজ উমাব কাছে তুচ্ছ অনাদৃত মাটীব ঢেলা, সেই মুবাবি যে একদিন তাহাব মাথাব মণি হইতে পাবিত। শুধু বিষয় নয়—রুদ্রকান্তেব স্নেহ নয়—তাহাব সর্ব্বস্বই যে সতীনাথ অপহবণ কবিয়াছে, তাহাকে পথের ভিখাবী কবিয়া দিয়াছে !

সতীনাথের শান্তিসুখ নষ্ট কবিতে গিয়া সে যে আজ অজ্ঞাতে উমাব হৃদয়েও কত বড আঘাত দিতে বসিয়াছে, সে কথা মনেব উত্তেজনায় যেন তাহাব মনেই পড়িল না। ঈর্ষার তাডনায় সতীনাথের ক্ষতির তুলনায় উমার হৃদয় বেদনাও আজ তাহাব কাছে খাটো হইয়া গিয়াছে। এত দিন তাহারই মুখ চাহিয়া সতীনাথের গোপন-রহস্য সে গোপন কবিয়া আসিয়াছে। আজ আর তাহা

করিবে না। কেন করিবে? উমা দেখুক, তাহার স্বামী কি! সে তাহার প্রণয়িনীর ছবি বুকে ধরিয়া, কেবল জ্যেঠামহাশয়ের মহাপ্রস্থানের দিন গণিতেছে। সে উমার স্বামী, কিন্তু কল্যাণীর প্রেমাস্পদ এবং ভবিষ্যৎ স্বামী। সেইটা উমা একবার বুঝিয়া, জীবন ধন্য করিয়া লউক। মুরারি যতই মন্দ হউক, তবু সে কাহারও মরণ টাঁকিয়া বসিয়া নাই;—নিজেকে সাধুতার আবরণে আবৃত করিয়া লোকচক্ষে শ্রদ্ধেয় হইতেও চাহে না। সে যাহা—তাহা ডাকিয়া হাঁকিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্যও সে রাখে।

উমাকে সত্যই প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মুরারি জোর করিয়া দরজা চাপিয়া দাঁড়াইল। বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল—"সতীদা'র টান যে কোথায়, তাও সেদিন হুগলী গিয়ে দেখে এলাম যে? তোমাদেরই বাড়ীর পাশে তাঁরা রয়েছেন? কল্যাণী—কুড়ি বছরের বুড়ী—এখনও সে থুব্‌ড়ো হয়ে রয়েচে। কেন জান? ঐ ওঁরই আশায়! জ্যেঠামহাশয় একবার সর্‌লে হয়, তার পর সে যখন এ বাড়ীর গিন্নী হয়ে আস্‌বে, তখন বোলো—মুরারির কথা সত্যি কি না।"

উমা এই অতর্কিত অপ্রত্যাশিত আক্রমণে, চলিয়া যাইবার কথা ভুলিয়া, বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কল্যাণীর পরিচয় তাহারও এখন আর অজ্ঞাত নাই। দিদির চিঠিতে সে আজকাল তাহার অনেক সংবাদই পাইয়া থাকে। প্রত্যাখ্যাত প্রেমে ভগ্নহৃদয়ে সে যে চিরকুমারী থাকিবার সংকল্প করিয়াছে—এ সব খবরও সে জানে। কাল্পনিক ক্রোধে কল্যাণীর প্রতি দিদির পক্ষপাতিতার ছল ধরিয়া সে কত দিন চিঠিতে তাঁহার সহিত কলহও করিয়া থাকে। অথচ দিদির চিঠি পড়িয়া সেই অপরিচিতা প্রতিদ্বন্দ্বিনীর জন্য সমবেদনায় অঞ্চলে অশ্রু মুছিতেও তাহার বাধে না।

উমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মুরারি পুনরায় আরম্ভ করিল—"তবে সব কথা তোমায় খুলে বলি শোন। শুনে—যা ভাল বোঝ, কর। আমার কি, আমি বলে খালাস,—এর পর আমায় দুষো না, যে ঠাকুরপো সব জান্‌ত তবু বলে নি। ঐ যে ১৭ নম্বর বাড়ীখানা তোমার ঘর থেকে বেশ ভালই দেখা যায়—ঐ বাড়ীতে এক বিধবা মেয়ে নিয়ে থাক্‌তেন। মস্ত মেয়ে, পাশের পড়া পড়্‌ত! বাবুর সঙ্গ কেমন করে ভাবসাব হলো তা তাঁরাই জানেন। বাবু আশা দিলেন, তাকে বিয়ে কর্‌বেন। কর্ত্তাবাবু শুনে মহাখাপ্পা! কুলীনের ছেলের অঘরে বিয়ে—সর্ব্বনাশ, তা হতে পাবে না! মাগী এই সব দেখেশুনে ভেব্‌ড়ে গিয়ে, মেয়ে নিয়ে ত দে চম্পট,—শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী দাঁড়াবে! বাবু অতশত বুঝ্‌লেন না, একেবারে রাগে রাঙা হয়ে, তাদের সাজা দেবার জন্যে,

দায় ঠ্যালা গলগ্রহ তোমায় করেচেন। পছন্দ করেও নয়, কিছুই নয়। এখন রাগ পড়ে গ্যাছে, মন এখন সেই বনপানে। তাদের আশাও দিয়েচেন, পরে যা ঘটবে তা আমিও জানি, তিনিও জানেন। এখন কেবল যে খেল্‌নাটা কিনেচেন, বোধ হয় সখ হয়েচে একবার সেটা—"

উমা সহসা আহতভাবে দুই পা পিছাইয়া, বাহিরের দিকে হাত বাড়াইয়া আদেশব্যঞ্জক দৃঢ়তাপূর্ণস্বরে কহিল—"যান্—"

সূর্য্য ডুবিয়া বাহিরের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। ঘরের ভিতরেও অন্ধকার ত্বরিত পদে আপনার স্থান অধিকার করিতেছিল। ঘরের লোক দুই জনের আত্মবিস্মৃতিতে তাহা এতক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিয়া কখন যে তাহা দরজার কাছে আসিয়া মিলাইয়া ছিল, তাহা বুঝিবার মত মনের অবস্থা সেখানকার দুইজনের একজনেরও তখন ছিল না। সতীনাথ দরজার কাছে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া, পরমুহূর্ত্তে নীরবে নিজের গন্তব্য পথে ফিরিয়া চলিয়া গেল। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মুরারি—উমার দিকে না চাহিয়াই, দ্রুতপদে ঝড়ের মত নীচে নামিয়া গেল।

১২

ঘরে ও বাহিরে

তখন সেই প্রায় অন্ধকার কক্ষে মর্ম্মর মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সহসা অসহ্য বেদনায় উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। কাঁদিতে চাহিলেও, চোখ দিয়া তাহার একফোঁটাও জল পড়িল না। অন্তরের অগ্নির উত্তাপে অশ্রুজল যেন বাষ্প হইয়া, উড়িয়া গিয়াছিল, তাই ধরণীর শুষ্কবক্ষে এক ফোঁটাও ঝরিয়া পড়িল না।

আজ প্রথম তাহার মনে হইল—সত্যই সে দুর্ভাগিনী। স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা, অনাদৃতা—তবুও এতদিন সে নিজেকে দুর্ভাগিনী বলিয়া স্বীকার করিত না। আজ সে অবস্থার কিসে যে এমন পরিবর্ত্তন ঘটাইল, তাহা স্পষ্ট না বুঝিলেও, মনে হইল তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। কি যে তাহার ছিল, আর কি যে গেল, তাহা অন্যের দৃষ্টিতে ধরা না পড়িলেও, উমার মনে হইল, তাহার সবই ছিল। যে বিশ্বাসের বলে কিছু না থাকিয়াও তাহার সব ছিল, আজ সেই অমূল্য নিধি—বিশ্বাস—হারাইয়া সত্যই সে জগতের অনুকম্পা ও ঘৃণার পাত্রী—ভিখারিণীরও অধম হইয়া গিয়াছে। স্বামী ভালবাসেন না, গ্রাহ্য করেন না, ইহা যদি সহিয়াছিল, তবে তিনি অন্যাসক্ত ইহা যে কেন সহিবে না, এ কথা সে বুঝিতে অসমর্থ। তবু তাহার কেবলই মনে হইতেছিল—মরণে সে যদি আজ তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারিত।

লোকের কথা কানে না তুলিয়া, যাঁহাকে বিশ্বাসের সপ্তস্বর্গে বসাইয়াও সে যথেষ্ট তৃপ্ত হয় নাই—নিজেকে যাঁহার দাসীরও অযোগ্য মনে করিয়াছে—সেই স্বামী এই। সত্যই তিনি তবে তাহাকে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই দাসী পদ দিয়া আনিয়াছেন? সে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সুখদুঃখভাগিনী জীবনমরণের সঙ্গিনী নয়। বাহিরে লোকের কাছে সে তাঁহার স্ত্রী,—অন্তরে তাঁহার প্রণয়িনীর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ঈর্ষ্যার অস্ত্র। সে প্রয়োজনও এখন ফুরাইয়াছে। এখন সে তাঁহার গলগ্রহ, বন্ধনরজ্জু, জীবন পথের বিষম বিড়ম্বনা। তবু আপাদমস্তক বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়াও সারা জীবন—মরণের প্রতীক্ষায় তাহাকে এই ঘরের মাটী আঁকড়িয়াই পড়িয়া থাকিতে হইবে। কোন উপায় নাই—মরণ ছাড়া তাহার আর কোন উপায় নাই। মনে হইল—তাহার কর্ত্তব্য, দায়িত্ব, এখানকার সম্বন্ধ—সমস্তই যেন সেই মুহূর্ত্তেই ফুরাইয়া গিয়াছে, সে এখানকার অনাবশ্যক ভারমাত্র। তাহার সব বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে, কোন কর্ম্ম নাই, আজ সে সম্পূর্ণরূপেই স্বাধীন, তবু এ স্বাধীনতার মুক্তির আনন্দ ছিল না—সর্ব্বস্বহারা সন্ন্যাসীর মতই বন্ধনহীন, শ্মশানবৈরাগ্যের এ স্বাধীনতা।

পিসীমার অনুপস্থিতিতে ঘরের মা ভাঁড়ারের জিনিষ বাহির করিবার জন্য বারবার তাগিদ দিয়া, অবশেষে চাবি লইয়া নিজেই বাহির করিয়া দিল। ঘরে সন্ধ্যার দীপ জ্বালা হয় নাই। রাস্তার ধারের ফুলভারাক্রান্ত কৃষ্ণচূড়ার একটা শাখা রন্ধ্র ছাড়াইয়া জানালার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রালোকে কক্ষগাত্রে তাহারই আন্দোলিত ছায়া পড়িয়া ছায়াছবির মত বাতাসে দুলিতেছিল। উমা অপলকনেত্রে সেই দিকেই চাহিয়া রহিল, সে উঠিলও না, নড়িলও না।

রুদ্রকান্তের আহার্য্য লইয়া অপর লোকে তাঁহাকে আহার করাইতে গেল। তাহার মনটাও আজ শূন্য বোধ হইতেছিল, তবু প্রশ্ন করিলেন না। মনে করিলেন, হয় ত এখনও উমা বাড়ী ফিরে নাই, ফিরিলে নিশ্চয়ই এতক্ষণ কাছে আসিত, হাজার ক্লান্ত হইলেও সে তাহাকে একবার না দেখিয়া কখনই শুইতে যাইবে না।

পিসীমা ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে সুধীরের দ্রুতধাবমান পদশব্দ ও কণ্ঠস্বর শোনা গেল। রুদ্রকান্তের প্রত্যাশাপূর্ণ নেত্র—বারবার দরজার দিকে ফিরিতেছিল। কৈ সে ত আসিল না। উমাকে না দেখিয়া সতীনাথও মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। হইল কি?

নফর ঔষধের গ্লাস লইয়া কাছে আসিতেই রুদ্রকান্ত কহিলেন—"মা বুঝি শুয়েচেন? আহা, অনিয়ম, পরিশ্রম—দেহে আর কতই সয়!"

নফর কর্ত্তাবাবুর মন বুঝিল, তাই প্রয়োজন বোধে কথাটা উমার শ্রুতিগোচর

করিবার জন্য মোহিনীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল। শুনিয়া উমা চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কাঠের পুতুলের মুখে যেমন ভাব দেখা যায় না, তাহার মুখেও তেমনি কোনও ভাব প্রকাশ পাইল না। মোহিনী স্মরণ করাইয়া দিল—যে বৈকাল, ক্রমে রাত্রে পঁহুছিয়াছে, এবং শীতের রাত্রে পাথরের মেঝে বড় বেশী আরামপ্রদও নহে।

উমা উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া এইবার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার শরীর ভাল নাই, সে বিশ্রাম চায়।

মোহিনী নীচে গিয়া পিসীমার মহাভারতের ব্যাখ্যায় সভামধ্যে নিপীড়িতা রাজবধূ দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণোদ্দেশে লজ্জানিবারণ কেমন করিয়া অদৃশ্য থাকিয়াও বস্ত্রের স্তূপ যোগাইয়াছিলেন, তাহারই অদ্ভুত বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণে বিস্মিতচিত্ত শ্রোতা ও শ্রোত্রীবর্গের বিস্ময়-রসে রধা জল্মাইয়া চাপাস্বরে কহিল—"আজ মাঠাকরুণের কি একটা নিশ্চয়ই হয়েচেন। কর্ত্তাবাবু সেই হতে এত যে 'মা মা' করে হেদুতে নেগেচে, তা একবার তিস্বীমানা মাড়ালেওনি। ঘরে আলো দিতে মানা কল্লে—বাবু ছেয়েচারে নে গেলনি বলে রাগ হয়েছেন—"

শুনিয়া পিসীমা শ্রোতাদের কৌতূহল অসমাপ্ত রাখিয়াই বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"যা যা—সন্ধ্যেবেলাই জটলা করে আহ্নিক নষ্ট করে দিলি সব। দিনান্তে যে একবার দীনবন্ধুর নাম নেব, তারও ত এতটুকু ফুরসুৎ নেই।"—তিনিই যে তাহাদের উৎসাহ দিয়া কাজ ছাড়াইয়া কাছে জড় করাইয়াছিলেন, সে কথা এখন আর মনেও পড়িল না। মনে করাইয়া দিবার মত সাহস—অভিযুক্তদের কাহারও না থাকায়, তাহারাও ব্যস্তভাবে যে যাহার কাজে চলিয়া গেল।

সতীনাথ তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দিয়া, দরোয়ান ও সরকারকে ফিরাইয়া আনিবার ভার দিয়া, নিজে যে সেই গাড়ীতেই ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে খবর পিসীমাও জানিতেন। মনে করিলেন—উমা থিয়েটার দেখিতে না যাওয়ায় তখন সময়াভাবে সতী তাহাকে কিছু বলিতে পায় নাই, তাই ফিরিয়া আসিয়া মনের রাগ মিটাইয়া হয় ত কতকগুলা 'ফৈজৎ' করিয়াছে। আজ আর এ চিন্তায় বধূর উপর তাঁহার সহানুভূতি আসিল না। "আগাম্বুক মেয়ে, যা পাস তাই পজ্জি করে নে, তা নয়! মেয়ে মানুষের এত কেন রে বাবু? ব্যাটা ছেলে সোনার আংটী, তার আবার বাঁকা সোজা! সোয়ামী তু-করে ডাকলেই উঠবি, তা নয়।"

বঙ্গমঞ্চের অভিনব দৃশ্যপট, অভিনেতা অভিনেত্রীদিগের অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গি এখনও তাঁহার চোখের উপর যেন নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছিল। ভাষা অবোধ্য হইলেও, চোখের তৃপ্তিতেই মন যেন ভরিয়া রহিয়াছে। উমা সাধ করিয়া এমন

জিনিষ দেখিল না বলিয়া তাঁহার ক্ষোভের ব্যথা, বিরক্তিতে পরিণত হইয়া উঠিতেছিল—মালা জপেও বিঘ্নের সীমা ছিল না।

বাহিরেও যে ঘন মেঘাড়ম্বরে জ্যোৎস্নার আলো ডুবাইয়া উমার অন্তরব্যাপী অন্ধকারের মতই দুর্য্যোগ নামিতেছিল, সে তাহার সংবাদ জানিতে পারে নাই। বাগানে গাছের পাখা দুলাইয়া বাতাস রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশের বিফল চেষ্টায় গোঁ গোঁ শব্দে আর্ত্তচীৎকার তুলিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ-স্ফুরণে অন্ধকারের গাঢ়ত্ব বাড়াইয়া উমার আত্মগোপনেচ্ছু মুখখানার পানে চাহিয়া নিশীথিনীও যেন উপহাসের হাসি হাসিতেছিল। এইবার ঝড়ের সঙ্গে আকাশভরা কালো মেঘে জলের ঝরণা ঝরাইয়া দিল। শীতকালের রাত্রে বৃষ্টির বাতাস হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

অন্ধকার রাতে সকাল সকাল কাজ সারিয়া, অথবা ফেলিয়া রাখিয়াই, চাকর বাকরেরা লেপের আশ্রয় লইয়াছে। অনুপায় ভিন্ন এমন দিনে কেহ আর স্বেচ্ছায় বিছানা ছাড়িবে না। রোগীর ঘরে কেহ আছে কি না, যাহারা আছে তাহাদের সজাগ চক্ষু চিমনীর আগুনের উজ্জ্বলতা অথবা জ্যেঠামহাশয়ের গাত্রাবরণের স্থানচ্যুতির সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে কি না, এই কথাটাই উমার বারবার মনে উঠিতেছিল। তবু মন তাহার অন্য দিনের মত প্রতিবিধানকল্পে ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল না।

মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া নলের জল উঠানে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। কোথাও টিনের উপর জল পড়িয়া ছড়-ছড় শব্দ তুলিয়াছে,—মেঘের ডাকে, ঝড়ের ও জলের শব্দে, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ বিকাশে বাহিরে মহাপ্রলয়ের সূচনা জাগাইয়া তুলিতেছে।

বাহিরের বিপ্লবের চেয়ে উমার অন্তরেও বড় কম বিপ্লব চলিতেছিল না। সে যেন বিশ্বের সহিত দেনা পাওনার চুক্তি মিটাইয়া আজ স্বাধীন রাজ্যের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখান হইতে পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার আর তাহার প্রয়োজন নাই। বাহিরের ঘনঘটাময়ী রজনীর প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি তাহাকে ভীত করিতে পারে নাই। যে আশাহীন, তাহার আবার ভয় ভাবনা কি? উমার আশা হারাইয়াছে, তাই তাহার ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই। প্রলয়ের ভেরীনিনাদে স্তব্ধ হইয়া মন তাহার ভয়হারা কোন্ অজানা পথের যাত্রী হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

এমন দুর্য্যোগের রাত্রি আরও কতবার আসিয়াছে, ভয়ে সে ঘুমাইতে পারে নাই, আলো জ্বালিয়া ঘরের সার্শী খড়খড়ি আঁটিয়া খাটের পাশে একা বসিয়া দুর্গানাম জপ করিয়াছে। বজ্র হাঁকিয়া গেলে, সভয়ে নিজের অজ্ঞাতে শিশুর মত

নিজের মাথায় হাত চাপা দিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছে, তবু লজ্জায় পিসীমা বা দাসীদের কাছে সাহায্য চাহিতে অগ্রসর হয় নাই—নিজের অবহেলিত একাকিত্ব লোকচক্ষে প্রকাশ করিবার দীনতা স্বীকারে প্রবৃত্তি হয় নাই। মন যখন আশ্রয় খুঁজিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিত, অনুকম্পার লাঞ্ছনা কুড়াইবার ভয়ে পা দু'খানা অচল বদ্ধ-জলস্রোতের মত তখনও একস্থানেই বদ্ধ হইয়া থাকিত। মনে পড়িত—এমন রাত্রি সেখানে কতবার আসিয়াছিল, মার দুই পাশ অধিকার করিয়া দুই বোনে যখন সুখের শয্যা গ্রহণ করিত, মা'কে সে পাশ ফিরিতেও দিত না— "মা তুমি খালি খালি দিদির দিকেই ফির্‌চ" বলিয়া অনুযোগ করিয়া দিদির সহিত সাধের কলহ করিত। মেঘের ডাকে দুরুদুরু সভয়-বক্ষে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়াও তাঁহার স্পর্শসুখকণ্টকিত দেহে মনে করিত, এ রাত্রি যদি শেষ না হয় ত বেশ হয়, মা কাজের ছুতায় উঠিয়া যাইতে পারিবেন না! স্নেহময়ীর সে স্নেহের স্পর্শটুকু এখনও সে তাহাব কল্পনায় অনুভব করিয়া পুলকে পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু আজ যখন সেই সর্ব্বংসহ মাতৃক্রোড, সে নিরাপদ প্রার্থিত আশ্রয়, তাহাব কাছে সুলভ হইয়া দেখা দিল, তখনই তাহার কামনার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হায ভ্রমান্ধ মানব, তুমি শুধু মরীচিকায় ভ্রান্ত ও প্রতারিত! বাস্তবের সহিত তোমাব সম্বন্ধ কোথায়? উমার মনে হইল, আজ মাতৃক্রোড়েও তাহার সান্ত্বনা নাই, এখন তাহাব একমাত্র সুহৃৎ বন্ধু সেই অযাচিতের আশ্রয়দাতা,—প্রার্থিতের দুর্ল্লভ—মৃত্যু!

১৩

উমা শুনিবে না

বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। দালানের দেওয়ালে টাঙ্গান একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া করিয়া দ্বিপ্রহর ঘোষিত হইল। সেই সঙ্গে উমার রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাহিরে মৃদু মৃদু করাঘাতের সঙ্গে শুনিতে পাওয়া গেল—"দোরটা একবার খোল।"

এ স্বর উমার অপরিচিত নয়। কতদিন এই স্বরেরই মৃদু আঘাতে তাহাব সুরবাঁধা হৃদয়বীণার তার তাহার অজ্ঞাতে বাজিয়া উঠিয়াছে. বায়ুতাড়িত বেতসপত্রের মত সারাদেহ ঐ স্বরের স্পর্শে সুখাবেশে কাঁপিয়া উঠিয়াছে, অকারণে অভিমানের জলে চোখ ভরিয়া উঠিয়াছে। সে স্বর, সে পরিচিত স্বর—বাহিরের ঝড় জল বা মেঘ গর্জ্জনেও উমার শুনিবার পক্ষে বাধা জন্মাইল না। তথাপি সে নড়িল না, কোন সাড়া দিল না।

"আমি সতীনাথ—একবার শোন। এখনি আমি ফিরে যাব—"

আহ্বানকারীর কণ্ঠস্বরে মিনতি ও আবেদন ধ্বনিত হইল, তবুও উমা উঠিল না, এতটুকু নড়িলও না। শ্বাস রুদ্ধ করিয়া, যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন সে শুনিবে? কেনই বা দ্বার খুলিয়া দিবে? হইলেনই বা উনি সতীনাথ, উঁহার সহিত উমার কিসের প্রয়োজন? না—শুনিবে না। সকল কথাই তাহার শুনা হইয়া গিয়াছে। যদি আরও কিছু শুনিবার বাকী থাকে, ওগো দয়া করিয়া তোমরা আর তাহা শুনাইও না; সে আর সহ্য করিতে পারে না! তাহাকে মুক্তি দাও—এইবার সে ক্লান্ত হইয়াছে!

বাহিরে করাঘাত ও কণ্ঠস্বর আগন্তুকের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া ক্রমেই উচ্চে উঠিতেছিল। কোন উত্তর অথবা ভিতরে জাগন্ত মানুষের অস্তিত্বের কোনও আভাস না পাইয়া, আহ্বান আপনিই থামিয়া গেল।

পদশব্দে উমা বুঝিতে পারিল, তিনি চলিয়া গেলেন। কি বলিতে আসিয়াছিলেন, না বলিয়াই, ব্যর্থক্ষোভে চলিয়া গেলেন। তিনি যে আসিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া গেলেন, এটা তবে স্বপ্ন নয়—সত্যই তিনি আসিয়াছিলেন—পাষাণী উমার রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়া গেলেন। আর কখনও আসিবেন না। আর—"শোন" বলিয়া অনুনয়ে দ্বার খুলিতে বলিবেন না। উমা তাঁহাকে বিদায় দিয়াছে চিরজীবনের জন্যই বিদায় দিয়াছে!

এইবার মাটীতে বসিয়া পড়িয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ছেলেমানুষের মত গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া মনের বেদনা যখন হাল্কা হইয়া আসিল, তখন সে বুঝিল, শুধু মানুষের কাছে নয়, মনের কাছেও সে প্রতারিত হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতে সে তাহার স্বামীকে মন প্রাণ সব দিয়াই ভালবাসিয়াছে। শুধু ভালবাসিয়াছে নয়—এত ভালবাসিয়াছে যে সে ভালবাসার পরিমাণ অনুভব করিতেও সে যেন ভীত হইল। তিনি যাই হউন, যেমন ব্যবহারই করুন, তবু সে তাঁহার সান্নিধ্য, তাঁহার দর্শনসুখ ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসও যে কামনা করে না! হায়, ভাগ্যের উপর বিদ্রোহ করিতেও সে আজ অক্ষম—এমনই সে কৃপার্হ। এখন সত্যই যদি উঁহারা তাহাকে তাড়াইয়া দেন, কেমন করিয়া দূরে গিয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে?

অন্ধকারে তাহার মানসচক্ষে একখানা রঙ্গিন ছবি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। উমার মনে হইল—সে যেন এ গৃহের কাছে চির বিদায় লইয়া, দুঃখিনী মায়ের কোলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পরিত্যক্ত গৃহিণী-পদে আর একজন আসিয়া স্থান পূরণ করিয়াছে। স্বামীর বামপার্শ্বে সুসজ্জিতা সুন্দরী ষোড়শী কল্যাণী—দুই জনের মুখেই সুখের ভাব—অনুরাগে অধরে মধুর হাসি ফুটিয়া

উঠিয়াছে ! স্বামী তাহার কর্ণে কত আদরে কত সোহাগে প্রণয়ের মধুরালাপ বর্ষণ করিতেছেন। বিধাতা এইবার যোগ্যের সহিত মিলন করিয়া দিয়া পূর্ব্বত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। উমার অজ্ঞাতে তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া জলের ধারা গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছিল। সে দুই হাত যোড করিয়া মনে মনে কহিল, "তাই কর ঠাকুর—আমি মরে যাই, ওঁরা দুজনে সুখী হোন—খুব সুখী হোন।"

সহসা রাজপথে শব্দ উত্থিত হইল—"বল হরি হরিবোল।"

কতদিন বিনিদ্র নিশীথে রাস্তা দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইতে সে শুনিয়াছে। মানবের সেই চিরন্তন পরিণামের সংবাদ ঘোষণায়—নিঃসঙ্গ রাত্রিতে তাহাকে মহা ভয়ে ভীত করিয়া তুলিয়াছে। কতদিন সে অবলম্বন খুঁজিয়া বিছানার চাদরখানাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া সভয়ে দেবদেবীর নাম স্মরণ করিয়াছে। আজ তাহার মনে হইল—"আহা, কে চলিয়া গেল রে, না জানি তাহার আপন জনের কত ক্ষতিই করিয়া গেল। আমি যদি তাহার সহিত আজ অবস্থার বিনিময় করিতে পারিতাম, তবেই জীবনের সকল সমস্যা মিটিয়া যাইত।'—মায়ের মুখ—আজ তাহার চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। দুর্ভাগিনী স্বামীপরিত্যক্তা কন্যা বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই যে তাঁহার ছিল ভাল।

উমা উঠিয়া ঘরের একটা জানালা খুলিয়া দিল। বৃষ্টি কমিয়া বাতাসের বেগ মন্দিভূত হইয়া আসিয়াছে। জলের বাতাস তাহাকে শীতার্ত্ত না করিয়া যেন শীতল স্নেহকরস্পর্শ বুলাইয়া সান্তনা দিতে লাগিল। বাহিরের ঘন অন্ধকার তরল হইয়া উষাগমের আভাস প্রকাশ করিতেছিল। উমার মনে পড়িল—এমন সময় রোজ সে জ্যেঠামহাশয়কে দেখিতে যায়, নিজ হাতে ঔষধ খাওয়াইয়া আসে। রাত্রি জাগরণক্লান্ত সেবকের দল তখন ঘুমে ঢুলিতে থাকে, সতীনাথ বা মুরারি সেই সময় কেহই থাকে না। জ্যেঠামহাশয়ের উৎকণ্ঠিত চক্ষু তাহারই প্রতীক্ষায় দরজার দিকে চাহিয়া থাকে। হয়ত এখনও তিনি তেমনি করিয়া চাহিয়া আছেন, আর স্বার্থপর উমা নিজের লাভক্ষতি লইয়াই ব্যস্ত। কাল সেই বৈকাল হইতে তাঁহাকে একবার দেখিতেও যায় নাই। না না, উমার অদৃষ্ট তাহাকে যেখানেই লইয়া যাক্, এখনও তাহার কর্ত্তব্য যে বাকী রহিয়াছে। জ্যেঠামহাশয়কে ছাড়িয়া, এমন অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া সে কোথায় যাইবে? তিনি যে অসহায় শিশুর মত, এখন কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া অসহ্য রোগের যন্ত্রণা হাসিমুখে সহিতেছেন। উমার যদি সব যায়—স্বামী যদি এখন তাহাকে তাড়াইয়াও দেন, তবুও সে যাইবে না—যাইতে পারিবে না। কিন্তু না যাইয়াই বা সে করিবে কি? তিনি যে এখন তাহাকে আর স্থান দিতেও অনিচ্ছুক,

এইবার সে বেশ বুঝিয়াছে। এই জন্যই সেদিন উপযাচক হইয়া তাহাকে হুগলী পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন—মূর্খ সে, তাই সে কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া গোপন-দুরাশার মোহে মুগ্ধ হইয়া নিজেকে প্রতারিত করিতে চাহিয়াছিল! ভালমন্দের বিচারে—সত্য মিথ্যার রূপ চিনিতে সে অনভিজ্ঞা। হিতকামী মুরারির হিতবাণীও তাই একদিনও কাণে তুলে নাই। স্বামীর প্রকৃত রূপ তিনি ত কত দিনই দেখাইতে চাহিয়াছেন, অহঙ্কারে সে কথায় সে কর্ণপাতও করে নাই। বরং তাহাকে পরশ্রীকাতর মনে করিয়া, স্বামীকে দেবতার আসনে বসাইয়া মনে মনে পূজাই করিয়াছে। বিশ্বের করুণা কুড়াইয়া যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহার বাঁচিয়া থাকা যে মরণের চেয়েও কষ্টকর। উমার আর বাচিবার সাধ নাই। এখন—ওগো মৃত্যু, ওগো পাপী তাপী অনাথের বন্ধু, তুমিও কি অভাগিনী উমার কথা ভুলিয়া থাকিবে? সে যে আর পারে না, এইবার তাহার সকল জ্বালার শেষ করিয়া দিয়া, সকলের সুখের পথ মুক্ত করিয়া, তাহাকেও মুক্তি দাও। তিনি ভুল করিয়াছিলেন, এইবার সে ভুল শুধ্‌রাইবার চেষ্টা করিতেছেন,—কেনই বা তা না করিবেন? উমা তাঁহার কে—যে তাহার কথা মনে করিবেন?

বাহিরের ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। বৃষ্টি প্রায় থামিয়া আসিয়াছে। খোলা জানালা দিয়া শীতের বাতাসও জলের ছাট তাহার দেহে শৈত্যানুভব করাইয়া জানালা বন্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তাহা বন্ধ করিল না! উঠিয়া নিঃশব্দে দরজা খুলিল, এইবার একবার চুপি চুপি পা টিপিয়া চোরের মত লুকাইয়া জ্যেঠামহাশয়ের সংবাদ জানিয়া আসিবে। ভিতরে যাইবে না, বাহির হইতেই ফিরিয়া আসিবে। দিবালোকে সে আর কাহাকেও মুখ দেখাইবে না।

দ্বার খুলিয়া চৌকাঠের বাহিরে পা দিয়াই উমা সহসা বিস্ময়ে দুই হাত পিছাইয়া আসিল। একটা অস্ফুট চীৎকারও অতর্কিত তাহার মুখ দিয়া বুঝি সেই সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

১৪

মুখ ফুটিল

ঘরের বাহিরে ঘেরা দালান—তাহার সব কয়টা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বিদ্যুতালোক জ্বালিয়া আসনাভাবে সতীনাথ একটা ষ্টীল ট্রাঙ্কের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। উমা দ্বার খুলিতেই সে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল— আমায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছ—উমা!"

স্বামীর মুখে উমা আজ প্রথম তাহার নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিল। শুনিল—সে তাঁহাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি। গোড়া কাটিয়া আগায় আর এ জলসেচন কেন? মরুভূমিতে আলেয়ার আলো জ্বালিয়া তৃষিতকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিবার এ বুঝি আবার কোনও নূতন আয়োজন? না না, বুঝি তা ছাড়া আরও কিছু আছে—বোধ হয় সেই সন্ধ্যার ঘটনা। প্রায়ান্ধকার কক্ষে কেন তিনি মুরারির কাছে উমাকে দেখিয়াছিলেন—সে কৈফিয়ৎ লওয়া যে এখনও তাঁহার বাকী আছে। আজ উমা অপরাধিনী, আর উনি বিচারক। অন্তরে যে প্রবল বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, উমা বাহিরে তাহার কোনও আভাস জানাইল না। সে স্থির হইয়া বদ্ধদৃষ্টিতে মাটীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীনাথ ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দ্বারে পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়া, অতি কোমল-কণ্ঠে নতবদনা উমার পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল— "আমায় কিছু বল্‌বে কি?

উমা মুখ তুলিয়া স্বামীর রাত্রিজাগরণে ম্লান চিন্তাশুষ্ক মুখের উপর আপনার অচপল-দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল—"না।"

"কিছুই না? কোন কথাই কি বল্‌বার নেই?"

মেঘে মেঘে ঘর্ষণে বিদ্যুদগ্নির উদ্ভব হয়, সে অগ্নিতে শুধু দাহিকাশক্তি থাকে না, অন্ধকারের গাঢত্বও বাড়ায়। আবার তেমনি দৃঢ, তেমনি অচপল স্বরে উত্তর হইল—"না।"

শীতে বা যে কারণেই হউক, সতীনাথের দীর্ঘ দেহ ঈষৎ কম্পিত হইল। মুখের মৃদু হাসিটুকু মিলাইয়া না গেলেও তাহার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কণ্ঠস্বরও একটুখানি যেন কাঁপিয়া গেল—"আমাদের নির্জ্জন সাক্ষাৎ এই প্রথম, আর—আর—হয়ত—উমা আমায় কি কিছুই তোমার বল্‌বার নেই? শেষ্‌বারও কোন কথা—"

স্বামীর নির্ল্লজ্জ ধৃষ্টতায় আজ উমা অন্তরের বেদনার উপর শুধু আঘাত পাইল না, সেই সঙ্গে নিজেকে সে অপমানিতও মনে করিল। যে কথা উনি শুনাইতে চাহিতেছেন, সে কথা সে শুনিয়াছে। ওগো দয়ালু, তোমার অনেক দয়া, দয়া করিয়া আর কিছু বলিও না।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সতীনাথ যেন আশান্বিতভাবে কহিল—"বল—"

কি বলিবে? ওগো তোমরা বলিয়া দাও, উমা কি বলিবে! বলিবে কি—'আমায় মুক্তি দিয়া তোমরা মুক্ত হও'। তবে তাই হোক্। এই পথই

যে উমার ভাগ্যবিধাতা তাহার নিজের হাত দিয়াই তাহাকে করাইয়া লইতে চাহিতেছেন, সে অদৃশ্য অঙ্গুলি-হেলনের অসীম শক্তি কেমন করিয়া নিজ দুর্ব্বল শক্তিতে উমা প্রতিরোধ করিবে? একান্ত নির্ভরপরায়ণ জীবন্মৃত জ্যেঠামহাশয়, ভ্রাতৃপ্রতিম প্রিয়তম সুধীর,—এ মুক্তির মূল্যে তাঁহাদেরও বিসর্জন দিতে হইবে। কিন্তু সে কি করিবে, এই যে তাহার বিধিলিপি! এখানকার দান এখানেই ফিরাইয়া দিয়া, শোণিতাপ্লুত ক্ষতহৃদয়ে আবার সে দুঃখিনী মায়ের স্নেহাঞ্চলের তলে ফিরিয়া যাইবে, সেখানে তাহার স্থানের অভাব হইবে না। মরণকালে চোখের জলে বিদায় দিবার লোকাভাবও ঘটিবে না। সমুদ্রে যে শয্যা বিছাইয়াছে, শিশিরবিন্দুতে তাহার আর ভয় কেন? স্বামীকে সে তাঁহার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি দিয়াই গৃহিণীশূন্য গৃহে নূতন অভ্যাগতার স্থান ছাড়িয়া দিয়া যাইবে। চিরবিদায়ের দিনেও সে তাহার অন্তরের দৈন্য প্রকাশ করিয়া যাইবে না। লোকে কি বলিবে—তা যা ইচ্ছা বলুক। তবু সে ত জানিবে, পরিত্যক্তা হইলেও, ত্যাগের মন্ত্র স্বেচ্ছায় নিজের মুখেই সে উচ্চারণ করিয়াছে; জোর করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হয় নাই।

উমা মুখ তুলিতেই সতীনাথের উদ্বেগ-ব্যাকুল জিজ্ঞাসু-দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিল। সে কহিল—'এইবার আমায় হুগলী পাঠিয়ে দিন।"

সতীনাথ বিস্মিত হইল। সেদিন পিত্রালয় গমনে উমা অনিচ্ছার যে কারণ দর্শাইয়াছিল, সতীনাথের মনের কাছে সে কারণ যতই তুচ্ছ হউক, বাহিরে এখনও ত তাহা খণ্ডিত হইবার কোন যুক্তি পাওয়া যায় নাই। তবে? সে কহিল—"হুগলী যাবে কেন? জ্যেঠামশায়কে এখন এরকম অবস্থায় রেখে থাকতে পারবে সেখানে?"—কণ্ঠস্বরেও বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

আহত স্থানেই আঘাত লাগে, কিন্তু আঘাতকারী যদি জানিয়া সে আঘাত করে, তবে আঘাতের বেদনা বুঝি নিরুপায় ক্রোধে আহতের মনে যন্ত্রণা জাগাইতে পারে না। উমা এ শরাঘাত গায়ে পাতিল না। কহিল—"আমি—আমি সবই পারি।"

"তা পার—কিন্তু সেখানে কি বল্‌বে? তাঁরা যদি বলেন—'এখন হঠাৎ কেন এলে'?"

উমার মুখের সবটুকু রক্ত নিমেষে সরিয়া গিয়া মুখখানা বিবর্ণ হইয়া, তখনই আবার ঘোর লোহিত রাগে রাঙা হইয়া উঠিল। লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিবার এদিকটা সে এতক্ষণ তলাইয়া দেখে নাই, হয় ত তুচ্ছ বলিয়া এ কথা তাহার মনেও পড়ে নাই। কিন্তু তুচ্ছ বলিয়া সংসার ত কোন জিনিষকেই বাদ দিবে না? তা

সে জন্য উঁহারই বা শিরঃপীড়ার এত প্রয়োজন কি ? তবে কি সত্যপ্রকাশে উনি অনিচ্ছুক ? নিজের অপরাধেই উমা স্বামিগৃহ-বিচ্যুতা হইল, এইটুকুই কি তবে প্রকাশ করিতে চান ? মুরারির আচরণই তবে তাঁহার যুদ্ধজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র ! এই সুযোগই চাহিতেছিলেন ! ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবু সে জোর করিয়া কহিল—"সে চিন্তা আমার।"

সতীনাথ নতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, এক সময় মুখ তুলিয়া কহিল—"তা সত্যি, কিন্তু এর উত্তর আমিও কি চাইতে পারি না ? যত মন্দই হই, স্বামী বলে' আমায় অস্বীকার করতে পারবে না ত !"

সতীনাথের ওষ্ঠে তাহার অভ্যস্ত বিদ্রূপের মৃদুহাসি ফুটিতেই, অপমানের ব্যথায় উমার মুখখানা আবার বিবর্ণ হইয়া আসিল। সত্যই উনি স্বামী ! বিধাতার এত বড় বিড়ম্বনা আর কোথাও না ঘটিলেও, এ ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে। যাহাই করুন, তবু উনি স্বামী। তাই ছুতা পাইয়া আজ নিজের স্বত্ব প্রমাণ করিতে আসিয়াছেন। এ সতর্কতা এতদিন কোথায় ছিল ? যে স্বামী অবহেলায় স্ত্রীকে পথের লোকেরও দুই কথা বলিয়া যাইবার সুযোগ দেন, তিনি আবার কোন্ মুখে নিজের সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দিতে আসেন ? উমার চিরসহিষ্ণু চিত্ত আজ অতর্কিত আঘাতে তাহার সহিষ্ণুতা হারাইয়া ফেলিল। সে আর সহ্য করিবে না, করিতে পারিবেও না। সে মুখ ফিরাইয়া সতীনাথের প্রশ্নের উত্তরে কহিল—"আমি ক্লান্ত হয়েছি, আমি চলে যাব।"

সতীনাথের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। উমা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই দেখিতে পাইল না। সতীনাথ বলিতে গেল, আজ এতদিনের পর ক্লান্ত হইলে কেন ? ওগো পাষাণী, এতদিনের পর সত্যই কি তবে তোমার আসন টলিয়াছে, তবে তুমিও ক্লান্ত হও ? মনের কথা সে কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। শুধু মৃদুস্বরে কহিল—"কেবল তাই—"

স্বামীর কথার অর্থ না বুঝিয়া, সহসা বারুদস্তূপে অগ্নি দিলে যেমন করিয়া ফাটিয়া পড়ে, তেমনি করিয়া জ্বলিয়া সে মুখ ফিরাইল ; উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা হানিয়া কহিল—"মুরারি ঠাকুরপোর কথা বল্‌চেন ?"

অত্যন্ত অপ্রতিভস্বরে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে সতীনাথ বাধা দিল—"না না, তার কথা আমি কিছুই বলিনি, বল্‌বও না। যার নিজের অপরাধ পাহাড়ের চেয়ে ভারী, পরের ছিদ্র খোঁজ্‌বার স্পর্দ্ধা সে কিসে নেবে ? এত নীচ আমায় মনে করো না উমা !"

দৃঢ়-নিশ্চিত বিশ্বাস যদি অতর্কিতরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে প্রমাণকারীর

উপর যেমন করিয়া সংশয়ে, বিস্ময়ে লোকে চাহিয়া দেখে, তেমনই করিয়া উমার রোষদৃপ্ত আঁখিতারা বিস্ময়ে ভরিয়া সতীনাথের লজ্জিত মুখে নিবদ্ধ হইয়া, কখন শান্ত হইয়া গেল, সে বুঝিতেও পারিল না। কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃতের মত সে যেন নিজের অবস্থা ভুলিয়া অভিভূত ভাবে চাহিয়া রহিল। সতীনাথ যে সেই অবসরে তাহার কতখানি কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই।

তাহাব মনের ভাব না বুঝিয়া, তাহাকে বাপের বাড়ী যাইতে বাধা দেওয়ায় দুঃখিত মনে করিয়া তাড়াতাড়ি সতীনাথ নিজের ভুল শুধ্‌রাইয়া লইয়া কহিল—"বেশ, হুগলীই যেও। কালই কি যাবে তবে? এই দুর্য্যোগে শীতে—তা হোক—দুপুব বেলা গেলেও আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আস্‌তে পার্‌ব।"

উমা বাধা দিয়া কহিল—"আপনি যাবেন? না না, তা কর্‌বেন না, কাকেও দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।"

"কেন উমা?"

স্বামীব কণ্ঠে এমন ব্যথা-কাতর স্বর সে তাহার অভিজ্ঞতায় আর কখনও শোনে নাই। তাহার স্বাভাবিক করুণ চিত্ত আজ এ আঘাতে বিচলিত হইলেও—দমিল না। সে কহিল—"তাঁবা গবীব, সে কুঁড়ে ঘরে—দরকারও ত নেই যাবার—"

সতীনাথ হাসিবাব চেষ্টা করিয়া কহিল—"সেখান থেকেই বোধ হয় আমি তোমায় এনেছিলুম—আবার আমাব স্ত্রীকে সেখানেই রাখ্‌তে যাব।"

নিদাঘেব তীব্র তাপদাহ জুড়াইয়া অকাল বর্ষণে এ কি শীতলতা আনিয়া দিল বে! সকল বিদ্রোহ, সব অপমান, চিরদিনের অবহেলার ব্যথা ভুলিয়া মন যে ঐ চবণতলেই লুটাইতে চায়! মরণপথেব যাত্রীকে আর এ জীবনের আলোর লোভ দেখান কেন? আজ এতকালের পর চিরবিদায়েব দিনে তবে স্ত্রী বলিয়া স্বীকাব কবিলে? এই কি বিদায়ের পাথেয়? উমা আর্ত্তভাবে কহিল—"সেখানে তাঁদের কাছে কি বল্‌বেন?, তাঁরা যদি বলেন—'কেন ওকে নিয়ে গেছ্‌লে, কেনই বা ফিবে দিলে'?"

"ফিবে দিলুম উমা?—"

সে ব্যথিত ভর্ৎসনার সুরে উমা ব্যথা পাইলেও, কথা কহিল না। কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া সতীনাথ কহিল—"তুমি তবে তাই চাইচ—আমায় চিরকালের জন্যে ত্যাগ করে, এখানকার সব সম্বন্ধ কাটিয়ে যেতে চাইচ? বল, তাই চাইচ?"

সতীনাথের মুখ শ্বেতপাথরের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল ; কণ্ঠস্বরও বেদনায় কাঁপিতেছিল। উমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে না পারিয়া নতমুখে মৌন হইয়া রহিল। সতীনাথ দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"তাই হোক্, এই তোমার দোর খোলা হয়ে গেল উমা। কিন্তু তবু আমি তোমার সঙ্গে যাব। কেন যাব তাও শোন। যে কথা এতদিন তোমার কাছে বল্‌তে পারিনি, এখন তা বলব! জীবনের কোন অপরাধ—যদি তা অপরাধই হয়, তাও আমি গোপন করব না! দাদামশায়ের কাছে যা বল্‌ব, তুমিও তা শোন। প্রথম যৌবনে একজনকে আমি ভালবেসেছিলুম। শুধু চোখের নেশা নয়, সত্যি ভালই-বেসেছিলুম। একটা প্রকাণ্ড ভুলের বশে—তার উপরে—তোমার উপরে যে অন্যায় আমি করেছি, তাও অস্বীকার কর্‌ব না। কিন্তু সে ভুল জেনে, নিজেকেও আমি মাপ করিনি। নিজেকে বিবাহিত জেনে, তার চিন্তা পর্য্যন্ত প্রাণপণে ভুল্‌তে চেয়েচি। স্বার্থ বা লোভের জন্যে আমার চিরকালের বিশ্বাস আমি বদল করবার চেষ্টা করিনি। নিজের দুঃখ দুর্ভাগ্যে—তখন তোমার কথা আমার মনে হয় নি। ভেবেছিলুম—কখনও তোমায় ভালবাস্‌তে পার্‌ব না, তোমার কাছে তা চাইবও না কিন্তু যখন থেকে তোমায় চিনেছি, তখন থেকেই তোমায় ভালবেসেছি! নিজেকে অপরাধী জেনে কখনও সে কথা সাহস করে বল্‌তে পারিনি। তবু বিশ্বাস কোরো, তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে—আমার বেঁচে থাকা ভার হবে—হয় ত—হয় ত—আমি বাঁচ্‌বও না।"

শেষের কথাগুলি অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিয়া সতীনাথ তাড়াতাড়ি জানালার ধারে গিয়া বাহিরে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার কম্পিত পা দু'খানার পানে চাহিলেই তখনকার মানসিক আবেগ স্পষ্ট বোঝা যাইত।

বাহিরের ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়া একটা প্রশান্ত নির্ম্মলতা প্রকাশ পাইতেছিল। ভোরের আলোয় বৃষ্টিধৌত গাছপালার কোমল শ্যামলতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অতি-বর্ষণে মেঘহীন আকাশ ভারমুক্ত অন্তরের মত প্রশান্ত ও উজ্জ্বল। পূর্ব্বাকাশে উষার অস্পষ্ট আলো সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছে। আকাশের এক প্রান্ত রক্তিমরাগে রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে উজ্জ্বল অগ্নিগোলকটি ক্রমে ক্রমে আত্ম-প্রকাশ করিল। দেখিতে দেখিতে সেটি একখানি সুবর্ণের থালার আকার ধারণ করিল এবং থালাখানি কাঁপিতে কাঁপিতে যেন কোন অদৃশ্য দেবতার চরণোদ্দেশে আরতি করিবার জন্য নিম্ন হইতে উর্দ্ধে—অতি উর্দ্ধে উঠিতেছিল।

পায়ের নীচে কোমল শীতল করস্পর্শে চমকিত হইয়া সতীনাথ মুখ ফিরাইল, তখনও তাহার চোখের কোলে, শুভ্র গণ্ডে জলের চিহ্ন—হয় ত সে বৃষ্টির ছাট।

উমা তাহার পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া মুখ তুলিতেই, স্ত্রীকে স্পর্শ না করিয়া মৃদুস্বরে সে কহিল—"আমায় মাপ কর্‌তে পার্‌বে কি উমা ?"

'উমা স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া, পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া গাঢ়স্বরে কহিল—'আপ্‌নি আমায় মাপ করুন !"

সতীনাথ এইবার মনে মনে ভক্তিপূর্ণচিত্তে, অনন্তশক্তিমান সেই অদৃশ্য মিলন-কর্ত্তাকে প্রণাম করিল। যাঁহাকে সন্দেহ করিয়া, যাঁহার সর্ব্বব্যাপক স্নেহে বিশ্বাস হারাইয়া, একদিন মনের কাছেও যাঁহাকে সে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল, অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার অসীম করুণা মনেপ্রাণে পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া নিজেকে সে ধন্য জ্ঞান করিল। স্ত্রীর কম্পিত হাতখানি নিজের হাতের ভিতর রাখিয়া কহিল—"উমা—তুমি শুধু আমার স্ত্রী নও, যথার্থই সহধর্ম্মিণী। তোমার বিশ্বাসে, তোমার শ্রদ্ধায়, তোমার ধৈর্য্যে, আজ আমার অপহৃত বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি।"

নবজীবনের আনন্দদাতার উদ্দেশে এবার তাহারা দুইজনে একসঙ্গে মাটীতে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল।

২৫

স্ত্রীচরিত্র

রুদ্রকান্তকে দেখিতে আসিয়া একদিন বিশ্বনাথ উমার কাছে কল্যাণীর কথা বলিয়া গেলেন। কল্যাণীর পরিচয় অন্নপূর্ণার পত্রে উমা অবশ্য সবিশেষ জ্ঞাত আছে। এই সম্পূর্ণ অপরিচিত দুইটী নরনারীর দর্শনাশায় কেনই যে সেই মরণপথের তরুণ যাত্রিনীটি সহসা এমন প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল—সে কথা খুলিয়া বলার কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিলেন না। আত্ম-সংযমে চির-অভ্যস্তা উমা প্রশ্ন করিয়া তাহাকে শুনাইতে যে বাধ্য করিবে না, তাহাও বিশ্বনাথের জানা ছিল।

বিশ্বনাথ চলিয়া গেলে উমা বিছানায় পড়িয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। যে উমা মুরারির মুখে স্বামীর অন্যাসক্তির পরিচয় পাইয়া নিজের মৃত্যুকামনায় অধীর হইয়াছিল, সেই উমা স্বামীর মুখে প্রকৃত ঘটনা শুনিয়া সমবেদনায় কল্যাণীর জন্য লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কতবার ইচ্ছা হইয়াছে স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলে যে, অযোগ্যা উমা যদি তাঁহার চরণে স্থান পাইল, তবে কল্যাণীই বা সে সুখে বঞ্চিত হইবে কেন ? তিনি কল্যাণীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনুন, উমা নিজে বরণ করিয়া, তাহাকে ঘরে তুলিবে, খুসী হইয়া তাহার সকল অধিকার সপত্নীকে ছাড়িয়া দিবে। মনের মধ্যে বিদ্রোহ চলিলেও সে সাহস

করিয়া মুখে কিছুই বলিতে পারিত না। কল্যাণীর মর্ম্মবেদনা আত্মহৃদয়ে অনুভব করিয়া, স্বামীপ্রেমের অংশীদার গ্রহণে আজ স্বেচ্ছায় উপযাচিকা হইতেও সে সম্মত। দুর্জ্ঞেয় স্ত্রীচরিত্র যখন দেবতাদেরও অবোধ্য, তখন উমা-চরিত্রই বা সে নীতির ব্যতিক্রম করিবে কেন? সতীনাথের ভালবাসা যতই সে মনে প্রাণে অনুভব করিতেছিল, মনটা তাহার কল্যাণীর জন্য ততই 'হায় হায়' করিয়া উঠিতেছিল। এমন হৃদয়ের একাধিপত্য পাইয়াও যে দুর্ভাগিনী তাহা রাখিতে পারিল না, তাহার সন্য সান্ত্বনা বুঝি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কল্যাণীর চিরকৌমার্য্যের সঙ্কল্প—উমার মনে প্রথমে একটা প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। সে ভাবিত—"এ আবার কি বাপু! হিঁন্দুর মেয়ের মেম সাহেবের মত নিজের বিয়ের আবার মতামত কি?" এখন সে কার্য্যও উমার চোখে আর নিন্দনীয় নহে। এখন সে ভাবে—"এঁকে যে কখনও ভালবেসেছে, স্বামী মনে করেছে, সে কি কখন আর ভুল্‌তে পারে?" কুমারী কন্যার স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত স্বামিগ্রহণে একমাত্র পুরাণোক্তা সাবিত্রীদেবী ছাড়া উমা এ পর্য্যন্ত মনে মনে কোন নারীকেই প্রশংসা করিতে পারে নাই। আজ কল্যাণীর অবস্থা ভাবিয়া কল্যাণীর কার্য্য তাহার চক্ষে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিতেছিল। অবিবাহিতা থাকা ছাড়া তাহার যে আর কোন পথ ছিল না, উমা এখন তাহা বেশই বুঝিতে পারে।

মাথার চুলে মৃদু করস্পর্শে সচকিত হইয়া উমা মুখ তুলিল। সতীনাথ পাশে বসিয়া গভীর স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিল—"এমন সময় শুয়ে যে, কোন অসুখ করে নি ত? এ কি, কাঁদ্‌চ উমা?"

উমার চোখের জল স্বামীর আদরে বন্যার বেগে বাহির হইয়া পড়িল। সতীনাথ বিপন্নভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; কি হইল জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসে কুলাইল না। দাদামহাশয় আসিয়াছিলেন, সে জানে, তার পর উমার সন্ধান না পাইয়া সে তাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল, ইতিমধ্যে কি এমন ব্যাপার ঘটিয়া গেল। কিছুক্ষণ বিনা বাধায় কাঁদিতে পাইয়া উমার মনের বেদনাটা অনেকখানি কমিয়া আসিলে, স্বামীর উদ্বেগব্যাকুল মুখের পানে চাহিয়াই মনে হইল, এমন ছেলে মানুষের মত কান্না তাহার ভাল হয় নাই। সে এইবার চোখ মুছিয়া শান্ত হইয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—"দাদামশাই আমাদের হুগলী যেতে বলে গেলেন—কবে যাবে?"

সতীনাথ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আদরের সুরে কহিল, "এই জন্যে কান্না—এমন ভয় পেয়েছিলুম আমি!" পত্নীর শিশিরাশ্রু-মণ্ডিত পরিম্লান পদ্মের মত মুখের পানে চাহিয়া পরিহাসের যে ইচ্ছা মনে জাগিয়াছিল, সেটি তখন আর

মুখে ফুটিল না। এ গৃহ ছাড়িয়া গেলে পুনঃপ্রবেশের ভয় এবার তবে সে নিঃসংশয়েই ছাড়িয়াছে। উমার রোদনারক্ত মুখের পানে চাহিয়া ব্যথায় তাহার চিত্তও ভরিয়া উঠিতেছিল। বালিকাকে বিনা কারণে দীর্ঘদিন আত্মীয়বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করাইয়া অকারণে তাহাকে কতই না মর্ম্মপীড়িত করিয়াছে। এমন কান্না হয়ত গোপনে সে আরও কতদিন কাঁদিয়াছে, সে তাহার খবরও ত লয় নাই। একটুখানি আবেগের সহিত সতীনাথ উমাকে কাছে টানিয়া তাহার কপোলে কপোল রাখিয়া কহিল—"কবে যাবে বল, সেই দিনই পাঠিয়ে দোব।" একটুখানি হাসিয়া রহস্যের সুরে পুনরায় কহিল—"এখন বোধ হয় বিশ্বাস কর্‌তে পার, বাড়ী ছেড়ে যেখানেই যাও, বাড়ীর সব দোরই চিরকাল তোমার পথ চেয়ে খোলা থাক্‌বে।"

উমা স্বামীর বাহু বন্ধনে ধরা দিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল—"কেন বন্ধ কল্লে না, তা—এর চেয়ে সেও যে ঢের ভাল ছিল।"

সতীনাথ স্ত্রীকে আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্তি দিয়া অভিমানক্ষুণ্ণ সংশয়পূর্ণকণ্ঠে কহিল—"কিসের চেয়ে উমা? আমার ভালবাসার চেয়ে? এ যদি তোমায় ব্যথা দেয়, খুলে বল, তুমি যাতে সুখী হবে, আমি তাই করব। আমার কাছ থেকে দূরে থেকে যদি সুখী হও—"

"ওগো না গো না, কেন তুমি আমার জন্যে এত সইলে? আমি ত তাঁর পায়ের ধূলোরও যোগ্য নই—"

সতীনাথ এবার সংশয়ে বিস্ময়ে ব্যাকুল-নেত্রে স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল—প্রশ্ন করিল না। কথাটা খুলিয়া বলা উমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, প্রগল্‌ভার মত কেমন করিয়াই বা স্বামীকে উপদেশ দিবে? অথচ না বলিলেও যে নয়। হয়ত তাহার জীবন-দীপ কখন এতটুকু ঝড়ের বাতাস না উঠিতেই নিবিয়া যাইবে। আর ত কখনও দেখা হইবে না। সতীনাথের চরিত্র উমার অজ্ঞাত নয়। স্বামী যে নিজ হইতে কোন প্রশ্ন করিবেন—এমন সম্ভাবনাও নাই। সে সতীনাথের ডানহাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া চেষ্টা করিয়া, মনের দ্বিধা কাটাইয়া কহিল—"কল্যাণী দিদির খুব অসুখ, তিনি আমাদের দেখ্‌তে চেয়েছেন।"

ধৃত হাতখানির মৃদু কম্পনে ও অত্যধিক শীতলতা অনুভব করিয়া বুদ্ধিমতী উমা তাঁহার মনের দ্বিধা বুঝিয়া আবার কহিল—"যাবে ত? কেন যাবে না? সত্যি বল্‌চি ক'দিন আমি রাত দিন তাঁর কথাই ভেবেচি। তোমরা কুলীন, অনেক বিয়ে তোমাদের ত—"

ভর্ৎসনাপূর্ণ চোখে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া সতীনাথ নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, আর যে যাহা বলুক, তোমার মুখে একথা সাজে না। আমার মনের সব কথাই ত আমি তোমায় বলিয়াছি, তবে এ পরীক্ষা আর কেন?

কিন্তু চুপ করিয়া থাকিবার দিনও যে কাটিয়া গিয়াছে! প্রতিকারের সময় যদি আর নাই পাওয়া যায়, যে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যে ধনী হইয়া বসিয়াছে, ভিক্ষুকের মত তাহার কাছে আবেদন জানাইয়াও তবে কি তিনি এতটুকুও পাইবেন না। দাদামহাশয় বলিয়াছেন—কল্যাণী উমাকে ভালবাসেন। এতবড় শত্রুকেও যিনি ভালবাসিতে পারেন, উমা তাঁহার জন্য কিছুই করিতে পারিল না? এইটুকু, এই মরণ পথের শেষ স্মৃতি সুখটুক, এ টুকুও কি উমা তাঁহাকে তবে দিতে পারিবে না? স্বামীর ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সে মুখ ফিরাইয়া লইল। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল—'তিনি দেখ্‌তে চাইলেন, তবু যাবে না? বল্‌বে না, যে শুধু ভুলের জন্যে তাঁকে এত দুঃখ দিলে—নিজেও পেলে? ক্ষমা চাইবে না? এ সময়েও তাঁকে সুখী কর।"

প্রবল অশ্রুধারায় উমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। খাটের ডাণ্ডার উপর পিঠ রাখিয়া সতীনাথ বসিয়াছিল—এবার করতল দিয়া মুখ ঢাকিল। তাহার অনাবৃত প্রশস্ত বক্ষের শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুত উত্থান পতনে মানসিক উচ্ছ্বাস দমনের প্রয়াসও উমার অলক্ষিত রহিল না। সহানুভূতিতে মন তাহার দ্রব হইয়া স্বামীর মর্ম্মব্যথার পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেছিল। তবু সে ব্যথার মধ্যেও একটা অস্ফুট সান্ত্বনার আনন্দের ক্ষীণ আভাসও বুঝি গোপনে ছিল। এমন হৃদয় এমন করিয়া যাহার জন্য কাঁদে, কে বলে সে দুভাগিনী? কে জানে উমার কপালে এমন শুভদিন কখনও আসিবে কি না, এত সৌভাগ্য তাহার কপালে আছে কি!

অনেকক্ষণের পর চোখ মুছিয়া শান্ত হইয়া সে স্বামীর মুখে আচ্ছাদিত হাতখানা সরাইয়া মৃদুস্বরে কহিল—"চল আমরা দু'জনে গিয়ে তাঁর কাছে মাপ চেয়ে আসি।—মাপ তিনি আমাদের করেইচেন, সেবার পুণ্যে কেন বঞ্চিত হব?"

"আজই যাবে কি—জ্যেঠামহাশয়কে বলে' তা হলে ঠিক করে আসি।"

মানুষের ইচ্ছা ও বিধাতার কার্য্য পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কখনও চলে না, উমার ইচ্ছাও পূর্ণ হইল না। রুদ্রকান্তের পীড়া সহসা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠায়, মনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মনের ভিতর রুদ্ধ রাখিয়াই সতীনাথ ও উমা জ্যেঠামহাশয়ের রোগ-শয্যার দুইদিকে নিজেদের অচল আসন পাতিয়া রহিল। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবে? বিশেষতঃ সতীনাথের

যাওয়া যে একেবারেই অসম্ভব। রোগ ত সাধারণ নিয়মে আবদ্ধ নয়, কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, রোগের আবির্ভাব যেমন অতর্কিত ঘটিয়াছে, মৃত্যুও তেমনি আকস্মিক হইতে পারে। রোগীর মনের শক্তিও ক্রমে যেন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। কথা কহিতেও ক্লান্তি বোধ হয়, এমনি দুর্ব্বলতা। আহারেও রুচি নাই, কেবল উমার হাতে তাহারই অনুরোধ-রক্ষার্থ যেটুকু আহার করেন—অন্যের দ্বারা সেটুকুও সম্ভব হয় না। দৃষ্টিশক্তিও দিনের দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল!

মুরারি, মার অসুখের অছিলা করিয়া সেই যে সেদিন কাহাকেও না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তারপর প্রায় মাসাবধি হইয়া গেল সে আর ফিরিয়া আসিল না। সতীনাথ উমার অনুরোধ জানাইয়া তাহাকে আসিবার জন্য পত্র দিয়া আজ উত্তর পাইয়াছে। মুরারি, বৌঠাকুরাণীর অসীম দয়ার জন্য চিরকৃতজ্ঞতা জানাইয়া শেষে লিখিয়াছে—"কলিকাতার বাস আমি চিরজন্মের মতই উঠাইয়াছি। তিনি যেন নিজগুণে তাহার অকৃতজ্ঞ দেবরকে ক্ষমা করেন। পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিতীর্থ পল্লীভবন আর পল্লীজীবনই আমার পক্ষে নিরাপদ স্থান। মাতৃস্বরূপা বধূঠাকুরাণী যেন তাহার সকল ভুলভ্রান্তি অপরাধ ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—ঐশ্বর্য্যের ধূলিজঞ্জাল ঝাড়িয়া সে যেন শুদ্ধচিত্তে তাহার নবজীবন গঠন করিতে পারে।"

চিঠি পড়িয়া উমার চোখ দিয়া দুই ফোটা অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। একটা দুর্ব্বোধ্য চিন্তার বিশ্লেষণে অসমর্থ হইয়া সতীনাথও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। আবাল্যের সাথী, খেলার সঙ্গী, যৌবনের বান্ধব মুরারি আজ তাহাদের চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রুদ্রকান্তকে সতীনাথ একথা জানাইল না, মার অসুখ, তাই সে দেশে গিয়াছে, এই কথাই প্রচার রহিল।

১৬

অবসান

মাঘ গিয়া ফাল্গুন আসিল। নব বসন্তের আগমনে আমের গাছে 'বৌল' ধরিয়া, সজিনার ফুল ফুটিয়া মধুগন্ধে দিক ভরাইয়া দিল! পুষ্পিত তরু, ফুলভারে নমিতা মাধবীলতা বসন্তলক্ষ্মীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিল। বিশ্বনাথের ছোট বাগানটিও নব বসন্তের অভ্যুদয়ে ফুলে পাতায় ভরিয়া উঠিতেছে। শীতাগমে যে সব গাছের পাতা ঝরিয়া গিয়াছিল, পুষ্পধন্বার শরনির্ম্মাণের জন্যই যেন সে সব গাছে আবার নব পত্রাবলী উদ্গত হইতেছে।

শীতাপগম ধরণীর শুষ্কবক্ষে নবজীবনের পুলকচাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিলেও,

কল্যাণীর তৈলহীন- অনুজ্জ্বল জীবন-প্রদীপ আর উজ্জ্বল করিতে পারিল না। প্রকৃতির বক্ষে যে সুন্দর ফুলটি মৃদু সৌরভ ছড়াইয়া ফুটিয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহার লাবণ্যের সতেজ দলগুলি ঝরিয়া পড়িতেছিল। অনিন্দ্য-মুখে মৃত্যুর ছায়া অতি দ্রুতগতিতে আপন শক্তির চিহ্ন আঁকিয়া তুলিতেছিল। বিদ্যানাথ অন্নপূর্ণা রাজলক্ষ্মী ও অনাথের অক্লান্ত স্নেহ যত্ন সেবাতেও রোগের গতি এতটুকুও ফিরিল না। তারাসুন্দরী যেন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত সেবা করেন, বাকী সময়টুকু চুপ করিয়া মেয়ের কাছে বসিয়া থাকেন।

মা'র মুখের পানে চাহিয়া কল্যাণীর মনের আনন্দও যেন কমিয়া আসিতেছিল। সে চলিয়া গেলে কেমন করিয়া তাহার মা বাঁচিয়া থাকিবেন! এত বড় শোকের আঘাত যদি সহিতে না পারেন—শোকে মৃত্যু—এ মৃত্যু তপ্রার্থিত মৃত্যু নয়! এত বড় অগ্নিপরীক্ষা কেমন করিয়াই বা তিনি সহিবেন? অন্ধকারে কল্যাণীর চোখ দিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়ে! সে মনে মনে বলে—"ঠাকুর, মা আমার তোমাকেই সার করেচেন। আমি তাঁর সন্তান আসিনি, শত্রু এসেছিলুম। মা'কে আমার তোমার পায়েই রেখে যাব ঠাকুর, তুমিই তাঁকে দেখো!"

* * * *

"দিদি—রাত কি শেষ হ'ল ভাই?"

অন্নপূর্ণা কল্যাণীর মাথার কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। পাখা রাখিয়া উঠিয়া একটা জানালা অল্প একটুখানি খুলিয়া দিল। জানালার কাচের সার্সি নাই, কাঠের দরজা; বেশী খুলিলে পাছে ঠাণ্ডা লাগে তাই সে একটুখানি খুলিয়া কহিল—"উমা আর একটু পরেই আস্‌বে, ভোরের গাড়ীতে বেরুবে—'তার' করেচে।"

কল্যাণীর বারবার নিশাবসান প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে অন্নপূর্ণা বুঝিয়াছিল, তাহাত ব্যাকুলচিত্ত—কাহার দর্শনাশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ভীতচিত্তে সে ভাবিতেছিল, দীর্ঘ দিনের সংযম-সাধনার পর আজ কেন তাহার এ অশান্ত ব্যাকুলতা? তবে কি কল্যাণী আজ মুক্তির পরোয়ানা পাইয়াছে?—রাত্রে মৃদুস্বরে সে যেন একবার বলিয়াও ছিল—"দিদি, দেখা কি তবে হ'ল না ভাই?" উমাকে সে অনেকবারই আশীর্ব্বাদ করিয়াছে; জ্বরের ঘোরে আর একজনের কাছেও মাপ চাহিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল—সে বুঝি তবে প্রলাপবাণী। তা নয়, সত্যই কল্যাণী এখানকার হিসাব মিটাইয়া ফেলিতেছে! কিন্তু তাও কি সম্ভব? ভগবান, এও কি তবে সহিতে হইবে? এতবড় রোগের যন্ত্রণা, এতখানি মনের যন্ত্রণা—যে হাসিমুখে চিরদিন সহিয়া আসিল, সে কেন আজ এই

অধৈর্য্য বারবার বিছানায় 'এপাশ ওপাশ' করিতেছে, সতৃষ্ণ চক্ষু দ্বারের পানেই ফিরিতেছে ?

সে রাত্রে বিদ্যানাথ ও অনাথ একবারও শয্যা গ্রহণ করেন নাই। বিদ্যানাথের চিরপ্রসন্ন মুখে বিষাদের ম্লান ছায়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া আছে। কেন এমন হইল ? দীর্ঘরাত্রি জাগরণের পর তারাসুন্দরী, অন্নপূর্ণা ও কল্যাণীর অনুনয়ে সবেমাত্র তাহারই শয্যাপ্রান্তে একটুখানি গড়াইয়া লইতেছিলেন। চোখ বুজিতে সাহস হয় না, কি জানি, এইটুকু অসতর্কতার অবসরে জীর্ণপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র বিহঙ্গটি যদি মুক্ত-আকাশে বাহির হইয়া পড়ে! তাই নিদ্রাহীন জ্বালাময় অপলক চক্ষু অন্ধকারেও চাহিয়া থাকে, বন্ধ হইতে পারে না।

অন্নপূর্ণা ফিরিয়া আসিয়া কল্যাণীর বিছানায় বসিয়া ঠাণ্ডা হাতখানি তাহার কপালে রাখিল। কল্যাণী তাহার হাতখানি টানিয়া মুদিত চোখের উপর বুলাইয়া লইয়া, মৃদুস্বরকে মায়ের কাণ এড়াইবার ইচ্ছায় মৃদুতর করিয়া কহিল—"কি ঠাণ্ডা হাত তোমার দিদি! তোমায় ছুঁয়ে থাক্‌লে আমার সব কষ্ট কমে যায়। আবার সেখানে যখন আমাদের দেখা হবে—"

"কলি—অত নিষ্ঠুর হোস্‌নে ভাই, এমন করে আমায় বিঁধিসনে—"

অন্নপূর্ণার রোদনরুদ্ধ-স্বরে সচকিত হইয়া তারাসুন্দরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। কল্যাণীর পীড়া বর্দ্ধিত হওয়ায় বিদ্যানাথ নিজের বাড়ীতেই তাহাকে আনিয়াছিলেন। দাদামহাশয়ের প্রার্থিত সঙ্গলাভে কল্যাণীরও আর কোন দুঃখ ছিল না। বিদ্যানাথকে ঘরে আসিতে দেখিয়া কল্যাণী মৃদু হাসিয়া কহিল—"দিদি ভেবেচে, কেঁদে জিত্‌বে—তা পার্‌বে না, দাদামশাই।"

বিদ্যানাথ তাহার পাশে বসিয়া শান্তস্বরে কহিলেন—"এখন কেমন আছ দিদি, বুকের বেদনটা কমেছে কি ?"

কল্যাণী হাসিমুখে কহিল—"বেশ আছি দাদামশাই। আজ যেন মনে হচ্ছে আমার সব যন্ত্রণা ফুরিয়ে গ্যাছে।" অনাথকে নতশিরে ম্লানমুখে পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সে মৃদু হাসিয়া কহিল—"অনাথদাদা, আজ আপনার ছাত্রেরা স্তব পাঠ কল্লেন না যে ?

কল্যাণীর নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া বিদ্যানাথ আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। গৃহে মৃত্যু তাহার আগমনের ছায়া বিস্তার করিতেছিল। গৃহবাসী সকলেই গভীর শোকাচ্ছন্ন; ছাত্রেরা ব্যথিত-হৃদয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া আছে। সকলেই যেন গভীর বিষাদের সহিত কোন একটা অতর্কিত বিপদের সম্ভাবনা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে, চেষ্টা করিয়াও সে অনিশ্চিত চিন্তা ছাড়াইতে পারিতেছে

না। বিদ্যানাথ অনাথের পানে পূর্ণনেত্রে চাহিতে অনাথ নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

বাহিরে একত্র-গ্রথিত মৃদু গম্ভীর-স্বরে অনাথ ও তাহার ছাত্র-মণ্ডলীর উচ্চারিত স্তবগীতি ভোরের বাতাসকে শব্দিত করিয়া তুলিল। অন্ধকার অপসারিত করিয়া উষার আলো জগতের বক্ষে ছড়াইয়া পড়িল। বাহিরে খাঁচায় টাঙ্গান টিয়া-পাখীটিও বিদ্যানাথের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে "তারা ব্রহ্মময়ী" বলিতেছিল।

কল্যাণী চোখ মুদিয়া শান্তভাবে সেই চিরশ্রুত স্তবগাথায় আজ এক অভিনব আনন্দময় ভাবের স্পন্দন অনুভব করিতেছিল। হৃদয়তন্ত্রী সেই সুরের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল। বিদ্যানাথ শুনিলেন, তাহার ঈষদুদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধরের ভিতর দিয়া ক্ষীণ-স্বরে সেই শব্দের প্রতিধ্বনিই বাহির হইতেছিল,—

"ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়—
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়—
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়"॥

ক্রমে কল্যাণীর কম্পিত ওষ্ঠ স্থির হইয়া গেল। সকলেই উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হইয়া তাহারাই হৃৎস্পন্দনের মৃদু শ্বাস শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া রহিয়াছেন। বিদ্যানাথ তাহার শ্লথ হস্ত নিজের হাতে তুলিয়া লইতেই সে চোখ চাহিয়া মৃদু হাসিল—"দাদামশাই, ঐ যে আনন্দময়ের আনন্দমূর্ত্তি আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। কি সুন্দর আলো!"

কণ্ঠস্বরের অত্যধিক ক্ষীণতায় বাকী কথা আর শোনা গেল না। অন্নপূর্ণার উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল দৃষ্টি ঘন ঘন মুক্তদ্বারের বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল, মনের উদ্বেগ বাহিরেও প্রকাশ পাইল।

"সতীর ট্রেণের সময় হল বুঝি, ট্রেণ একটা দাঁড়াল না?"

কল্যাণী চোখ চাহিতেই, সহসা নিবাত নিষ্কম্প দীপের মত স্থিরমূর্ত্তি মায়ের চোখ পড়িতেই, তাহার আনন্দোৎফুল্ল মুখখানি ম্লান হইয়া আসিল। অস্বাভাবিক দীপ্তিপূর্ণ চোখে জলের রেখা প্রকাশ পাইল। মা'র হাতখানি মৃদু আকর্ষণ করিতেই, তারাসুন্দরী তাহার শ্রম বাঁচাইয়া ঈষৎ নত হইলে—হাতখানি সে নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। গভীর মিনতি-ভরা চোখে বিদ্যানাথের দিকে চাহিয়া কহিল—"মা আমার আপনাকেই আশ্রয় করেচেন দাদামশাই।"

বিদ্যানাথ তাহার বক্তব্য বুঝিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"মা যে আমারও মা দিদি, বিশ্বনাথ ওঁকে শান্তি দেবেন।"

তারাসুন্দরীর অন্তরের যে ব্যাকুল ক্রন্দন ব্যথিত বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার বৃথা প্রয়াসে ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মত গর্জ্জন করিতেছিল, বদ্ধ ওষ্ঠের বাহিরে তাহার এতটুকু ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও বাহির হইল না। অন্নপূর্ণা ও রাজলক্ষ্মীর অশ্রুমলিন মুখে আশঙ্কা ঘনায়িত হইয়া আসিল। রাস্তায় গাড়ী চলিয়া যায়, আর ঘরের সব কয়টি চোখ ব্যাকুলভাবে চাহিয়া দেখে। অন্নপূর্ণা মনের উদ্বেগ আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না—তবে কি সে আসিল না? বিদায়-মুহূর্ত্তে চোখের দেখা—অনির্দ্দেশ্য পথের শেষ সম্বল—এটুকুও কি তবে ফেলিয়া য়. .ব? ওগো নিষ্ঠুর—ওগো পাষাণ—একবার এসো। শুধু চোখের দেখা—এটুকু ি ়ল তোমার রাজভাণ্ডার খালি হইয়া যাইবে না; ওরে পাষাণী উমা, সর্ব্বস্ব লইয়া ‘তটুকুর লোভও ছাড়িতে পারিলি না?

কতকগুলি ফুটন্ত বেলফুল আনিয়া অনাথ কল্যাণীর বিছানায় রাখিলে, বিশ্বনাথ মৃদুস্বরে কহিলেন—“ষ্টেশনে গেলে হ'ত না? সে ত এখানকার পথঘাট কিছু জানে না।”

কল্যাণীর দুর্ব্বল হাতখানা বিশ্বনাথের পায়ের ধূলা লইবার জন্যই যেন তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। ওষ্ঠাধরের মৃদু স্পন্দনে উচ্চারিত হইল—“বিশ্বনাথ!” বাহিরে ছাত্রমণ্ডলী তখনও স্তবপাঠ করিতেছিল—

“তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম—
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ” ॥

শুনিতে শুনিতে বিশ্বনাথেব দুই চোখ দিয়া দুইটি জলের ধারা গড়াইয়া পড়িল। শুনিতে শুনিতে কল্যাণী শান্তিপূর্ণ গভীর ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িল। বিশ্বনাথ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—“দুর্গে।”

বাজলক্ষ্মী গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই অন্নপূর্ণা কল্যাণীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—“কল্যাণী, দিদি আমার!” তারাসুন্দরী আস্তে আস্তে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—“চুপ কর অন্নপূর্ণা, এখনি ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।” অন্নপূর্ণা উর্দ্ধস্বরে কাঁদিয়া আবার লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—“কলি যে আমাদের চলে গেল কাকীমা!”

তারাসুন্দরী পলকহীন স্থির-নেত্রে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কল্যাণী কোথায় চলিয়া যাইবে, মা'র কোল ছাড়া তাহার ত এ জগতে আর কোথাও স্থান হয় নাই! সে যে মা'কে ছাড়িয়া কখনও কোথাও যাইবে না

বলিয়াছিল—তবে সে কোথায় যাইবে? সে মুখে এতটুকু বিকৃতি নাই, ঠোঁটের মৃদু মধুর হাসিটুকু তেমনি উজ্জ্বল রেখায় আঁকা। এ মুখ কি চিরনিদ্রার? তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ওগো না গো না, ও আমার ঘুমিয়ে পড়েচে। তোমরা সব চুপ করে থাক, বাছার এখনি ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

বিশ্বনাথ ভীত হইয়া, তাঁহার মোহাবিষ্ট জ্ঞানকে সজাগ করিবার অভিপ্রায়ে অশ্রুবদ্ধ গাঢ়স্বরে কহিলেন—"তুমিও ওকে ডাক মা—তোমার ডাক শুনে যদি ওর ঘুম ভাঙ্গে! আর কেউ ত এ ঘুম ভাঙ্গাতে পারবে না!"

রাস্তায় একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। সে শব্দ অন্য কাহারও কানে না গেলেও বিশ্বনাথের গিয়াছিল। তিনি বাহিরে আসিতেই উমা তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া রাস্তার ধূলার উপরেই লুটাইয়া প্রণাম করিল। ভিতরের ক্রন্দন কোলাহল তাহাদের অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল; মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছু প্রয়োজন ছিল না।

উমা রোদনরুদ্ধস্বরে ডাকিল—"দাদামশাই।"

"দিদি, বড় দেরী করে এলি রে—নিরঞ্জন হযে গ্যাছে!" উমার পশ্চাতে স্তম্ভিত, অভিভূত-প্রায় সতীনাথকে দেখিয়া, তাহার গায়ে স্নেহের হাত বুলাইয়া বুকে টানিয়া কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন—"দাদাভাই, বিজযাকৃত্য তোমাকেই উপস্থিত থেকে কর্‌তে হবে। লৌকিক বিবাহ নাই হোক, সেই তোমার প্রথমা স্ত্রী। তার সাধনার সিদ্ধি এখানকার সঙ্কীর্ণ পরিচ্ছিন্ন জীবনের নয়—অনন্ত জীবনেব নয়—অনন্ত জীবনের! মৃত্যুজয়ী প্রেমের মৃত্যু নেই—শুধু রূপভেদ। উমা তোর জন্মায়তি দিদিকে সিঁদূর আলতায় সাজিয়ে, পায়ের ধূলো নিয়ে নিজেকে ধন্য করে নে ভাই! তোদের আশীর্ব্বাদ করে সতী সতীলোকে চলে গ্যাছেন—'শিব শম্ভো।'

সমাপ্ত

মিত্রালয়, ১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
পি, বি, প্রেস, ১৮, মারকুইস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
চণ্ডীচরণ সেন কর্তৃক মুদ্রিত